ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে

অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ

ড. এম ওমর চাপরা

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে

অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ

[বিগত দু'শ বছর যাবৎ ভ্রান্ত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে ওঠা প্রচলিত অর্থশাস্ত্র কী কারণে মানব জাতির সমস্যাবলী আলোচনায় ও সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে কী ধরনের অর্থশাস্ত্র প্রয়োজন- এ সকল বিষয়ের উপর লিখিত এক অনবদ্য গ্রন্থ।]

মূল
ড. এম ওমর চাপড়া

ভাষান্তর
ড. মাহমুদ আহমদ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে
অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ

মূল : ড. এম ওমর চাপরা
ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমদ

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন,
ঢাকা- ১২৩০, ফোন : ৮৯২৪২৫৬, ৮৯৫০২২৭ ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
Email:biit_org@yahoo.com, Web: www.iiitbd.org.

প্রকাশকাল
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৯ ফাল্গুন ১৪১৭
১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩২

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-70103-0029-0

মূল্য : ৩০০ টাকা US$ 10

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭ ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

'Islami Dristrikon Thake: Arthosashtrer Vobissath' (The Future of Economics: An Islamic Perspective) written by Dr. M Umer Chapra and translated into Bangali by Dr. Mahmood Ahmed, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT). House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka- 1230. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227, Email:biit_org@yahoo.com, Web: www.iiitbd.org. Price: Tk. 300 US$ 10

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

একবিংশ শতাব্দিতে এসে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মানুষকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। মুসলমান পণ্ডিতগণই শুধু নয়, অনেক অমুসলিম অর্থশাস্ত্রবিদও বর্তমানে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অক্ষমতা, ব্যর্থতা ও ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে কেবল সচেতনই হননি, প্রচলিত অর্থশাস্ত্র বাতিল করে এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করার দাবীও তুলেছেন। দু'শত বছর যাবৎ গড়ে তোলা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে সবই কি ভুল? অবশ্যই তা নয়। তবে, অনেক ভ্রান্ত-নীতি ও ভ্রান্ত-দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বখ্যাত ইসলামি অর্থশাস্ত্রবিদ ড. এম ওমর চাপরা তার লিখিত The Future of Economics: An Islamic Perspective গ্রন্থে ইবনে খালদুনসহ প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে এ জাতীয় সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলা ভাষা-ভাষি পাঠকদের মধ্যে এ জাতীয় গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিত সামনে রেখেই গ্রন্থটির ভাষান্তর উপস্থাপন করা হল, যদিও ভাষান্তর কখনই মূল রচনার বিকল্প নয়।

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মাহমুদ আহমদ যত্নসহকারে গ্রন্থটি ভাষান্তর করেছেন। আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়াতে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন।

আশা করি গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পাঠকদের চিন্তার জগতকে নাড়া দেবে এবং তাদেরকে আলোকিত মানুষ হতে সাহায্য করবে।

ঢাকা
২১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং

এম আযীযুল হক
প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	xi
মুখবন্ধ	xii
সূচনা	২৭
ইসলামি প্রেক্ষাপটে অর্থশাস্ত্রের কোন প্রয়োজন আছে কি?	২৭
রূপকল্প	২৮
কৌশলাদি	৩৪
বিশ্ববীক্ষার ভূমিকা	৩৭
কর্মপদ্ধতি	৩৮
পরিশেষে আমরা কোথায় যাচ্ছি?	৪০
১ম অধ্যায়	
প্রচলিত অর্থশাস্ত্র	৪৩
পাহাড় প্রমাণ অগ্রগতি	৪৩
লক্ষ্যসমূহ ও বিশ্ব-বীক্ষার মধ্যস্থিত বিরোধ	৪৪
বিশ্ববীক্ষা	৪৫
যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষ	৪৭
প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)	৪৯
কেইন্সের তত্ত্বের ঐকতান এবং তার সমাপ্তি	৫৫
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫৬
কঠিন শর্তসমূহ	৫৮
অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব	৬২
পদ্ধতি	৬৬
কাঙ্ক্ষিত সংস্কার	৬৮
পারিবারিক ও সামাজিক সংহতিতে ভাঙ্গন	৬৯
একটি হতাশা	৭১
বিপদে আশার আলো	৭২
ইসলামি অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা	৭৭

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী	৭৯
মৌলিক বিষয়সমূহ	৮০
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইসলামি রূপরেখা	৮৫
যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষ	৮৫
প্রত্যক্ষবাদ	৮৯
ন্যায়বিচার	৮৯
সর্বোচ্চ পারেটো মান?	৯৩
দক্ষতা	৯৩
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চলবে না?	৯৬
হিসবাহ	১০০
একনায়কতন্ত্র চলবেনা	১০১
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব: আদর্শ এবং বাস্তবতা	১০৩

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় রূপকল্পের মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে কি?	১০৫
মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদি আন্দোলন	১০৭
যুক্তিবাদিদের পতনের কারণ	১১৫
আল-গাজ্জালী ও ইবনে রুশদ	১১৯
পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার আন্দোলনের (Enlightenment) সাথে তুলনা	১২৮
মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদের ভবিষ্যৎ	১৩০
অর্থশাস্ত্র ও ফিকাহ শাস্ত্র	১৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি অর্থনীতি: কেমন হওয়া উচিত?	১৩৯
ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা	১৩৯
লক্ষ্যসমূহ ও কর্মকৌশল	১৪২

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিশ্বাসের ভূমিকা — ১৪৩
মানবসত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং ধন-সম্পদ — ১৪৬
সামাল দেওয়া কি অসম্ভব? — ১৪৭
সংজ্ঞা ও আওতা — ১৪৯
কার্য-প্রণালী — ১৫৪
কতিপয় যৌক্তিক পদক্ষেপ — ১৫৬
একটি সাবধান বাণী — ১৬২
বিজ্ঞান, অদৃশ্য বস্তু ও ভাববাদি মতামত — ১৬৩
বাস্তবানুগ অনুমান — ১৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

চিরায়ত ইসলামি অর্থশাস্ত্রের আর্থ-সামাজিক গতি-প্রকৃতি — ১৬৭
ইবনে খালদুনের অবদান — ১৬৮
আন্ত:শাস্ত্রীয়, প্রগতিশীল কাঠামো — ১৭০
জনগণ, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রের ভূমিকা — ১৭৪
শরীয়াহ'র ভূমিকা — ১৭৯
ইবনে খালদুনের অন্যান্য অবদানসমূহ — ১৮৪
সরবরাহ ও চাহিদা — ১৮৪
রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন — ১৮৭
পরবর্তি কালের অগ্রগতি — ১৯০
আল-মাকরিজী — ১৯২
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী — ১৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমানদের পতনের কারণ: মুসলিম ইতিহাসে ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ — ১৯৫
সূচনা — ১৯৫
প্রথম ভাগ: ইসলাম ও নৈতিক অবক্ষয় কি পতনের কারণ? — ১৯৯
ইসলাম কি পতনের কারণ? — ১৯৯

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানুষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আমুল পরিবর্তন	২০১
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	২০২
নগর সমৃদ্ধি	২০৬
জ্ঞানের অগ্রগতি	২০৬
কারণটি কি নৈতিক অবক্ষয়?	২০৯
দ্বিতীয় ভাগ: ঘটনার কারণ ও তার ফলাফল	২০৯
ভুল পদক্ষেপ: খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসান	২০৯
খিলাফত ও গণতন্ত্র	২১০
অবৈধ ক্ষমতা সুসংহতকরন	২১৪
শরীয়াহ্'র নিয়ন্ত্রক প্রভাব	২১৮
আয়ের সাথে সঙ্গতি-বিহীন জীবন যাপন: বাজেট ভারসাম্যহীনতা	২১৯
ভূ-সম্পত্তি অনুদান প্রথা (ইকতা ও তিমার্স)	২২৩
অন্যায্য কর ব্যবস্থা	২২৬
মুদ্রার অবমূল্যায়ন	২২৯
বৈদেশিক ঋণ	২৩২
দুর্নীতি ও রাজনৈতিক পদ-পদবী বিক্রয়	২৩৩
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়	২৩৬
সরকার ও জনগণ-এর সংহতিতে ফাটল	২৪৩
ফিকহ্শাস্ত্রের স্থবিরতা	২৪৫
সূফীবাদের ভূমিকা	২৫০
নারীর সামাজিক অবস্থানের অবনতি	২৫২
শিক্ষা ক্ষেত্রে অবক্ষয়	২৫৬
তৃতীয় ভাগ: মুসলিম ইতিহাসের কতিপয় শিক্ষা	২৬১
প্রথম শিক্ষা	২৬৩
দ্বিতীয় শিক্ষা	২৬৪
তৃতীয় শিক্ষা	২৬৫
চতুর্থ শিক্ষা	২৬৬
পঞ্চম শিক্ষা	২৬৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোমল অবতরন	২৬৭
শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতা	২৬৮
সপ্তম অধ্যায়	
সাম্প্রতিক পুনর্জাগরণ- একটি সমীক্ষা	২৭১
সূচনা	২৭১
শত শত বছরের নীরবতা	২৭১
নিদ্রা-ভঙ্গ	২৭৪
প্রথম ভাগ: মুদ্রা, ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতি	২৭৬
রিবা'র জটিল প্রশ্ন	২৭৬
বিকল্প	২৭৮
যৌক্তিক ভিত্তি	২৮১
স্বপ্ন ও বাস্তবতা	২৮৪
ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা	২৮৫
প্রাথমিক সমস্যাসমূহ	২৮৬
কতিপয় সমালোচনা	২৯০
সমালোচনার মূল্যায়ন	২৯২
গোটা অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরণ	২৯৮
মূল্যায়নের মাপকাঠি	২৯৯
পাকিস্তানের উপাখ্যান	৩০০
ইরান ও সুদানের উপাখ্যান	৩১০
মুদ্রা ব্যবস্থাপনা	৩১৫
যে সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি	৩১৯
জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মূল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপন	৩২১
আর্থিক দায় সমূহের বিলম্বিত নিষ্পত্তি	৩২২
সমাপনী মন্তব্য	৩২৫
দ্বিতীয় ভাগ: সামষ্টিক অর্থনীতি ও এর ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি	৩২৯

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

সামষ্টিক অর্থনীতি	৩২৯
অভাব মেটানো	৩৩০
আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণ কর্মসংস্থান	৩৩২
বৈষম্যহীন বন্টন ব্যবস্থা	৩৩৮
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	৩৪০
ব্যাষ্টিক অর্থনীতি	৩৪৮
তাত্ত্বিক ভিত্তি	৩৪৯
উপসংহার	৩৫২
অসমাপ্ত কাজ	৩৫৪
তৃতীয় ভাগ: সরকারী অর্থায়ন	৩৫৬
করারোপ: যাকাত	৩৫৭
অন্যান্য কর	৩৫৯
ব্যয় নীতিমালা	৩৬৫
নিয়ন্ত্রিত বাজেট-ঘাটতি	৩৬৮
অষ্টম অধ্যায়	
ভবিষ্যত কর্মপন্থা	৩৭১
কোথা থেকে শুরু করা যায়?	৩৭১
রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	৩৭২
শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম সফল হতে পারে কি?	৩৭৪
ইসলামের পুনর্জাগরণ কি কোন কাজে আসবে?	৩৭৭
ইসলামি অর্থনীতি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি?	৩৮০
নৈতিক মূল্যবোধ এবং পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি ব্যতীত চলা সম্ভব কি?	৩৮২
প্রতিষ্ঠান কেন প্রয়োজন?	৩৮৩
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে কি করা যেতে পারে?	৩৮৬
ভবিষ্যত কর্মপন্থা	৩৮৭
প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন একটি কাজ	৩৮৮
গ্রন্থ -তালিকা	৩৯২

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এ গ্রহে মানুষের অস্থিত্বের মতই প্রাচীন। সে রকমই পুরনো এ সব সমস্যা সমাধানে মানুষের প্রয়াস, কোন রকমে দিন পার করার প্রয়াসই শুধু নয়, জীবনকে আরো আরামপ্রদ করার জন্যে এবং মানুষের রুপকল্প অনুযায়ী বিষয়গুলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। ভোগ করবো কি? কিভাবে উৎপাদন করবো? কিভাবে বন্টন করবো? জানা ও কিছুটা অজানা কয়েক সহস্র বছর ধরে মানুষের চলমান সংগ্রামের মুল বিষয়গুলো হচ্ছে এ সব প্রশ্ন। যত অপরিপক্ক, পাকা কিংবা চমৎকার হোক না কেন অর্থনৈতিক ধারনা, লক্ষ্য, প্রযুক্তি, নীতি-কৌশল ও ব্যবস্থা সব সময়েই ছিল, কিন্তু 'অর্থনীতি' নামক সুশৃংখল শাস্ত্রটির উত্থান ঘটেছে কেবল মাত্র মধ্য আঠার শতকে। মুলধারার শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে মুলত: আধুনিক পুঁজিবাদের শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের প্রেক্ষাপটে। অর্থনীতির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে।

অতীতে অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও প্রয়াসসমুহ অনিবার্যভাবেই মানুষের নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতি, আশা-আকাংখ্যা ও ধ্যান-ধারনার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। মানুষের বিশ্ববীক্ষা, সমাজের রুপকল্প ও মুল্যবোধ কাঠামো কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বাঞ্চিত ও অবাঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপুর্ণেও দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেছে। স্বীয়-স্বার্থ, সম্পদ সৃষ্টি, ও সম্পদ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল কেন্দ্র-বিন্দুতে, তথাপিও প্রতিটি সংস্কৃতি ও ধর্মীয়-নৈতিক কাঠামোর নিজস্ব রীতি-নীতি ছিল – জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট'র ভাষায় মানুষের মনের উপর দু'টি প্রধান প্রভাবক ছিল: "মাথার উপরে তারকাজ্জোল আকাশ এবং ভেতরের নৈতিক বিধানাবলী"।

তবে, অর্থনীতির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দু'টো প্রধান বৈশিষ্ঠ রয়েছে। প্রথমত: অর্থনীতি বিকাশ লাভ করেছে একটি সমন্বিত শাস্ত্র আকারে, স্বীয়-স্বার্থ, বেসরকারী উদ্যোগ, বাজার ব্যবস্থা ও লাভ অর্জনকে কেন্দ্র করে, এরুপ একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ ছাঁচের মধ্যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক সাহসী প্রচেষ্টার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: এরুপ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত: অর্থনীতিকে সকল অতি-প্রাকৃতিক সম্পর্ক এবং ন্যায়-নীতি, ধর্ম ও নৈতিক মুল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। নতুন পদ্ধতিটি ছিল পুরোপুরি ইহজাগতিক, পার্থিব, প্রত্যক্ষবাদি ও বাস্তববাদি। সমস্যা-সমাধানমুলক বিবেচনাসমুহকে হয় পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া হলো অথবা সেগুলো সমস্যা-সংকুল বিবেচনায় দুরে ঠেলে দেয়া হলো, অন্তত: মুলধারার অর্থশাস্ত্রে।

www.pathagar.com

এরুপ সর্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্য দিয়ে অর্থশাস্ত্র তার দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তিমুল থেকে বহুদূরে সরে গেল এবং এক যান্ত্রিক সম্পর্কের জালে পরিণত হলো, যা সংখ্যাতত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ বাণী'র কৌশলের প্রতি সংবেদনশীল থাকলো।। ফলশ্রুতিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আগে যা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই সাম্য ও কল্যাণের বিবেচনাগুলো গৌণ হয়ে গেল, হারিয়ে গেল ও প্রায় তুচ্ছ হয়ে গেল। অর্থনীতির বর্তমানের সংকট, যা পুঁজিবাদেরও সংকট, এ প্রক্রিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শুমপেটার এ ব্যর্থ প্রয়াসকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করেছেন: "পুঁজিবাদ এমন এক প্রকার যুক্তিবাদি মানসিক কাঠামো তৈরী করে, যা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের নৈতিক কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার পর অবশেষে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানকেও আর সমর্থন করে না"।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা অর্থশাস্ত্র এখন আমাদের যুগের একটি বৃহৎ সামাজিক বিজ্ঞান। বিগত দু'শত বছর অর্থশাস্ত্রের সৃজনশীল বিকাশ, পদ্ধতি সংক্রান্ত শাস্ত্রের নিখুঁত ক্ষুরধারতা, বিশ্লেষনে গাণিতিক কৌশলের বহুল ব্যবহার ও অর্থশাস্ত্রীয় মুল্যায়নের মডেল ও ভবিষ্যৎ বাণী'র মাধ্যমে অধিকতর আধুনিকতা প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং পণ্য ও সেবার উৎপাদনে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির কারনে বিরাট জনগোষ্ঠী ও বিরাট অঞ্চলের জীবন ধারায় সংঘটিত আমুল পরিবর্তন বিশ্বের অগ্রসর শিল্পোনত দেশগুলোর অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা প্রতিফলিত হয়েছে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদে। পুঁজিবাদ ও মুলধারার অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এরুপ প্রাচুর্য ও শক্তির নব্য দুনিয়া সৃষ্টির পেছনের শক্তি। সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পিত সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অর্থশাস্ত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেতর থেকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উত্থিত হলো, কিন্তু, সত্তর বছরের কিছু বেশী কাল ধরে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জীবনকে প্রভাবিত করার এক শক্তিশালী অর্ন্তবর্তিকালের পর তা মিলিয়ে গেল এবং ব্যর্থ হয়ে গেল, যদিও তারা মাঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়নি (প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হচ্ছে চীন)।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখনও প্রাধান্য বিস্তার করেই আছে, যদিও বাজার ব্যবস্থার *প্রিমিয়াম মোবাইলের* মাধ্যমে মানব জাতির সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা রয়েছে মর্মে এর যে দাবী তা ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের সতর্ক বাণীর সব দিকের সহিত কেউ সম্পূর্ণ একমত নাও হতে পারেন (*New York Times*, 28 November, 1993), কিন্তু, পুঁজিবাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে এর যতখানি প্রাসঙ্গীক তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। তিনি বলেন: "যদিও সমাজতন্ত্র-কম্যুনিজমের পার্থিব আদর্শের পতন ঘটেছে, তবুও এ আদর্শ যে সব সমস্যা সমাধান করার কথা ছিল, সে সব সমস্যা কিন্তু রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

যেমন, সামাজিক ক্ষমতা ও অর্থের ক্ষমতার নির্লজ্জ ব্যবহার, যা কিনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা-প্রবাহের গতি-প্রকৃতি নির্ধারন করে থাকে এবং বিংশ শতাব্দির বৈশ্বিক শিক্ষা যদি প্রতিষেধকরুপে কাজ না করে, তাহলে বিশাল লাল ঘূর্নিঝড় আবারও পুর্ণোদ্যমে আসতে পারে"। এ বিষয়ে তাদের সাম্প্রতিক গবেষণা শেষ করে উইলিয়াম ওলম্যান ও এ্যান কোলামোস্কা চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা তুলে ধরে বলেন যে, "সৌভাগ্যবশত: অবাধ বিশ্ব পুঁজিবাদের গুণাবলী যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে, এবং তাও আবার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত স্থানসমুহে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত জমকালো ডাভোস সম্মেলনের মুল বিষয় ছিল বৈশ্বিক পুঁজিবাদের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা – যে সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর রিপোর্ট করতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের থমাস ফ্রীডম্যান যে সম্ভাবনা তুলে ধরেন তা হলো: "যারা বিশ্বকে একমাত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চান, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যই সবকিছু ও যেখানে কেবলমাত্র আর্থিক হিসাব-নিকাশই গুরুত্ব পেয়ে থাকে, তাদের বিরুদ্ধাচরনকারী কঠোর সমালোচনা সহজেই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এক সম্ভাব্য কঠোর নৈতিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে পারে" (*The Judas Economy: The Triumph of Capital and the Betrayal of Work* by William Wolman and Anne Colamosca, Addison-Wesley, New York, 1997, p. 221)।

নামকরা অর্থশাস্ত্রবিদগণের লেখায় গুরুত্বপুর্ণ দ্বিতীয় চিন্তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী এম আই টি'র পল স্যামুয়েলসন অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলোর এলোমেলো অবস্থা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, "এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যে, আমরা কোন পরশ পাথরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যা সব কিছু ঠিক্-ঠাক্ করে দিবে"। হার্ভাডের প্রফেসর অটো ইকস্টেন বলেন, "বাজার মুল্য সংক্রান্ত যথার্থ ভবিষ্যৎ বাণী করার সমীকরণ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই এক দফা মুল্যস্ফীতি পেছনে থাকি"। রবার্ট হেইলব্রনার আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, "অর্থশাস্ত্রবিদগণ বুঝতে শুরু করেছেন যে, তারা কিছুটা ছোট, দুর্বল ও সংকীর্ণ ভিত্তির উপর কিছুটা বড় আকারের ভবন গড়ে তুলে ফেলেছেন" (দেখুন, "Crisis in Economy or Economics" by Wilfred Beckerman, *New Statesman*, London, 23 January, 1976)।

বিগত দু'শতক ধরে নিয়ন্ত্রণ ধরে থাকা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দেওয়ালে এখন কেবল ফাটলই দেখা যাচ্ছে না, বরং অভিযুক্ত হচ্ছে এর খোদ তাত্ত্বিক ভিত্তিমুল, এর অন্তর্নিহিত অনুমানগুলো ও ভবিষ্যৎ আচরণের সফল ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

বাণী করায় এর ক্ষমতা। আলোচনা কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির *ভেতরে পরিবর্তনের* মধ্যেই সীমিত থাকছে না; বর্তমান বিতর্ক ক্রমবর্ধমানভাবে সরে যাচ্ছে *খোদ দৃষ্টিভঙ্গিরই রদবদলের প্রয়োজনীয়তার দিকে।* আমিতাই ইতজিয়নি লিখেছেন, "প্রতিষ্ঠিত উপযোগবাদি, যুক্তিবাদি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদি, নব্য-সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় না বরং ক্রমবর্ধমান হারে গোটা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সেগুলো বর্তমানে কাঠগড়ায় রয়েছে" (Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Towards a New Economics*, New York, Macmillan, 1988, p. ix) ।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির খোদ প্রাণকেন্দ্রই অভিযুক্ত হচ্ছে যে, নব্য-সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মাত্র নৈতিক দিককেই উপেক্ষা করে না, এটি বস্তুত: দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নৈতিকতাকে স্থান দিতেই নারাজ। অপর দিকে উদীয়মান নতুন দৃষ্টিভঙ্গি "নৈতিক মুল্যবোধকে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা" প্রদানের বিষয়টি কল্পনা করছে। ইতজিয়নি জোর দিয়ে বলছেন, "কোনটি সঠিক ও কোনটি আনন্দদায়ক দু'টোই খোঁজ করা" কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে পারে (প্রাগুক্ত, পৃ: ix, x) । ব্রাজিলের সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ ও ব্রাজিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেক্টর ক্রিস্টোভান বুয়ার্ক (Cristovan Buarque) তাঁর গ্রন্থ *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress*, translated by Mark Ridd (London, Zed Books, 1993) - এ অর্থনীতির এ নুতন পদ্ধতির জন্য আরো বেশী নিরুত্তাপ ও নৈর্ব্যক্তিক আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্রের ব্যর্থতা এর সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধ উপেক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, "সামাজিক লক্ষ্যসমুহকে সভ্যতার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা না করে বরং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরিণতি হিসেবে দেখা হয়েছে। ইতোমধ্যে, নৈতিক মুল্যবোধসমুহকে পরিত্যাগ করা হয়েছে" (পৃ: xi)। প্রয়োজন হচ্ছে পদ্ধতির একটি মৌলিক পরিবর্তন ও অগ্রাধিকারগুলোকে সম্পুর্ণরুপে ঢেলে সাজানো। তিনি উপসংহার টানেন এ বলে যে, "বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর যেমন পদার্থ বিজ্ঞান নৈতিকতা নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনের উপর হোঁচট খেয়ে পড়েছে, তেমনি অর্থশাস্ত্রের নৈতিকতাকে খুঁজে নেওয়া ভীষনভাবে প্রয়োজন। কোন প্রকল্প মুল্যায়ন করতে গিয়ে যেমনটি করা হয় তেমনি এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপাদানগুলো পুণ: মুল্যায়ন করে ও নুতন করে ব্যয় বাড়িয়ে বর্তমান সংকট দূর করা যাবে না। বরং, এটি হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যসমুহ পরিবর্তনের একটি বিষয়, বিগত দু'শতকের অর্থশাস্ত্রীয় ধরা-বাঁধা ধারা থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার বিষয় ...। প্রগতির প্রচলিত ধারনাকে উচ্ছেদ না করে ক্রমবর্ধমান

www.pathagar.com

দারিদ্র্য ও বৈষম্য জনিত সমস্যার সাথে লড়াই করা সম্ভব হবে না, এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্যকে সামাজিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টির জন্য নুতন তাত্ত্বিক পদ্ধতি বের করা আবশ্যক, যার ভিত্তি হবে তিনটি স্তম্ভ: সভ্যতার খোদ লক্ষ্যসমুহকে পুণরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি নীতি; গবেষণার লক্ষ্য ও ক্ষেত্রের জন্য একটি নুতন সংজ্ঞা, যা প্রতিবেশগত দিকগুলো বিবেচনায় গ্রহণ করতে সক্ষম; এবং একটি শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির জন্যে একটি নুতন মুলনীতি (প্রাগুক্ত, পৃ: xii)। এরূপ পদ্ধতির ফলাফল হবে যে: "নৈতিক মুল্যবোধের আওতায় উদ্ভাবিত সামাজিক লক্ষ্যসমুহের অধীন অর্থনৈতিক মুলনীতির দ্বারা প্রযুক্তিগত বিকল্পসমুহ অবশ্যই নির্ধারিত হবে। ক্রম-শ্রেণী-বিন্যাস: প্রযুক্তিগত মুল্যবোধ/ অর্থনৈতিক মুলনীতি/ সামাজিক উদ্দেশ্যসমুহ/ নৈতিক মুল্যবোধ, এভাবে পাল্টে যাবে" (প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪)।

অর্থশাস্ত্রের এরূপ করুণ দশা এক দল নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ কর্তৃকও একটি মুল্যবান গবেষণায় গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, *Economics in the Future: Towards a New Paradigm.* এ গ্রন্থে যে প্রায় সম্মত ঐক্যমতে পৌঁছানো গেছে তা হচ্ছে, অর্থশাস্ত্রকে তার সংকটের যাতনা থেকে উদ্ধার করার জন্য যা দরকার তা কেবলমাত্র দু'একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বকে নুতনভাবে ব্যাখ্যা করা নয়, কিংবা বর্তমান অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে কিছু রদবদল ঘটানো নয়, বরং *প্রয়োজন হচ্ছে খোদ দৃষ্টিভঙ্গির রদবদল* এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে সরে যাওয়া, যার অধীনে অর্থশাস্ত্রীয় সমস্যাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত না হয়ে গোটা সমাজ ব্যবস্থার আলোকে আলোচিত হবে, যার আদর্শ, সমাজের রূপকল্প ও নৈতিক মুল্যবোধসমুহ গোপনীয় নয়, বরং যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করনের মাপকাঠি রচনা করবে। মানব জাতির এক বিরাট অংশের মধ্যে বন্টন সংক্রান্ত ন্যায়বিচার, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি, ভারসাম্যপুর্ণ মানবিক উন্নয়ন, সামাজিক শান্তি ও আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিত করতে আধুনিক অর্থনীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে দীর্ঘকালীন মন্দা, নাছোড়বান্দা বেকারত্ব, স্থবিরতা ও মুদ্রাস্ফীতি (Stagflation), অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সম্প্রসারন, দেশী ও বিদেশী ঋণের বিশাল পাহাড়, প্রত্যেক দেশের ভেতরে ও জাতিসমুহের মধ্যে অতি প্রাচুর্য ও অতি দারিদ্রের পাশাপাশি অবস্থানের বিপদের মুখো-মুখী হয়েছে আধুনিক অর্থশাস্ত্র। ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় পর্যায়ে নৈতিক মুল্যবোধ ও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনা ও আচরনের মধ্যস্থিত সম্পর্ক, যা হাজার হাজার বছর যাবৎ মানবতাকে টিকিয়ে রেখেছিল, ইহজাগতিক পুঁজিবাদী উত্থানের যুগে তা ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এবং অর্থনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষ উভয়েই এখন সেই হারানো নৈতিক সম্পর্ক খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

একটি অত্যন্ত বোধগম্য গবেষণায় জেমস রবার্টসন লেখেন: "পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বিপরীতক্রমে, একবিংশ শতকের অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি অবশ্যই হবে এরূপ স্বীকৃতির উপর যে, মানুষ হলো একটি নৈতিক জীব যার স্বাধীনতা বাজার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি দ্বারা সংকীর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিৎ হবে না। স্বনির্ভরতার একটি দিকরূপে একবিংশ শতাব্দির অর্থনীতিকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, অর্থনৈতিক জীবনে নৈতিক দায়িত্ব ও পছন্দ-অপছন্দ প্রয়োগ করার জন্যে মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব জাহির করার সুযোগ দিতে হবে। জনগণকে এরূপ ব্যক্তিত্ব জাহির করার সুযোগ দানের জন্য, এবং (বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে) স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে জনগোষ্ঠীকে তাদের ব্যক্তিত্ব জাহির করার সুযোগ দানের জন্যে প্রস্তুতকৃত পদক্ষেপসমূহকে অবশ্যই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে হবে ... সুতরাং, নতুন অর্থশাস্ত্রকে অবশ্যই প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বস্তুগত অনুমানসমূহ থেকে অনেক উর্দ্ধে উঠতে হবে: অর্থনৈতিক জীবনকে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সীমিত করে ফেলা যায়; সম্পদ এক প্রকার পণ্য যা ভোগ করার আগে সৃষ্টি করতে হয়, এবং সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ একটি সরল রৈখিক প্রক্রিয়ার ক্রম-পর্যায় যা সম্পদকে আবর্জনায় পরিণত করে। এ নতুন শাস্ত্রকে অবশ্যই সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনে এবং সম্পদ বরাদ্দে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের উদ্বেশ্যমূলক কার্যাবলীকে পুণরায় ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, যেন তা মানুষকে তার অভাব মেটানোর ও নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে, এবং সম্পদ ও প্রাকৃতিক জগতের মান বাড়াতে সক্ষমতা প্রদান করার মাধ্যমে অর্থশাস্ত্রের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে রূপান্তরিত হয়। নতুন অর্থশাস্ত্রকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ যেহেতু একটি নৈতিক জীব, সেহেতু অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নগুল্রো হচ্ছে নৈতিক প্রশ্ন" (*Future Wealth: A New Economics for the 21st Century*, Cassel Publications, London, 1990, pp. 21-8)।

'ইসলামিক অর্থশাস্ত্র' অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন ও নাছোড়বান্দা সমস্যাগুলোর জন্য নতুন সমাধান পেশের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীসহ অর্থনীতির কর্মপদ্ধতি প্রতি নতুনভাবে দৃষ্টি প্রদানে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণের একটি সংগঠিত প্রয়াস। এ প্রয়াসটি এখনও শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা জানি যে, মুসলিম অর্থনীতিবিদগণকে অনেক দুর যেতে হবে, কিন্তু, কোন সন্দেহ নেই যে, এ লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। শুরুটা ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করছে।

ড: উমর চাপরা একজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম অর্থনীতিবিদ। একজন ফয়সল পুরস্কার বিজয়ী, তাঁর আগের কর্মগুলো, বিশেষত: তাঁর *Towards a Just*

Monetary System ও *Islam and the Economic Challenge,* তাকে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে একজন নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান বইটিতে ড: চাপরা একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন। *The Future of Economics: An Islamic Perspective* কেবল মাত্র ইসলামি অর্থশাস্ত্রীয় রচনাবলীর জন্য একটি মৌলিক অবদান শুধু নয়, বরং সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিতর্কেও এটি একটি মৌলিক অবদান। গভীর পান্ডিত্যপুর্ণ ও সৃজনশীল চিন্তার ফসল এ বইটি মুল ধারার অর্থশাস্ত্রের এক শক্তিশালী অথচ ভারসাম্যপুর্ণ সমালোচনা, এবং, অর্থশাস্ত্রকে তার ইহজাগতিক ও পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক খোলস থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে এক শক্তিশালী আবেদন। মানবতার সেবায় ব্যবহার করার জন্য অর্থশাস্ত্রকে নৈতিক ও সাম্যবাদি সংশ্লেষের সাথে পুণ: সম্পর্কিত করার পক্ষে তিনি এক বিশাল যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। আমার দৃষ্টিতে এ পথ-প্রদর্শক গবেষণা-কর্মটির, অন্যান্যের মধ্যে, অন্তত: পাঁচটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে।

প্রথমত: অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় প্রেক্ষাপট থেকেই এটি প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের একটি জ্ঞানগর্ভ ও সহানুভূতিশীল সমালোচনামুলক রচনা। একজন পেশাদার অর্থনীতিবিদ হিসেবে ড: চাপরা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা অর্থশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও বিশ্বব্যাপী মানব সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখায় অর্থশাস্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থেকে তিনি ঐ সকল দুর্বলতাগুলো সনাক্ত করেছেন যেগুলোর কারনে এ শাস্ত্র তার ন্যায্য দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ও সৃজনশীল। তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন কোথায় গড়বড় হয়েছে এবং সেগুলো ঠিক করার জন্য কী করা দরকার তা বলে দিচ্ছেন। তিনি কোন প্রথা-বিরোধী লেখক নন। তিনি একজন নুতনের প্রবর্তক ও সংস্কারক যিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে চান, তবুও এমনভাবে তা করতে চান যাতে ভুলগুলো সংশোধন করে নেয়া যায়। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অতি গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখলকারী নৈতিক ও সামাজিক মাত্রার মধ্যেই তাঁর উদ্বেগ সীমিত নেই, বরং অর্থশাস্ত্রের ক্ষুদ্র-ভিত্তি সুদৃঢ়করণের জন্যও তাঁর উদ্বেগ রয়েছে, সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো শক্তিশালী করাতে সক্ষম করে তোলার জন্য ও সামাজিক লক্ষ্যসমুহ অর্জন করার জন্য যা সক্রিয় করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: এ গবেষণা অর্থশাস্ত্রের মুলদৃষ্টি সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যে ফিরিয়ে আনার একটি সংগঠিত প্রয়াস চালিয়েছে, এবং তা করেছে সম্পদের

www.pathagar.com

উৎপাদনশীল বন্টনের সংশ্লিষ্টতাকে দুর্বল না করে। অর্থনীতি যদি 'সম্পদের নীরস বিজ্ঞান' না হয়ে মানুষের মঙ্গল অর্জনের কোন শাস্ত্র হয়, তাহলে সাম্য ও সম্পদের উৎপাদনশীল বন্টনের দ্বৈত উদ্দেশ্যকে অবশ্যই হাতে হাত রেখে চলতে হবে। ড: চাপরা নৈতিক পরিশোধনের ধারনা প্রণয়ন করে এবং মুলধারার অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সাম্যের মাত্রা যুক্ত করে একটি চমৎকার কাজ করেছেন।

তৃতীয়ত: ড: চাপরা কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের মধ্য দিয়ে ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে অর্থনীতির কার্যক্ষেত্রে স্থাপন করেছেন। তিনি ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে ভিন্ন কোন প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করছেন না। তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন এবং অর্থনীতিকে ইসলামি রুপকল্প ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ করার জন্যে এক সৃজনশীল প্রয়াস চালিয়েছেন। ইসলাম ও অর্থনীতি এমনভাবে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়েছে যে, অর্থনীতি একটি নুতন দিক্ নির্দেশনা পেয়েছে এবং বিচরনের জন্য একটি নতুন পৃথিবী পেয়েছে।

চতুর্থত: এ গবেষণা কর্মটি ইসলামি অর্থশাস্ত্রের সর্বোত্তম অবস্থার একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাসঙ্গিক ও দক্ষ উপস্থাপনা। কারিগরী অর্থে কোন জরীপ না হলেও, বিগত শতকে অর্থশাস্ত্রে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণের বড় অবদানসমুহের উপর ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে কৃত একটি বোধগম্য পর্যালোচনা বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও মুল দৃষ্টি মুদ্রা ও রাজস্বনীতির বিষয়াবলীর উপরই বেশী নিবদ্ধ, তথাপিও ড: চাপরা সফলভাবেই ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তাধারার স্বাদ বের করে এনেছেন এবং ইসলামি অর্থশাস্ত্র পরীক্ষা-নীরিক্ষার চেষ্টা করেছে এমন কতিপয় প্রধান উপায়সমুহ সনাক্ত করেছেন। ফারাক ও সমস্যাগুলো সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন। কিন্তু তিনি এ সংক্রান্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোকপাত করেছেন।

পরিশেষে, এ প্রথম একজন ইসলামি অর্থনীতিবিদ আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের ভুল-ভ্রান্তি বের করার লক্ষ্যে, এবং ভবিষ্যতে কীভাবে প্রকৃত উত্থান ঘটানো যায় ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা যায় সে লক্ষ্যে সমালোচনার দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন। ইসলামি আদর্শ, মুল্যবোধ ও রীতিনীতি সমুহের একটি চিত্র উপস্থাপনের মধ্যেই তিনি তুষ্ট থাকেন নি। পুণরুদ্ধারও পুণ: গঠনের উপায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তিনি ইবনে খালদুনের বরাত দিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করেছেন। এটি একটি মৌলিক অবদান, যা করা হয়েছে গভীর

www.pathagar.com

অর্ন্তদৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও সাহসের সহিত। কেউ হয়ত: এখানে ওখানে দু'একটি বিষয়ের সহিত দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আমি নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, ড: চাপরা এরুপ একটি জটিল বিষয়ে নুতন একটা কিছু করেছেন। আমি নিশ্চিত তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সুপারিশ অনেক দিন যাবৎ অন্যদেরকে এ পথ অনুসরন করতে এবং অতীতকে উপলব্ধি করতে ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার লক্ষ্যে নতুন নতুন উপায় বের করতে অনুপ্রাণিত করবে, এমনকি উৎসাহিতও করবে। অর্থনীতি ও ইতিহাসের এরুপ সংমিশ্রণ, বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে, আমাদের (অর্থশাস্ত্রীয়) সাহিত্যে একটি মৌলিক অবদান। ড: চাপরার বইটি আরো দেখায় আদর্শবাদিতার সহিত বাস্তববাদিতার মিলনের একটি প্রয়াস, সমসাময়িক লেখায় এরুপ একটি গুণের বাস্তবায়ন সহজে দেখা যায় না।

ড: চাপরা যথার্থভাবেই অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেমন তিনি উদ্বিগ্ন মুসলিম উম্মাহ'র ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ বইটি যে বার্তা বহন করছে তা হচ্ছে যে, মানব জাতির জন্য উপযোগী একটি ন্যায় ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার সন্ধানে অর্থশাস্ত্রের যেমন প্রয়োজন ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে নৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, নিজেদের জীবনে নতুন কোন অধ্যায় শুরু করতে চাইলে মুসলিম উম্মাহ'রও তেমনি প্রয়োজন অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস ও তাদের নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে আরো বেশী মনযোগী হওয়া। আমাদের সকলকে অবশ্যই রুঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আকাশকুসুম কল্পনা ও সহজ ফাঁকাবুলি আওড়ানো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। আমি আশা করি যুক্তির এ কন্ঠস্বর সকলেই শুনবেন।

ইসলামাবাদ
খুরশিদ আহমাদ
২৯ ধু আল-কা'ধাহ ১৪২০
৬ মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

প্রশ্ন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রত্যেক জাতিরই একটি লক্ষ্য (রুপকল্প) রয়েছে, যে দিকে সে অগ্রসর হয়ে থাকে; অতএব, তোমরা ভাল সব কিছুতেই উৎকর্ষতা অর্জন কর।

(আল-কুর'আন, ২: ১৪৮)[১]

পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত হয়েছে আমরা তাদের সাহায্য করতে চাই; তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে চাই ও উত্তরাধিকার করতে চাই এবং পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

(আল-কুর'আন, ২৮: ৫-৬)

আধুনিক বিবেকবোধকে আলোকিত করার লক্ষ্যে একটি ফলপ্রসূ রুপকল্প সরবরাহ করার ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে মর্মে দেখানো গেলে তার ফলাফলে শুধু মুসলমানদের নয়, গোটা মানব জাতির স্বার্থ রয়েছে।

(মার্শাল হজসন)[২]

সমাজের রুপকল্প বাস্তবায়নে অর্থশাস্ত্রের কি কোন ভূমিকা রয়েছে? এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন, যার জবাব নির্ভর করছে অর্থনীতি ভবিষ্যতে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তার উপর। তবে, আমরা যখন রুপকল্পের কথা বলছি, তখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে যে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রুপকল্প থাকতে পারে কী না, এবং এ সকল পার্থক্য সে সকল সমাজের সামাজিক বিজ্ঞানের কার্যপদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয় কী না। মুসলমানগণ সব সময়েই অনুভব করেছে যে ইসলামের নিজস্ব একটা রুপকল্প রয়েছে, এবং সে অনুযায়ী কয়েক শতাব্দি পুর্বে ইসলামি সভ্যতার জোয়ারের সময় থেকে এর রুপকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রুপরেখার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিল। সে যাহাই হোক, মুসলমানেরা যখন পতন দেখতে শুরু করলো ও বিদেশীদের অধীনস্থ হলো, তখন এমনকি এরুপ কোন রুপকল্প বাস্তবায়নের চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিজ্ঞান বিকাশের ধারা হোঁচট খেল। তবে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করার পর এবং অর্থশাস্ত্রসহ

---

[১] এ অনুবাদটি আয়াতটির উপর ফখর আল-দীন আল-রাজির (মৃত্যু ৬০৬/১২০৯) ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৩১-৩। আরো দেখুন, মুহাম্মদ আসাদের অনূদিত কুর আনের ফুটনোট ১২৩

[২] Hodgson, 1977, Vol. 3, p. 441.

www.pathagar.com

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের বিকাশের পর, রুপকল্পটি আবারও সামনে উঠে আসলো।

অতএব, অনেকগুলো প্রশ্নই উঠে আসছে। প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে খোদ রুপকল্প সম্পর্কে – এটা কী? কিভাবে এটি প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও মুসলিম বিশ্বের পতনের সময়ে পাশ্চাত্যে বিকাশলাভকারী কল্যাণ, অনুদান, সামাজিক, মানবতাবাদি, ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্রের মত তার প্রশাখাসমুহ থেকে ভিন্ন? একটি রুপকল্প অপরিহার্যভাবেই নির্দেশ করে একটি সমাজ কেমন 'হওয়া উচিৎ'। জীবন আসলেই খুব স্বাচ্ছন্দময় হতো যদি বিদ্যমান অবস্থা এরুপ রুপকল্পের সহিত মিলে যেতো। দুর্ভাগ্যবশত: এ রকম হয় না বললেই চলে। সচরাচরভাবে যা 'বিদ্যমান আছে' ও 'যা হওয়া উচিৎ' এ দু'য়ের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, প্রশ্ন হচ্ছে এরুপ পার্থক্য কীভাবে দূর করা যেতে পারে? কেবল মাত্র 'বিদ্যমান অবস্থা' বিশ্লেষণ করে তা করা যাবে, নাকি এটাও বুঝার চেষ্টা করা, কেন 'বিদ্যমান' অবস্থা 'উচিৎ'- এর কাছাকাছি নয়? পার্থক্য দূর করার জন্য আবশ্যকীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি- প্রকৃতিও দেখানো উচিৎ কি না? যেহেতু ইসলামের রুপকল্প হচ্ছে মুলত: 'নৈতিক' ও 'সাম্যবাদি' এবং দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয়, সেহেতু প্রশ্ন উঠে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব কী না। জবাব যদি হাঁ- বোধক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা প্রবেশ করছি সেই জটিল প্রশ্নে: ৪০০ বছর যাবৎ মুল্যবান অবদান রাখার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব কেন পিছিয়ে গেল? এরুপ পিছিয়ে পড়ার কারন কি ইসলাম নাকি অন্য কিছু? এসব ও আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর এ বইয়ের ভূমিকা ও প্রথম চার অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে, কোন সমাজই ঐতিহাসিক শুন্যস্থানে বিরাজ করে না। অনেকগুলো পরস্পরভাবে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের ঘাত- প্রতিঘাত তাকে প্রভাবিত করে। মুসলিম দেশগুলোর পতন ও বর্তমান সমস্যাগুলোর ঐতিহাসিক কারন না খুঁজে তাদের ভবিষ্যত বিকাশের কোন ফলপ্রসূ কৌশল আলোচনা করা হয়ত: সম্ভব হবে না। সাধারণভাবে আশা করা হয় যে, দক্ষ প্রতিষ্ঠানসমুহ কালান্তরে টিকে থাকবে এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানসমুহ মুলোৎপাটিত হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বে কেন বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ ধীরে ধীরে অবক্ষয় আনয়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে? মুসলিম বিশ্ব এ প্রবণতা ঘুরিয়ে দিতে পারলো না কেন?

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চলকসমুহের সাহায্য নিয়ে এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব প্রদান করা সম্ভব হবে না। সে মতে, মুসলিম বিশ্বের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও তা

www.pathagar.com

বোধ করার উপায় বাতলানোর লক্ষ্যে ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও বৃত্তাকার কার্যকারন সম্পর্কের (Socio-economic and political dynamics and circular causation) উপর ভিত্তি করে একটি বহু-শাস্ত্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, জনমিতি সংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক বিষয়ের মত অনেকগুলো বিষয় বিবেচনায় গ্রহণের পক্ষে স্পষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মডেলটি ৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে তাঁর উত্তরকালে রেখে যাওয়া কিছু অবদানের সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম অবক্ষয়ের কারন নির্ণয়ের জন্য মুসলিম ইতিহাসে তাঁর মডেল প্রয়োগ করা হয়েছে। এটা আমাদের নিয়ে গেছে ৭ম অধ্যায়ে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে গত কয়েক দশকে ইসলামের আলোকে অর্থশাস্ত্রের উপর রেখে যাওয়া অবদানগুলো, যা এখন ইসলামি অর্থশাস্ত্র নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শেষ অধ্যায়ে এ সদ্য বিকাশমান শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের লক্ষ্যে একটি কাঠামো প্রস্তাব করার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, যেন এটি মুসলিম দেশগুলোর চলমান সমস্যাসমুহ সমাধান করতে ও ইসলামি রুপকল্প বাস্তবায়নেও সহায়তা করতে পারে। এরুপ আলোচনায় কিছু কিছু পুণরাবৃত্তির ঘটনা অপরিহার্য। কারন একই প্রশ্নের বিভিন্ন দিকগুলো একাধিক প্রসঙ্গে আলোচনায় ফিরে আসে এবং সেগুলোকে বাদ দেওয়া কিংবা কোন অপ্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে সেগুলো আলোচনা করা অবশ্যই বাঞ্চিত নয়। এ গ্রন্থটি প্রকাশের আগে কয়েকটি অধ্যায় জার্ণালে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে জেদ্দায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক প্রাঙ্গণে ইসলামি অর্থনীতির উপর ব্যাংকটির পুরস্কার গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাষণে ব্যক্ত কতিপয় প্রাথমিক ধারনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে এ বই। পরবর্তিকালে সেটা *ইসলামি অর্থশাস্ত্র কি?* (What is Islamic Economics?) শিরোনামে ব্যাংক কর্তৃক প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও অ-অর্থশাস্ত্রবিদগণের নিকট অনুধাবনযোগ্য করার লক্ষ্যে আমি বর্তমান বইটি সহজভাবে লেখার চেষ্টা করেছি, তথাপিও আমার পক্ষে অর্থশাস্ত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সুপরিচিত পরিভাষাগুলো সম্পুর্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমার আগের রচনাগুলোর মত, আমার স্ত্রী খায়রুন্নেসার প্রতি আমার ঋণ প্রচুর ও অপরিসীম। তার সার্বক্ষণিক সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান এবং আমার অনেক সাংসারিক দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এ কাজটি শেষ করার স্বাধীনতা প্রদানের কারনে এ বইয়ের সকল কৃতিত্বের বিরাট অংশ তাঁর প্রাপ্য।

বহু পন্ডিত ব্যক্তি পান্ডুলিপিটির প্রাথমিক খসড়া পড়েছেন এবং মুল্যবান মন্তব্য করেছেন, যেগুলোর সবই চূড়ান্ত খসড়ার মান উন্নয়নে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ধন্যবাদ পাবেন ড: মুরাদ হফম্যান, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে নিযুক্ত সাবেক জার্মান

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূত; হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস এডমিনেস্ট্রেশনের অধ্যাপক স্যামুয়েল হেইস তৃতীয়; ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউ কে) অধ্যাপক রডনি উইলসন; মাদ্রিদের ইউনিভার্সিদাদ অটোনোমা'র অধ্যাপক আলেজান্দ্রো ভি লরকা করোনস; জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকনোমিকস- এর অধ্যাপক এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, আনাস জারকা ও রফিক আল- মিস্রি; জেদ্দাস্থ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালক, আই আর টি আই, ড: মাবিদ আল- জারহি; তেহরানের আল- জাহরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ড: ইরাজ তুতুনসিয়ান; এবং যুক্তরাজ্যের লু'বারো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ড: হুমায়ুন ডার। পরিণতিতে, চূড়ান্ত সংস্করণের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মূল্যবান অন্ত: দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। এ বইয়ে উত্থাপিত কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্নের বিষয়ে তাদের বিস্তারিত ও গভীর মন্তব্যের জন্যে আমি ড: হফম্যান ও অধ্যাপক আলেজান্দ্রো করোনস, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ও রফিক মিস্রি- দের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তবে যদি কোন ভুল এখনও পাওয়া যায়, সেগুলোর জন্যে আমি নিজেই দায়ী।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মুহাম্মদ আসাদের অনূদিত কুর'আন, এবং রোজেনথাল (১৯৬৭) ও ইসাবি (১৯৫০) - দের অনূদিত ইবনে খালদুনের *মুকাদ্দিমাহ* থেকে আমি ভীষণ উপকার পেয়েছি, যদিও আমি তাদের অনুবাদ হুবহু উপস্থাপন করিনি। *আহাদিত* ও অন্যান্য আরবী রচনার অনুবাদ আমার নিজের। তবে, আমার কন্যা সুমাইয়া, যে পেশায় একজন শল্য চিকিৎসক, অনুবাদের কতিপয় কঠিন সমস্যা সমাধানে আমাকে উদারভাবে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক মুস্তাফা আল- আজমী ও তাঁর পুত্র আকিল তাদের কমপিউটারে ধারনকৃত হাদিস ডেটাবেসের সহায়তায় এ বইয়ে ব্যবহৃত কতিপয় *আহাদিত'র* উৎস সন্ধানে সাহায্য করেছে। আমার ভাই আবদুল রহমান চাপরা ও তাঁর ছেলে মুহাম্মদ সেলিম, ড: জাফর ইসহাক আনসারী (পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ, ইসলামাবাদ), ড: মানাযির আহসান ও জনাব আজমতুল্লাহ খান (যথাক্রমে মহা- পরিচালক ও গ্রন্থাগারিক, ইসলামিক ফাউন্ডেসন, লেস্টার (যুক্তরাজ্য, আমাকে বহু পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য প্রকাশনার ফটোকপি সরবরাহ করেছেন, যা আমি রিয়াদে পেতাম না। আমার সহকর্মী, ড: ইব্রাহীম আল- জেলাইকাহ IFS CD-ROM থেকে ডেটা উদ্ধার করতে সাহায্য করেছেন, এবং জনাব আবদুল রহমান আল- মুহান্না, গ্রন্থাগারিক, সৌদী আরবের মনিটরি এজেন্সী, ও কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের জনাব এম হায়ান আল- হাফিজ দু'টো গ্রন্থাগার থেকে আশানুরুপ সাহায্য গ্রহণে সাহায্য করেছেন। তাদের মুল্যবান সাহায্যের জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মিসেস সুসান থ্যাকারে ও জনাব ই আর ফক্সের প্রতি তাদের চমৎকার সম্পাদকীয় সাহায্যের জন্য এবং জনাব মবিন আহমাদের প্রতি এ

www.pathagar.com

বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রদত্ত মূল্যবান সাচিবিক সহায়তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না।

যেখানে কোন প্রাচীন মুসলিম ব্যক্তিত্ব বা বংশের নামের পর একটি '/ ' চিহ্ন দ্বারা দু'টো বছরকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে, সেখানে প্রথম বছরটি হচ্ছে হিজরী সন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রেগরিয়ান সন। একটি হিজরী বছর সাধারণত: দু'টি গ্রেগরিয় বছরে সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। তবুও লেখার সুবিধার জন্য আমি একটি হিজরী সনই দেখিয়েছি। অধিকন্তু, মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে যেহেতু আমার লক্ষ্য হচ্ছে কেবল লোকটির জীবন কাল সম্পর্কে একটি আনুমানিক ধারনা প্রদান করা, সেহেতু এ সকল পার্থক্যের বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়িনি।

প্রাথমিকভাবে আমার ইচ্ছা ছিল তুলনামূলকভাবে একটি সার্বিক গ্রন্থ- তালিকা সরবরাহ করা। তবে ইসলামি অর্থশাস্ত্রের আন্ত: শাস্ত্রীয় প্রকৃতি তৎসহ প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও এর সহযোগী শাস্ত্রের উপর আলোচনার কারনে গ্রন্থ- তালিকা বেশী দীর্ঘ হয়ে গেছে। এ কারনে প্রচুর তালিকাভুক্তি ঘটেছে। মূলত: যে সকল গ্রন্থ সম্পর্কে অত্র বইয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা হয় নি সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে পাঠকগণ এতে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের নাম পাবেন না যাদের নাম হয়ত: এখানে থাকা উচিৎ ছিল। তবে এর ফলে কোনভাবেই তাঁদের অবদানের গুরুত্ব হ্রাস পায় নি।

রিয়াদ
এম উমর চাপরা
১২ রবি উল- আওয়াল
২৬ জুন ১৯৯৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচনা

ইসলামী প্রেক্ষাপটে অর্থশাস্ত্রের কোন প্রয়োজন আছে কি?

মৌলবাদি রাজনৈতিক প্রবণতা যেখানে বেশ লক্ষণীয় সেই ইসলামী বিশ্ব ব্যতীত অন্যত্র বিশ্ব রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রাধ্যান্য বিস্তার করে আছে ফাঁকা বুলি ও এমন মুল্যবোধ যা মুলত: ভোগবাদি ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মুল লক্ষ্য হিসেবে ব্যক্তিগত আত্ম- সন্তুষ্টির উপরই বেশী গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(বিগনিউ ব্রেজনস্কি, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩)

কোন শাস্ত্রই চেতনাহীন অধিবিদ্যার মত এত বেশী নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যে তা নীরবে অনুমান করে নেয়।

(আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড) [১]

আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রচলিত অর্থনীতি এখন বেশ ভালভাবে বিকশিত ও আধুনিকতম শাস্ত্র যা একশ' বছরেরও বেশী সময় ধরে একটা দীর্ঘ ও কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। এরুপ বিকাশের ধারা অবাধে চলছে, যা প্রতিফলিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য জার্ণাল, বইপত্র, ও গবেষণা পত্র প্রকাশের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী পর্যায়ে সবাই সক্রিয়ভাবে এরুপ বিকাশে অংশগ্রহণ করছে। অধিকন্তু, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বর্ধিত উন্নয়নের ফলে পন্ডিতগণ তাদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে প্রচুর অর্থ- সম্পদও পাচ্ছেন। এরুপ বিরাট জ্ঞানান্বেষণ, এ কাজে গবেষকগণ যেরুপ কঠোর পরিশ্রম করছেন, এবং সৃজনশীল কাজকর্মের জন্য যে বিপুল মর্যাদা ও বস্তুগত সুবিধাদির পুরস্কার তারা পাচ্ছেন, সে জন্যে সকল কৃতিত্ব পশ্চিমা দেশগুলোর।

বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতি নামে পরিচিত ইসলামের প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির উত্থান দেখা যাচ্ছে মাত্র বিগত তিন বা চার দশক থেকে এবং তা ঘটছে কয়েক শতকের গভীর নিদ্রাচ্ছন্নের পর। এটির বিকাশে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, বিশ্বাবিদ্যালয়, সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনও তুলনামুলকভাবে কম। যেহেতু, অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলো দরিদ্র এবং উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু তাদের গবেষণা কর্মকান্ডে ব্যয় করার মত অর্থ- সম্পদও তুলনামুলকভাবে সামান্য। অধিকন্তু, মুসলিম দেশসমুহের কতিপয়

---

[১] Alfred North Whitehead, Milton Myers কতৃর্ক উদ্বৃত, 1983, p. v.

www.pathagar.com

সরকারগুলো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের অনিবার্য আহ্বানের বোধগম্য কারনে ইসলামের পুনরুত্থানকে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকীরূপে মনে করছে। অতএব, ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য কোন নৈতিক কিংবা বস্তুগত সমর্থন প্রদান করতে তারা অনিচ্ছুক।

অতএব, যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই সামনে আসে তা হচ্ছে, বেশ উঁচু পর্যায়ে বিকশিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্র হাতের কাছে থাকতে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের বাস্তবিক কোন প্রয়োজন রয়েছে কি না। এ প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এ কারনে যে, উভয় শাস্ত্রের বিষয়-বস্তু প্রায় একই রকম – অসীম ব্যবহারের মধ্যে সীমিত সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন। এটা সমর্থন করা যায় তখনই যদি ইসলামী অর্থশাস্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে এমন একটা লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস থাকে যা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হবে না। প্রযোজনটা আরো তীক্ষ্ম হবে যদি বিশ্লেষনের কাজে ব্যবহৃত চলকগুলো আরো ব্যাপক হয় এবং সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন কার্যে নিয়োজিত কৌশল ও পদ্ধতিগুলোও ভিন্নতর হয়। নিম্নে পরবর্তি অধ্যায়গুলোতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের একটা খোলামেলা কাঠামো ও যে সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া আবশ্যক হবে সেগুলো উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প

যুক্তিবাদি মানুষের প্রতিটি কার্যের সাধারণত: একটা লক্ষ্য থাকে এবং সচরাচর ক্ষেত্রে এ লক্ষ্যই কার্যের প্রকৃতি নির্ধারন করে থাকে, অন্যান্য কার্য থেকে সেই কার্যকে পৃথক করে এবং তার ফলাফল মুল্যায়নে সাহায্য করে থাকে। অতএব, প্রথম যে প্রশ্নটি তোলা যায় তা হতে পারে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন সম্পর্কীয় গবেষণার পেছনে লক্ষ্য সম্পর্কে। সম্পদ যদি সীমিত না হতো তাহলে এরূপ গবেষণার দরকার হতো না। তবে, সম্পদ সীমিত এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ও দলের সকল দাবী মেটানোর জন্যে সম্পদের যোগান যথেষ্ট নয়। সুতরাং, আমাদের সামনে আসে সেই জটিল প্রশ্ন: কোন খাত ও কার দাবী আমরা বেছে নেব এবং তা কীভাবে করবো। একটা সহজ উত্তর হতে পারে সম্ভবত: যে, সম্পদ ব্যবহার করা হবে এমন ভাবে যেন তা সমাজের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। রূপকল্প অবশ্যই সমাজের সেই স্বপ্নকে ধারন করে যা সে ভবিষ্যতে অর্জন করতে চায়। এটা হতে পারে অনেকগুলো লক্ষ্যের সমাহার, যে গুলো সে ভবিষ্যতে অর্জন করার অভিলাষ করে। এরূপ সকল লক্ষ্যসমুহ একত্রে পথ নির্দেশক তারকার মত ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সমাজ যে পথে অগ্রসর হতে চায় তার একটা দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এটা

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত লক্ষ্যে সমাজের প্রয়াস ও সামর্থ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে এবং তার মাধ্যমে অপচয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে পারে। রূপকল্প কখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তথাপিও, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা চির অম্লান রেখে এটি সমাজকে রূপকল্প বাস্তবায়নে তার সংগ্রাম লাগাতারভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে প্রেরণা দিয়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রকম রূপকল্প থাকতে পারে। তবুও একটা দিক অধিকাংশ সমাজেই একই রকম রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। তা হচ্ছে মানুষের কল্যাণ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য। তবে, বহু অর্থনীতিবিদগণ[২] কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও কল্যাণ শব্দটি নিজেই একটা বিতর্কিত শব্দ এবং এটাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এর আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এটাকে বিশুদ্ধ বস্তুগত লাভের অর্থে সংজ্ঞায়িত করা যায়, কিংবা আধ্যাত্মিক দিক অন্তর্ভুক্ত করেও এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কল্যানের কোন্ অর্থটি মেনে নেয়া হলো তার উপর নির্ভর করে সমাজের দখলে থাকা সীমিত সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আকার-প্রকারের পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এর ফলে বরাদ্দ ও বন্টনের জন্য আলাদা আলাদা কৌশলের দরকার হতে পারে।

যদি হয়ে থাকে সম্পূর্ণ বস্তুগত ও আনন্দবাদী অর্থে কল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করা, সেক্ষেত্রে, ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিল করা, যত বেশী সম্ভব সম্পদ বৃদ্ধি করা, যত বেশী সম্ভব দৈহিক আনন্দ ও ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি বাড়ানোর উপর প্রাধান্য দেয়া অর্থশাস্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ যৌক্তিক হবে। যেহেতু, আনন্দ ও ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি মুলত: নির্ভরশীল ব্যক্তিগত অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দের উপর, ভাববাদি মূল্যায়নকে (value judgements) বাদ দিতে হতে পারে, যেন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা পুরনে পরিপুর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা যায়। এভাবে, মানুষকে তাদের নিজস্ব রুচী ও পছন্দ অনুযায়ী আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রদানকারী সকল পণ্য ও সেবা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নিরপেক্ষ বাজার ব্যবস্থার নিয়ামক শক্তিসমুহকে তখন সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করা হতে পারে। উৎপাদিত সম্পদের পুণ: বন্টন[৩] গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কেবল মাত্র ততটুকুই যতটুকু হলে তা নিজস্ব

---

[2] *The Economic Journal*, November, 1997, pp. 1812-58, -এ Oswaid, Frank, and Ng -কর্তৃক "Economics and Happiness" উপর তিনটি রচনা দেখুন।

[3] বন্টন ও পুণ: বন্টন শব্দগুলোর পার্থক্য সম্পর্কে ধারনা স্পষ্ট করা দরকার। বাজার ব্যবস্থার তৎপরতার কারনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদের যেরুপ বরাদ্দ হয়ে থাকে তাকে বন্টন বলে। তবে, যখন কোন সমাজ তার বিশ্ববীক্ষার আওতায় ন্যায়বিচারের ধারনা অনুযায়ী

www.pathagar.com

স্বার্থ হাসিলে ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। কেবল মাত্র ব্যক্তি ও বাজার ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে চালু রাখার জন্যে যা করা দরকার তা ছাড়া সরকারের ভূমিকাকেও একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে হতে পারে।

তবে, কল্যাণকে যদি এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাতে তা বস্তুবাদি ও আনন্দবাদিতার উর্দ্ধে উঠে মানবিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমুহ ধারন করে, তাহলে এ সকল লক্ষ্যসমুহ কী ও কীভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে অর্থশাস্ত্র তা আলোচনা না করে পারবে না। এ সকল লক্ষ্যসমুহের মধ্যে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক কল্যাণই শুধু থাকবে না, বরং মানব ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, জীবনের পবিত্রতা, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মর্যাদা, মানসিক সুখ-শান্তি, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিও থাকবে। এ সকল লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়নের একটা মাপকাঠি হতে পারে যে, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, ঋণ পরিশোধের বিরাট বোঝা মাথায় না নিয়ে, উঁচু হারের মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে, নবায়ন-অযোগ্য সম্পদ অযথা নি:শেষ না করে, পৃথিবীতে প্রাণীকুলের জীবন বিপন্ন হয় এমন ভাবে প্রতিবেশকে ধ্বংস না করে সকলের অভাব পুরণ করা, পুর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, আয় ও সম্পদের বৈষম্যহীন বন্টন করা, এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা- কতটা সম্ভব হবে। আরেকটি মাপকাঠি হতে পারে পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি অর্জন, যা প্রতিফলিত হয়ে থাকে সমাজের সদস্যদের পরস্পরের, বিশেষত: শিশু, বয়স্ক, অসুস্থ, দুর্বলদের জন্যে যত্ন ও ভালোবাসার অনুভূতির মধ্যে এবং পারিবারিক ভাঙ্গন, অবিবাহিত মাতা, কিশোর অপরাধ, অপরাধ ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা দুর করা কিংবা নিদেন পক্ষে কমিয়ে আনার মধ্যে।

একবার যদি অর্থশাস্ত্র এরূপ সার্বিক অর্থে মানুষের মঙ্গল নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তাহলে অর্থনীতির কাজকর্ম আরো বিস্তৃত ও জটিল হয়ে উঠবে। এটি তখন শুধুমাত্র অর্থশাস্ত্রীয় চলকের মধ্যে নিজকে সীমিত রাখতে পারবে না। এটাকে তখন হয়ত: আরো কতিপয় চলক, যেমন: নৈতিক, মনস্তাত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জনমিতি ও ঐতিহাসিক বিবেচনায় গ্রহণ করতে হতে পারে, যা সার্বিক অর্থে কল্যাণের অর্থ নির্ধারন করে থাকে। এটিকে হয়ত: তখন আরো অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হতে পারে। কিন্তু এর লক্ষ্যসমুহ যদি হয় শুধুমাত্র সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, তবে সেগুলোর জবাব

বাজার বহির্ভূত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্টন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনে, তখন তাকে বলা হয় পুণ: বন্টন।

www.pathagar.com

দেয়ার প্রয়োজন পড়তো না। এরূপ একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, স্বীয়-স্বার্থ হাসিল করা সার্বিক কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্যে অনুপ্রেরণা হিসেবে যথেষ্ট কিনা, কিংবা আরো কিছু অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে কি না? বাজার ব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল সকল এজেন্টগুলো যদি কতিপয় আচরণ বিধি মেনে চলে ও কতিপয় প্রত্যাশিত মান বজায় রাখে, তাহলে এরূপ কল্যাণ আরো কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে কি? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তির আচরণের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে যা কিছু ইচ্ছা করার জন্য স্বাধীন থাকতে পারবে না। এরপর যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে, এ সকল নিয়ন্ত্রন কে নির্ধারন করবে এবং কীভাবে নিশ্চিত করা হবে যে, ব্যক্তির স্বাধীনতায় অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হবে না। এটা প্রয়োজন এ কারনে যে, মানুষের কল্যানের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতাও জরুরী এবং এরূপ স্বাধীনতা সম্মত পরিমানের বেশী হ্রাস করা যাবে না।

অধিকন্তু, মনুষ্য সমাজে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফলাফলকে প্রভাবিত করে থাকে। বাজার ব্যবস্থা এরূপ প্রতিষ্ঠানসমুহের একটি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত: পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ, কারন পরিবার বাজার ব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য জনশক্তি সরবরাহ করে থাকে। এটি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাথমিক জন্ম-স্থান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানেই ব্যক্তির অভিরুচী, পছন্দ-অপছন্দ, ব্যক্তিত্ব, এবং স্বভাব-চরিত্রের বড় অংশ গড়ে উঠে। এ কারনে পারিবারিক স্বাস্থ্য ও সংহতি অতীব গুরুত্বপুর্ণ। পরিবার যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার প্রয়োজনীয় লালন-পালন প্রদান করা সম্ভব হবে কি? লালন-পালনের মান যদি কমে যায়, তাহলে সমাজের পক্ষে অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষেত্রসমুহে উন্নয়ন ও উঁচু অবস্থান দীর্ঘ সময় যাবৎ ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। যেহেতু, অর্থশাস্ত্র সমাজের উত্থান ও পতন নিয়ে মাথা ঘামায়, সেহেতু, পরিবারের সংহতি ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি উপেক্ষা করা অর্থশাস্ত্রের জন্য বাস্তবসম্মত হবে কি?

যদি মানব কল্যাণ অর্জনে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের পালন করার মত ভূমিকা থেকে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে, কীভাবে তাদেরকে দিয়ে স্ব স্ব ভূমিকা এমনভাবে পালন করান যায়, যাতে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সেগুলো পরস্পরের পরিপূরক হয়, কিন্তু পরস্পরের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করলে বাজার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

দক্ষভাবে যেমন চলতে পারে, তেমনি ব্যক্তি যদি একই রকম স্বার্থবাদি আচরণ করে, তাহলে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের পক্ষে কি দক্ষতার সহিত শান্তিপুর্ণভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?

এগুলো কোন নতুন প্রশ্ন নয়। সামাজিক দার্শনিকেরা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এগুলো মোকাবেলা করে আসছেন। অধিকাংশের মনে হচ্ছে এরকম: ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিল করা মানব সমাজের অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তিসমুহের মধ্যে একটি এবং সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি করা অনেকগুলো লক্ষ্যের মধ্যে একটি। উপরে বর্ণিত আধ্যাত্মিক ও মানবিক লক্ষ্যসমুহ বেশী না হলেও সমান গুরুত্বের দাবীদার। এগুলোর কতিপয় লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এক প্রকার সমঝোতা করার দরকার হয়ত হতে পারে। কিন্তু, কোন সমাজের পক্ষে কি কোন সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে যদি সে সমাজ সম্পদ ও ভোগের বৃদ্ধি ঘটানোকেই তার মুল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে এবং তার সদস্যরা সমাজের মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য তাদের স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি না হয়?

পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পিতা-মাতাগণ যত বেশী পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ থাকে এবং পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকে, পরিবারেও তত বেশী সংহতি ও স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা বজায় থাকে। সন্তানদের লালন-পালনেও যথেষ্ট পরিমানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পিতা-মাতার স্বার্থ সংক্রান্ত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়। একইভাবে, সামাজিক শান্তির জন্যেও সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সকলের মঙ্গলের লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকার এবং গরীব ও দুর্বলদের প্রতি নজর রাখার প্রযোজন হয়। এমন কি বাজার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ত্যাগ স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়তে পারে। সামাজিক স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিযোগিতা সত্বেও বাজারের কুশীলবগণের পক্ষে দৃষ্টির আড়ালে থেকে প্রতারণা ও প্রতিযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে অযৌক্তিকভাবে লাভ অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। একইভাবে, যেমন করে গণতন্ত্র, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা, ও স্বাধীন গণমাধ্যম জনস্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে, তেমনি সরকারের কর্তা-ব্যক্তিদের পক্ষে তথাপিও করদাতাদের অর্থে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে।

অতএব, অন্যায় কাজ থেকে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যাবার সুযোগ থাকা সত্বেও মানুষকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে একটা অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তি থাকা আবশ্যক। জবরদস্তিমুলক সরকারী ক্ষমতা একটি অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তি হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। তবে, যদি এরুপ ক্ষমতা মানব সমাজে অন্যায়

www.pathagar.com

কাজ রোধ করার একমাত্র শক্তি হতো, তাহলে তা প্রয়োগ করার ব্যয় হতো অনেক বেশী। এমন কি সম্ভব যে, প্রতিযোগিতা, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা ও জবরদস্তিমুলক সরকারের পরিবর্তে এমন কোন অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি স্থলাভিষিক্ত হবে, যা সমাজের সদস্যগণকে কতিপয় সম্মত মুল্যবোধ কিংবা আচরণ বিধি স্বেচ্ছায় মেনে চলতে রাজী করাবে, এবং স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও মানুষ বিশ্বস্ততার সহিত তাদের চুক্তি রক্ষা করবে ও সামাজিক কর্তব্যগুলো পালন করবে?

এরপর আমাদের সামনে আসছে সেই প্রশ্ন: বাজার ব্যবস্থায়, পরিবারে, সমাজে কিংবা সরকারে একজন মানুষ সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে তার ব্যক্তি-স্বার্থ কেন জলাঞ্জলি দেবে? যদি অর্থশাস্ত্র শুধু কেবল স্বীয়-স্বার্থ'র উপর মনযোগ দেয়, এবং স্বীয়-স্বার্থ ব্যতীত আর কোন প্রেরণামুলক শক্তিকে স্থান না দেয়, তাহলে অর্থশাস্ত্র প্রশ্নটির জবাব প্রদানের জন্য প্রস্তুত নয়। সম্পদ ও ভোগ যতদুর সম্ভব বৃদ্ধি করা যদি একজন ব্যক্তির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে অপরের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আত্ম-স্বার্থ হাসিল করাই উত্তম নীতি। পরিণতিতে, পরিবারকে খেসারত দিতে হতে পারে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মান কমে যেতে পারে, এমনকি বাজার ব্যবস্থা ও সরকারের কর্মকান্ডের উপরও শেষ পর্যন্ত বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। সুতরাং, সমস্যা হচ্ছে যে, মানুষকে তাদের চুক্তি ও অন্যান্য অঙ্গিকার মেনে চলা, এবং প্রতিযোগিতার মানকে ক্ষতিগ্রস্থ না করতে কিংবা ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও অবৈধ আয় করার পথ না ধরার জন্যে কীভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়। প্রাণী ও পরিবেশের প্রতি ব্যক্তি মানুষের নৈতিক কর্তব্য আকারে আচরন বিধি মানুষ প্রণয়ন করে এবং স্বীয়-স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও ধর্মের অনুসারীগণকে এ সকল বিধান মেনে চলার জন্যে ধর্মগুলো অনুপ্রাণিত করে । এ কাজে তারা সফল হয়েছে কি না, তা ভিন্ন বিষয়। তবে, লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে সার্বিক কল্যাণ বাস্তবায়ন করা, তাহলে অর্থশাস্ত্রের পক্ষে ধর্মীয় মুলবোধ ও তার প্রেরণাদায়ক শক্তিকে উপেক্ষা করা হয়ত: সম্ভব হবে না।

পার্থিব অর্থে একটি সমাজ শৌর্য-বীর্যের চূড়ায় হয়ত: পৌঁছতে পারে, কিন্তু, তা দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে পারবে না, যদি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক গঠণ দুর্বল হতে থাকে, পরিবার ভেঙ্গে যেতে থাকে, নতুন প্রজন্ম একটি উঠতি সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় মনযোগ ও লালন-পালন না পায়, এবং সামাজিক টানা-পোড়েন ও অস্থিরতা যদি বাড়তে থাকে। অতএব, কল্যানের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিক পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং, সেগুলো পরস্পরের সাথে

www.pathagar.com

নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। অধিকতর পারিবারিক সংহতি বাজার ব্যবস্থায় কাজ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল মানুষ গড়ে তুলতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল সামাজিক সংহতি, কার্যকরি সরকার ও বর্ধিত উন্নয়নের জন্য আরো বেশী উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে পারে। এটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সামাজিক স্বার্থ রক্ষা ও মানব কল্যান আশানুরুপ করার জন্যে স্বীয়-স্বার্থ হাসিলের উপর গুরুত্বারোপ এবং সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি হ্রাস করতে হতে পারে। সমাজের সকল মানুষের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলকারী ও আনন্দবাদি কাঠামোর সাথে খাপ খায়-সম্পদের এমন কিছু কিছু ব্যবহার হ্রাস করতে হতে পারে, এবং তার মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক সংহতিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

পার্থিব উন্নতি নিজে সুখ-শান্তি ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির জন্য যে যথেষ্ট নয়, সে বিষয়টি প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ১৯টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ত্রিশ বছর ব্যাপী পরিচালিত জরীপের মাধ্যমে রিচার্ড ইস্টারলিন উপসংহার টেনেছেন যে, "ধনী দেশগুলো গরীব দেশগুলোর চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী সুখী নয়"।[৪] অন্য এমন কিছুর প্রয়োজন রয়েছে সুখ-শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং টানা-পোড়েন ও অস্থিরতা দুর করার জন্য । অতএব, অর্থশাস্ত্র যদি সার্বিক অর্থে কল্যানের জন্যে ব্রতি হয়, তাহলে এটি শুধু কেবল পার্থিব উন্নতির বিষয়ে আলোচনার মধ্যে নিজকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়ত: সক্ষম হবে না।[৫]

কৌশলাদি

সুতরাং, মানব কল্যাণকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সে বিষয়টি সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন ব্যবস্থায় একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। কল্যাণের ধারনায় যদি মতভেদ থাকে, তাহলে কল্যাণের বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতিতেও ভিন্নতা থাকবে। কোন সমাজে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যবহার নির্ধারণের জন্যে তিনটি কৌশল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পুণ: গঠন।[৬] ঠিক যেমন কল্যাণকে অনেকভাবে

---

[৪] Heilbroner and Thurow, 1975, p. 538-এ Easterlin (1973)। আরো দেখুন, Easterlin, 1995; Oswald, 1997.

[৫] মানব কল্যাণ নির্ধারকের উপর লেখা-লেখি দ্রুত বাড়ছে। একটি জরীপের জন্য দেখুন, David Myers, 1993।

[৬]এগুলোর উপর আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Chapra, *Challenge*, 1992, pp. 213-33।

www.pathagar.com

সংজ্ঞায়িত করা যায়, তেমনি পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পুণ: গঠনের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব।

প্রথমত: সীমিত সম্পদের বিভিন্ন প্রকারের দাবীসমূহকে একটা পরিশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার করতে হবে যাতে সম্পদের উপর সকল দাবী ও সরবরাহের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে। পরিশোধনের বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে। এগুলোর তিনটি হচ্ছে: কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, বাজার ব্যবস্থার কৌশল ও নৈতিক মুল্যবোধ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এমনকি পার্থিব অর্থেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিশোধনের জন্য কোন কার্যকর কৌশল নয় এবং সম্ভবত: কিউবা ব্যতীত প্রায় সবাই এরই মধ্যে তা পরিত্যাগ করেছে। তবে, বাজার ব্যবস্থার কৌশল বেশ ভালভাবেই কাজ করেছে। পরিপুর্ণ প্রতিযোগিতামুলক বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত বাজার মুল্য সম্পদের বিভিন্ন রকম ব্যবহারকে এমনভাবে পরিশোধন করতে সহায়তা করেছে যে, এক প্রকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পরিশোধন কাজে বাজার ব্যবস্থার কৌশলকে ব্যবহারের সমস্যা হচ্ছে যে, বাজারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কোন অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ পরস্পরের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করছে তার উপর নির্ভর করে নানা প্রকার বাজার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যে কোন ও প্রত্যেক বাজার ভারসাম্য মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের অনুকুলে নাও যেতে পারে। অতএব, বাজার ব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে অন্য কোন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ব্যক্তির অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারে, এবং যা প্রত্যাশিত প্রকারের ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারে। নৈতিক মুল্যবোধের পক্ষে এরুপ পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হতে পারে কি?

দ্বিতীয়ত: জোর-জবরদস্তিতা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সকল ব্যক্তিকে যথেষ্ট রকম অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম প্রয়াস নিয়োজিত করে এবং প্রত্যাশিত কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্য ব্যর্থকারী খাতে সম্পদ ব্যবহার করা থেকে বিরত রেখে প্রত্যাশিত পরিশোধন ঘটানো যেতে পারে। উদাহরণত: পদার্থ বিজ্ঞানের চেয়ে অর্থশাস্ত্রে অনুপ্রাণিতকরণের গুরুত্ব অনেক বেশী, কারন অর্থশাস্ত্র মানুষ নিয়ে কাজ করে, যারা সকল সময় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে উপযোগী পুর্বনির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করতেও পারে, নাও করতে পারে। স্বীয়-স্বার্থ হাসিল করার লোভ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে একটা কার্যকরি অনুপ্রেরণার কৌশল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে, যেখানে প্রতিযোগিতা, জনগনের নিকট দায়-

www.pathagar.com

বদ্ধতা ও সরকারের হস্তক্ষেপ সামাজিক স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা করেছে। বাজার ব্যবস্থার কৌশল ও সরকারী হস্তক্ষেপের সহিত যদি নৈতিক কর্তব্য বোধ যোগ করা যায় সেক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থ আরো কার্যকরভাবে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে কি?

তৃতীয়ত: ভৌত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও মানুষের আচরন ও সীমিত সম্পদের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, পরিশোধন কৌশল ও অনুপ্রেরণা প্রদানের ব্যবস্থা উভয়ের সাথেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের[৭] অনুকুল পরিবেশ যুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে, যা মানুষকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং তা এমন ভাবে করে যে, সার্বিক অর্থে তা লক্ষ্য বাস্তবায়নের অনুকুল হয়ে থাকে। এটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারকে সামনে নিয়ে আসে।

উদাহরণত: সকলের অভাব মেটানোটাকে যদি একটি লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এবং বাজারের নিয়ামক শক্তিসমুহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ লক্ষ্যে অগ্রসর না হয়, তাহলে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। বাজেট সমস্যার কারনে রাষ্ট্র যদি কোন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে না পারে, তাহলে পরিবার বা সমাজের পক্ষে এরুপ বোঝার অংশীদার হওয়া সম্ভব কি? তবে, যদি পরিবার ও সমাজের মুল্যবোধ বা কাঠামো কালান্তরে পরিবর্তন হয়ে থাকে, যার ফলে তারা বোঝা বহনে অংশীদার হতে অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম হয়, তাহলে তার মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা না করা অর্থশাস্ত্রের পক্ষে কি সম্ভব হবে? এটি করতে অস্বীকার করার অর্থ হবে বিদ্যমান বৈষম্যকে আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করার

---

[৭] এ বইয়ে মুল্যবোধসমুহ বলতে বুঝায় নিজেদের, পরিবারের ও সমাজের প্রতি মানুষের নৈতিক কর্তব্য। এগুলো যা কিছু ভাল কিংবা খারাপ, সঠিক কিংবা ভুল, ন্যায় কিংবা অন্যায় তা সুনির্দিষ্ট করে বাঞ্ছিত আচরণ দেখিয়ে দেয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি- স্বার্থ হাসিলের প্রবণতা হ্রাস করে ন্যায়বিচার, সকলের মঙ্গল, ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করা। নৈতিক কর্তব্য পালন করার জন্য প্রেরণা আসে আল্লাহ'র প্রতি ভালবাসা থেকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা থেকে এবং পরকালে পুরস্কার প্রাপ্তির আকাংখা থেকে। তবে, সকল মানুষকে দিয়ে ন্যায়ের পথে কাজ করানোর জন্যে এ কারনটি যথেষ্ট নয়। পার্থিব পুরস্কার এবং খারাপ নিরোধকের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

মুল্যবোধসমুহ প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে তখনই যখন সেগুলোকে বিধি, আইন, প্রথা ও সংবিধানে রুপান্তর করা হয়। সেগুলো তখন আর নৈতিক কর্তব্য থাকে না, আইনগত কর্তব্যও হয়ে পড়ে। মুল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অর্থ হচ্ছে যে, ধনী ও ক্ষমতাধর নির্বিশেষে (আইনের) লংঘনকারীদেরকে আটক ও শাস্তি প্রদানের জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সামিল। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা ও টানা-পোড়েন বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত পার্থিব অর্থেই সমাজের পতন আসতে পারে। একইভাবে, এমনকি যদিও কোন সমাজের মূল্যবোধও থাকে, এবং অপরাধীদেরকে আটক ও শায়েস্তা করার মত কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকার কারনে মানুষ অসততা, দুর্নীতি ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করে সটকে পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে দীর্ঘ দিন যাবৎ চেনা পথে চলতে থাকার কারনে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তি অর্জন প্রক্রিয়ায় এরুপ অবস্থা স্থায়ীরুপ লাভ করে যায়। তখন প্রত্যেকেই হয়ত: এ ব্যবস্থার নিন্দা করতে পারে, কিন্তু কেহই একা তা দুর করতে সক্ষম হবে না। কেবল মাত্র হাদিস শুনিয়ে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পুণ: গঠনের মাধ্যমে সার্বিক সংস্কারে হাত না দিয়ে অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাকে দুর করা সম্ভব হবে কি? যদি এরুপ পুণ: গঠন প্রয়োজন হয়, তাহলে রাষ্ট্রের সহায়ক ভূমিকা ব্যতীত তা ঘটানো সম্ভব হবে কি? যেরুপ পরিবর্তন প্রয়োজন, এবং পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে তা আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা অর্থশাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

যদি অর্থশাস্ত্রের বেছে নেয়া কৌশল প্রত্যাশিত কল্যাণের ধারনার সাথে সঙ্গতিপুর্ণ না হয়, কিংবা প্রত্যাশিত পুণ: গঠন ঘটানো না হয় বা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রত্যাশিত ধরনের কল্যান অর্জিত হবে না। এরুপ প্রেক্ষাপটে, প্রত্যাশিত কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও পুণ: গঠনকে যা কিছুই বাধাগ্রস্থ করে, তাকে বিকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, এবং লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে না বা লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এরুপ কোন খাতে সম্পদের ব্যবহার করা হলে তাকে 'অনুৎপাদনশীল', 'অপ্রয়োজনীয়' বা 'অপচয়মুলক' বিবেচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের রুপকল্পের বাস্তবায়নের জন্য যেরুপ পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও পুণ: গঠন প্রয়োজন তার দ্বারা অর্থনীতিতে রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করে থাকে তাও নির্ধারন করা যেতে পারে।

বিশ্ববীক্ষার (World view) ভূমিকা

অর্থশাস্ত্র কর্তৃক বেছে নেয়া কল্যাণের ধারনা তৎসহ অর্থশাস্ত্র কর্তৃক গৃহীত পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও পুণ: গঠণ কৌশল মুলত: তার বিশ্ববীক্ষা (World view) কর্তৃক নির্ধারিত, যা আবার "প্রায় যে কোন বিষয়ে মানুষের চিন্তা-চেতনার গতি-প্রকৃতি"-কে প্রভাবিত করতে চায়।[৮] এরুপ বিশ্ববীক্ষা (world view) যে সকল প্রশ্নের জবাব দিতে চায়, তার কতিপয় হচ্ছে এ মহাবিশ্ব কীভাবে জন্ম নিয়েছে, মানুষের জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য, মানুষের হেফাজতে

---

[৮] Lovejoy, 1960, p. 7.

থাকা সীমিত সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা ও উদ্দেশ্য, এবং ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার ও পরস্পরের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং তাদের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ।

এ সকল প্রশ্নের জবাবের মধ্যে মানুষের চিন্তাধারা ও আচরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বগত কাঠামো ও নীতি সংক্রান্ত পরামর্শের জন্ম দিয়ে থাকে। উদাহরণত: যদি বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, মহাবিশ্ব নিজে নিজেই এসেছে, এবং মানুষকে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হবে না, তাহলে তারা যেমন খুশী জীবন যাপন করতে পারে। জীবনে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যতবেশী সম্ভব সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-স্বার্থ হাসিল করা। এ ক্ষেত্রে তাদের কল্যাণের পরিমাপ হবে তারা কত পরিমান দৈহিক আনন্দ ও ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। যোগ্যতমের টিকে থাকার অধিকারই হয়ত: হবে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত আচরণের ধারা। ভাববাদি মুল্যায়ন হয়ত: অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে এবং পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও পুণ: গঠনের তিনটি কৌশলই হয়ত: মানবজাতি কর্তৃক তাদের নিজস্ব যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে তোলা হবে।

তবে, যদি মহান স্রষ্টা কর্তৃক সকল মানুষ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং তাদের হেফাজতে থাকা ধন-সম্পদ যদি স্রষ্টার তরফ থেকে প্রাপ্ত আমানত হয়ে থাকে, তাহলে সকল মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে অন্যের সাথে এক স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে, এবং স্রষ্টার নিকট দায়বদ্ধ রয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা যা খুশী তা করার জন্য সম্পূর্ন স্বাধীন নয়, বরং তাদের নিকট থেকে আশা করা হয় যে, তারা এমন ভাবে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করবে, এবং পরিবেশ ও পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে যেন ধনী কিংবা গরীব, সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ, ছেলে কিংবা বুড়ো নির্বিশেষে তা সকল মানুষের কল্যান অর্জন করার পক্ষে সহায়ক হয়। তারা কেবল মাত্র পার্থিব লক্ষ্যসমূহই অর্জন করবে না, আধ্যাত্মিক ও মানবিক লক্ষ্যসমূহও, বিশেষত: সামাজিক শান্তি ও অস্থিরতা মুক্ত সমাজ, বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে, প্রত্যাদেশ (Revelation) ও যুক্তি উভয়ই পরিশোধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও পুণ: গঠনে একটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং ভাববাদি মুল্যায়ন সীমার বাইরে যাবে না।

কর্মপদ্ধতি

অর্থশাস্ত্রের কর্মপদ্ধতিও তার বিশ্ববীক্ষা কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। ভাষাগতভাবে, কর্মপদ্ধতি শব্দটি কোন প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুক্তিসঙ্গত ধারায় সাজানো

www.pathagar.com

কোন শাস্ত্রীয় বিধি ও পদ্ধতিকে বুঝায়।[৯] মুলত: কর্মপদ্ধতি যা করে তা হচ্ছে কোন শাস্ত্রের অংশ হিসেবে কোন প্রস্তাবনা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখানের জন্য একটি মাপকাঠি সরবরাহ করা।[১০] সুতরাং, কাউস (Caws) যথার্থই বলছেন, গৃহীত পদক্ষেপ এবং গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখানের মাপকাঠি প্রত্যাশিত লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে।[১১]

যোগ্যতমের টিকে থাকার অধিকার যদি গ্রহনযোগ্য আচরন ধারা হয়ে থাকে, এবং যদি মানুষের অভিরুচী ও ধন-সম্পদ অনুসারে ইচ্ছে মাফিক যা খুশী তা করার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে বাজার ব্যবস্থার নিয়ামক শক্তিগুলো যেরুপ বরাদ্দ ও বন্টন সংঘটন করছে সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন তোলা যাবে না। মানবিক লক্ষ্যসমুহ নিয়ে আলোচনা করা অবান্তর হবে। অর্থশাস্ত্র স্থিতাবস্থা মেনে নিবে, এর উপর কোনরুপ মন্তব্য করবে না, এবং এর পরিবর্তনের জন্য কোন কৌশলগত সুপারিশ করবে না। এর কাজ হবে বাজার ব্যবস্থায় সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন বাস্তবে কীভাবে ঘটছে কেবলই তা বর্ণনা করা (ইতিবাচক বর্ণনা করা), এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সে বিষয়ে ভবিষ্যত বাণী করার লক্ষ্যে এরুপ বরাদ্দ ও বন্টনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চলকসমুহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক তাত্ত্বিকভাবে ও বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। অর্থশাস্ত্র তখন একান্তই একটি প্রত্যক্ষবাদি (positive) শাস্ত্রে পরিণত হবে যার কোন সমস্যা-সমাধানমুলক (normative) ভূমিকা থাকবে না।

তবে, যদি অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য হয়ে থাকে মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন করা, তাহলে এর কর্মপদ্ধতি কেবলই বর্ণনা করা, ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা ও ভবিষ্যত বাণী করা হতে পারে না, বরং প্রকৃত ফলাফলের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল তুলনা করা, দু'য়ের মধ্যস্থিত পার্থক্যগুলোর কারন ব্যাখ্যা করা, এবং অযথা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব না করে এরুপ পার্থক্যসমুহ কীভাবে দুর করা যায় তা দেখানোও এর আওতাভুক্ত হতে পারে। ভাববাদি মুল্যায়নও তখন সীমা ছাড়িয়ে যাবে না। যেহেতু, প্রত্যাদেশের (Revelation) লক্ষ্য হচ্ছে এরুপ ভাববাদি মুল্যায়নে সহায়তা করা, সেহেতু, সেটাকেও স্বাগত জানানো যেতে পারে, এবং

---

[৯] কর্মপদ্ধতি (method) ও কর্মপদ্ধতি (methodology) শব্দ দু'টির জন্য Webster's Ninth New Collegiate Dictionary দেখুন। আরো দেখুন, Caws, 1967; Blaug, 1980, p. xi.

[১০] দেখুন, Machlup, 1978, p. 54; Blaug, 1980, p. 264.

[১১] Caws, 1967, p. 339.

www.pathagar.com

তখন অর্থশাস্ত্র প্রত্যাদেশ (Revelation), ও যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষবাদি (positive) ও সমস্যা-সমাধানমূলক (normative) কার্যাবলীর মধ্যে কোনরূপ নিশ্চিদ্র পার্থক্য সৃষ্টি করার কোন যুক্তি নেই, যেহেতু, উভয়কেই ঘনিষ্টভাবে সমন্বিত করা সম্ভব হতে পারে এবং উভয়ে একত্রে অর্থশাস্ত্রের অস্তিত্বের নিমিত্তের (raison d'etre) অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অর্থশাস্ত্রের রূপকল্প, কৌশলাদি, এবং কর্মপদ্ধতি সবই বিদ্যমান বিশ্ববীক্ষার যৌক্তিক ফলাফল। যদিও চলমান মুখ্য বিশ্ববীক্ষাগুলোর কোনটিই সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদি ও আনন্দবাদি কিংবা সম্পূর্ণরূপে মানবিক ও আধ্যাত্মিক নয়, তথাপিও বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের মধ্যে গুরুত্ব আরোপের বিষয়গুলো বিবেচনায় এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। গুরুত্বারোপে পার্থক্য যত বেশী হবে, এ সকল সমাজগুলোর অর্থশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যও ততবেশী হবে। তাঁর চিন্তা-উদ্দীপক বই Against Method- এর চীনা সংস্করনের ভূমিকায় ফেয়ারব্যান্ড (Feyerabend) স্পষ্টভাবেই তা স্বীকার করেছেন: "প্রথম বিশ্বের বিজ্ঞান হচ্ছে অনেকগুলোর মধ্যে কেবল মাত্র একটি; এর চেয়ে বেশী কিছু দাবী করার মাধ্যমে এটি আর গবেষণার কোন শাস্ত্র থাকে না এবং একটা (রাজনৈতিক) দাবী আদায়ের সংঘে পরিণত হয়"।[১২] এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র, যার বিশ্ববীক্ষা প্রায় প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বিশ্ববীক্ষার মতই এবং যার অনেক প্রবক্তাগণ অনুভব করেন যে, নব্য-সনাতনী অর্থশাস্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক, সেই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ডগলাস নর্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে: "স্থবির নব্য-সনাতনী তত্ত্বের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য বিদ্যমান তত্ত্বগুলোর পরিবর্ধন (modification) প্রয়োজন। কিন্তু, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কোন মডেল উদ্ভাবন করার জন্য সম্পূর্ণ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার পড়ে, কারন এরূপ কোন মডেলের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই"।[১৩]

তবে, যদি বিশ্ববীক্ষা ও রূপকল্পের মধ্যেও বিশেষ কোন পার্থক্য থেকে থাকে, তাহলে শাস্ত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য না থাকার কোন কারন নেই। একটি শাস্ত্র কেবল মাত্র বিদ্যমান অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চাইতে পারে, কোন

---

[১২] Feyerabend, 1993, p. 3; বন্ধনী মুল রচনায়।
[১৩] North, 1990, p. 112.

www.pathagar.com

ভাববাদি মুল্যায়ন করতে চাইবে না, এবং জীবনের রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন সামাজিক পরিবর্তনের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করবে না। অন্য একটি শাস্ত্র 'বিদ্যমান' অবস্থাকে মেনে নিতে রাজী হবে না, এবং প্রত্যাশিত সামাজিক রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করতে চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে, কীভাবে, কী পদ্ধতিতে রূপকল্পটি বাস্তবায়ন করা যায়, সে সম্পর্কীয় আলোচনা সম্ভবত: এড়ানো যাবে না।

ইসলামী অর্থশাস্ত্র সৃজন করার প্রয়াস বিচ্ছিন্নতা[১৪] তৈরী করছে এরূপ বলা তখনই সত্য হতে পারে, যদি দু'টো শাস্ত্রের কোন একটার মধ্যে ঔদ্ধত্য ও এক গুয়েঁমী বিরাজ করে এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া রোধ করে। বিভিন্ন বিশ্ববীক্ষা ও বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ও বন্ধুত্বপুর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে বিভিন্ন ধারনার বহুমুখী পরাগায়নের মাধ্যমে উভয় শাস্ত্রেরই গভীরতা ও প্রশস্ততা বাড়বে, এবং এভাবে বিশ্ব আরো সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী হবে। একারনে ফেয়ারব্যান্ড ঠিকই বলেন, "তত্ত্বের সৃজন বিজ্ঞানের জন্য উপকারী, যদিও তত্ত্ব মেনে নেওয়া বিজ্ঞানের সমালোচনা করার ক্ষমতাকে দূর্বল করে। সবার মধ্যে মিল-মিশ ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে"।[১৫]

উপরের আলোচনা তাত্ত্বিক মনে হতে পারে, কিন্তু, আমরা যখন প্রচলিত ও ইসলামী অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করবো তখন দেখা যাবে, মানব সমাজের ইসলামী রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে চাইলে কেন ইসলামী অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক।

---

[১৪] Kuran, (1996) এরূপ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, পৃ: ১৯৬।

[১৫] Feyerabend, 1993, p. 5.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১ম অধ্যায়

প্রচলিত অর্থশাস্ত্র

যারা সন্দেহ করেন যে অর্থশাস্ত্র যে কাঠামোটি নির্মান করেছে তার সব কিছুই ভাল চলছে না, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছেই। (মার্ক ব্লাউগ) [১৬]

মানুষ হচ্ছে একটা নৈতিক জীব এবং কোন রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নৈতিক ভিত্তি ছাড়া বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। (নাইজেল ল'সন) [১৭]

পাহাড় প্রমান অগ্রগতি

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র নি: সন্দেহে প্রচুর অগ্রসর হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সুক্ষতার আকারে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতিতে এর অবদান মুল্যায়ন করতে গেলে এটি সম্ভবত: পুর্ণ নম্বর পেতে পারে। ইতিহাসের অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় এর অবদান অনেক অনেক বেশী। তবে, মানুষের যেমন কোন শাস্ত্রের উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতি আকর্ষণ থাকে, তেমনি তাদের অধিকতর আগ্রহ থাকে তা তাদের সমস্যা সমাধানে, এবং তাদের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমুহ বাস্তবায়নে কত খানি সাহায্য করতে পারে। সুতরাং, প্রচলিত অর্থশাস্ত্র এ বিষয়টি কতটা সামাল দিতে সক্ষম?

প্রচলিত অর্থশাস্ত্র তার সামনে দু' গুচ্ছ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারন করে রেখেছে। এর একটাকে বলা যেতে পারে অর্থশাস্ত্রীয় আচরণগত (Positive, ও সীমিত সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে 'উৎপাদনশীলতা' ও 'সমবন্টন' বাস্তবায়নের সহিত সম্পর্কিত। অন্যটি হচ্ছে সমস্যা সমাধান সম্পর্কীয় (normative) এবং, যা অভাব-মেটানোর সার্বজনীন আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য, পুর্ণ কর্মসংস্থান, আশানুরুপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আয় ও সম্পদের সমবন্টন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য আকারে প্রকাশ করা হয়, এবং সামাজিক সংহতি ও সামাজিক অশান্তির অনুপস্থিতিসহ যার সবই কম-বেশী মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ দু' গুচ্ছ লক্ষ্যসমুহের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অর্ন্তনিহিত বিশ্ব-বীক্ষা (World view) র আলোকে ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করা। তবুও, প্রথম গুচ্ছকে বলা হয় অর্থশাস্ত্রীয় আচরণগত

---

[16] Blaug, 1980, p. xiii.
[17] Lawson, 1995, p. 35.

www.pathagar.com

(Positive), কারন দাবী করা হয় যে, ব্যক্তিগত মুল্যায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও সমবন্টন নির্ধারন করা যাবে, এবং দ্বিতীয় গুচ্ছটিকে বলা হয় সমস্যা সমাধানমুলক (normative)। কারন, এতে সমাজের মহান স্বপ্ন, 'যা করা উচিৎ', প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এ সকল অর্থশাস্ত্রীয় আচরণগত (Positive) ও সমস্যা সমাধানমুলক (normative) লক্ষ্যসমুহ পারস্পরিক সামঞ্জস্যপুর্ণ কি না তা নির্ভর করে সম্পদের উৎপাদনশীল ও সমবন্টন কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার উপর। এ আলোচনা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হবে। একটি গতিশীল অর্থনীতিতে সম্পদের উৎপাদনশীল ও সমবন্টন সংজ্ঞায়িত করন ও পরিমাপ করার অসুবিধার কারনে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র আচরণগত (Positive) লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে কিনা তা বলা মুশকিল হয়ে থাকে। তবে, সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, এমনকি ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলোও তাদের দখলে প্রচুর সম্পদ থাকা সত্বেও একই সাথে তাদের সকল সমস্যার সমাধানমুলক (normative) লক্ষ্যসমুহ অর্জনে সক্ষম হয় নি। যদি এগুলোর কতিপয় লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েই থাকে, তবে তা হয়েছে অন্যগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমান মতে প্রতীয়মান হয় যে, কালের ব্যাপ্ত পরিসরে ব্যর্থতা আরো বেশী করে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। সুতরাং, এরুপ ব্যর্থতার কারন কি হতে পারে?

লক্ষ্যসমুহ ও বিশ্ব-বীক্ষা (World view) মধ্যস্থিত বিরোধ

এরুপ ব্যর্থতার দু'টি সম্ভাব্য কারন থাকতে পারে: প্রথমত, পরিশোধন, প্রেরণা যোগান ও পুণ:গঠনের জন্যে উপযুক্ত কৌশল প্রণয়নে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অক্ষমতা; এবং দ্বিতীয়ত, এ সকল কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সমাজের অক্ষমতা। তবে, প্রয়োগের প্রশ্নটি কেবল মাত্র তখনই গুরুত্ব পায় যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রণীত কৌশলটি সমস্যার সমাধানমুলক (normative) লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত। এমন কি হতে পারে যে, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের প্রণীত কৌশল তার লক্ষ্যসমুহের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়? এ বইয়ের প্রেক্ষাপটে জবাবটি হাঁ বোধক।

সম্ভবত: এর কারন হতে পারে যে, লক্ষ্যসমুহ ও প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের কৌশলগুলো দু'টি ভিন্ন বিশ্ব-বীক্ষা (World view) থেকে নেয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধানমুলক (normative) লক্ষ্যসমুহ হচ্ছে একটি ধর্মীয় বিশ্ব-বীক্ষার (World view) উপজাত, যে বিশ্ব-বীক্ষা (World view) স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের ভূমিকা ও স্রষ্টার সামনে মানুষের জবাবদিহি করা, মানব ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে নৈতিক মুল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যদিও

অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে এ সকল লক্ষ্যসমুহের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তাদের মুল উৎস ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে ধর্মীয় বিশ্ব-বীক্ষার (World view) মধ্যে। পরিশোধন, প্রেরণা যোগান ও পুণ: গঠনের কৌশল হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার (Enlightenment) যুগের ইহজাগতিক বিশ্ব-বীক্ষার (World view) উপজাত। সুতরাং, মানবিক কৌশল ব্যতীত মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি মুলত: পন্ডিতগণের ছোট একটি দলের ভেতর সীমিত ছিল, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক মডেলের মধ্যস্থিত বিরোধের প্রভাব অর্থনীতি ও সমাজের উপর তেমন একটা পড়েনি। নিয়োজিত কৌশলে ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের উপরে ধর্মীয় মুল্যবোধের অবস্থান ছিল ও তা প্রাধান্য বিস্তার করেই চলছিল। তবে, ইহজাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণ মাধ্যমের সহায়তায় ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার (Enlightenment) যুগের বিশ্ব-বীক্ষার (World view) ইহজাগতিক মুল্যবোধের বিকাশের সাথে সাথে, এবং তাদের নৈতিক দীক্ষার পতন রোধ কল্পে নতুন প্রজন্মকে যথাযথ নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে লালন-পালন করতে ভাঙ্গনরত পরিবারগুলোর ব্যর্থতার কারনে বিরোধটি আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বিশ্ববীক্ষা (World view)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার (Enlightenment) আন্দোলন নাযিল হওয়া সকল ধর্মীয় সত্যকে বিবেচনা করেছে "শুধু মাত্র কল্পিত, অস্তিত্বহীন, বস্তুত: মানুষকে যুক্তি ও প্রকৃতির পথ থেকে অজ্ঞ রাখার লক্ষ্যে ধর্মযাজকদের আবিষ্কার" হিসেবে।[১৮] এ আন্দোলন মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যাদেশের (Revelation) যে কোন প্রকার ভূমিকাকে অস্বীকার করে এবং অন্যায় থেকে ন্যায় আলাদা করা ও মানব জীবনের সকল বিষয়ে শৃংখলা আনয়নের ক্ষেত্রে যুক্তির যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এভাবে এ আন্দোলন সমাজকে বঞ্চিত করেছে নৈতিক মুল্যবোধের আওতায় পরিশোধন, প্রেরণা যোগান ও পুণ: গঠনের কলা-কৌশল থেকে, যার ক্ষমতা রয়েছে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে বাজার ব্যবস্থার ভূমিকার কার্যকর পরিপূরক হিসেবে কাজ করার।

তবে, প্রত্যাদেশ যদি 'শুদ্ধ' ও 'ভুল', 'বাঞ্ছিত' ও 'অবাঞ্ছিত', 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' বিবেচনার মাপকাঠি রুপে গ্রহন না করা হয়, তাহলে এগুলো

---

[18] Brinton, 1967, p. 520.

www.pathagar.com

সংজ্ঞায়িত করার অন্য কোন উপায় থাকতে হবে। উপযোগবাদিদের আনন্দবাদি মতবাদকে বিকল্প হিসেবে পেশ করা হলো। শুদ্ধ ও ভুল নির্ধারিত হবে 'আনন্দ' ও 'বেদনা'র পরিমাপযোগ্য মাপকাঠির ভিত্তিতে।[১৯] এ পদ্ধতির ফলে অর্থশাস্ত্রে সামাজিক ডারউনিজম, বস্তুবাদ ও নিমিত্তবাদের দর্শন ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান প্রচলনের পথ প্রশস্ত হলো।

সামাজিক ডারউনিজম হচ্ছে মানব সমাজে ডারউইনের যোগ্যতমের টিকে থাকা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতির সম্প্রসারন। এর ফলে, মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে শৃংখলা আনতে গিয়ে অসাবধানতাবশত: 'শক্তিধরই সঠিক' (might is right) নীতির প্রতি নীরব সমর্থন প্রদান করা হয়ে গেল, এবং গরীব ও নির্যাতিতদের নিজেদেরকেই তাদের দারিদ্র ও দুর্দশার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হলো। সুতরাং, ধনী ও শক্তিধরগণ তাদের বিবেকে শান্তি বোধ করার সুযোগ পেল এবং সমাজ ব্যবস্থার ক্রটি ও অবিচার দুর করার জন্যে তাদের কোন প্রকার সামাজিক কিংবা নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার সুযোগ পেয়ে গেল।

বস্তুবাদ ধন-সম্পদ, দৈহিক সন্তুষ্টি, এবং ইন্দ্রিয় সুখকে মানুষের পরিশ্রমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। এর ফলে আজকের ভোগবাদি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা ক্রমবর্ধমান ভোগকে একটি নৈতিক কর্তব্যে পরিণত করেছে এবং যা মানুষের অভাবকে বহুগুন বাড়িয়ে সেগুলো পুরণ করা প্রাপ্য সম্পদের সাধ্যের বাইরে নিয়ে গেছে। এরুপ সংস্কৃতির রীতি-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের একটা অবিতর্কিত প্রস্তাব হচ্ছে যে, কমের চেয়ে বেশী অবশ্যই তুলনামুলকভাবে ভাল, এবং, তদানুযায়ী, বর্ধিত উৎপাদন, বেশী বেশী বস্তুগত ধন-সম্পদ, এবং বেশী বেশী ভোগ অবশ্যই ভাল।[২০] বোঝা যায়নি যে, বেশী বেশী উৎপাদন ও ভোগের অর্থনীতি-বহির্ভূত খরচ হ্রাস করার জন্যে এবং অধিকতর সাম্য অর্জন ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মনুষ্য সমাজে কখনও কখনও বস্তুগত লক্ষ্যসমুহকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

---

[19] Miller, 1962, pp. 230-31; আরো দেখুন, Russell, 1945, pp. 773-82.

[20] এলান ব্লাইন্ডার প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের তিনটি অবিসংবাদিত প্রস্তাব যথার্থই সনাক্ত করেছিলেন:

(ক) কমের চেয়ে বেশী ভাল;

(খ) সম্পদ সীমিত;

(গ) কম উৎপাদনশীলতার চেয়ে বেশী উৎপাদনশীলতা ভাল (Blinder, 1987, pp. 15-17)।

www.pathagar.com

নিমিত্তবাদ ঈঙ্গিত করলো যে মানুষের আচরনের উপর মানুষের সামান্যই নিয়ন্ত্রন রয়েছে। বরং, ক্রিয়া-কর্মগুলোকে দেখা হতো মুলত: বাইরের উদ্দীপকের প্রতি: যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ারুপে, যেমন হয় জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে (Watson and Skinner), ব্যক্তির সচেতন নিয়ন্ত্রনের বাইরে অসচেতন মানসিক অবস্থা রুপে (Freud), কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব রুপে (Marx)। সুতরাং, নিমিত্তবাদ শুধুমাত্র মানব সত্বার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও জটিলতাকেই অস্বীকার করে নি, এটি সামাজিক ডারউইনিজমের পদাংক অনুসরন করে ব্যক্তির আচরণের নৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করলো। যেহেতু, ব্যক্তির আচরন নিয়ন্ত্রনকারী পরিস্থিতি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনের বাইরে থাকে, সেহেতু, গরীব ও নির্যাতিতদের কপালে যা-ই ঘটুক না কেন তার জন্য ধনী বা শক্তিধর ব্যক্তিগণকে দোষারোপ করা যাবে না। এটি ধর্মীয় বিশ্ব-বীক্ষা (World view) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার কর্মের জন্য দায়ী এবং এ কারনে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

তবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার (Enlightenment) যুগের বিশ্ব-বীক্ষা (World view) তাৎক্ষণিকভাবে নৈতিক স্খলন কিংবা ধর্মীয় বিশ্ব-বীক্ষার (World view) মানবিক মুল্যবোধসমুহের ক্ষয় সাধন শুরু করে নি। তবে, এটি বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় মডেলের মধ্যে একটা বিরোধের সূত্রপাত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এমন অনেক গুলো ধারনার অবতারনা করতে সক্ষম হয়েছিল যা মানবিক লক্ষ্যসমুহের সহিত সাংঘর্ষিক ছিল। প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন তিনটি গুরুত্বপুর্ণ ধারনা হচ্ছে: যৌক্তিক অর্থনৈতিক মানুষ, প্রত্যক্ষবাদ (positivism), ও ছেই-এর সূত্র (Say's law)। অর্থশাস্ত্রে এ গুলোর অর্থ ও তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষ

প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বদ্ধমুল ধারনা হচ্ছে যে ব্যক্তির আচরণ যৌক্তিক হয়ে থাকে। এরুপ অনুমান মেনে নেয়া যদিও কঠিন কিছু নয়, তবুও যৌক্তিকতার সংজ্ঞা প্রদানে কিছু সমস্যা রয়েছে, এবং আসলেই এরুপ সংজ্ঞা নানা ভাবেই প্রদান করা যায়।[21] তবে, সমাজের সমস্যা-সমাধানের লক্ষ্যসমুহ একবার নির্ধারন করা সম্ভব হলে এরুপ সংজ্ঞা প্রদানের জন্য অসীম স্বাধীনতা আমাদের আর থাকে না। যৌক্তিক আচরণ তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এমন আচরনের সহিত সম্পৃক্ত হয়ে

---

[21] Sen, 1987, pp. 11-14.

পড়ে যা এ সকল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অনুকুল হয়ে থাকে। তখন প্রতীয়মান হবে যে, ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার সহিত এ সকল লক্ষ্যসমূহ এবং তার মাধ্যমে তার নিজের ও অন্যান্যদের কল্যাণ অর্জনে প্রভাবক সকল অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়সমূহ বিবেচনা করে থাকে।

তবে, অর্থশাস্ত্র তা করেনি। অন্যের কল্যাণ চিন্তা করা হলে ব্যক্তির আচরনের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপের প্রয়োজন পড়তো। এটা ইহজাগতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঠিক মানায় না এবং এরূপ চিন্তা বাতিল হয়ে যেতো। এ কারনে, অর্থশাস্ত্রে সামাজিক-ডারউইনিজম তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তিবাদিতাকে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের সমার্থক করা হলো। কার্যত: সকল লেখকের রচনায় 'যৌক্তিক অর্থনৈতিক মানুষে'র যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে। তারা "মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের তাগিদকে প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নৈতিক সমকক্ষ রুপে ব্যাখ্যা করেছেন"।[২২] এজওয়ার্থ এরুপ ধারনা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন এভাবে: "অর্থশাস্ত্রের প্রথম নীতি হচ্ছে যে, প্রত্যেক এজেন্ট কেবল মাত্র স্বীয়-স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকে"।[২৩] এরুপ কাঠামোর মধ্যে সমাজের যে ধারনা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে এটা শুধুই স্বীয়-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের একটা সমষ্টি।

তবে, এমন কি অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত, আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত স্বীয়-স্বার্থ বিভিন্ন উপায়ে হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু এর বস্তুবাদি ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থশাস্ত্র ব্যক্তি-স্বার্থের সকল অর্থনীতি-বহির্ভূত দিকগুলো বাতিল করে দিল এবং মুলত: যুক্তিবাদিতাকে 'অর্থনৈতিক'-এর সমার্থক করে ফেললো। এমনকি 'অর্থনৈতিক' শব্দটিকেও শুধুমাত্র আর্থিক বিষয়ে সীমিত করে ফেললো। অর্থশাস্ত্র তৈরী করলো 'অর্থনৈতিক মানুষে'র কল্পনাপ্রসূত ধারনা, যার "এক মাত্র, শুধুমাত্র একটি সামাজিক দায়িত্ব হলো তার লাভের অংক বর্ধিতকরন"।[২৪] এ ভাবে অর্থশাস্ত্র মুলত: নিজকে জড়িত করলো যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষের আচরন বিষয়ে - যে মানুষ কেবল মাত্র যে কোন উপায়ে তার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বীয়-স্বার্থ চরিতার্থ করনে উৎসাহী হয়ে থাকে। সহযোগিতা, দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও পরার্থপরতা'র মত অন্য যে সকল আবেগ মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে আনে, তাৎক্ষণিকভাবে

---

[22] Myers, 1983, p. 4.
[23] Edgeworth, 1881, p. 16.
[24] Friedman, 1972, p. 133.

www.pathagar.com

নিজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও যেগুলোর কারনে মানুষ অন্যের কল্যাণ সাধনে ব্রতি হয়ে থাকে, সেগুলো সব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হলো। সুতরাং, অর্থনীতির ইহজাগতিক পোষাক বস্তুত: ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করনকে পরিশোধন, প্রেরণা যোগান ও পুণ: গঠনের প্রাথমিক কৌশলে পরিণত করলো।

প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)

মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে জরুরী এমন অনেক মানবিক লক্ষ্যসমুহের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে থেকেও কোন একজন ব্যক্তি তার স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম। এ যদি হয় ঘটনা, তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মসহ মানুষের সাথে একত্রে বসবাসরত সকল পার্থিব প্রাণীকুল, তৎসহ জীবনের বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দিকগুলোর প্রতি যথাযথ মনযোগ প্রদান করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির স্বাধীনতা হবে কেবল মাত্র অনেকগুলো লক্ষ্যের একটি। একবার সকল প্রত্যাশিত লক্ষ্য চিহ্নিত করা গেলে পরে প্রত্যক্ষবাদ পরিমাপ করার সবচেয়ে যৌক্তিক উপায় হবে শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য অর্জনের সফলতার দিকে নজর দেয়া নয়, বরং, মানব কল্যাণ অর্জনের প্রাধিকার অনুসারে সকল লক্ষ্যসমুহের দিকে নজর দেয়া। অর্থনৈতিক কিংবা অ-অর্থনৈতিক, সরকারী কিংবা বেসরকারী, নৈতিক কিংবা পার্থিব ইত্যাদি নির্বিশেষে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সকলের কল্যাণ সাধনে অবদান রাখতে সক্ষম এমন সকল বিষয়সমুহকে বিবেচনায় গ্রহণ করতে হতে পারে। বাজার ব্যবস্থা বিবেচনায় গ্রহণ করে এমন বস্তুগত বিষয়গুলোকে নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো পরিপূরক হিসেবে সহায়তা করে থাকে, এবং এ প্রক্রিয়া লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

তবে, প্রত্যক্ষবাদ এ সকল লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়নে অন্য সকল লক্ষ্যসমুহের সমান গুরুত্ব কিংবা অ-বস্তুগত বিষয়সমুহের গুরুত্ব মেনে নেয় না। এটি বস্তুগত স্বীয়-স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষের স্বাধীনতার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে থাকে। এটি যুক্তি দেখায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব স্বার্থের সেরা বিচারক এবং বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে তার বিবেচনায় নিজের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষাকারী যে কোন একটি বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ তাকে দেওয়া উচিৎ। নৈতিক বা অন্য কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতার মধ্যে তাকে রাখা উচিৎ নয়। এটা বিবেচনার মধ্যে নেয়া হয় না যে, কোন ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থের সেরা বিচারক হয়ত: হতে পারেন, কিন্তু, তিনি অবশ্যই সামাজিক স্বার্থের সেরা বিচারক নন।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি এরূপ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে ভাববাদি মুল্যায়ন (value judgements) অভিশপ্ত ও বাতিল হয়ে গেল এবং মুল্যবোধ-নিরপেক্ষতার (value-neutrality) উপর জোর দেওয়া হলো। অর্থনীতিকে ঘোষণা করা হলো "দু' প্রান্তের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ" হিসেবে,[২৫] এবং যার অবস্থান "বিশেষ কোন নৈতিক অবস্থান গ্রহণ কিংবা সমস্যা-সমাধানমুলক মতামত (normative judgements) প্রদানের দায় থেকে স্বাধীন"।[২৬] সমাজের সদস্যগণের পছন্দ-অপছন্দ কিংবা তাদের ভাববাদি মুল্যায়ন পুর্ব-নির্ধারিত মর্মে ধরে নেয়া হলো। সমস্যা-সমাধানমুলক লক্ষ্যসমূহের সহিত সামঞ্জস্যতার আলোকে এ সকল বিষয়ে কোন মুল্যায়ন প্রকাশ করা যেত না। পরিণতিতে, অর্থশাস্ত্রবিদগণের মুল কাজ হয়ে পড়লো 'বিদ্যমান অবস্থার' বর্ণনা ও ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা, যাতে কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব হয়।[২৭] 'বিদ্যমান অবস্থা' সম্পর্কে তাঁরা কোন প্রকার মতামত প্রদান করতে পারবেন না, কিংবা 'কী হওয়া উচিৎ' সে বিষয়ে কোন ঈঙ্গিত প্রদান করতে পারবেন না। তাঁরা কেবল সম্ভাব্য কার্যাবলী আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু অগ্রাধিকারমুলক কার্যাবলী আলোচনা করতে পারেন না।

প্রত্যক্ষবাদ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে যে, নব্যচিরায়ত ও কেইনসীয় বিপ্লবের পরেও এটি অর্থনীতির পেশাজীবীদের সাধারণ সদস্যদের নিকট সপ্তদশ শতাব্দি থেকে অবিসংবাদিত ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে থাকলো।[২৮] এর ফলে প্রকারান্তরে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে

---

[২৫] Robbins, 1935, p. 240.

[২৬] Friedman, 1953.

২৭ অর্থনৈতিক পদ্ধতির লক্ষ্য সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। স্যামুয়েলসনের মত প্রত্যক্ষ্যবাদি ও প্রয়োগবাদিগণ জোর দেন যে, অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা হচ্ছে শুধুমাত্র বর্ণনা করা। যুক্তিবাদি বাস্তববাদিগণ বলেন যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য। বিপরীতক্রমে, ফ্রীডম্যানের মত তত্ত্ববিদগণ (instrumentalists) মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ বাণী করা হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের মুল কাজ (দেখুন, Blaug, 1980; Caldwell, 1982)। যেহেতু, এই সংক্ষিপ্ত রচনায় আমি এ বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না, আমি এ রচনায় তিনটি পথই উল্লেখ করেছি। আরো একটি লক্ষ্য রয়েছে, প্ররোচনা প্রদান, সেটিও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে (McCloskey, 1986)। তবে, এটাও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ বাণী করার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়, কারণ, সাধারণত: বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ বাণী না করা গেলে প্ররোচিত করা যায় না। অতএব, প্ররোচনা প্রদান করার লক্ষ্যও এ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[২৮] Rouyh, 1989, p. 19.

www.pathagar.com

একটি পরিশোধন প্রক্রিয়া হিসেবে নৈতিক মুল্যবোধের ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়ে থাকে, এবং অভিরুচী, পছন্দ-অপছন্দ, ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে বহি:স্থিত চলক হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকলো। যুক্তি দেখানো হলো যে, এ সব কিছুর জন্য দরকার হতো ভাববাদি মুল্যায়ন, যা হচ্ছে মনের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়, এবং স্বভাবত:ই পরীক্ষা-নীরিক্ষার অযোগ্য। এ কারনে, বাজার ব্যবস্থার নিয়ামক শক্তিসমুহ কর্তৃক নির্ধারিত বাজার মুল্য ও আয় সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের মুল কৌশলে পরিণত হলো, এবং তা অর্থশাস্ত্রের বর্ণনামুলক, বিশ্লেষণী ও ভবিষ্যৎ বাণী করার কাজে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে থাকলো। এটি পারেটোর সর্বোচ্চ মানের ধারনায়ও অবদান রাখলো-যা দাবী করে যে, কেবল মাত্র সেই কৌশলই মেনে নেওয়া যায় যেটি কারও অবস্থার অবনতি না ঘটিয়ে অন্তত: একজন ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে থাকে। জন রওলস-এর মতে, সাধারণভাবে সবার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করার জন্যে কারো কখনও এমন কোন কিছু করা ঠিক নয় যদি তা করতে গিয়ে কাহাকেও অসন্তুষ্ট করতে হয়।[২৯] যেহেতু, খুব কম নীতি-কৌশলই রয়েছে যা কারো না কারো অবস্থা কিছুটা খারাপ করে না, সেহেতু, বাস্তবে ভাববাদি মুল্যায়নের অনুপস্থিতি ও পারেটোর সর্বোচ্চ মান যা অর্জন করেছে সম্ভবত: তা হচ্ছে, সলো'র (Solo) ভাষায়, "নিস্পৃহতা, বিকল্পহীনতা, উদ্দেশ্যবিহীন ভেসে বেড়ানো'র মাধ্যমে নীতি-কৌশল প্রণয়ন কার্যে স্থবিরতা।[৩০]

"অর্থশাস্ত্রে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তার বাস্তবে নির্ধারনযোগ্য একটি সঠিক কিংবা ভুল জবাব থাকতেই হবে-এরুপ বিশ্বাসের সাথে" প্রত্যক্ষবাদ জড়িত হয়ে পড়লো।[৩১] জবাবটি যদি বাস্তবে নির্ধারনযোগ্য না হয় তাহলে অর্থশাস্ত্র প্রশ্নটি বিবেচনা করবে না। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আর্থিক ও বস্তুগত মাত্রায় পরিমাপযোগ্য ধারনাগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপিত হলো। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা ভবনে লেখা রয়েছে: "আপনি যদি পরিমাপ করতে না পারেন, তাহলে আপনার জ্ঞান সামান্য ও অপর্যাপ্ত"।[৩২] এরুপ দৃষ্টিভঙ্গির কারনে অর্থনীতিকে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের উপর সামাজিক মুল্যবোধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রভাব বিশ্লেষন,[৩৩] এবং সামাজিক স্বপ্ন

---

[২৯] Rawls, 1958.

[৩০] Solo, 1981, p. 38; আরো দেখুন, Sen, 1987, p. 32.

[৩১] Colander, 1992, p. 113.

[৩২] Kuhn কর্তৃক উদ্বৃত, Kuhn, 1961, p. 161.

[33] Blaug, 1980, p. 149.

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজ পরিচালনার কর্মসূচী বাতলে দেয়ার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সরকারী হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি: সরকারী-বেসরকারী স্বার্থের ভারসাম্যসামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য মূল্যবোধসমুহ সামাজিক পরিশোধন, প্রেরণা যোগান ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে না পারলে সরকারকেই এ সকল সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। তবে, ছেই-এর সূত্র,[৩৪] যা কিনা অর্থনীতিতে নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রসমুহ প্রয়োগের পার্শ-প্রতিক্রিয়ারূপে বিবেচিত, এবং যা চিরায়ত অর্থনীতির একটি অন্যতম ভিত্তি, সরকারের এরূপ দায়িত্ব অনুমোদন করবে না। এ মত অনুসারে ঠিক মহাবিশ্বের মতই অর্থনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিলেই সবচে ভাল চলবে। উৎপাদনই তার চাহিদা সৃষ্টি করে নিবে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বা বেকারত্বের মত ঘটনা ঘটবেই না। অতিরিক্ত উৎপাদন বা বেকারত্ব সৃষ্টির মত প্রবণতা কখনো দেখা দিলে অর্থনীতি নিজেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করে নিবে। এ বিষয়ে অর্থনৈতিক নিয়ামকসমুহ যথেষ্ট শক্তিমান এবং কোন খবরদারী সহ্য করে না।

এটা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারনা, যা বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের হস্তক্ষেপহীনতার নামান্তর। বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের তরফ থেকে করণীয় কিছুই নেই এবং হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা বৈ গত্যন্তর নেই। বাজার প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমুহ নিজেরাই একটা 'শৃংখলা' ও 'সাযুজ্য' তৈরী করে নেয়, সরকারের তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার যে কোন প্রয়াস স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করতে ও অব্যবস্থাপনায় ফেলতে বাধ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের যান্ত্রিক গতি প্রভাবিত মানুষের ধারনা এভাবে বাজার ব্যবস্থার নিয়ামকসমুহের কার্যকারতার প্রতি এক প্রকার অন্ধ-বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

আরও আগে এডাম স্মিথ যখন দাবী করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে তখনই ছেয়ই-এর তত্ত্বের বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল।প্রত্যেকে যখন প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থ অর্জনে ব্যস্ত থাকে তখনই বাজার ব্যবস্থার 'অদৃশ্য হাত' প্রতিযোগিতাপ্রসূত নিয়ন্ত্রন প্রয়োগ করে সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্বার্থের উন্নতি ঘটায়, এবং এ ভাবেই তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সাযুজ্য সাধন করে।[৩৫] এ কারনে বাজার ব্যবস্থায় সরকার বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন পড়েনি। ভারসাম্যের সাধারন সূত্র এ

---

[৩৪] Jean Baptist Say (১৭৬৭-১৮৩২)-এর নামানুসারে।
[৩৫] Smith (1723-90), 1937, p. 423.

www.pathagar.com

যুক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বিষয়টিকে গাণিতিকভাবে উপস্থাপন করে 'কিভাবে সমন্বয়হীন স্বার্থপরতা অনাকাংখিত ফলাফল দিয়ে সীমিত সম্পদ দক্ষতার সহিত ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পুরণ করছে'।[৩৬]

বাজার ব্যবস্থাকে নিজের গতিতে চলতে দিলে যে সব চেয়ে ভাল চলবে তা প্রমান করার জন্য যুক্তি দেখানো হতো যে, ব্যক্তি মানুষ স্বাধীন ভোক্তা হিসেবে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে, এবং সবচেয়ে কম দামে তার সবচেয়ে পছন্দের পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করে। তার পছন্দ প্রতিফলিত হয় বাজারে তার চাহিদায় বা বাজার মুল্যে ক্রয় করার জন্য তার ইচ্ছায়। উৎপাদক হিসেবে ব্যক্তি মানুষও যুক্তি সঙ্গত আচরণ করে এবং বেশী লাভ করার মানসে সম্ভাব্য কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে এরুপ চাহিদার প্রতি নীরবে সাড়া দিয়ে থাকে। যথার্থ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় উপযোগ-পাগল ভোক্তা ও লাভ প্রত্যাশী উৎপাদকদের মুক্ত মিথস্ক্রিয়া পণ্য ও সেবার 'বাজার দর' নির্ধারন করে থাকে। এরুপ বাজার দর (খরচাদিসহ যা মুল্যের অর্ন্তভুক্ত) একটি পক্ষপাতবিহীন মুল্য-নিরপেক্ষ বিশোধন প্রক্রিয়ারুপে কাজ করে এবং সম্পদের বহু ব্যবহারের পথ সুগম করে। এভাবে কারো সচেতন প্রচেষ্টা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমন আকার-প্রকারের পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়ে থাকে যা ভোক্তার পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ। এটাকেই বলা হয় 'পারেটো কার্যকরতা'। এটা সবচেয়ে কার্যকর, কারন এক জনের ক্ষতি না করে এ অবস্থার কোন উন্নতি করা যায় না। প্রথাগত অর্থনীতির কাঠামোতে আর কোন তত্ত্ব 'পারেটো কার্যকরতা'- 'র মত এত শক্ত ভিত্তি লাভ করেনি।

এ কাঠামোর মধ্যে ইকুইটি শব্দটি খোলাখুলি উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য, ধরে নেয়া হয় পারেটো সংজ্ঞায় উত্তম মানের পণ্য ও সেবার আকার-প্রকারও সমদর্শী[৩৭] (equitable), কারন, এটা পারেটো সংজ্ঞামতে সবোর্চ্চ মানের ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদনের উপকরনসমুহ কর্তৃক আয় উপার্জনের পরিমান প্রকাশ করে। ফ্রীডম্যান স্পষ্টভাবেই দেখান যে, "আমরা যতই অন্য রকম ফলাফল চাই না কেন পণ্যের দাম থেকে কোন তথ্য প্রচার করা এবং পণ্যের দামকে আয় বন্টনে নির্ধারক না হোক প্রভাবকের ভুমিকায় না রেখে সে

[৩৬] Rosenberg, 1992, p. 219; আরো দেখুন, Blackhouse, 1994, p. 13.

[৩৭] বহু অর্থনীতিবিদ এ মতামত গ্রহণ করতে দ্বিধা করতে পারেন। তবে, এটি বাজারের নিয়ামকসমুহের উপর আস্থার একটি যৌক্তিক ফলাফল, জে বি ক্লার্কের মত অর্থনীতিবিদগণও অনুভব করেছিলেন যে, বাস্তব জগতে উপকরন আয় প্রান্তিক উৎপাদন ও তার মুল্যের কাছাকাছি হয়। (দেখুন, Stigler, 1941)।

www.pathagar.com

তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজ করা সম্ভব নয়"।[৩৮] এভাবে মানগত লক্ষ্য নয়, পারেটো মান আকারেই ইকুইটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ভারসাম্য কেন্দ্রে ভোক্তার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি ও সরবরাহকের ব্যয় ন্যূনতম রাখার প্রচেষ্টা থাকে এবং খাতওয়ারী আয় (মজুরী, বেতন, রেন্ট ও লাভ) বাড়ানোর প্রচেষ্টা থাকে। একারনেই বলা হয়ে থাকে যে বাজারদর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারই নিশ্চিত করে না বরং অত্যন্ত যৌক্তিক ও নিরপেক্ষতার সহিত যোগ্যতা-উপযুক্ততার বাছ-বিচারবিহীনভাবে আয়ের সমবন্টন বন্টন করে থাকে।

এভাবে ব্যক্তি স্বার্থ ও জনস্বার্থের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাযুজ্য সাধিত হয়ে থাকে। এরুপ প্রক্রিয়ায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটে কিনা বা সম্পদের বন্টন সুষম কিনা এরুপ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা এরুপ প্রশ্নের জবাব প্রদান করা যায় না সামগ্রিকভাবে যোগ্যতা-উপযুক্ততার বাছ-বিচার ব্যতীত, যা বাজারদরের মত সহজে নির্ধারনযোগ্য নয়। সম্পদের মালিকানায় বৈষম্যের প্রশ্নও অবান্তর একারনে যে ব্যক্তির সম্পদের পরিমান ব্যক্তির বা পিতৃকুলের সঞ্চয় ও উৎপাদনে তাদের অবদান এবং ভোগবিহীনতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং, যোগ্যতা-উপযুক্ততার বাছ-বিচারের কোন দরকার নেই বা সরকারী হস্তক্ষেপেরও কোন আবশ্যকতা নেই।

যা করা দরকার তা হচ্ছে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার নিশ্চিত করা যেন পণ্যের দাম ভারসাম্যমুলক পর্যায়ে থাকে, যেখানে ক্রেতাগন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কেনা-কাটা করে সর্বোত্তম উপযোগ ভোগ করা বা ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করে ইপ্সিত লাভ করার যেন অবাধ সুযোগ থাকে। এ রকম একটি বাজার ব্যবস্থা বিরাজ করতে বাধা সৃষ্টিকারী যে কোন পদক্ষেপ বিপর্যয় নিয়ে আসে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদের অদক্ষ ও অসম বন্টনের দিকে পরিস্থিতিকে নিয়ে যায়।

জনস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের বিরাজমান ভারসাম্যের কথিত যুক্তি এ ভাবে ধীরে ধীরে ব্যক্তির সামাজিক দায় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে তাদের কর্মকান্ডের 'অনৈচ্ছিক' সামাজিক ফলাফলের দিকে, এবং বাজার ব্যবস্থাকে সীমিত সম্পদের দক্ষ, সুষম বিলি-বন্টনের মুল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত করছে। এর ফলে নৈতিক মুল্যবোধ ও সরকারসহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা তিরোহিত হয়েছে। বাজার-নিয়ন্ত্রিত মুল্যই থাকলো একমাত্র বিশোধন প্রক্রিয়া, এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধিই থাকলো একমাত্র প্রেষণা। এ দু'টোই আবার ঘটাবে সম্পদের

---

[৩৮] Milton and Rose Friedman, 1980, p. 23.

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত পুর্ণবন্টন যতক্ষণ পর্যন্ত না বন্টনের সবচেয়ে দক্ষ ও সুষম ফলাফল আসে। এ ধারনা থেকেই সবাই নীরবে মেনে নিয়েছে যে, সামাজিক স্বার্থ নিশ্চিত করা ও মনুষ্য সমাজে সাযুজ্য আনয়নের জন্য প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারই যথেষ্ট ।

কেইন্সের তত্ত্বের ঐকতান এবং তার সমাপ্তি

মহামন্দা, ছেইয়ের সূত্র ও মুক্তবাজার ব্যবস্থার যৌক্তিক দুর্বলতা স্পষ্টভাবেই প্রমান করেছে।[৩৯] প্রমানিত হয়েছিল যে, বাজার অর্থনীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ কর্ম ও সমৃদ্ধির সংস্থান করতে সক্ষম নয়। বাজার ব্যবস্থা মন্দায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে, এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনমনীয়তার কারনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সক্ষম অবস্থায় তা পুনরুত্থিত হতে অপারগ। চূড়ান্ত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য কারোই নেই, কারন, কেইনস যেমন বলেছেন, 'চূড়ান্ত পরিণিতিতে আমরা সবাই মারা যেতে পারি'।[৪০] কেইনস যা করলেন তা হলো তিনি মহামন্দার বাস্তবতার একটি তাত্ত্বিক যুক্তি পেশ করলেন। অপ্রতুল চাহিদাকে তিনি মন্দার কারন হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এটা থেকেই সবাই কেইনসের সাথে একমত হয়ে মেনে নিল যে অর্থ ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন-বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের তরফ থেকে একটি পালনীয় ভূমিকা রয়েছে। প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে এবং অন্তত: আংশিকভাবে হলেও, দক্ষ ও সুষম বন্টনে বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা লাঘবের লক্ষ্যে সরকারগুলো অল্প-বিস্তর হস্তক্ষেপ করলো।

ছেইয়ের সূত্রের মত কেইনসের সম্মত তত্ত্বেরও একটি যৌক্তিক দুর্বলতা ছিল। ছেইয়ের তত্ত্বে লক্ষ্য অর্জনের সকল ভার ছিল বাজার ব্যবস্থার উপর, কেইনসের বিপ্লবী তত্ত্ব বেকার সমস্যা সমাধানের ভার দিয়েছে সরকারকে। তার তত্ত্বেও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে মুল্যবোধ এবং পারিবারিক, সামাজিক সংহতির কোন স্থান ছিল না। সরকারের উপর এরূপ মাত্রাতিরিক্ত চাপ ১৯৭০-এর দশকে উচ্চহারে বাজেট ঘাটতি ও মুদ্রা-স্ফীতির ঘটনার জন্ম দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে কেইনসের সম্মত তত্ত্বের অবসান ঘটেছে এবং মুক্তবাজার ব্যবস্থায় বিশ্বাসের পুণার্ভিভাব ঘটেছে। মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থার অকার্যকরতা প্রতি কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকলেও তা যৌক্তিক প্রত্যাশার তত্ত্ব দ্বারা নড়বড়ে হয়ে গেছে।[৪১] যুক্তি

[৩৯] Klein, 1954, p. 90.

[৪০] Keynes, 1924, p. 88. এ বইটি Keynes -এর ৪র্থ খন্ড, ১৯৭২।

[৪১] প্রসারিত মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি অনুসরনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের ক্ষমতার উপর আস্থা নষ্ট করাতে লুকাস যে কোন অর্থশাস্ত্রবিদের চেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন। দেখুন, বিশেষ করে, Lucas, 1973, and 1976; Mankiw, 1990.

www.pathagar.com

দেখানো হলো যে, বিবেক-তাড়িত ব্যক্তি মানুষ মুদ্রা ও আর্থিক নীতিসমূহে সম্ভাব্য পরিবর্তনসহ সকল তথ্যাদি বিবেচনায় গ্রহণ করবে এবং তদানুযায়ী আচরণ করবে। এটা সরকারি নীতিসমূহকে অকার্যকর করে দেয়।ফলাফল হচ্ছে, ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপের শর্তে যতদূর সম্ভব চিরায়ত ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা বা উদারনীতির জন্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহল থেকে তীব্র আহ্বান। কেবলমাত্র পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের এবং অধুনা উদারনীতি গ্রহণকারী অনেক কমুনিষ্ট দেশের চিন্তা-চেতনা ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনে বর্তমানে এ দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য বিস্তার করছে।[৪২]

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কেইনসের সম্মত তত্ত্বের এরূপ পতন প্রথাগত অর্থনীতিকে নিয়ে এল একটি হস্তক্ষেপ-বিরোধী নব্য-চিরায়ত অবস্থানে। এখন বিশ্বাস করা হয় যে, একটি সম্প্রসারিত মুদ্রা ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ স্থায়ীভাবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সফল হতে পারে না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে যে, মুক্তবাজার ব্যবস্থা যখন বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুদ্রা ও আর্থিক নীতির মাধ্যম সরকারি হস্তক্ষেপও যখন অকার্যকর, তখন সামাজিক লক্ষ্য সমূহ কীভাবে অর্জন করা যেতে পারে। প্রথাগত অর্থনীতিতে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। পারেটো মানের আওতায় ধারনাকৃত দক্ষতা ও সমতা কোন্ প্রক্রিয়ায় কীভাবে মানবিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফল হবে তা নিয়ে কদাচিত কোন আলোচনা হয়ে থাকে। নীরবে অনুমান করা হয়ে থাকে যে, এ সকল লক্ষ্যসমূহ 'শেষ পর্যন্ত' অর্জিত হতে পারে যদি বাজার ব্যবস্থাকে তার ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়।

এরূপ একটি অনুমান তখনই যুক্তিসঙ্গত হবে যখন কেবল মাত্র একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজারের অস্তিত্ব থাকবে। যে সত্য অস্বীকার করা যায় না তা হল যে, অভিরুচী ও পছন্দের হেরফেরের ভিত্তিতে বিভিন্ন মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাজারের নিয়ামক্ শক্তিসমূহের মিথস্ক্রিয়ার ফলে একাধিক ভারসাম্যের বাজারের অস্তিত্ব থাকতেই পারে। সে ক্ষেত্রে কোন্ ভারসাম্যটিকে পারেটো মানসম্পন্ন বলা হবে? যে কোনটিকে পারেটো মানের বলা যেতে পারে, নাকি যেটি মানবিক লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য বেশী অনুকূল? এ প্রশ্নটি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়নি। এটা করা সম্ভব নয় এ জন্যে যে, এতে

---

[৪২] *World Development Report: The State in a Changing World*, 1997-এ বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর ও সুশাসন-এর সরকার আহ্বান করায় প্রতীয়মান যে, বাতাস এখন আবার ঘুরে গেছে।

www.pathagar.com

সম্ভাব্য সকল ভারসাম্যসমূহকে মানবিক লক্ষ্য অর্জনে সক্ষমতার ভিত্তিতে বিশ্লেষন করতে হবে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত যেটি সবচেয়ে মানবিক মনে হবে সেটি গ্রহন করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি এর ফলে ভোক্তা বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আচার-আচরনের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং পরিণতিতে যদি ভোক্তা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান রুচী, পছন্দে রদবদল আবশ্যক হয়, তা হলে আত্ম-কেন্দ্রিক মুল্যায়ন ও সামাজিক সংস্কার আবশ্যক হবে।

আত্ম-কেন্দ্রিক মুল্যায়নে চরম অনীহা ও অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি দুর্বার আকর্ষনের কারনে ধ্বনাত্মক অর্থনীতিতে সামাজিক সংস্কার বিবেচনার যোগ্য হবে না। একারনেই, 'অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে' বাক্যাংশটির এত বহুল প্রয়োগ। মুল্যবোধ এবং প্রতিষ্টানসমূহসহ রুচী ও পছন্দ ইত্যাদিকে অন্যজগত থেকে আগত কোন ধারনা হিসেবে অনুমান করা হয় এবং পারেটো মানকে সেই বিষয়সমূহের বিরাজমান অংশের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়াদি মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য উপযোগী কি না তা বিবেচ্য ছিল না। ভেতরে ভেতরে এরুপ অনুমান করা হয়েছিল যে, বাজার ব্যবস্থার প্রতিটি ভারসাম্য মানের লক্ষ্যসমুহ অর্জনে সমর্থ । এভাবে ভারসাম্যের অর্থনীতি দাঁড়াল 'বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একটি সাফাই', [৪৩] যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরুপ ধারনার সৃষ্টি করা যে, স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে আরো অদক্ষ ও অসাম্যের পরিস্থিতির অবতারনা করবে।

কেইনস দেখালেন যে, বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনমনীয়তার কারনে প্রতিটি বাজার ব্যবস্থা পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয় না। পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য তিনি রাজস্ব ও মুদ্রানীতিকে ব্যবহার করার প্রস্তাব করলেন। অবশ্য, কেইনস অন্যান্য সামাজিক লক্ষ্যসমুহের (অভাব মেটানো, আয় ও সম্পদের সমবন্টন, প্রতিবেশ ভারসাম্য এবং সামাজিক সাযুজ্য) প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এ দৃষ্টি কোন থেকে দেখলে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থা সম্পদ বিলি-বন্দেজ ও আয় বন্টনের সমস্যার যুক্তসই সমাধান দিয়েছে। এটা কেবল মাত্র পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, তিনি বাজার ব্যবস্থায় কেবল মাত্র সামান্য একটি পরিবর্তন সুনির্দিষ্ট করে দেন। তিনি কোন একক অর্থনৈতিক এজেন্টের দৃষ্টিভঙ্গী ও পছন্দ-অপছন্দের পরিবর্তনের কথা বলেন নি। বর্তমানে সর্বসম্মত 'যৌক্তিক প্রত্যাশার তত্ব' দেখিয়েছে যে, এমনকি মুদ্রা ও রাজস্ব নীতিও পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য কোন সহায়তা করতে অক্ষম।

---

[৪৩] Hahn, 1970.

নীতি পরিবর্তনের ফলে প্রত্যাশিতভাবেই স্বয়ংক্রিয় পন্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, কিন্তু, স্থায়ীভাবে বেকারত্ব হ্রাসের কোন ঘটনা ঘটেনি। অতএব, ভাল উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সরকার কোন কিছুই অর্জন করতে পারবেনা।

একাডেমিক পরিসরে কেইনসের সমস্ত তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়লেও পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ঠিকই টিকে আছে। তথাপি, প্রথাগত অর্থশাস্ত্র এ যাবত এমন কোন কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করতে পারেনি যা কিনা এরূপ বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি করবে যা কর্মসংস্থানের এ লক্ষ্য ও পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। সরকারের অসহায় এবং করার কিছুই নেই, সুতরাং সমাজের সামনে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে অপেক্ষা করা যতক্ষন পর্যন্ত না বাজার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অর্জন করে নেয় - সামাজিক অস্থিরতার মুখে নিপতিত একটি সমাজের পক্ষে এরূপ হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সম্ভব কি? সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় ততপর সকল এজেন্টসমুহের অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দের পরিবর্তন না ঘটালে শেষ পর্যন্ত বাজার ব্যবস্থা তা অর্জন করতে সক্ষম হবে কি?

কঠিন শর্ত সমূহ

জ্ঞান অন্বেষনে মূল্যবোধের নিরপেক্ষতা রক্ষার অঙ্গীকার ও স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টায় ব্যক্তি মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদানে বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে (বর্ণিত প্রশ্নের বিপরীতে) প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের নীরবতার কারন বোধগম্য। সে যাহাই হোক সামাজিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য নীতির বাস্তবায়ন জরুরী এবং ন্যূনতম সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত বাজার ব্যবস্থা নিজে নিজে এ সব লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারে যদি না কতিপয় পুর্ব শর্ত বিদ্যমান থাকে। এ শর্তসমুহের মধ্যে সবচেয়ে অপরিহার্যগুলো হচ্ছে: (ক) ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সাযুজ্য, (খ) আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন, (গ) বাজার মুল্যে অভাবের তীব্রতার প্রতিফলন, (ঘ) সঠিক প্রতিযোগিতা।

এডাম স্মীথ ধরেই নিয়েছিলেন একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে (ক) শর্তটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। অর্থশাস্ত্রের পুরো কাঠামোতে এ অনুমানটি একটি স্থায়ী ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও, কখনও কখনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সাযুজ্যতা কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাজমান থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধও থাকে। এরূপ বিরোধের অস্তিত্বই স্বাভাবিক ফলাফল অর্জন কঠিন করে তোলে যদি বিরোধসমুহ দুর না করা হয়। এ সমস্যাটি আরো ভালভাবে বোঝা যায় যদি সামিষ্টিক অর্থনীতির ভারসামহীনতা দুর করার লক্ষ্যে আভ্যন্তরীন সম্ভোগের পরিমান

www.pathagar.com

(সরকারি ও বেসরকারী খাতের মোট ভোগ ও বিনিয়োগের যোগফল) হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করা হয়, যা অধুনা অনেক দেশই মোকাবেলা করছে। স্বাভাবিক লক্ষ্যসমূহের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তা যদি উপক্ষো করা যেত তা হলে বাজার ব্যবস্থার কৌশলই হতো আভ্যন্তরীন সম্ভোগের পরিমান হ্রাস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যা হোক, বিরাজমান উচ্চ হারের বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো ব্যতীত পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

যদি সম্ভোগের পরিমান এমনভাবে হ্রাস করা যায় যাতে বিনিয়োগ না কমে বরং বাড়ে, তখন ভোগই হবে আভ্যন্তরীন সম্ভোগের পরিমান হ্রাস করার প্রাথমিক লক্ষ্য যা হ্রাস করার দরকার পড়বে। অধিকন্তু, অভাব মেটানোর লক্ষ্য যদি বহাল থাকেই, তবে সকল পণ্য ও সেবা ভোগের পরিমান হ্রাস করার ইচ্ছা কাংখিত নাও হতে পারে। যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, বিলাস সামগ্রিসহ আভিজাত্যের প্রতীক পন্যসমূহ এবং অভাব মেটায় না বা কষ্ট হ্রাস করে না এরূপ পণ্যসমূহের ভোগ কমানো হলে সামাজিক স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। সে যাহাই হোক, প্রত্যাশিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে এরূপ পাথর্ক্য করা অসম্ভব বা অগ্রহণযোগ্য। কারন, প্রথাগত অর্থশাস্ত্র ব্যক্তি মানুষের পছন্দ-অপছন্দের উপর আত্ম-কেন্দ্রিক মুল্যায়ন অনুমোদন করে না এবং সে সকল পছন্দ-অপছন্দ মেটানো বা না মেটানোর বিষয়টি বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারন করার উপরই মুলত: ভরসা করে থাকে।

প্রত্যাশিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনের বিষয়টি বাধাগ্রস্থ না করে আভ্যন্তরীন সম্ভোগের বিভিন্ন খাত হ্রাসকরনে আবশ্যিকভাবে সহায়তা করে কী না বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাজার ব্যবস্থার কলা-কৌশল প্রাথমিকভাবে নির্ভর করবে অন্য সব উপায়, বিশেষ করে আত্ম-কেন্দ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে কেবল মুল্য, সুদের হার এবং করের হার বৃদ্ধির উপর। মুল্য বৃদ্ধি কোন কাজে নাও আসতে পারে কারন, ধনী লোকেরা তাদের ইচ্ছানুসারে উচ্চ মুল্য পরিশোধ করতে সক্ষম হতে পারে, গরীবদের প্রকৃত আয়ে আরো কমে যেতে পারে এবং তাদের অমঙ্গল ঘটতে পারে। প্রাথমিকভাবে মুল্যের উপর এরূপ নির্ভরতা সম্ভোগ হ্রাসের বেশীর ভাগ ভার গরীবের উপরই বর্তাতে পারে।

একইভাবে সুদের হার বৃদ্ধিও প্রত্যাশিতভাবে সম্ভোগ হ্রাসে সহায়তা করবে না। উচ্চ সুদের হার নিজে নিজে ধনীদের বিলাসিতা কমায় না, সরকারের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য অনুতপাদনশীল খাতের ব্যয়ও কমায় না। বর্ধিত সুদের হার অবশ্য

www.pathagar.com

বিত্তহীনদের কল্যান সাধন প্রক্রিয়ায় বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। এরুপ সুদের হার উৎপাদনশীল দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগকে বিপদে ফেলতে পারে। কিন্তু পণ্য, শেয়ার বাজার, বৈদেশিক মুদ্রার কৃত্রিম বাজারে কেনাবেচার স্বল্প-মেয়াদের হুজুগ কমাবে না। এভাবে অর্থনীতির সার্বিক এবং সুদুরপ্রসারী ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এমনকি মুল্য ব্যবস্থায় সামাজিক অগ্রাধিকারসমুহের অর্ন্তমুখী গতির লক্ষ্যে বিলাস সামগ্রী ও আভিজাতের প্রতীক পন্যসামগ্রীর উপর করারোপ করেও কোন ফলোদয় নাও হতে পারে, কারন এতে লোকেদের ভোগের প্রতিযোগিতা ও আত্ম-কেন্দ্রিক বিচার-বিবেচনার বিষয়সমুহ জড়িত। এরুপ করারোপ পারেটো মানের শর্তাদিও লংঘন করে কারন এতে বাজার নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে বেশী মুল্য দিতে বাধ্য করার মাধ্যমে ধনীদের ক্ষতি করে, যা মুক্ত মানুষ হিসেবে তারা করতে দিতে চাইবে না।

একইভাবে যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, একটি দেশের নদীগুলোর দূষিতকরন প্রতিরোধ করা হয় সামাজিক মঙ্গলের স্বার্থে। অবশ্য বাজার ব্যবস্থার আলোকে যে কেহ তর্ক করতে পারে এ বলে যে, দূষিতকরন প্রাথমিকভাবে সম্পদের ভুল বন্টনের ফল যা উদ্ভুত হয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের বিভিন্নতার কারনে সংঘটিত বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকে। সে যাহাই হোক, বাইরের এরুপ বিষয়কে ভেতরে প্রবেশ করানোর যে কোন পদক্ষেপ (দূষিতকরনের সামাজিক ব্যয়কে ব্যক্তির খরচে ঢুকিয়ে দেয়া) শুধু কেবল আত্ম-কেন্দ্রিক মুল্যায়নকেই আবশ্যক করে না, এটা বেশী মুল্য পরিশোধ ও কম লাভের কারনে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর ক্ষতি করার মাধ্যমে পারেটো মানের শর্তসমুহকেও লংঘন করে, যদিও এটা সামাজিক কল্যান সাধন করে। সরাকরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় যদি সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে অভাব মেটানোর কোন ব্যবস্থা না থাকা, বেকারত্ব, অসম বন্টন ব্যবস্থা, এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে উদ্ভুত সামাজিক ব্যয় একই ভাবে বিবেচনায় নেয়া হবে না কেন?

আয় ও সম্পদের সমবন্টন, যা শর্ত (খ)-এর বাস্তবায়ন, সকল ভোক্তাকে বাজার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারে সমান গুরুত্ব প্রদান করে। উতপাদকগণ, যাদেরকে নীরব সরবরাহকারী হিসেবে ধরে নেয়া হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এক মুখো হয়। এভাবে, প্রত্যেকে প্রয়োজন মেটানোকেই অগ্রাধিকার প্রদান করবে এরুপ অনুমানের প্রেক্ষাপটে, অভাব মেটানোর লক্ষ্যে সম্পদের বন্টন প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা হবে না।[৪৪] তবে, যেহেতু আয় ও সম্পদ

---

[৪৪] Samuelson যথার্থই বলেছেন যে, "the Invisible Hand will only maximize total social utility *provided the state intervenes so as to make the initial*

www.pathagar.com

বন্টনে যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে, এবং যেহেতু ধনীদেরই ঋণ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ বেশী, তারা বিদ্যমান দামে যা খুশী কিনতে পারে। মুলত: দামের উপর ভরসা করলে তা স্বত:ই ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীক পণ্য-সামগ্রী, অতি জরুরী নয় এমন পণ্য এবং অনুতপাদনশীল পণ্য ও সেবার চাহিদা কমাবে না। শুধুমাত্র তাদের ভোটের ক্ষমতাবলে তারা সীমিত জাতীয় সম্পদ এমন জিনিস উতপাদনে ব্যবহার করবে যা সামাজিক প্রয়োজনের তালিকায় তুলনামুলকভাবে নীচের দিকে থাকে।

একজন ব্যক্তির কতটি ভোট আছে এবং তিনি সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করছেন সে বিষয়ে মুল্য-নিরপেক্ষ দাম নির্ধারন ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যবস্থা দাম পরিশোধের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদার তীব্রতা বিচার করে। যা হোক, যদিও ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শিশুর নিকট দুধের প্রয়োজন একই, তথাফি একটি দরিদ্র পরিবার দুধের জন্য যে কয় টাকা খরচ করতে সক্ষম তা একটি ধনী পরিবার বিলাস সামগ্রীর জন্য যা ব্যয় করতে সক্ষম তার সমান নয়। যদি মুল্য পরিশোধের ক্ষমতা চাহিদার তীব্রতার সহিত সম্পর্কিত না হয়ে থাকে, তা হলে শর্ত (গ) অপূর্ণ থাকে। সুতরাং, আর্থার উকান ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে, বাজার ব্যবস্থার একটি প্রবণতা হলো "এটা বিজিতদেরকে তাদের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য যা দিয়ে থাকে, তার চেয়ে বেশী পুরুস্কৃত করে বড় বড় বিজয়ীগণকে তাদের পোষা প্রাণীদেরকে খাওয়ানোর লক্ষ্যে"।[৮৫] "জোর যার মুল্লুক তার" তত্ত্বে বিশ্বাসী ডারউইনের সামাজিক কাঠামোতে এরূপ ফলাফল গ্রহণযোগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মানবিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন সামাজিক কাঠামোতে এরূপ ফলাফল অবশ্যই সহ্য করা হয় না।

এবার (ঘ) শর্ত আলোচনা করা যাক। এটা ভালোভাবে স্বীকৃত যে, যদিও পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতামুলক বাজার[৮৬] ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য একটি তাত্ত্বিক ধারনা, বাস্তব ক্ষেত্রে তা একটি অবাস্তবায়িত স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতেও এ রকমই থাকবে বলেই মনে হয়। বাজার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি

---

distribution of dollar votes ethically proper" (1966, p. 1410; italics in the original)।

[৮৫] Okun, 1975, p. 11.

[৮৬] পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতামুলক বাজার ব্যবস্থা তখনই বিরাজ করে যখন সেখানে অনেক ক্রেতা, অনেক বিক্রেতা থাকে, যেখানে প্রবেশের কোন বাধা থাকে না, এবং যেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পুর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যায়। এ সকল শর্তাদি কোথাও পুরণ করা হয় না।

www.pathagar.com

বাজার ব্যবস্থার নিয়ামকসমুহের দক্ষ কার্যকরতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রান্তিকভাবে আদর্শ প্রতিযোগিতামুলক মুল্য নির্ধারনের প্রক্রিয়ায় বিচ্যুতি ঘটায় যার ফলে এমন একটি বাজার দর সৃষ্টি হয় যা প্রকৃত দর বা লাভ প্রতিফলিত করে না। এ কারনে বাজার দর নিজ থেকেই সম্পদের প্রত্যাশিত সামাজিক বিলি-বন্দেজ ও বন্টন সংঘটনে অক্ষম এবং, যদি এ ব্যবস্থা প্রকৃত খরচ ও লাভ প্রদর্শণ করতে অক্ষম হয়ে থাকে তা হলে তা এরুপ বন্টন সংঘটনে আসলেই অক্ষম।

বিশ্বের কোন বাজার ব্যবস্থার পক্ষেই পুর্বশর্তগুলো এমনকি কাছাকাছি পুরন করার সম্ভাবনা যেহেতু কম, [৪৭] সেহেতু বাজারের অগ্রাধিকারসমুহ প্রকাশে যথেষ্ট গোঁজামিল দেখা যায়। [৪৮] এর ফলে একটি সহজাত পক্ষপাতিত্ব ক্রিয়াশীল হয় দক্ষতা ও সমবন্টন অর্জনের বিরুদ্ধে (যা প্রত্যাশিত লক্ষ্য রুপে ইতোপুর্বে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল), যদি সম্পদের বিলি-বন্দেজ ও বন্টন প্রক্রিয়ার জন্য মুলত: বাজার দরের উপর নির্ভর করা হয়।

অসম্পূর্ণ বিপ্লব

তর্ক পেশ করা যেতে পারে যে, উপযুক্ত সহজাত পক্ষপাতিত্বের যুক্তির মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে কারন অনেক সমাজেই অন্তত: আংশিকভাবে হলেও তাত্ত্বিক ফলাফল অর্জিত হয়েছে যেখানে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের দোর্দন্ড প্রতাপ। অনেক কারনেই এরুপ ঘটতে পারে। প্রথমত, প্রাচ্যে গীর্জার ... কারনে অনিবার্যভাবেই নৈতিক মুল্যবোধসমুহ পরিত্যাগের ঘটনা ঘটেনি। নৈতিক মুলবোধসমুহ টিকেছিল এবং এটা পরিমানমত নৈতিক সততা নিশ্চিত করেছিল। এরুপ সততা ব্যতীত বাজার ব্যবস্থা ভালোভাবে কাজ নাও করতে পারতো, সম্পত্তির অধিকার প্রয়োগ নাও করা যেতে পারতো, ন্যায় বিচার নিশ্চিত নাও করা যেতে পারতো, সমাজের বিভিন্ন জনের মধ্যে লাভজনক বিনিময় ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত হতে পারতো, এভাবে উন্নয়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারতো। [৪৯] দ্বিতীয়ত, প্রথাগত অর্থশাস্ত্র প্রকৃত অর্থে কখনও ধ্বনাত্মক ছিল না। অর্থশাস্ত্রের কথিত মুল্য-নিরপেক্ষ ভুমিকা সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদগন আত্ম-কেন্দ্রিক মুল্যায়ন করেছেন এবং নীতিগত সুপারিশও করেছেন। এটার সম্ভাব্য কারন হচ্ছে এ জন্যে যে, কুপম্যানস যেমন বলেছেন, "একজন অর্থশাস্ত্রবিদের চামড়া ছিড়েঁ

---

[৪৭] Brittan, 1985, p. 16.

[৪৮] Tawney, 1948, p. 12.

[৪৯] দেখুন, North, 1990; Hausman and McPherson, 1993; Rodney Wilson, 1997.

www.pathagar.com

দেখুন, ভেতরে একজন নীতিবাদী পাবেন"।[৫০] অন্য কথায়, অর্থশাস্ত্রবিদগণের পক্ষে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে মানবিক মুল্যবোধসমুহের পক্ষাবলম্বন করা সম্ভব নয় এবং পেশাগত জীবনে সেগুলো দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও যাবে না। তৃতীয়ত, মানুষ সকল সময়ে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যেই আচরণ করে না, তারা পরার্থবাদীও হয়ে থাকে। যদিও প্রাচ্যের সমাজ ধীরে ধীরে বেশী বেশী ভোগবাদিতার দিকে ঝুঁকেছে, তবে পরিবর্তনটি সম্পূর্ণ হয় নি। নৈতিক মুল্যবোধসমুহ এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ কিছুটা হলেও ভোগবাদিতার দিকে যাত্রায় বাধার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও বাধা প্রদান অব্যাহত থাকতে পারে। চতুর্থত, গণতন্ত্রের কারনে সরকারসমুহের উপর বৈষম্য দুরীকরন ও সামাজিক স্বার্থসমুহের উন্নতি ঘটানোর জন্য চাপ রয়েছে। সুতরাং, তারা সম্পত্তির অধিকার রক্ষা, ন্যায় বিচার ও শিষ্টাচার নিশ্চিত করা, সামাজিক নিরাপত্তা অবকাঠামো তৈরী এবং শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। যা কিছু ন্যায় ও যা কিছু আকাংখিত সে বিষয়ে ভালো ধারনা ব্যতীত এ সকল আইন ও নীতিসমুহ প্রণয়ন করা সম্ভব হতো না।

এতদসত্বেও, প্রথাগত অর্থশাস্ত্র তার বিচার-নিরপেক্ষ ভুমিকা ধরেই আছে। অর্থশাস্ত্রবিদগণকে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাঠামোর এরুপ দ্বান্দ্বিক অবস্থান প্রকাশ করে দেয়া ছাড়াও এটা অর্থশাস্ত্রের ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ও সামিষ্টিক অর্থনীতি নামক দুটি মুখ্য শাখার মধ্যে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব-বীক্ষার (World view) আলোকে সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাষ্টিক অর্থনীতি, দৈহিক সন্তুষ্টি ও ইন্দ্রিয় সুখ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিচার-নিরপেক্ষতার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরুপ গুরুত্বারোপের ফলে কেবল মাত্র বাজার ব্যবস্থাকে সম্পদের বিলি-বন্দেজ ও বন্টনের এক মাত্র গ্রহনযোগ্য কৌশল হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে এবং এর ফলে এরুপ ধারনারও সৃষ্টি হয়েছে যে, বাজার ব্যবস্থা সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষায় একটি অব্যার্থ অনুঘটক। এ কারনে প্রতিযোগিতাপূর্ণ প্রতিটি ভারসাম্যকে এক একটি পারেটো মান হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেগুলো 'কার্যকর' ও 'সুষম' রুপে বিবেচিত। অপর দিকে মানবিক লক্ষ্যগুলোও আলোচনায় স্থান পায় যা মেনে নিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক অগ্রাধিকারসমুহ প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়িত নাও হতে পারে যদি না সীমিত সম্পদ এ সকল সামাজিক অগ্রাধিকারের সাথে সাযুজ্য রেখে

---

[৫০] Koopmans, 1969, M Ali Khan কর্তৃক Z Ahmed, Fiscal Policy ..., 1983, p. 243- এ উদ্বৃত.

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের অবাধ প্রচেষ্টা সম্পর্কিত ব্যাষ্টিক অর্থনীতির নীতিসমূহ, অভিরুচী প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসীম ব্যক্তি স্বাধীনতা, এবং মূল্য-নিরপেক্ষতা এ সকল সামাজিক অগ্রাধিকারের সহিত অনিবার্যভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

এটার অর্থ হচ্ছে যে, কুহন-এর ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব'[৫১], যা কিনা ধর্মীয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষতায় মৌলিক পরিবর্তন এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মূল্য-নিরপেক্ষতার জোরালো প্রকাশ এবং ব্যক্তি মানুষের বস্তুগত স্বার্থ হাসিলের অবাধ সুযোগের মাধ্যমে। কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতিতে এ পরিবর্তন ঘটেনি। নৈতিক মূল্যবোধ বা জনকল্যানে অঙ্গীকারাবদ্ধ খ্রিষ্টিয় বা অন্য কোন ধর্ম অনুসারী একটি সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর সামাজিক ডারউনীয় লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ধর্মীয় কাঠামোর মানবিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি অঙ্গীকার জলাঞ্জলি দেয়া সম্ভব ছিল না। কেইনসীয় বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি ঘটার পূর্ব পর্যন্ত এরুপ বিরোধ স্পষ্ট হয়নি।

এ অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্কের অনুপস্থিতি দেখিয়ে দিয়েছে। হাউইট যথার্থই বলেছেন যে, "ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যকার স্পষ্ট যোগসূত্র না থাকা দীর্ঘকাল যাবত অর্থশাস্ত্রবিদগণের অসন্তোষের কারন হয়েছে. . . অগণিত ছাত্র ও চর্চাকারীগণ এরুপ একটি বিষয়ের স্ববিরোধী প্রকৃতির জন্য আপত্তি জানিয়ে আসছে, যার দুটি শাখা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্ববীক্ষা পেশ করছে"।[৫২] লুকাস এবং সারজেন্ট একইভাবে দেখিয়েছেন যে, "শুরু থেকেই ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে এবং সাধারণ ভারসাম্যের তত্ত্বে কোন ভিত্তি না থাকার দরুন সামষ্টিক অর্থনীতি সমালোচিত হয়ে আসছে"।[৫৩] এ রকম কোন সম্পর্কের অস্তিত্বহীনতাকে এরো আখ্যায়িত করেছেন, "আধুনিক মূল্য তত্ত্বের একটি অন্যতম বড় কলংক"।[৫৪] অন্য কথায়, ব্যাষ্টিক অর্থনীতি সঠিকভাবে বুঝলে সামষ্টিক অর্থনীতিকে কর্মসংস্থান, অভাব পুরন এবং সুষম বন্টনের মত নীতিগত বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। সরকারের হস্তক্ষেপহীনতার নব্য-চিরায়ত তত্ত্ব সে ক্ষেত্রে

[৫১] Kuhn, 1970.

[৫২] Peter Howitt, 1987, p. 273.

[৫৩] Lucas and Sargent, 1979, p. 4.

[৫৪] Arrow, 1967, p. 734. আরো দেখুন, Peter Howitt, 1987, 273.

www.pathagar.com

সঠিক হতে পারে। তবে, যদি মানবিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হয়, তা হলে ব্যাষ্টিক অর্থনীতি একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো না। বাজার অর্থনীতিতে, যেখানে সরকারের ভূমিকা সীমিত হবে মর্মে ধরে নেয়া হয়, লক্ষ্যসমূহ অনার্জিত থেকে যায় যদি ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে লক্ষ্য বাস্তবায়নের সমস্যার সমাধান না করা হয়।

অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষন প্রক্রিয়া পারেটো অর্থে দক্ষতা নিয়েই আগ্রহী, কিন্তু, মানবিক ও ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে তার কোন আগ্রহ নেই, যার জন্য ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতায় লাগাম টানার প্রয়োজন হয়। একাজে নৈতিক মুল্যবোধসমুহ সাহায্য করতে সক্ষম। ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থসমূহের মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে এবং লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করাকে উতসাহিত করার মাধ্যমে এ সকল নৈতিক মুল্যবোধ সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। মুল্য-নিরপেক্ষ পরিবেশে বাজার ব্যবস্থা নিজে থেকে এটা করতে অক্ষম, বিষেশ করে এমন পরিবেশে যেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থসমুহের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। বিধিগত লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখার ক্ষমতার ভিত্তিতে সম্পদের বিভিন্ন রকম ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে বাজার ব্যবস্থা সক্ষম নয়। তখন নৈতিক মুল্যবোধের সহায়তা নিতে হয় যা মানবিক লক্ষ্য সুমহের সহিত সাযুজ্য রেখে ব্যক্তি মানুষের অভ্যাস নির্ধারন করে। নৈতিক মুল্যবোধের সহিত সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংস্কার ব্যতীত এরুপ অভ্যাস পরিবর্তন কঠিন হতে পারে।

কেইনস শুধুমাত্র সরকারের মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির উপরই মনোনিবেশ করেছিলেন। যৌক্তিক প্রত্যাশার তত্ত্ব মনে হয় যথার্থই বলে যে, সরকারের রাজস্ব নীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব করে তুলতে বড় ভূমিকা রাখে। অবশ্য এরুপ সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন সরকারের তরফ থেকে বেশী বেশী ব্যয় করার উপর মুলত: নির্ভর করা হবে, এবং ব্যক্তি মানুষের আচরন সামাজিক লক্ষ্যসমুহের সহিত সাংঘর্ষিক হয়। বর্ধিত বাজেট ঘাটতি তখন বেসরকারি খাতের ভোক্তা সংস্কৃতির সাথে হাত মিলিয়ে সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাহিদার চাপ সৃষ্টি করবে, এবং এরুপ অবস্থার সৃষ্টি করবে যেখানে ভোক্তা চাহিদার ও ব্যবসায়িক কাজকর্মের অতি সামান্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু পণ্যমুল্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।[৪৪] রাজস্ব ও মুদ্রানীতিই একমাত্র

---

[৪৪] দেখুন, Chapter 3, "The Crisis of the Welfare State", in Chapra, 1992, pp. 113-46.

www.pathagar.com

সমাধান মর্মে কেইনসের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। কারন সামাজিক লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তির আচরন, রুচীবোধ ও পছন্দের পরিবর্তন আনয়ন একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠমোর মধ্যে অসম্ভব।

হবস্ তাঁর বিখ্যাত বই লেভিয়াথান-এ যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তি-স্বার্থ কোন সীমা-পরিসীমা মানে না এবং চাইলেই এটা মানুষকে অতিমাত্রার আতিশায্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এটা থেকে মানুষকে বিরত রাখার একমাত্র উপায় হলো তাকে নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষের অধীন রাখা।[৫৬] ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার মধ্যে এরুপ ক্ষমতা কোন মানুষকে প্রদান করা সম্ভব নয়। কেননা এরুপ ক্ষেত্রে মানুষ নিজের স্বার্থেই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এটা ভালোভাবেই প্রমান করেছে। কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সবচেয়ে ভালো জানেন কিসে মানুষের স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষিত হবে, এবং যাঁর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মত কোন কিছু নেই, সেই তিনিই সকলের স্বার্থে এরুপ নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। তাঁর পয়গম্বরগণকে পাঠিয়ে এবং নৈতিকতা কেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষার মাধ্যমে তিনি তা করেছেন। অতএব, প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববীক্ষার পরিবর্তে এরুপ নৈতিকতা কেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটানো অপরিহার্য।

পদ্ধতি

সুতরাং, ধ্বনাত্মক অর্থশাস্ত্র এবং তাত্ত্বিক লক্ষ্যসমূহ পারস্পরিকভাবে অসামঞ্জস্য এবং একই বিশ্লেষন কাঠামোতে বা লাকাতো-এর ভাষায় "বৈজ্ঞানিক গবেষনা কর্মসূচী"-তে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে সক্ষম নয়।[৫৭] প্রথাগত অর্থশাস্ত্রকে যা করা উচিত ছিল তা হচ্ছে-তার ব্যাষ্টিক অর্থশাস্ত্রকে একই ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা, যার থেকে তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা হয়েছে, যেন তার দুটি মুখ্য বিষয়ের বিশ্ববীক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। তাহলে এ সকল লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানের আচরন নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হতো এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব হতো।

এটা না করে প্রথাগত অর্থশাস্ত্র পরিস্থিতির একান্ত মুল্যায়ন পুর্বক কোন পরামর্শ না দিয়ে পিছু হঠার সহজ ও অবাস্তব পথ ধরেছে। বড় ও ছোট মিল সহ বহু

---

[৫৬] Meyers কর্তৃক উদ্বৃত, Meyers, 1983, pp. 2-3.
[৫৭] Lakatos, 1974.

www.pathagar.com

অর্থশাস্ত্রবিদ বাস্তব সমস্যা সমাধানে উপদেশ প্রদান তাদের কাজ নয় মর্মে দাবী করেছেন। কারন, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির একান্ত মুল্যায়ন প্রয়োজন হবে এবং অর্থশাস্ত্র বহির্ভূত অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় সমুহ বিবেচনায় চলে আসবে।[৫৮] ভাবজগত এবং ধর্মীয় মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে উপদেশ প্রদান করা বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের আওতা বহির্ভূত মর্মে ঘোষিত। এ কারনে রবিনস এ পেশার লোকদেরকে কোন বিশেষ কর্মপদ্ধতি অনুসরন করার লক্ষ্যে সুপারিশ না করার জন্য সাবধান করেছেন।[৫৯] উপদেশ প্রদান করার বিষয়ে অনীহা এবং লক্ষ্যসমুহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অর্জিত হবে এরুপ অনুমান সকলের অজ্ঞাতসারে অর্থশাস্ত্রকে কোন সমাধান ব্যতীত শুধুমাত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ও ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে সীমিত রেখেছে।

পল স্যামুয়েলসনের মত ধনাত্মক ও কর্মবিদগন দাবী করেন যে, অর্থশাস্ত্রের ভুমিকা হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের বিষয়সমুহকে পরীক্ষার যোগ্য বা পরীক্ষার অযোগ্য স্বত:সিদ্ধের মাধ্যমে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা।[৬০] স্যামুয়েলসনের নিজের ভাষায়: "এরুপ কোন বর্ণনা যা ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষনযোগ্য কোন বাস্তবতাকে ভালো ভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম, সেটাই হচ্ছে সব যা পৃথিবীতে আমরা পেতে বা আশা করতে পারি . . . । ব্যাখ্যা হচ্ছে, যা যুক্তিসঙ্গতভাবেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, এক প্রকার উন্নততর বর্ণনা এবং যা বর্ণনাকে ছেড়ে চলে যায় না"।[৬১] তিনি দেখাননি কী সেটা যা "ভালোভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম"। এটা কি তাত্ত্বিক লক্ষ্যসমুহ এবং সেগুলো অর্জনের সাথে অর্থশাস্ত্রের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন কিছু হওয়া সম্ভব, যতক্ষন অর্থশাস্ত্র এ সকল লক্ষ্যসমুহ নিজের অধিক্ষেত্রের মধ্যে রাখবে?

মিল্টন ফ্রীডম্যানের মত তাত্ত্বিকগণ জোর দিয়ে বলেন যে, অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ভবিষ্যত বাণী করা। এর থেকে প্রশ্ন উঠে যে, যখন এর জ্ঞানজাত বহু ধারনা স্থুলভাবে অবাস্তব তখন এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব কী না। ফ্রীডম্যান এ সকল ধারনার সপক্ষে সাফাই দিতে এগিয়ে এলেন তার সেই বিতর্কিত জবাব নিয়ে যা হচ্ছে, এ সকল ধারনা বাস্তবভিত্তিক হওয়া শুধু কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, এগুলো যদি অবাস্তব হয় তা হলেই ভালো:

---

[৫৮] Hutchinson, 1964, pp. 29-31.
[৫৯] Blaug, 1980, p. 150.
[৬০] দেখুন, Mark Blaug, 1980; Bruce Caldwell, 1982.
[৬১] Samuelson, 1972, pp. 765-6; আরো দেখুন, 1966, p. 1778.

www.pathagar.com

"গুরুত্বের বিবেচনায়. . . কোন অনুমানভিত্তিক তত্ত্বকে অবশ্যই তার অনুমানের বিষয়ে মিথ্যা হওয়া আবশ্যক"। তিনি আরো বলেন যে, "একটি অনুমানভিত্তিক তত্ত্বের সঠিকতা যাছাইয়ের এক মাত্র পথ হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে তত্ত্বটির ভবিষ্যত বাণীর তুলনা করা"।[৬২]

কিন্তু, তাত্বিকগন যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হচ্ছে যে, যদি সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিচ্যুতিসমুহ বিবেচনায় গ্রহন না করা হয় তা হলে ভবিষ্যত বাণী প্রায়ই অসত্য প্রমানিত হতে পারে। এটা কি গ্রহনযোগ্য? অবশ্য যখনই তাদের ভবিষ্যতবাণী মিথ্যা হয় তখন এরুপ শাখের করাত থেকে অর্থশাস্ত্রবিদগনের নিষ্কৃতির একটি পথ রয়েছে। সকল ভবিষ্যতবাণীই "অন্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে" শর্তের উপর নির্ভরশীল এবং তাঁরা সব সময়ই কোন লজ্জা-শরম ব্যতীতই দাবী করতে পারেন যে, "অন্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে" সূত্রের শর্তগুলো প্রতিপালিত হয়নি। অনস্বীকার্য ঘটনা হচ্ছে যে, বিশ্ব অর্থনীতি বিগত দু'দশকে এত বেশী অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে যে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যত বাণী করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অর্থনীতির ভবিষ্যত বানী প্রদানের ক্ষমতা হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পড়েছে।[৬৩] যদি ভবিষ্যত বানী প্রদান করাকে অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কাজরূপে বিবেচনা করা হয় এবং ভবিষ্যত বানী সাধারণভাবে অসত্য প্রতিভাত হয়ে থাকে তা হলে অর্থশাস্ত্রের অর্জন কি? শুধুমাত্র পেশাগত চাকচিক্য! এটা কি ইঙ্গিত করছে না যে, অর্থশাস্ত্র অন্তত: কতিপয় অর্থশাস্ত্র বহির্ভূত মুখ্য বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যা অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যত বানীকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে না বা তার মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাতিল করে দেয় না।?

কাঙ্খিত সংস্কার

বিশ্লেষন ও ভবিষ্যত বাণী করা যদি অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রাথমিক লক্ষ্য রুপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কার্যকরী হতে হলে তাদেরকে যথার্থ দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সামাজিকভাবে সম্মত মানবিক লক্ষ্যসমুহ

---

[৬২] Friedman, 1953, p. 14. তিনি আরো বলেন যে: যথার্থই গুরুত্বপুর্ণ স্বত: সিদ্ধসমুহের মধ্যে দেখা যাবে বাস্তবতার জঘন্য রকম অসত্য উপস্থাপনা, এবং সাধারণভাবে তত্ত্বটি যত গুরুত্বপূর্ণ হবে, অনুমানগুলো ততবেশী অবাস্তব হয়ে থাকে। (আরো দেখুন, Hahn and Hollis, 1979, p. 12-এ Hahn-এর মতামত)।

[৬৩] আধুনিক অষ্ট্রিয়ান সম্প্রদায় যুক্তি দেখায় যে, অর্থশাস্ত্রের মত একটি বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করা একান্তই অসম্ভব কারন অর্থনৈতিক আচরণ ভবিষ্যতমুখী হওয়ার কারনে অন্তর্গতভাবেই অনিশ্চিত (Blaug, 1980, pp. 259-60)।

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নির্ধারন করে এরুপ দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে এবং অর্থশাস্ত্রকে যে কোন দিকে লক্ষ্যহীনভাবে ধাবিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। অর্থশাস্ত্রবিদগন যেমন 'বিষয়টি কী' তা বর্ণনা ও বিশ্লেষন করে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেবল মাত্র তা জানতে আগহী নন। তিনি বেশী আগ্রহী নির্বাচকমন্ডলীর প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূরণে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ভোটের জন্য তাকেঁ যাদের মুখো-মুখি হতে হয়। এ সকল অঙ্গীকারসমুহ মানবিক লক্ষ্যসমুহের সহিত জড়িত যা আবার সম্পর্কিত 'যা হওয়া উচিত'-এরুপ ধারনার সহিত। যেহেতু সম্পদ সীমিত, সেহেতু তিনি প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ণ বিষয়ে পরামর্শ চাইবেন। অর্থশাস্ত্রবিদের বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যত বাণী থেকে তিনি (রাজনিতবিদ) এ কৌশল প্রণয়ন করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। যদি অর্থশাস্ত্র তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অর্থশাস্ত্রের আকর্ষণ হ্রাস পায়। সুতরাং, মানব সমাজে বসবাস করে এরুপ কোন পরামর্শ প্রদান করা থেকে বিরত থাকা অর্থশাস্ত্রবিদদের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

অতএব, অর্থশাস্ত্রের জন্য সবচেয়ে প্রত্যাশিত কাজ হবে মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন ও সে লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এর ফলে অর্থশাস্ত্রের পক্ষে মানবিক লক্ষ্যসমুহ এবং লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য উপযোগিতার নিরিখে সম্পদের বিভিন্ন প্রকার বিভাজন ও বন্টনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে মনযোগী হতে সাহায্য করবে। এরুপ কার্য বাস্তবে অর্জিত ফলাফলের সাথে মিলিয়ে অর্থশাস্ত্রের, বিশেষ করে ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রের, তত্ত্ব গড়ে তোলায় সহায়ক হতে পারে, এবং প্রকারন্তরে, মানব সমাজের সমস্যাসমুহ সমাধানের লক্ষ্যে উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কার্যকর কৌশল তৈরীতে সহায়তা করতে পারে।

পারিবারিক ও সামাজিক সংহতিতে ভাংগন

ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে বর্ধিত প্রবৃদ্ধি প্রদান করেছে। কিন্তু, তা সকল তাত্ত্বিক ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করে নি। এটা আরো দিয়েছে এক প্রকার তেতো ফল যাকে ফুকুয়ামা তার সাম্প্রতিক বই "The End of Order(1997)" -এ "মহা বিশৃংখলা" রুপে অভিহিত করেছেন। এ বইয়ে পারিবারিক ভাঙ্গন সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিছুটা কল্যান রাষ্ট্রের ভূমিকায় ও কিছুটা প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থনীতিতে সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছিল, কিন্তু, ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করা মুখ্য সামাজিক দর্শন হওয়ায় পারিবারিক ঐক্য-সংহতি রক্ষার জন্য কোন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ছিল না। পরিবার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ভালভাবে কার্যকর থাকে যখন পরিবারের সদস্যগন পরস্পরের প্রতি অনুগত থাকেন এবং অন্যের জন্য স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে রাজি থাকেন। শিশুর লালন-পালন করায়, সুনির্দিষ্টভাবে বললে, পিতামাতাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ভোগবাদিতার নিরিখে এরূপ ত্যাগ এক প্রকার অপচয়। কিন্তু, বাস্তবে এটা বাড়তি স্নেহ-ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং মানসিক শান্তিকে উতসাহিত করার মাধ্যমে সকলের স্বার্থকে চরিতার্থ করে।

ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে বাজার ব্যবস্থার মানসিকতা পরিবারেও অনুপ্রবেশ করেছে, এবং ফলাফল হচ্ছে যে, পিতা-মাতাও একে অন্যের সাথে চলতে পারছে না। যদি পারস্পরিক ত্যাগ ও অনুরাগের বুনন অনুপস্থিত থাকে তাহলে তারা কেন একত্রে বাস করবে, কেনইবা পরস্পরের প্রতি অনুগত থাকবে। বেড়েছে যৌন. স্বেচ্ছাচার, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং একক পিতা বা মাতার পরিবার। যার ফল হচ্ছে, শিশুদের মানসিক, আত্মিক এবং বাস্তবিক দুর্গতি। অধিকন্তু, এমনকি যদি পিতা-মাতা একত্রেও বাস করে শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় আদর-যত্ন নাও পেতে পারে যদি তাদের পিতা-মাতা শিশুদের যথার্থ লালন-পালনের জন্য তাদের আরাম-আয়েশ এবং বস্তুগত স্বার্থ ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হয়।

যদি ভবিষ্যত বংশধরগন একটি উঠতি সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন ও লালন-পালন থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে অনিবার্যভাবেই মানুষের গুনাবলীতে ধ্বস নামবে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রন ভেঙ্গে পড়বে। কিশোর অপরাধ ও নৈতিক স্খলনজনিত সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। এটা আরো বাড়তে পারে যদি জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে নিপতিত হয়, বড় বড় শহরের পঁচা-ঘিঞ্জি কেন্দ্রে বসবাস করে, এবং কম বয়সে মাতৃত্ব, পিতৃহীন সংসার, স্থায়ী বেকারত্ব, অপরাধ ও মাদকাসক্তি ইত্যাদির আবর্তে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন করে এ সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নাও হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হতে পারে একটি দায়িত্বশীল সমাজ- এমন একটি সমাজ যেখানে ন্যায় বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে এবং যেখানে অপরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রত্যেকে রাজি আছে। ভবিষ্যতের বাজার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মানবীয় উপকরন, শিশুদেরকে লালন-পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবারকে শক্তিশালী করা, এবং তা দ্বারা সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন ব্যতীত এটা কি সম্ভব? একটি সভ্যতা কি তার পতন ঠেকাতে পারে যদি তার মানব সম্প্রদায় নষ্ট হয়ে যায়, অপরাধ এবং নৈতিক অধ:পতন জনিত অস্থিরতা বেড়ে যায় এবং সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে

www.pathagar.com

যায়? ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের চেষ্টার উপর গুরুত্ব হ্রাস করে সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মিক ও বস্তুগত জীবনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধনের আশু প্রয়োজনীয়তাকে এটা স্পষ্টত:ই সামনে নিয়ে আসে। শুয়েটজার ঠিকই বলেন, যখন তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন: "যদি নৈতিক ভিত্তি না থকে, তবে সভ্যতার পতন হতে পারে যদিও অন্য দিকে সৃজনশীলতা থাকে এবং শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চ্চা ক্রীয়াশীল থাকে"।[৬৩]

একটি হতাশা

১৯৩০-এ যখন কল্যান অর্থশাস্ত্রের আভির্ভাব ঘটেছিল তখন তার নামই আশার আলো জাগিয়েছিল।[৬৪] অর্থশাস্ত্র শব্দটির পুর্বে 'কল্যান' শব্দটি যোগ করে অর্থশাস্ত্র বুঝিয়েছিল যে, অর্থশাস্ত্র এখন খোলাখুলিভাবেই সমস্যা-সমাধানমূলক হবে, কী ধরনের কল্যান প্রার্থিত তা ঈঙ্গিত করবে এবং কল্যান বাস্তবে অর্জনের জন্য কৌশল সুপারিশ করবে। যা হোক, প্রমানিত হয়েছে যে, এরুপ আশা করা সঠিক হয় নি। কল্যান অর্থশাস্ত্র প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ আলখাল্লা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কল্যানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের আলোকে যেখানে পরার্থপরতার[৬৫] কিংবা সকলের কল্যাণের কোন স্থান নেই। উহার ধ্বনাত্মক প্রতিপক্ষের মত অর্থশাস্ত্র নিরপেক্ষ (*wertfreiheit*) থাকতে পছন্দ করলো। পরিণতিতে উহা পারেটোর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করেছে এবং ধ্বনাত্মক ও কল্যান অর্থশাস্ত্রে সামান্য পৃথক খোলসে অনেকগুলো ইতিবাচক ধারনা জন্মলাভ করেছে।[৬৭]

বহু অর্থনীতিবিদ[৬৮] পরার্থপরতার অর্থনীতির নিরপেক্ষতার (*wertfreiheit*) পদ্ধতিকে আক্রমন করেছেন। ব্লাউগ যথার্থই বলেছেন যে, "ধ্বনাত্মক কল্যান অর্থশাস্ত্রের কথা বলা মানে হলো স্ববিরোধী কথাবার্তায় ফূর্তি করা"।[৬৯] মিরডাল, যিনি সারা জীবনের কর্মে সামাজিক বিজ্ঞানসমুহকে অর্থপূর্ণ শাস্ত্রে পরিণত করার ব্রত নিয়েছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, একজন অর্থশাস্ত্রবিদের উচিত নিজস্ব

---

[৬৩] Schweitzer, 1949, p. xii; আরো দেখুন, Sorokin, 1951, p. 177.
[৬৪] কল্যাণ অর্থনীতির তাত্ত্বিক দিক তিনটি মুল তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, Feldman, 1987, pp. 889-94।
[৬৫] পরার্থপরতার (Altruism) উপর Hammond-এর প্রবন্ধটি দেখুন, Hammond, 1987, p. 86।
[৬৭] Blaug, 1980, p. 140.
68 দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, Hutchinson, 1964; Myrdal, 1970; Heilbroner, 1973.
[৬৯] Blaug, 1980, p. 146.

www.pathagar.com

বিশ্বাস, চিন্তাচেতনা, মতামত ও ধারনার প্রতিফলন ঘটানো (*value judgment*), তবে তা সাহসের সহিত আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া উচিত: "মতামত সমৃদ্ধ ধারনাসমুহ প্রকাশ করা দোষের কিছু নয় যদি সেগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয় খোলাখুলি পরিবেশে স্পষ্টভাবে"।[৭০]

প্রয়োজন হচ্ছে এটি কল্যান অর্থশাস্ত্র যা মানব কল্যানকে বোঝে ধারনা-নিরপেক্ষ পারেটো প্রত্যাশার অর্থে নয় বরং মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থে বোঝে এবং যা পথ দেখায় কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সামষ্টিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা এড়িয়ে এরুপ কল্যান সাধন করা সম্ভব হবে। এটা করা সম্ভব নাও হতে পারে যদি অর্থশাস্ত্র আপন বিশ্বাস-নির্ভর মতামত প্রকাশে ও সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের উপর অনীহা প্রদর্শন করে যেতেই থাকে এবং এমনকি যখন এ দু'টোকেই দক্ষ ও ন্যায্য বাজার ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিপূরক মর্মে মনে হয়। এছাড়া, যদিও অর্থশাস্ত্র বহির্ভূত এবং ঐতিহাসিক বিচ্যুতিসমুহ যা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিবেচনায় নেওয়ার যোগ্য, সেগুলো ব্যতীত শুধুমাত্র অর্থশাস্ত্রীয় বিচ্যুতিসমুহ বিবেচনায় নেওয়ার যে অভ্যাস অর্থশাস্ত্রের রয়েছে তাও শিথিল করার দরকার হতে পারে।

বিপদে আশার আলো

অর্থশাস্ত্র যদি মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে না পারে তাহলে এটা নিষ্প্রভ ও সংকুচিত হয়ে পড়ার হুমকীতে পড়বে। প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের পুরো ইতিহাসেই অর্থশাস্ত্রবিদগন এ বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২), কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১), রাসকিন (১৮১৯-১৯০০), হবসন (১৮৫৮-১৯৪০), ট'নী (১৮৮০-১৯৬২), শুমাখার (১৮৯১-১৯৭১) এবং বোল্ডিং (১৯১০-১৯৯৩) প্রমুখ অর্থশাস্ত্রবিদগন তা প্রকাশও করেছিলেন। এঁরা এবং আরো অনেক অতীত ও বর্তমান কালের অর্থশাস্ত্রবিদগন নব্য-সনাতনী অর্থশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং যা আরো বাড়ছে।[৭১] তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রের গজদন্ত মিণারের বাইরে বের হচ্ছেন সামনে পড়ে থাকা জগত আবিষ্কারের জন্য।

এমনকি কতিপয় অর্থশাস্ত্রবিদ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।[৭২] যুক্তিবাদের একটা সীমাবদ্ধতা যে রয়েছে এবং জ্ঞান-তত্ত্বীয়

[৭০] Myrdal, 1970, pp. 55-6.

[৭১] দেখুন, Hausman and McPherson, 1993; Rodney Wilson, 1997.

[৭২] দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, Dopfer, 1976; Balogh, 1982; Bell and Kristol, 1981.

www.pathagar.com

আন্দোলনের ফলে যুক্তিবাদিতাকে যে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছিল তাকে নামিয়ে একটি বাস্তব পর্যায়ে নিয়ে আসা যে প্রয়োজন, এবং প্রত্যক্ষবাদ ও বাস্তববাদিতা যে কোন সমস্যা-সমাধানমুলক জ্ঞান সৃষ্টি করতে অপারগ, এটা হচ্ছে তার ক্রমবর্ধমান বোধোদয়ের প্রতিফলন।[৭৩] ওয়ারনক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে যুক্তিবাদিতার সহিত দ্বিমত করার অর্থ অবশ্যই যুক্তিকে সমালোচনা করা নয়; যে লোকটি যুক্তিকে সম্মান করেন এবং দেখান যে তিনি সম্মান করেন, তিনি সেই ব্যক্তি নন যিনি কেবল যুক্তির দাবীকে অত্যোধিক উচ্চে স্থান দেন, বরং যিনি কঠিন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে- যুক্তির দাবীগুলোকে যৌক্তিকভাবে কত উচ্চে স্থান দেওয়া সম্ভব"।[৭৪] যাহোক, নতুন রুপরেখা কিরুপ হবে তা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৭৫] নতুন রুপরেখা হয়ত: খুব সম্ভব ধর্মের প্রতি জ্ঞান-তত্ত্বীয় আন্দোলনের চেয়ে কম বৈরী ভাবাপন্ন হবে। Religion in Contemporary Europe-এর সম্পাদকগন স্বীকার করছেন যে, তাঁরা ২০০ শত বছর ব্যপী ধর্মের প্রতি বৈরী ভাবসম্পন্ন সময়ের অবসানের শুরু দেখছেন।[৭৬]

এটাও ক্রমবর্ধমান হারে স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, ব্যক্তি-স্বার্থ ও প্রতিযোগিতা অবশ্যই মানুষের কর্মের পেছনে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে না। পরার্থপরতা, সহযোগিতা, নৈতিক মুল্যবোধ, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক প্রতিষ্ঠানে মানব সমাজের পছন্দ-অপছন্দ ও ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভাব পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারও প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি পাচ্ছে। প্রথাগত অর্থশাস্ত্র ও বিশ্ববীক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়েঁ দেওয়া বিভিন্ন মতবাদের উত্থান অর্থশাস্ত্রের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আশার আলোর সৃষ্টি করেছে। এ সকল মতবাদ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। তাদের মধ্যকার পার্থক্য মুলত: বিষয় ভিত্তিক গুরুত্বের মাত্রাগত।

এরুপ একটি মতবাদ হচ্ছে Grant Economics যার দাবী হচ্ছে পরার্থপর আচরন অবশ্যই যুক্তিবাদিতা থেকে বিচ্যুতি নয়।[৭৭] এ মতবাদ যুক্তি দেয় যে,

---

[৭৩] দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, Skinner, 1986। নীতি বিবর্জিত মানব শাস্ত্রসমুহের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কতিপয় অত্যন্ত সাহসী বিদ্রোহীদের পেছনের কাহিনী এ পুস্তকে রয়েছে।

[৭৪] Warnock, 1972, p. 85.

[৭৫] Wiseman, 1991, p. 150.

[৭৬] Fulton and Gee, 1994.

[৭৭] দেখুন, Janos Horvath, "Foreword", in Solo and Anderson, 1981, pp. ix-x.

www.pathagar.com

যৌক্তিক আচরন ও স্বার্থপর আচরনকে এক করে দেখা বাস্তবতা বিবর্জিত। হান-এর মতে: "'যৌক্তিক' অভিধা গ্রহন করে অর্থশাস্ত্র সম্ভবত: একটি ভুল করেছিল অথচ অর্থশাস্ত্র যা করে তা হলো সঠিক নিরুপন এবং সুশৃঙ্খল বিশেষত্ব: সমুহের উপস্থাপনা"।[৭৮] এ মতবাদ আরো যুক্তি দেখায় যে, ফ্রীডম্যানের বিপরীত রকম মতামত সত্ত্বেও বাস্তবতা বিবর্জিত অনুমান অবশ্যই সঠিক তত্ত্ব দিতে পারে না। এটা বলা অধিক যৌক্তিক হবে যে, যদি অর্থশাস্ত্রের কাজ হয় ভাবী কার্যধারার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যতবাণী করা, তাহলে পরার্থপরতা ও ব্যক্তিস্বার্থের উভয় কাঠামোর মধ্যে থেকে যৌক্তিক আচরনের অনুমান করা হলে সম্ভবত: আরো অর্থপূর্ণ ভবিষ্যতবাণী করা যেতে পারে। এ কারনে "অর্থশাস্ত্রের আওতার মধ্যে মানবিকতার ছোঁয়া ঢুকিয়ে পারেটো মানের পরিবর্তে বুল্ডিং মানের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষতার অজুহাতে দুরে রাখা হয়েছিল"।[৭৯]

এরুপ দ্বিতীয় একটি মতবাদ হচ্ছে, অভাব-ভিত্তিক মানবিক অর্থশাস্ত্র যা "মৌলিক মানবিক মুল্যবোধসমুহকে স্বীকৃতি প্রদান ও সমন্বয় করে মানব কল্যান উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে" সৃজন করা হয়েছে।[৮০] অভাব ও সম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী উপযোগবাদিতার প্রাচীন মনস্তত্ত্বের স্থলে এ মতবাদ মানবিক মনস্তত্ত্ব: আশা করে এবং অভাব মেটানো এ প্রগতির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেয়, যাকে আব্রাহাম মাসলো বলেন, 'আত্ম-উপলব্ধি' বা 'আত্ম-চরিতায়ন'।[৮১] পরিণতিতে, এ মতবাদ সকল মানবীয় প্রয়োজন যেমন দৈহিক(ভাত, কাপড়, বাসস্থান), মনস্তাত্ত্বিক (নিরাপত্তা, প্রেম-ভালবাসা, আত্ম-মর্যাদাবোধ), সামাজিক (একাত্মতা), বা নৈতিকতা (সত্য, ন্যায়বিচার, স্বার্থকতা) নির্বিশেষে সবকিছু বিবেচনার মধ্যে নেয়।

তৃতীয় আরেকটি মতবাদ হচ্ছে, সামজিক অর্থনীতি যা "নৈতিকতার আদলে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বসমুহকে ঢেলে সাজানোর" সহিত সম্পর্কিত।[৮২] মুল্যবোধের নিরপেক্ষতার বাধ্যবাধকতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধতা, যা কিনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের যুগের বিজ্ঞানীদের আদর্শ হিসাবে অর্থশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক

---

[৭৮] Hahn and Hollis, 1979, p. 12.
[৭৯] Solo and Anderson, 1981, p. x.
[৮০] Lutz and Lux, 1979, p. ix.
[৮১] Maslow, 1970.
[৮২] Choudhury, 1986, p. 237.

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, এ মতবাদ অচল ও অবাঞ্ছিত- অচল এ কারনে যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এমন অনুমান নির্ভর যা নিরবে ব্যক্তিগত পছন্দ ও মতামত কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়; অবাঞ্ছিত এ কারনে যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পদ বন্টনে জনগণের স্বার্থ ও সামাজিক অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমুহ এড়িয়ে যেতে পারে না। মুল্যবোধের নিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ কোন শাস্ত্র জনস্বার্থে বিবেচনার জন্য কোন নীতির মুল্যায়নে বা সুপারিশ প্রণয়নে সফল হতে পারে না। এরুপ মুল্যায়ন অবশ্যই ব্যক্তিগত পছন্দ ও মতামত কর্তৃক প্রভাবান্বিত হবেই। এ কারনে, সেনের মতে, "ন্যায়শাস্ত্র থেকে অর্থশাস্ত্রের দুরত্ব সৃষ্টি করার ফলে কল্যান অর্থশাস্ত্রের গুনগত মান হ্রাস পেয়েছে এবং বর্ণনামুলক ও পুর্বাভাস অর্থশাস্ত্রকে দুর্বল করেছে"। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, মানুষের আচরন ও বিচার বিবেচনায় প্রভাবক হিসাবে ক্রিয়াশীল নীতিশাস্ত্রের প্রতি আরো বেশী ও আরো খোলামেলা মনযোগ প্রদান করে অর্থশাস্ত্রকে আরো বেশী সফল করা সম্ভব হবে"।[৮৩] জার্নাল অব ইকনমিক লিটরেচার এ প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্র ও সমসাময়িক নৈতিক দর্শন' নামক তাদের একটি জরিপ রচনায় হউজম্যান ও ম্যাকফার্সনও বলেছেন যে, "একটি অর্থনীতি যা সক্রিয়ভাবে আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার আওতাধীন বিষয়গুলোর নৈতিক দিকসমুহের সাথে বোঝা-পড়া করে, তা অবশ্যই আরো মজার, আরো জ্ঞানৌদ্দীপক এবং চূড়ান্তভাবে আরো বেশী উপকারী হবে অন্য অর্থনীতির চেয়ে, যা এরুপ বোঝা-পড়া করতে চায় না"।[৮৪]

চতুর্থ মতবাদ হচ্ছে: প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র। যার মতে, মানুষের আচরন অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রভাবান্বিত, যা নির্ধারন করে কোন ব্যক্তি কিরুপ আচরন করবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আচরনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটানোর দ্বারা সংগঠনসমুহ পরিবর্তনের ধারক হিসাবে কাজ করে। এ মতবাদটি বেশ আশাব্যঞ্জক। কারন এটি ব্যখ্যা করতে সক্ষম যে, কিভাবে সময়ে সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন বর্তমান ও ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কেন কোন কোন অর্থনীতি অন্যটির চেয়ে ভাল করতে পারে। ইহা সহযোগিতা ও সমন্বয় ব্যখ্যা করতে সহায়তা করে এবং মানব সমাজের অনেক আচরন কাঠামোও এ মতবাদ দ্বারা ব্যখ্যা করা সম্ভব, যা মুলত: স্বীয় স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার উপর বেশী গুরত্বারোপ করায় নব্য-চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের

[৮৩] Sen, 1987, pp. 78-79.
[৮৪] Hausman and McPherson, 1993, p. 723.

www.pathagar.com

পক্ষে করা সম্ভব নয়। এরূপ সম্ভবনাগুলোই মানব সমাজে প্রতিষ্ঠানসমুহের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষনা করার ধারনাগত ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে ধীরে ধীরে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

সমস্যা হলো কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন মুল্যবোধ সম্পর্কে এমন সার্বজনীনভাবে গ্রহনযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় এবং এ সকল মুল্যবোধ এমন নৈতিক সচেতনতার সহিত প্রতিপালিত হয় যে, ইহার স্খলনকে নিন্দা জানানো হয়। প্রথাগত অর্থশাস্ত্র এরুপ ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে সক্ষম কি? সম্ভবত: সক্ষম নয়। শ্যাডউইক যেমন যথার্থই বলেছেন, "সামাজিক নৈতিকতা নির্ভরশীল একটি সর্বসম্মত মানের উপর এমন এক প্রকার ঐক্যমত্য যা বিবেচিত হয় সার্বজনীন সত্যরুপে যে বিষয়ে কোন আলোচনাই সংগত নয়", এবং তিনি আরো বলেন যে, "কতিপয় ব্যতীক্রমধর্মী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্র ব্যতীত মানব জাতির পুরো ইতিহাসে কখনও নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে আলাদা করা হয় নি"।[৮৫] উপযোগবাদিতা ও সামাজিক চুক্তির তত্ত্বসমুহে এমন কোন মুল্যবোধ নেই যা সকলে মেনে নিবে এবং যা কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না। এমনকি মুল্যবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা সত্বেও সামাজিক অর্থশাস্ত্রও কোন উপকারে আসবে না, কারন এটা হলো একটা "অতি মাত্রায় বহুত্ববাদি শাস্ত্র যা সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী বিভিন্ন বিশ্ববীক্ষা, শুম্পটেরিয়ান রুপকল্প, এবং মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী সামাজিক তত্ত্বসমুহ কর্তৃক অনুপ্রানিত ও সমৃদ্ধ হয়"।[৮৬] দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থের দ্বন্ধ মতপার্থক্য সৃষ্টি করে যা সমাধান করা কঠিন হতে পারে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন মিনস্কি বলেন, "যা আমাদের করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন ঐক্যমত্য নেই"।[৮৭]

এতদসত্বেও 'ব্যক্তি-স্বার্থ' ও 'অর্থনৈতিক মানুষ'-এর পবিত্রতার ধারনায় ক্রিয়াশীল ধ্বস, এবং, প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ও আত্ম-কেন্দ্রিক বিচার-বিবেচনার উপর গুরুত্বারোপকে অবশ্যই ভালো উন্নতি বলা যেতে পারে। এগুলো প্রমান করে যে, অসাম্যের মধ্যে বসবাস করা মানুষের অদৃষ্ট নহে। প্রয়োজনের সময় সে ভাল করতে সক্ষম, সে তার সমস্যা বিশ্লেষন করতে সক্ষম, কোনটি ভুল তা জানতে সক্ষম। তবে, যা সবচেয়ে কঠিন তা হচ্ছে এগুলোর প্রতিকার। উপরে উপরে নামমাত্র পরিবর্তনের জোড়া-তালির মধ্যে প্রতিকার নিহিত নেই।

---

[৮৫] Schadwick, 1975, pp. 229 and 234.
[৮৬] Lutz, 1990, p. ix.
[৮৭] Minsky, 1986, p. 290.

www.pathagar.com

প্রতিকার নিহিত আছে গোটা সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এমন পুণ: র্গঠনের মধ্যে যাতে, এক দিকে, ব্যক্তি-মানুষের পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক মানুষ থেকে নৈতিকভাবে সচেতন মানুষে যিনি সৌভ্রাতৃত্ব ও আর্থসামাজিক ন্যায্যতার দাবী মেনে চলতে রাজি, এবং, অন্য দিকে, গোটা অর্থনীতিকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয় যাতে ভারসাম্যহীনতা ও আয়ের অসাম্য সৃষ্টি ব্যতীতই প্রয়োজন মেটানো যায় এবং যাতে সম্পদ সৃষ্টি কেবল মাত্র বদ্ধই হবে না তা যথেষ্ট পরিমানে কমেও যাবে।

যদিও মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর গুরত্বারোপের প্রক্রিয়ার পুন: র্জাগরন প্রশংসনীয়, প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে তাদের অন্তর্ভুক্তি বেশ কঠিন কাজ হবে। এর কারন হচ্ছে, যেমনটি বলেছেন গলব্রেথ, "প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের প্রতি কায়েমী স্বার্থবাদি বুদ্ধিজীবীদের অঙ্গিকার", যা অর্থশাস্ত্রকে দেখে বিজ্ঞান হিসাবে, এবং বিজ্ঞানের কঠিন নিয়মের নিরিখে "বুদ্ধি-বৃত্তিক যথার্থতার মাপকাঠি" নির্ধারন করে।[৮৮] তথাপিও হতাশার কোন সুযোগ নেই। দশ বছর দ্য ইকনমিক জার্ণাল পত্রিকার ব্যবস্থাপক সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর রয়াল ইকনমিক সোসইটির পরিষদের নিকট দাখিলকৃত একটি প্রতিবেদনে জন হে দু:খ করে বলেছেন যে, "খুব কম অর্থশাস্ত্রবিদ সমাজের সবচেয়ে জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবেন। যদি তাঁরা তা করতেন, তা হলে তাঁরা আরো অধিক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লিখতে পারতেন"।[৮৯] এর ফলে, এমন ভবিষ্যত দেখা যাচ্ছে যেখানে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমুহের সমাধান খুঁজে বের করা অর্থশাস্ত্রের একটি জরুরী কাজ মর্মে বিবেচিত হবে। একবার এ রকম ঘটলে এরকম বোধোদয়ও হবে যে, এ সকল সমাধানের জন্য অর্থশাস্ত্র বহির্ভূত ও বাজার বহির্ভূত উপায় আছে। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক মাত্রার অনুপ্রবেশ ঘটানো তখন আর হয়ত: নিষিদ্ধ থাকবে না।

ইসলামী অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা

এটা আমাদেরকে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের রুপরেখা, লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় নিয়ে আসে। এরুপ ধারনা করার কোন কারন নেই যে, বিগত একশ বছরের চেয়েও বেশী সময় ধরে প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কর্তৃক সম্পন্ন ভাল ও মুল্যবান বিশ্লেষনী কর্মকান্ড ছুড়ে ফেলে দেওয়ার এটা একটা প্রচেষ্টা। ব্লাউগ যা বলেছেন তার সাথে একমত না হয়ে উপায় নেই: "কোন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশক যা অর্থশাস্ত্রের সকল লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে উদ্যত এবং

---

[৮৮] Galbraith, 1987, p. 284.
[৮৯] John Hey, 1997, p. 4.

www.pathagar.com

সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে চায়, তা আত্ম-বিনাশী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলযোগ্য”। [৭০] মুসলমানদের ইতিহাস এ বিষয়ে যথেষ্ট বাস্তববাদিতার প্রমান দেয়। তারা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে যা কিছু প্রয়োজনীয় ও তাদের মুল্যবোধের সহিত সংগতিপূর্ণ তা গ্রহন করেছে, এবং তারা সেটার উন্নতি ঘটাতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। ইসলামী অর্থনীতির প্রচেষ্টা থাকবে ইহার রুপরেখায় মানবিক লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়নকে সবার উপরে স্থান দেওয়া, এবং দক্ষতা ও ন্যায্যতাকে এ সকল লক্ষ্যের আলোকে সংজ্ঞায়িত করা। এটা প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের ব্যখ্যা বিশ্লেষনে অনুপ্রবেশ ঘটাবে মুল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিকতাসহ অর্থশাস্ত্র বহির্ভূত গুরুত্বপুর্ণ বিচ্যুতিসমুহ এবং ঐতিহাসিক মাত্রা, যাতে কাংখিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনে মুসলমানদের অক্ষমতার কারন সমুহ ভালভাবে বোঝা যায়। এ সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত সুপারিশ পেশ করতেও ইসলামী অর্থশাস্ত্র পিছিয়ে আসবে না। এমনকি পাশ্চাত্যেও অনেক অর্থশাস্ত্রবিদ ঠিক একই কাজ করছেন। ইসলামী অর্থশাস্ত্র এ সকল প্রচেষ্টার সুবিধা গ্রহণ না করে পারে না। প্রশ্ন হলো অর্থশাস্ত্র শব্দটির পুর্বে ‘ইসলামী’ শব্দাংশটি যুক্ত করা কি ঠিক হচ্ছে? জবাব হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে একটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ বেশী যদি আলোচনাটি ইসলামী বিশ্ববীক্ষার কাঠমোর মধ্যে হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতা ইসলামের এমন একটি অপরিহার্য লক্ষ্য এবং তা বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এমন লক্ষ্যনীয়ভাবে অনুপস্থিত যে এ নিয়ে কোন দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মত বিলাসিতা করার মত কোন সময় নেই, যদি বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলা হ্রাস করা আবশ্যক মর্মে অনুভূত হয়। যত দ্রুত সম্ভব একটি ঐক্যমত্যে পৌছা প্রয়োজন, ইহজাগতিক ও মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ অর্থনীতির কাঠামোর চেয়ে ইসলামের সম্মত নিয়ম-নীতির কাঠামোর মধ্যে কোন আলোচনা হলে তা দ্রুততর সময়ের মধ্যে দানা-বাঁধবে। যদি প্রথাগত অর্থশাস্ত্রও তার ইহজাগতিকতা ও মুল্যবোধ-নিরপেক্ষতা ঝেড়ে ফেলা এবং তার বিশ্লেষন পদ্ধতিতে নৈতিক মুল্যবোধ ও ন্যায়ের অনুপ্রবেশ ঘটানোর দিকে আরো দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলে, তাহলে শেষ পর্যন্ত দু'রকম অর্থশাস্ত্রের মধ্যে মিলন ঘটতে পারে। ‘ইসলামী’ শব্দাংশটি তখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে। সে পর্যায়ে মানবজাতি তখন মানুষ ও মানবীয় ভ্রাতৃত্বের ‘ঐক্য’-এর লক্ষ্যসমুহের কাছাকাছি পৌছেঁ যাবে, যা ইসলাম বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কারন এ সকল লক্ষ্যসমুহ আল্লাহর একত্ব ও খিলাফতের ইসলামী ধারনার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ।

---

[৭০] Blaug, 1980, p. 121.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী

আমরা আমাদের নবীগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ, এবং তাদের সাথে পাঠিয়েছি কিতাব এবং পাল্লা, যেন মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(আল কুর-আন, ৫৭: ২৫)

ইসলামি বিশ্বাসের একটি সুখ্যাতি আছে যে, এটা সহজবোধ্য. . . , এর সবচেয়ে জরুরী বিষয়গুলো তুলনামুলক সহজভাবে বর্ণনা করা যায়।

(মার্শাল হজসন)[১]

ইসলামি অর্থশাস্ত্র ও প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কি কোন বড় ধরনের পার্থক্য আছে? যদিও বড় বড় ধর্মীয় বিশ্বাসসমুহের বিশেষত: ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী বিশ্ববীক্ষার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, এই কথা ইসলামি অর্থশাস্ত্র ও প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রযোজ্য নয়। উভয় শাস্ত্রের রুপরেখা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামি রুপরেখা ইহজাগতিক নয়, মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ নয়, বস্তুবাদি নয় এবং সামাজিক-ডারউইনবাদিও নয়। বরং ইহা এ সকল তত্ত্বের মুলে আঘাতকারী কতিপয় ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি অর্থনীতি মুলত: জোর দেয় নৈতিক মুল্যবোধ, মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর এবং ইহার মার্কসীয় ও ধনতান্ত্রিক প্রতিপক্ষের বিপরীতক্রমে, তার স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র বা বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। বরং এটা সকলের কল্যান নিশ্চিত করার জন্য মুল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, বাজার, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমন্বিত ভুমিকার উপর নির্ভর করে। এতে খুব জোর দেওয়া হয় ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনের উপর, যা ছাড়া বাজার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করে ফেলতে পারে।

কুরআন ও সুন্নাহ যুগপতভাবে ইসলামি রুপরেখার গুরুত্বপুর্ণ উপাদানসমুহ এমন ভাবে ব্যাখ্যা করে দেয় যে অস্পষ্টতার সুযোগ খুব কম। যদি মতের পার্থক্য হয় তবে তা হয় ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে। একারনে হজসন যথার্থই বলেছেন যে, "ইসলামি ধর্মীয় বিশ্বাস, সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও, কতিপয় বিষয়ে ঐক্য অটুট রেখেছে; স্পষ্টত: ই খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে বেশী হারে"।[২] অর্থশাস্ত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক এরুপ ইসলামি রুপরেখার কতিপয় মৌলিক ধারনা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

---

[১] Hodgson, 1977, Vol. 1, p. 73.

[২] প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।

www.pathagar.com

মৌলিক বিষয়সমূহ[৩]

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে যে, এ মহাবিশ্ব এবং মানুষসহ এর মধ্যের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। সকল মানুষই তাঁর প্রতিনিধি এবং একে অন্যের ভাই। বর্ণ, লিংগ, জাতীয়তা, ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার কারনে একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার কোন সুযোগ নেই। এ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান খুবই স্বল্পকালীন। তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল হচ্ছে পরকাল; যেখানে তাদেরকে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। পরকালে তাদের কল্যাণ নির্ভর করে তারা এ বিশ্বে অন্যের জন্য কল্যাণকামী হয়ে বসবাস করেছেন কিনা এবং অন্যের প্রতি তার কর্তব্য পালন করেছেন কিনা তার উপর। এটা এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সকলের কল্যান প্রভাবিত করে এমন একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নিকট থেকে একটি আমানত হিসেবে প্রাপ্ত সীমিত সম্পদ কী ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৪] এ সকল সম্পদের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা'লা কতিপয় মুল্যবোধ, আচরন বিধি, বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন। আশা করা হয় এরুপ কাঠামোর মধ্যে থেকে মানুষ এ সকল সম্পদ ব্যবহার করবে ও পরস্পরের সাথে কার্যকলাপ চালাবে। কোন একটি সুনির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীর প্রতিপালনের জন্য এ সকল মুল্যবোধ প্রদান করা হয়নি, বরং সকল মানুষের জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে তাঁর পয়গম্বর ইব্রাহীম, মুসা, যীশু এবং সর্বশেষ হযরত মুহম্মদ (স:)-এর মাধ্যমে এ সকল মুল্যবোধ প্রেরণ করা হয়েছিল।[৫] এভাবে, ইসলামের মতে, নাজিল হওয়া সকল ধর্মের মুল্যবোধসমুহের যতটুকু কালের প্রবাহে হারিয়ে যায়নি বা বিকৃত হয়নি ততটুকুর মধ্যে এক প্রকার চলমানতা ও মিল রয়েছে।

---

[৩] ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Chapra, Challenge, 1992, pp. 201-12.

[৪] জুবায়ের হাসান সম্ভবত: মুসলমানদের সম্মিলিত মতামত ব্যক্ত করেন, যখন তিনি বলেন যে, ইসলামের গোটা আর্থ- সামাজিক দর্শনের মুলে রয়েছে আমানত (Zubair Hasan, 1988, p. 41)।

[৫] মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত অন্যান্য স্থানে মানুষের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবীদের নাম কুর□আনে উল্লিখিত হয় নি। তাদের নাম মানুষের জানা ছিল না এবং কুর□আন এনসাইক্লোপেডিয়া নয়। তবে, কুর□আন স্পষ্টভাবেই বলছে যে: এবং অবশ্যই আমরা সকল সময়েই সকল সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের পয়গম্বরদেরকে পাঠিয়েছিলাম□ (আল- কুর□আন, ১৬: ৩৬)।□এবং আমরা পয়গম্বরগণকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি; তাদের কয়েক জনের নাম আমরা তোমাদেরকে বলেছি, কয়েক জনের নাম আমরা বলিনি□ (আল- কুর□আন, ৪০: ৭৮)।

www.pathagar.com

পয়গম্বরগণ মূল্যবোধসমূহ কেবলমাত্র নিয়েই আসেন নি। তাঁরা তাদেঁর সমাজগুলো সংস্কারের জন্য সংগ্রামও করেছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ইসলামি বার্তার এক বিরাট উদ্যোগ। 'যা বিদ্যমান আছে' তা মেনে নেওয়া এবং স্বপ্নের বা 'যা হওয়া উচিত' তার বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম না করা বিদ্যমান বৈষম্যের পক্ষাবলম্বন করা বা সেগুলো দূর করার জন্য কোন কিছু না করার সামিল। এ রকম দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামি রূপরেখায় সমর্থনযোগ্য নয়। মানবজাতির লক্ষ্য এ নয় যে শুধুমাত্র তারা নিজেরা ইসলামি মূল্যবোধসমূহ মেনে চলবে, বরং তারা এ সকল মূল্যবোধের আলোকে তাদের সমাজ সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করবে। ন্যায় সংগত: জীবনযাপন বলতে এটাকেই বোঝায়। আনসারী যথার্থই গুরুত্বারোপ করেছেন যে, "কুর'আনের বার্তার মূল বিষয় হচ্ছে ন্যায় সংগত: জীবন যাপন"।[৬] ন্যায় সংগত: জীবন যাপন সীমিত সম্পদের এমন ব্যবহার নিশ্চিত করে যাতে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, এবং, তার দ্বারা, শুধু মাত্র ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি নয়, সামাজিক সাযুজ্যও উৎসাহিত করে।

সুতরাং, মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে। তারা এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে পারে অথবা এটাকে বাতিল করে দিতে পারে যদি তাদের আচরন তাদের নিজেদের বা অন্যের ক্ষতি না করে অথবা তা সমাজ কিংবা সভ্যতার খোদ ভিত্তিকে নড়বড়ে করে ফেলে। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে কুর'আনের বিভিন্ন সূরায় গুরত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটিতে বলা হয়েছে: "ইহা একটি উপদেশ; যেই চায় সেই তার প্রভুর রাস্তায় যেতে পারে"(আল কুর'আন, ৭৩: ১৯)।

বেশী বেশী সম্পদ অর্জন করে বা ভোগ বাড়িয়ে অনিবার্যভাবে শরিয়ার কাঠামোর মধ্যে প্রকৃত কল্যান বাস্তবায়িত হবে না; এর জন্য প্রয়োজন সুষম ভাবে মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানো। বস্তুগত প্রয়োজন বলতে বোঝায় উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং অপর সকল পণ্য ও সেবা যা সুখ ও প্রকৃত কল্যানের কাজে লাগে; আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বলতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য, মানসিক শান্তি, মনের সুখ, পারিবারিক ও সামাজিক সাযুজ্য, এবং অপরাধ-মুক্ত ও অস্থিরতা-মুক্ত একটি সমাজ বোঝায়। সম্পদ যেহেতু সীমিত, সেহেতু, একটির উপর অধিক গুরুত্ব দিলে অন্যটি অবহেলিত হতে পারে।

---

[6] Z I Ansari, 1992, p. 142.

www.pathagar.com

বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় চাহিদা পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং, ইসলাম তাদের মধ্যে কোন নিশ্ছিদ্র পার্থক্য স্বীকার করে না। আধ্যাত্মিক চাহিদা কেবলমাত্র প্রার্থনা দ্বারা পুরন করা যায় না। বরং, 'বস্তুগত', 'সামাজিক', 'শিক্ষাগত', বা 'বৈজ্ঞানিক' লক্ষ্যসমুহ নির্বিশেষে সকল মানবিক প্রচেষ্টা প্রকৃতিগতভাবে আধ্যাত্মিক এ কারনে যে, এটা ইসলামি মুল্যবোধের আলোকে প্রকৃত কল্যান অর্জনে ভুমিকা রাখে। পরিবার, সমাজ ও নিজের কল্যানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা প্রার্থনা করার মতই একটি আধ্যাত্মিক কর্ম, যদি পার্থিব কর্ম নৈতিক মুল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা কোন ব্যক্তিকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে দুরে না রাখে।

মুসলিম আইনজ্ঞগন সকলে একমত যে, শরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে ক্লেশ হ্রাস করন এবং ব্যক্তি মানুষের জীবনকে আরো আরামপ্রদ করা (আল কুর;আন ২:১৮৫; আরো দেখুন ৫:৬)। তথাপিও, অধিকাংশ লোক অনিবার্যভাবেই স্বল্প সংখ্যক লোকের চেয়ে ভাল নাও থাকতে পারে, যেমনটি প্রথাগত অর্থশাস্ত্র আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলে। কিভাবে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জিত হচ্ছে, কে কিভাবে তা ভোগ করছে, এবং সমাজের সার্বিক মঙ্গলে এরুপ বর্ধিত সম্পদের প্রভাব কিরুপ - এগুলোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কম সম্পদের চেয়ে বেশী সম্পদ অর্জন ভাল হতে পারে যদি বর্ধিত সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে সমাজের নৈতিক গঠন ও সামাজিক সংহতি দুর্বল না করা হয়, কিংবা সমাজে অস্থিরতা না বাড়ানো হয় এবং প্রতিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করা না হয়। এরুপ রুপরেখার কাঠামোর মধ্যে আদর্শ আচার-আচরণকে আত্ম-প্রবঞ্চনা বলা যায় না; এটা কেবলমাত্র সীমিত সম্পদের উপর সকল দায়-দাবীকে নৈতিক মুল্যবোধের ফিল্টারে পরিশোধনের মাধ্যমে সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণের বাধ্য-বাধতকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নিজের স্বার্থান্বেষন করাকে বোঝায়।

নৈতিক মুল্যবোধ মেনে জীবন যাপন করা হলে তা ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থ সমুহের মধ্যে এক প্রকার ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং শরিয়তের লক্ষ্যসমুহ (অত:পর 'লক্ষ্যসমুহ' মর্মে উল্লিখিত) বাস্তবায়নে সাহায্য করে, যার মধ্যে দু'টো সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও আল্লাহ তা'লার সৃষ্ট সকল প্রাণীর জন্য কল্যাণ।[৭] লক্ষ্যসমুহের মধ্যে ন্যায়বিচার এমন

---

[৭] ইসলামের লক্ষ্যসমুহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, Chapra, *Challenge*, 1992, pp. 7-9 । ফিকহ শাস্ত্রে ইসলামের লক্ষ্যসমুহের ব্যপক আলোচনা রয়েছে, কতিপয় নামকরা আলোচকের মধ্যে রয়েছেন: আল-মাতুরিদি (মৃত্যু ৩৩৩/৯৪৫), আল-শাসি (মৃত্যু

www.pathagar.com

গুরুত্বপুর্ণ স্থান পেয়েছে যে, একটি প্রকৃত মুসলিম সমাজে ইসলাম ও অবিচার একত্রে টিকে থাকার ধারনা করাও কঠিন।[৮] অবিচার চলতে পারে তখনই যখন সমাজে ইসলামি মুল্যবোধসমূহ শক্তভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এটা প্রকৃত কল্যাণ সাধনে বারবার বাধা প্রদান করবে, উত্তেজনা ও সামজিক অস্থিরতা বাড়াবে, মানুষকে সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম প্রয়োগ করতে নিরুতসাহিত করবে, এবং এভাবে প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। অবশ্য, যেখানে প্রথাগত অর্থশাস্ত্র সকলের স্বার্থপর আচার-আচরণ ধরেই নিয়ে থাকে, সেখানে ইসলাম ধরে নেয় না যে, আদর্শ আচার-আচরণ বিরাজমান রয়েছে। ইসলাম আরো বাস্তব অবস্থান গ্রহণ করে মনে করে যে, কিছু লোক স্বাভাবিকভাবে আদর্শ পথে হয়ত: চলতে পারে, তবে, অধিকাংশ লোকের আচার-আচরণ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার দুটি চরম অবস্থানের মধ্যে অবস্থান করে, এবং, এ কারনে নৈতিক উন্নতির জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়রেই অবিরাম প্রচেষ্টা (জেহাদ) চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এ রকম নৈতিক উন্নতির জন্য বল প্রয়োগ ইসলাম বাতিল করে দেয়: "ধর্মীয় বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্থী চলবে না" (আল-কুর'আন, ২:২৫৬), এবং "বলুন যে, সত্য তোমার প্রভুর নিকট থেকে এসেছে: যে চায় সে এটা বিশ্বাস করতে পারে বা প্রত্যাখান করতে পারে"(আল-কুর'আন, ১৮:২৯)।[৯] বরং, ইসলাম গুরুত্ব দেয় যথাযথ প্রতিপালনে, যৌক্তিক ও আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন করাতে (আল-কুর'আন, ১৬:১২৫), এবং এমন একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষকে সঠিক কাজ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রানিত করা যায়। অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য

৩৬৫/৯৭৫), আল-বাকিল্লানি (মৃত্যু ৪০৩/১০১২), আল-জুয়েনি (মৃত্যু ৪৭৮/১০৮৫), আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১), ফখর আল-দিন আল-রাজি (মৃত্যু ৬০৬/১২০৯), আল-আমিদি (মৃত্যু ৬৩১/১২৩৪), ইজ্জ আল-দিন আবদ আল-সালাম (মৃত্যু ৬৬০/১২৬২), ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৭) ও আল-শাতিবি (মৃত্যু ৭৯০/১৩৮৮)। এগুলোর আধুনিক আলোচনার জন্য দেখুন, মাসুদ, ১৯৭৭; আল-রায়সুনি, ১৯৯২, পৃ: ২৫-৫৫; নিয়াজী, ১৯৯৪, পৃ: ১৮৯-২৬৮।

[৮] ইরফান শফি'র বক্তব্যে এ একই ধারনা খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে: "একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট, এবং সংজ্ঞানুসারেই ইসলাম অর্থ ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচার অর্থই ইসলাম"। (জুবায়ের হাসানের লেকার উপর মন্তব্য, এম, ইকবাল, ১৯৮৮, পৃ: ৬৩)।

[৯] আরো অনেক জায়গায় কুর'আন একই বাণীর পুণরাবৃত্তি করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: "আপনি কি লোকদেরকে বিশ্বাস আনতে বাধ্য করতে যাচ্ছেন" (আল-কুর'আন, ১০:৯৯), এবং "বলপূর্বক বিশ্বাস আনতে লোকদেরকে বাধ্য করার জন্যে আপনাকে সেখানে পাঠানো হয় নি। সতর্ক বাণী শুনতে আগ্রহী এমন লোকদেরকে আপনি কুর'আনের মাধ্যমে উৎসাহিত করুন" (আল-কুর'আন, ৫০:৪৫)।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচুর পরিমান ধৈর্য প্রকাশ করার জন্য বলে, "তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার" (আল-কুর-আন, ১০৯:৬)।

নিজের ও অন্যের কল্যানের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে অনুপ্রানিত করার জন্য ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার পুরস্কার ও প্রতিরোধক অপরিহার্য। সর্বোচ্চ মানের দক্ষতার জন্য প্রয়োজন একটি স্বাচ্ছন্দে চলমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা যেখানে মানুষ নিজের স্বার্থে পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করে থাকে। তবে, যদিও প্রতিযোগিতা সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তা করে, তার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে না। কারন কিছু লোক অসাধু উপায় অবলম্বন করে নিজেদেরকে ধনী করতে পারে। এ কারনে সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু, ঠিক কি করা উচিত তা না বুঝে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। অতএব, আমরা যখন আইন প্রণয়ন করে নিয়ন্ত্রন করি তখন আমরা মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ থাকি না। তাছাড়া, মুলত: আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের উপর বাস্তবানুগ নাও হতে পারে। কারন এ গুলো পাশ-কাটিয়ে যাওয়া যায় এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে। এগুলো প্রয়োগের ব্যয় তুলনামুলকভাবে কম হতে পারে যদি সেগুলো ব্যক্তিগত প্রয়োগের কোন কার্যকর পদ্ধতি থাকে।

এরূপ ব্যক্তিগত প্রয়োগ দু'টি উৎস থেকে আসতে পারে। এক, মানুষের জন্মগত সততা থেকে। ইসলামি বিশ্বাসের কাঠমো মতে মানুষ স্বভাবত:ই ভাল, কারন আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আদলে(আল-কুর'আন, ৩০:৩০)। কোন ব্যক্তি সবসময় অনিবার্যভাবেই স্বীয় স্বার্থে কাজ করে না। সে অন্যের স্বার্থেও কাজ করে থাকে এবং, এমনকি নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে অন্যের জন্য ত্যাগ-স্বীকারও করে থাকে। তবে, যেহেতু ব্যক্তিও মুক্ত এবং তার আচরণ নির্ধারিত নয়, সেহেতু, সে তার জন্মগত সততা ধরে রাখতেও পারে নাও পারে এবং তার স্বভাব বিরোধী পথে কাজ করতে পারে। এটা তাকে এবং তার সমাজ উভয়কে আঘাত করতে পারে। সুতরাং, পুরস্কার এবং প্রতিরোধকের ব্যবস্থাসহ একটি অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা প্রয়োজন। অনেক ইহজাগতিক পুরস্কার ও প্রতিরোধকের সমস্যা হচ্ছে যে, সেগুলো হয় অপর্যাপ্ত কিংবা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

অতএব, ব্যক্তিগত প্রয়োগের দ্বিতীয় উতস হচ্ছে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির বিধানে বিশ্বাস। আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকি এবং অন্যের জন্য আমি আমার ইহজাগতিক স্বার্থও জলাঞ্জলি প্রদান করি, তাহলে আমি পরকালে আমার কল্যাণ বৃদ্ধি করবো। এভাবে পরকালের ধারনা ব্যক্তি-

www.pathagar.com

স্বার্থের ধারনাকে একজন মানুষের পার্থিব জীবনকালের বাইরে সম্প্রসারিত করে ইহাকে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে থাকে। প্রতিযোগিতা বা সরকারি হস্তক্ষেপ দ্বারা সবসময় কোন ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে সঠিক কাজ করতে এবং নৈতিকভাবে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখতে, অন্যেদের সাথে সহযোগিতা করতে বা অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে অনুপ্রানিত করা সম্ভব নয়। সরকার প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে, ধরা না পড়ে প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্থ করতে, প্রতারনা করতে ও অন্যদেরকে শোষন করতে এত বেশী চোরাগুপ্তা উপায় রয়েছে যে, সফলকাম হওয়া সরকারের পক্ষ্যে কঠিন হতে পারে যদি বাজারের কারবারিগনের নিজেদের ভেতরে সঠিক কাজটি করার জন্য ও অন্যদের সহিত তাদের চুক্তি ও অঙ্গিকার বিশ্বস্থতার সহিত পালন করার জন্য কোন তাগিদ না থাকে, এবং প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে কোন কিছু না করা হয় বা আয় রোজগারের জন্য কোন অসদুপায় অবলম্বন না করা হয়। সুতরাং, চূড়ান্ত বিশ্লেষনে, নৈতিক মুল্যবোধের সহায়তা ব্যতীত কার্যকরভাবে সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করা, একটি কার্যকর প্রেরণাদানকারী শক্তির সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর প্রয়োগের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এভাবে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারের দায়িত্ব কমিয়ে আনা যেতে পারে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইসলামি রূপরেখা

মুসলিম বিশ্ব সব সময় ইসলামি রূপরেখার চাহিদা মোতাবেক চলতে সক্ষম হয় নি। সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করা সব সময় সম্ভব হয় নি। সফলতা যেমন ছিল, তেমন ছিল নানা কারনে ভীষন ব্যর্থতা, যার অনেকগুলো ৩ ও ৪ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। তবে, নৈতিক মুল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার এবং সকলের কল্যাণ সংক্রান্ত ধারনার আদর্শসমুহের প্রাধান্য খুবই স্পষ্ট, এবং সেগুলো এত ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে যে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞামতে যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষ, প্রত্যক্ষবাদ এবং মুক্ত অর্থনীতির ধারনাসমুহ ইসলামি চিন্তাধারার মুলধারার প্রতিনিধিত্বকারী বিখ্যাত পন্ডিতদের বুদ্ধিভিত্তিক সমর্থন পায়নি।

যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক মানুষ

ইসলামি চিন্তা-চেতনার মুলধারায় যুক্তিসংগত আচার-আচরনকে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে স্রষ্টা-প্রদত্ত সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে ব্যক্তির ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যান নিশ্চিত করা যায়, এবং, তার দ্বারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। একটি

www.pathagar.com

বিষয়ে ঐক্যমত্য মনে হয় সৃষ্টি হয়েছে যে, দারিদ্র্য বাঞ্চিত নয়, অন্যায় ভাবে সম্পদ অর্জন বা যে সম্পদ ব্যয়ের বাহুল্য, অতি অহংকার ও বৈষম্যকে উৎসাহিত করে তার নিন্দা করতে হবে। অধিকাংশ লেখক বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন। কারো প্রতি অবিচার না করে বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করা এবং নিজের ও অপরের প্রয়োজন অনুসারে পরিমিতভাবে তা ব্যয় করা বা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।[১০] এরুপ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিবাদিতা খুবই দরকার। বাজার ব্যবস্থা নিজের থেকে এটা করতে সক্ষম নয়। অপর সকল মুসলিম পন্ডিতদের মত আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০হি: / ১০৫৮ খৃ) ব্যক্তির বাসনাকে নৈতিক মুল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা আবশ্যক মনে করেছিলেন।[১১] ইবনে খালেদুন (মৃত্যু ৮০৮/ ১৪০৬) গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, নৈতিক ধারনা প্রদান করা হলে তা পারস্পরিক দ্বন্ধ ও ঘৃনা দুর করে, গোষ্ঠিগত সংহতিকে শক্তিশালি করে, এবং নীতিবাদিতার দিকে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে।[১২]

এর স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে, অন্তত: ধারনাগতভাবে, ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করন এবং সম্পদ ও ভোগের পরিমান বাড়ানোর প্রতি নজর কমানো, যা (ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করন এবং সম্পদ ও ভোগের পরিমান বাড়ানো) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা পরবর্তি যুগে পাশ্চাত্যের দর্শনে খুব বেশী করে বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল। যদিও মুসলিম বিশ্বেও বস্তুবাদ ও ভোগবাদের প্রকাশ ঘটেছিল, তবুও সামাজিক-ডারউনীয়, উপযোগবাদি ও বস্তুবাদি অর্থে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করা ও সম্পদ বাড়ানো এবং অভাব মেটানো ইত্যাদি বিষয়ে 'যুক্তিবাদি অর্থনৈতিক মানুষের' ধারনা বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পায়নি।

ইসলামি চিন্তাধারার গভীরে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে আপাত: একটা ভারসাম্য সাধারনভাবে বজায় রাখা হচ্ছে মনে হলেও তার ব্যতিক্রমও রয়েছে।

---

[১০] আইনশাস্ত্রবিদগণ প্রয়োজন, সুবিধাদি ও আতিশয্য সম্পর্কে বলেছেন। তবে, এগুলোর সবই আধুনিক অর্থশাস্ত্রে 'অভাব' রুপে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে, এবং এর সবগুলোই ঐ সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে যা প্রয়োজন মিটিয়ে কিংবা কষ্ট দুর করার মাধ্যমে মানুষের জীবনে মঙ্গল সাধন করতে পারে। যা কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবেচিত হয় সেগুলোকে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ অমিতব্যয়িতা ও অসংযম মর্মে চিহ্নিত করেন এবং কঠোরভাবে বারন করে থাকেন। অপচয়মুলক ও বিলাসী জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে গিয়ে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ *তারাফ, ইসরাফ, তাফাখুর, এবং তাকাথুর* ইত্যাদি অনেক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

[১১] দেখুন, আল-মাওয়ার্দি, *আদাব* (১৯৫৫), পৃ: ১১৮-২০।

[১২] ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ১৫৮।

www.pathagar.com

সূফী ও মরমীবাদগণ আধ্যাত্মিকতায় আত্ম-হারা হওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং পার্থিব উন্নতির উপর গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন। কারন তাদের মতে ধন-সম্পদ ঔদ্ধত্য এবং অন্যায় কাজকে উৎসাহিত করে।[১৩] ধর্মনুরাগের জন্য বিখ্যাত একজন প্রাচীন পন্ডিত হাসান আল-বসরি (মৃত্যু ১১০/৭২৮) তাঁর এক পত্রে লিখেছিলেন: "সতর্কতার সহিত দুনিয়া থেকে সাবধান থেকো; কারন এটা একটা সাফের মত, ধরতে খুব মসৃণ, কিন্তু এর বিষ প্রাণঘাতি। যত মজাই পাও না কেন এর থেকে সরে এসো..."।[১৪] আল-বাসরি একা নন, একদল সূফী পন্ডিত দারিদ্র্যকে একটি নৈতিক উতকর্ষতারূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা ভারসাম্যবাদিতার উপর গুরুত্বারোপের ইসলামি ভাবাধারার স্পষ্টই বিপরীত। তবে, এটা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে পারে নি। অন্যান্য পন্ডিতগণ জোর দিয়ে বলেছেন যে, বৈধ পথে অর্জিত ধন-সম্পদে দোষের কিছু নেই কারন এটা নিরাপত্তা ও শক্তির যোগান দেয়, অন্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে স্বীয় নৈতিক কর্তব্য পালনে সাহায্য করে। দারিদ্র্যকে অনাকাংখিত বিবেচনা করা হয়েছে কারন এটা অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের দিকে *ঠেলে* দেয়। উদাহরণত: আল-খালাল (মৃত্যু ৩১১/৯২৩) মনে করেছিলেন ধন-সম্পদ অর্জনকে প্রত্যাখান করে সূফীগণ ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন, এবং মহানবীর সাহাবীগণের এক অনুসারী ইবন মুনাব্বিহকে উদ্ধৃত করে বলেন, দারিদ্র্য ও মৃত্যু সমার্থক।[১৫] আল-দিমাস্কীও (মৃত্যু ৫৭০/১১৭৫) একই অবস্থান গ্রহণ করেছেন।[*]

একটি সমাজের অস্তিত্ব তার আদর্শের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা নির্ভর করে আদর্শের সঠিক চর্চার উপর। ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসে শাসক ও

---

[১৩] আল-মাওয়ার্দি, *আদাব* (১৯৫৫), পৃ: ২০৩। *"ধন-সম্পত্তির বিষয়ে মানুষের ধারনা"* শীর্ষক অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে, পৃ: ২০৩-১০। আরো দেখুন, আল-আবাদি, ১৯৭৭, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৫-২৯।

[১৪] আবু নঈমের *হিলিয়াত আল-আওলিয়া* থেকে Arberry কর্তৃক উদ্বৃত, Arberry, ১৯৫০, পৃ: ৩৩।

[১৫] দেখুন, আবু বকর আল-খাল্লাল, ১৪০৭ হিজরি, যথাক্রমে পৃ: ৫০ ও ৯০। তিনি বলেন যে, কুর'আনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যেখানে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যা সম্পদ ব্যতিত সম্ভব নয়। তাছাড়া, সম্পদ থাকলে কোন ব্যক্তি ধর্ম-কর্ম করতে পারে, অন্যদেরকে দান-খয়রাত করতে পারে, এবং প্রার্থনা করতে পারে (পৃ: ৭৩)। তিনি মহানবী (স:), তাঁর অনেক সাহাবীসহ পরবর্তি প্রজন্মের অনেক ব্যক্তিকে উদ্বৃত করে প্রমান করেছেন যে, সম্পত্তি ইসলামের জন্য একটি সম্পদ (৭৫); অন্যদের সাহায্য ব্যতিত চলতে পারা (পৃ: ২৮), তাদের বাড়ী-ঘর ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন সাধন (পৃ: ৩৯ ও ৪৯), এবং তাদের সম্পদের বিকাশ ঘটানোর (পৃ: ৪১) মধ্যে মুসলমানদের আত্ম-সম্মান নিহিত রয়েছে। এমনকি তিনি বলেন যে, সম্পদ হচ্ছে এক প্রকার অস্ত্র (পৃ: ৫০)। তাঁর মতে, বিবাহ, সম্পদ ও খাদ্য বর্জন করে সূফীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছে (পৃ: ৫০)।

[*] দেখুন, জাফর আল-দিমাস্কি, ১৯৭৭, পৃ: ১৯।

www.pathagar.com

শাসিতের মধ্যে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্যের আদর্শের বিষয়ে একটি সাধারন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল মর্মে মনে হয়। কিন্তু, এটা পরে স্থায়ীভাবে বজায় থাকে নি। সাধারণ মানুষেরা স্বভাবত: সাধারন জীবনই যাপন করেছে এবং সেভাবেই চলছে। অধিকাংশ শাসক, ধন-সম্পদের মালিক ও কেউকেটাগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন না করে ফূর্তিবাজ ও বিলাসিতাপুর্ণ জীবন যাপন করেছেন। সতজীবন যাপন কারী ও সাহসী লোকজন প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার অবৈধতা মুসলিম বিশ্বে সুরক্ষিত হওয়ার পর এ সকল প্রতিবাদ অধিকাংশ শাসক ও তাদের সভাসদগন সাধারনভাবে উপেক্ষা করেছেন। যেহেতু সাধারণ মানুষের উপর অসম করের বোঝা চাপিয়ে এরূপ বিলাসিতা সম্ভব হয়েছিল এবং যেহেতু, সমালোচনাকারীর উপর স্বৈর শাসকদের তরফ থেকে কঠিন সাজা নেমে আসতো, সেহেতু, ধর্মপ্রাণ 'উলেমা' এবং সূফীগণ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাজ-দরবার এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। আমজনতার উপর এ সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রভাব থাকায় বিরাজমান টানাপোড়েনের ফলে সরকার ও জনগণের সংহতির মধ্যে চিড় ধরলো, যা সরকারকে আরো দুর্বল করলো এবং অনেক চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেল করতে সরকার ব্যর্থ হলো। এর ফলে ফিকহ্ শাস্ত্রের উন্নতিতেও বিরূপ প্রভাব পড়লো যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরিলক্ষিত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের ভোগবাদি সংস্কৃতির আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের উপর পড়লে ইহজাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্য বাস্তবায়নের প্রত্যাশা আরো পিছিয়ে যায়। এটা ইসলামি বিধি-বিধান ও বিদ্যমান জীবনযাত্রার মধ্যকার পার্থক্যসমুহ আরো বেশী করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্যভিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে চোখে পড়ার মত, যা এ শ্রেণীর মধ্যে পুর্বে ছিল না; ফলে বেড়েছে দুর্নীতি ও অবৈধ পথে আয়। এটা সঞ্চয় কমে যাওয়ার এবং দেশীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে যথেষ্ট পরিমান বিনিয়োগে অসমর্থতার একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কারন। সুতরাং, অধিকাংশ মুসলিম দেশ অত্যধিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ও ঋণের বোঝাসহ নিম্ন প্রবৃদ্ধির শিকার হয়ে থাকে। অতীতের মতই এগুলোর বিরুদ্ধে ধর্মীয় গুরু ও বিবেকবান ব্যক্তিদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। অবশ্য, ঠান্ডা মাথায় ইসলামি মুল্যবোধ, মুসলিম বিশ্বে সম্পদের স্বল্পতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ব্যতীত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনের আলোকে এ সকল প্রতিবাদের প্রতি নজর না দিয়ে পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যম প্রতিবাদকারীগণকে আধুনিকতা-বিরোধী ও মৌলবাদি হিসাবে আখ্যায়িত করছে। সম্ভবত: তারা বুঝতে পারছে না যে, ভোগবাদিতা ও যথেচ্ছাচারের সহিত সম্পর্ক আধুনিকতা

www.pathagar.com

নহে, বরং যে আধুনিকতা গণতন্ত্র, শিক্ষা, এবং প্রযুক্তি আনয়ন করে তা'ই মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন। চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে পরিণতিতে ভারসাম্যহীনতা ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা আরো বৃদ্ধি, পাবে।

প্রত্যক্ষবাদ

"দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ" বা "কোন বিশেষ নৈতিক অবস্থান বা ফলিত মুল্যায়ন থেকে সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ"-এরুপ অর্থে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত প্রত্যক্ষবাদের কোন স্থান মুসলিম ভাবধারায় আছে বলে মনে হয় না। এটা কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। যেহেতু মানুষের হেফাজতে থাকা সকল ধন-সম্পদের মালিকানা ছিল আল্লাহ তা'লার, মানুষ ছিল সেগুলোর আমানতদার। শরিয়ার বিধান মতে আমানতের শর্তাদি অনুযায়ী ধন-সম্পদের ব্যবহারের জন্য মানুষ আল্লাহ তা'লার নিকট দায়বদ্ধ ছিল। সুতরাং, সেখানে মুল্যবোধ-নিরপেক্ষতার কোন স্থান ছিল না। মুল পক্ষ (আল্লাহ তা'লা) কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদির প্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পক্ষের (মানুষ) জন্য ঔদ্ধত্যপুর্ণ আচরণের সামিল হতো। সুতরাং, পন্ডিতগণ ইতিহাসে ব্যতিক্রমহীনভাবে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'লার আমানত হিসেবে এবং তাঁর নিকট মানুষের দায়বদ্ধতার বিষয়ে কুর-আন ও সুন্নাহর মতামতকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। উদাহরনত:, আবু ইউসুফ(মৃত্যু ১৮২/৭৯৮) খলিফা হারুনুর রশীদের (মৃত্যু ১৯৩/৮০৯) নিকট প্রেরিত এক পত্রে বর্ণনা করছেন যে, "আপনাকে বিনা করনে সৃষ্টি করা হয় নি এবং আপনাকে হিসাব দিতে হবে। আপনার যা আছে, ও সেসব দিয়ে আপনি যা করেছেন সে বিষয়ে আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করবেন"।[১৭]

ন্যায়বিচার

ধন-সম্পদ যদি আল্লাহর তরফ থেকে আমানত হয়ে থাকে এবং মানুষকে তাঁর নিকট হিসেব দিতে হয়, তবে, ধন-সম্পদ ব্যবহারে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বৈ আর কোন গত্যন্তর নেই। কুর-আন ও সুন্নাহ উভয়ই ন্যায়বিচারের উপর ভীষন গুরুত্ব আরোপ করেছে, ফলে এটা শরিয়ার মুল লক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে। শরিয়ার আরেকটি মুল লক্ষ্য ভ্রাতৃত্ব একটি অর্থহীন শব্দে পরিণত হবে যদি তার সহিত আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বন্টনে ন্যায়বিচার সম্পৃক্ত না হয়। কুর-আন মতে আল্লাহ তা'লা কর্তৃক নবীদেরকে পাঠানোর অন্যতম মুল লক্ষ্য ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা (আল-কুরআন, ৫৭:২৫)। কুর'আন ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসে গুরুত্বের দিক থেকে ন্যায়বিচারকে ন্যায়পরায়নতা বা তাকওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি স্থান দেয়। ন্যায়পরায়নতা স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কারন

---

[17] আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরি, পৃ: ৪।

www.pathagar.com

এটা ন্যায়বিচারসহ সকল ন্যায্য কাজের স্প্রিংবোর্ড। ন্যায়বিচারবিহীন অবস্থাকে মহানবী(স:) "গাঢ় অন্ধকার"-এর সমান মর্মে বর্ণনা করেছেন এবং সাবধান করেছেন এভাবে: "অবিচার সম্পর্কে সাবধান থেকো। কারন অবিচারের কারনে শেষ বিচারের দিনে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবে"।[18] এ অবস্থা অনিবার্য কারন অবিচার ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি নষ্ট করে, সংঘাত, উত্তেজনা ও অপরাধকে উৎসাহিত করে মানুষের সমস্যা বাড়ায় এবং এভাবে তা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে অশান্তি এবং আখিরাতের জন্য দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই আনে না।

সংগত কারনেই মুসলিম ইতিহাসের প্রথম সারির সকল আইনশাস্ত্রবিদগন ন্যায়বিচারকে ইসলামের লক্ষ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উদাহরণত: আবু ইউসুফ খলিফা হারুন আল-রশীদের নিকট লেখা পত্রে ন্যায়বিচারের উপর আলোকপাত করে বলেছেন যে: "নিপীড়িতকে ন্যায়বিচার প্রদান করে ও অবিচার দুর করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়, দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করা যায় এবং কল্যান হাসিল করা ছাড়াও পরকালের জন্য পুরস্কার নিশ্চিত করা যায়"।[১৯] আল-মাওয়ার্দি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সার্বিক ন্যায়বিচার "পারস্পরিক স্নেহ ও ভালবাসা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দেশের উন্নয়ন, ধন-সম্পদের প্রসার, বংশ-বৃদ্ধি, এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার ধারনাকে সুদৃঢ় করে", এবং "অবিচার ব্যতীত আর কোন কিছুই দুনিয়া ও মানুষের বিবেককে এত দ্রুতগতিতে বিনাশ করতে পারে না"।[২০]

ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮) ন্যায়বিচারকে তৌহিদ বা এক আল্লাহ তা'লার প্রতি বিশ্বাসের একটি অনিবার্য ফলাফল হিসেবে দেখেছেন:[২১] "ভাল সব কিছুই ন্যায়বিচারের অংশ এবং খারাপ সব কিছুই অবিচার ও নির্যাতনের অংশ। এ কারনে সব কিছুতে ও সবার জন্য ন্যায়বিচার করা সকলের জন্য বাধ্যতামুলক এবং সব কিছুতে ও সবার ক্ষেত্রে অবিচার বারন করা হয়েছে। মুসলিম, অমুসলিম ও অন্যায়কারী নির্বিশেষে কারো জন্যই অবিচার কোনভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়"।[২২] তিনি উতসাহের সহিত তাঁর সময়ে প্রচলিত প্রবাদগুলো

---

১৮ সহি মুসলিম (১৯৫৫), ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৯৯৬:৫৬, কিতাব আল-বির ওয়া আল-সিলাহ ওয়া আল-আদাব, বাব তাহরিম আল-জুলম, যাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। মহানবী (স:) তাঁর হাদিসে জুলুমাত শব্দটি ব্যবহার করতেন। জুলুমাত হচ্ছে জুলমাহ বা অন্ধকার শব্দটির বহুবচন, এবং এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকারের কয়েকটি স্তর যা শেষতক নিকষ অন্ধকার বোঝায়, যেমন বলা হয়েছে কুর'আনের আয়াত ২৪:৪০-এ।

১৯ আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরি, পৃ: ১১১; আরো দেখুন, পৃ: ৩-১৭।

২০ আল-মাওয়ার্দি, আদাব (১৯৫৫), পৃ: ১২৫।

২১ ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমু আল-ফতুয়া, ১৯৬১, ১৮ খন্ড, পৃ: ১৬৫।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬। আরো দেখুন, তাঁর *মিনহাজ আল-সুন্নাহ*, ১৯৮৬, ৫ম খন্ড, পৃ: ১২৭।

www.pathagar.com

সমর্থন করেন: "স্রষ্টা একটি ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রকে অবিশ্বাসী হলেও সমর্থন করেন, কিন্তু, ন্যায়পরায়ন নয় এমন রাষ্ট্রকে ইসলামি হলেও তিনি সমর্থন করেন না", এবং "ন্যায়বিচার ও অবিশ্বাস নিয়ে দুনিয়া টিকে যেতে পারে, তবে অবিচার ও ইসলাম নিয়ে দুনিয়া টিকতে পারে না"।[২৩]

ইবনে খালেদুন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, ন্যায়বিচার ব্যতীত কোন দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে না, [২৪] যা উন্নয়ন অর্থনীতির পন্ডিতগণ দীর্ঘ সময় ধরে অবিচারের সাথে ছিনালি করে অবশেষে বিলম্বে স্বীকার করেছেন।[২৫] তিনি এমনও বলেছেন যে, "নির্যাতন উন্নয়নের অবসান ঘটায় এবং রাষ্ট্রের পতন ও ধ্বংসের মধ্যে উন্নয়নের পরিসমাপ্তি প্রতিফলিত হয়", [২৬] এবং "তরক্কীর ছন্দপতন হচ্ছে অবিচার ও পাপের আবশ্যকীয় এবং অনিবার্য পরিণতি"।[২৭] আরো বলা হয়েছে যে, "শুধুমাত্র কোন কারন ছাড়া ও ক্ষতিপুরণ ব্যতীত কারো ধন-সম্পদ কেড়ে নেওয়ার মধ্যেই অত্যাচার নিহিত নেই। অত্যাচারের আরো ব্যপক অর্থ রয়েছে। সে-ই অত্যাচারী যে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করে, যে বলপুর্বক অন্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপন স্বার্থ খাটায়, যে অন্যের উপর অন্যায় দাবী করে, বা তাদের উপর অন্যায্য ভার চাপিয়ে দেয় যা শরিয়া অনুমোদন করে না"।[২৮]

যেহেতু শ্রম ও উদ্যোগের যথাযথ মজুরী ও লাভ অর্জন করা শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের দাবী পুরণ করার জন্যই নয় দক্ষতার জন্যেও আবশ্যকীয় সেহেতু সকল লেখকই উহাদের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ইবনে খালেদুন গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, "জনগণের আর্থিক লাভ বাজেয়াপ্তকরণ আয় উপার্জনের আগ্রহ হ্রাস করে" এবং "আগ্রহের ঘাটতি প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ থেকে মানুষকে বিরত রাখে"। তিনি আরো বলেছেন যে, "যদি অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকরণ বেশী ও ব্যপক হয় তবে আগ্রহের সার্বিক ঘাটতির কারনে আয় উপার্জনের বিষয়েও সার্বিক অনীহা দেখা দিবে"।[২৯] এরুপ ধারনা প্রকৃতপক্ষে সকল লেখকের চিন্তার জগতে বিরাজমান রয়েছে এবং তা সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, মুল্য নিয়ন্ত্রন,

---

[23] ইবনে তায়মিয়াহ, *আল-হিসবাহ ফি আল-ইসলাম* (১৯৬৭), পৃ: ৯৪। অনুবাদ সংস্করনের জন্য দেখুন, Muhtar Holland, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (1982), p. 95.

[২৪] ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ২৮৭।

[২৫] দেখুন, Chapra, *Challenge*, 1992, pp. 143-56 and 168-9.

[২৬] ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ২৮৮।

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৮।

[২৮] প্রাগুক্ত।

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

www.pathagar.com

এবং অত্যধিক করারোপকে দোষারোপ করছে। এতদসত্ত্বেও, প্রথাগত অর্থশাস্ত্রীয় অর্থে কর্মে অনুপ্রেরণার উপর গুরুত্বারোপ, স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থকরণ, লাভ অর্জন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ইসলামি শাস্ত্রে স্থান পায় নি। এ অর্থে এগুলো ইসলামের রূপ-কাঠামোতে ঠিক মানায় না।

তুলনামুলকভাবে আধুনিক লেখকদের মধ্যে শেখ মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু ১৩২৩/১৯০৫) জুলুম বা অবিচারকে ইসলামের মুল্যবোধের জগতে সবচেয়ে জঘন্য ধরনের পাপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[৩০] সাইয়িদ কুতুব (১৩৮৫/১৯৬৬), সাইয়িদ মওদুদী (১৩৯৯/১৯৭৯), এবং বাকির আল-সদর (১৪০০/১৯৮০), যাদের লেখা চলমান ইসলামি পুণ:র্জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতির কারনে মুসলিম বিশ্বের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। সাইয়িদ কুতুব ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর 'আল-আদালাহ্ আল-ইজতিমা ইয়া ফি আল-ইসলাম' (ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার) শীর্ষক গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে দেখেছেন ইসলামের আদর্শের কাঠামোর পরিসরে "মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য একটি সার্বিক এবং অপরিহার্য অংশ" হিসেবে।[৩১] তিনি কুর'আনের ২৮৪টি আয়াত উদ্ধৃত করে ইসলামে ন্যায়বিচারের সার্বিক ধারনার বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩২] সাইয়িদ মওদুদীও গবেষণায় পেয়েছিলেন যে, একটি মুসলিম সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজ থেকে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং জীবনকে সকল চরমপন্থা ও বাড়া-বাড়ি থেকে মুক্তি দেবে, এবং যার মাধ্যমে সকল সামাজিক সেক্টরসমুহ তাদের অধিকারসমুহ অর্জন করতে পারবে ও দায়িত্বসমুহ পালন করতে সক্ষম হবে।[৩৩] বাকির আল-সদর মনে করতেন যে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের ডাকে সকল মুসলমানের সাড়া দেওয়া কেবল মাত্র গুরুত্বপুর্ণই নয়, এর বহুবিধ তাৎপর্যসমুহ হৃদয়ঙ্গম করাও জরুরী।[34]

---

[৩০] সৈয়দ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, *তফসির আল-মানার* (১৯৫৪), ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪৫।
[৩১] Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam*, 6th ed., 1964, p. 34; tr. John B Hardie, *Social Justice in Islam* (1970), p. 29.
[৩২] দেখুন, Adnan M. Musallam, "Sayyid Qutb and Social Justice, 1945-1948", 1963, p. 61.
[৩৩] মওদুদী, তাফীম আল-কুর আন, সুরা ৫৭-এর আয়াত ২৫-এর উপর মন্তব্য, ৫ম খন্ড, পৃ: ৩২২।
[৩৪] M Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, 1981, p. 303.

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ পারেটো মান?

ন্যায়বিচারের উপর এরুপ গুরুত্বারোপের কারনে কয়েক শতাব্দি ধরে আইনশাস্ত্রবিদগণ অনেকগুলো বিধিগত সূত্র জারী করেছেন, যা ন্যায্য ও ভারসাম্যপুর্ণভাবে সকলের কল্যান বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করতে পারে।[35] তাদের মধ্যে কতিপয় নিম্মরুপ:

- সামাজিক ত্যাগ বা ক্ষতি ঠেকানোর জন্য ব্যক্তি বিশেষকে ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করা যেতে পারে, এবং বৃহত্তর স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ২৬)।
- ক্ষুদ্রতর ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে বড় আকারের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ২৭)। ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতর স্বার্থের নিকট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থ অগ্রাধিকার পাওয়া সমীচীন; জনস্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের উপর প্রাধান্য পায় (অনুচ্ছেদ ২৮)।
- সুবিধা প্রদানের চেয়ে দুর্ভোগ ও ক্ষতি লাঘব করা অগ্রাধিকার পাওয়া সমীচীন (অনুচ্ছেদ ৩০)।
- যতদুর সম্ভব ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্যই লাঘব করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩১)।

উপরোক্ত সুত্রসমুহ নি:সন্দেহে পারেটো মানের ধারনার সাথে সাংঘর্ষিক, যা এমন কোন সমাধানকে স্বীকৃতি প্রদান করে না যাতে (গরীব) অধিকাংশের কল্যানের জন্য (ধনী) স্বল্প সংখ্যক লোকের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সুতরাং, কোন অবস্থাতেই এরুপ ধারনা ইসলামি অর্থশাস্ত্রের রুপকাঠামোতে মর্যাদাপুর্ণ স্থান পেতে পারে না যা প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে পেয়ে আসছে।

দক্ষতা

অতএব, দক্ষতা শব্দটি তার আধুনিক ভারসাম্যপুর্ণ ও মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ পারেটো মানের অর্থে ইসলামের শাস্ত্রে স্থান পায় নি। এর অর্থ এ নয় যে

---

[৩৫] *মাঝাল্লাহ আল-আহকাম আল-আদলিয়াহ,* যা সংক্ষেপে *মাঝাল্লাহ* নামে পরিচিত, তার মুখবন্ধে ১০০ আইনের প্রবাদ উল্লেখ করেছে। C R Tyser-এর *মাঝাল্লাহর* একটি ইংরেজী অনুবাদ, যার নাম The Mejelle, ১৯৬৭ সালে All Pakistan Legal Decisions, Nabha Road, Lahore, কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও *মাঝাল্লাহ* হচ্ছে *একটি* হানাফি সংহিতা যা অটোমান যুগে সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু, প্রবাদগুলো প্রায় সকল ধারার মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরো দেখুন, মুস্তফা আল-আরকা, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ফি তাওবিহি আল-জাদিদ* (১৯৬৭), ২য় খন্ড, পৃ: ৯৪৫-১০৬০; আলী আহমদ আল-নাদবি, *আল-কাওয়াইদ আল-ফিকিয়াহ* (১৯৮৬)। প্রতিটি নীতির শেষে বন্ধনীর ভেতরে প্রদত্ত নম্বর হচ্ছে *মাঝাল্লাহর* অনুচ্ছেদ নির্দেশক, যেখান থেকে নীতিটি সংকলিত হয়েছে। আরো প্রবাদের জন্য দেখুন, শচৎরহবপরঢ়ষবব ভৃত বাঢ়বহক্ষরহমচ শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়।

www.pathagar.com

দক্ষতার ধারনাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় নি। বরং, এটাকে অনেকগুলো অর্থে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর একটি হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মহানবী (স:) নিজে ইহসান (ভাল কাজ) ও ইটকান (নৈতিকভাবে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করে উতকর্ষতার প্রতি খুব বড় সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ ইহসানকে সব কিছুর জন্য বাধ্যতামুলক করেছেন", এবং "আল্লাহ তাকেই ভালবাসেন যে যখন কোন কিছু করে তা ভালভাবে সম্পন্ন করে"।[৩৬] ইহসান বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ইটকান বাস্তবায়নের পরিপুরক হতে পারে এবং তার বাস্তবায়নকে সহজ করে দিতে পারে, এবং এ দুটো সম্মিলিতভাবে দ্রব্য-সামগ্রীর ও মানব সম্পদের সবচেয়ে সুষম বন্টনে সহায়তা করতে পারে।

আরো একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও দক্ষতা গুরুত্বপুর্ণ। কারন আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধতা রয়েছে বিধায় ধন-সম্পদের অপচয় বা অপব্যবহার অবশ্যই করা যাবে না। আবু ইউসুফের তরফ থেকে হারুন আল-রশীদের[৩৭] নিকট একটি হাদিসের[৩৮] উপর ভিত্তি করে প্রেরিত একটি নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ দায়বদ্ধতা একজন ব্যক্তির গোটা জীবনকাল, জ্ঞান ও প্রযুক্তি, ধন-সম্পদ এবং মানব দেহের সকল সক্ষমতাসহ সকল সম্পদের উপর প্রযোজ্য। এ রকম দায়বদ্ধতার শর্ত হচ্ছে যে, সকল ধন-সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সবচেয়ে বেশী মানব কল্যান সাধিত হয়। মানবিক বা বস্তুগত, স্বল্প বা প্রচুর, মুল্যবান বা বিনামুল্যের যে রকমই হোক না কেন সকল সম্পদের জন্যই এরূপ শর্ত প্রযোজ্য।[৩৯]

এভাবে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ ব্যবহারকে পারেটো মানের আলোকে সংজ্ঞায়িত করা গেলেও ইসলামি অর্থশাস্ত্রে তাকে লক্ষ্যের (মকসুদ)

---

[৩৬] সাদ্দাদ ইবনে আউস, *সহি মুসলিম, কিতাব আল-সাঈদ ওয়া আল-দাবাই, বাব আল-আমর বি ইহসান ফি আল-দাহব ওয়া আল-কাতল,* ৩য় খন্ড, নং ৫৭, পৃ: ১৫৪৮, থেকে প্রথম হাদিসটি নেয়া হয়েছে; আল-বেয়াহাকি'র *ও'আব আল-ঈমান,* ১৯৯০, ৪র্থ খন্ড, নং ৫৩১২, পৃ: ৩৩৪-এ সাঈদা আইশা থেকে দ্বিতীয় হাদিসটি নেয়া হয়েছে।

[৩৭] আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরি, পৃ: ৪।

[৩৮] হাদিসের মূল কথাগুলো হচ্ছে: "শেষ বিচারের দিনে কোন এক জন মানুষকে তার তার জীবন সম্পর্কে, তার জীবন যাত্রা সম্পর্কে, তার জ্ঞান কীভাবে ব্যবহার করেছে সে সম্পর্কে, কীভাবে সে সম্পদ অর্জন করেছে ও কীভাবে তা ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে, এবং তার দেহ ও কীভাবে তা নি:শেষ করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত সে নড়তে পারবে না"। আবু বারজাহ আল–আসলামী থেকে তিরমিদি কর্তৃক বর্ণিত, দেখুন, আল–মুন্দারী, ১৯৮৬, ১ম খন্ড, নং ৫, পৃ: ১১৫।

[৩৯] দেখুন, আনাস জারকা, ১৯৮০, পৃ: ১৩।

www.pathagar.com

আলোকে সংস্কারিত করার প্রয়োজন হতে পারে। লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য বাতিল করে দেয় সম্পদের এরূপ যে কোন ব্যবহারকে অপচয় বা অদক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৪০] উদাহরণত: প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে পারেটো দক্ষতার ধারনা অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্যের ধ্বংস সাধনকে অনুমোদন করে যদি তা ব্যবসায়ীকে তার লাভ কমানোকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে অথচ মুল্য বৃদ্ধির কারনে ভোক্তাদের অবস্থা খারাপ করে না। এটা ইসলামি কাঠামোতে গ্রহণযোগ্য নয় কারন এরূপ আচরন শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত আমানত হিসেবে সম্পদের ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেয় না, এর দ্বারা ভোক্তাদের প্রতি অবিচারও করা হয়। যদিও বর্তমান পর্যায়ে পণ্য-মুল্য বজায় রাখা হলে ভোক্তাদের অবস্থা খারাপ হয়ত: হবে না, তাদের অবস্থা আরো ভাল করা সম্ভব হতো যদি অতিরিক্ত উৎপাদন ধ্বংস না করা হতো এবং মুল্য কমতে দেওয়া হতো বা অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্যকে গরীবের মধ্যে বন্টন করা হতো। একই ভাবে প্রার্থনা ও রোজায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা ইহজাগতিকতার প্রেক্ষাপটে সম্পদের অপচয় রূপে মনে হতে পারে কারন এর ফলে অনিবার্যভাবে না হলেও উৎপাদন কমে যেতে পারে, এভাবে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও লাভ অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। তবে, বিষয়টিকে যদি চূড়ান্ত পরিণতিতে চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদন ও মানব কল্যাণে বিরাট অবদান রাখার সক্ষমতার দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়, তা হলে প্রার্থনা ও রোজা ইতিবাচক সুবিধা প্রদান করতে পারে। সম্ভবত: এরূপ ও অন্যান্য কারনে, যেমনটি আগে বলা হয়েছিল, ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি সুত্র বৃহত্তর জনস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া অনুমোদন করে।[41]

পন্ডিতগণ সকলে সার্বিকভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, নৈতিক মুল্যবোধ ও কলা-কৌশল সমাজে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠার যে শিক্ষা শরিয়া প্রদান করে, তা শুধুমাত্র সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও কল্যান নিশ্চিতই করে না, মানব প্রগতি ও উন্নয়নে প্রসার ঘটায়।[৪২] আল-মাওয়ার্দি দেখিয়েছেন যে, ইসলামের শিক্ষা বিশ্বে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার শক্ত ভিত্তিরূপে প্রমানিত হয়েছে।[43] ইবনে খালদুন জোর

---

[৪০] সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট বন্টনকে ফরিদি এভাবে বর্ণনা করেন, "আয় ও প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে সমাজের নৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির উপযোগী বন্টনই হচ্ছে সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট বন্টন" (ফরিদি, ১৯৮৩, পৃ: ৪০)।

[৪১] *মাজাল্লাহ*'র ২৬, ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদ।

[৪২] দেখুন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (মৃত্যু ১১৭৬/১৭৬২), *হুজ্জতুল্লাহ আল-বালিগাহ,* ১৯৯২। গোটা পুস্তকেরই (দু' খন্ড) লক্ষ্য হচ্ছে, শরিয়াহ'র বিভিন্ন দীক্ষার পেছনের প্রজ্ঞা তুলে ধরা।

[৪৩] আল-মাওয়ার্দি, *আদাব,* (১৯৫৫), পৃ: ১২০।

www.pathagar.com

দিয়ে বলেছেন যে, শরিয়া বাস্তবায়ন না করে কোন দেশ মর্যাদা ও শক্তি অর্জন করতে পারে না।[৪৪]

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চলবে না?

ইতো: পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হতে পারে যে, প্রতিযোগিতা ও নিয়ন্ত্রন উভয়ই জরুরী হলেও যথেষ্ট নয়। বাজার ব্যবস্থায় সুস্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধসমুহের ভূমিকা এবং বাজার ব্যবস্থার সকল ক্রীড়নকদের সংস্কারে বিষয়টি সকল মুসলিম পন্ডিতগণ কর্তৃক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য, সকল মানুষই তার নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারে, এবং, এমনকি যদি তারা সচেতন হয়ও তবুও তারা ঐ সকল কর্তব্য পালন করে জীবন যাপন নাও করতে পারে। এমনও হতে পারে যে তারা অন্যের জরুরী, অপূর্ণ অভাব, বা সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও সম্পদ ব্যবহারে সামাজিক অগ্রাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। অধিকন্তু, সার্বিক কল্যান সাধনের স্বার্থে অনেকগুলো কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু নৈতিকভাবে সচেতন সমাজেও বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বা যথেষ্ট সম্পদ যোগাড় না করতে পারার কারনে সেকাজগুলো করতে কোন ব্যক্তি অনীহা প্রদর্শণ করতে বা অক্ষম হতে পারে। এ রকম অবস্থায় নৈতিক উন্নয়ন এবং পণ্যমুল্য পদ্ধতি যতই অপরিহার্য হোক না কেন সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে।

সুতরাং ইসলামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে পার্টনার, অনুঘটক ও প্রদায়ক হিসেবে একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন খুবই অপরিহার্য। মহানবী (স:)-এর বহু উক্তিতে এরুপ ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে: "যাকে জনসাধারনকে শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ প্রত্যাশা পুরনের জন্য আন্তরিক নয় এরুপ কোন ব্যক্তি বেহেশতের স্বাদ পাবেনা"।[৪৫] অন্য একটি হাদিসে তিনি বলেছেন, "আল্লাহ কোর-আনের চেয়ে রাজার মাধ্যমেই বেশী নিয়ন্ত্রন আরোপ করেন"।[46] সেই বিষয়টি কি যা কুর'আন নিয়ন্ত্রন করতে পারে না অথচ রাজা পারেন? এগুলো সব হচ্ছে সামাজিকভাবে ক্ষতিকর আচার-আচরণ যার মধ্যে রয়েছে অবিচার, ছল-চাতুরী, প্রতারণা এবং চুক্তি ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।[47]

---

[৪৪] ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ২৮৭।

[৪৫] বুখারী, *কিতাব আল-আহকাম,* মা'কিল ইবনে ইয়সার থেকে *বাব মান ইস্তেরিয়া রাইয়াতান ফালাম ইয়ানসা*।

[৪৬] আল-মাওয়ার্দি কর্তৃক *আদাব*-এ উদ্বৃত, ১৯৫৫, পৃ: ১২১।

[৪৭] এ ধরনের আচরনকে অধ্যাপক নর্থ 'ক্ষতিকর' মর্মে চিহ্নিত করেছেন। নর্থের বইয়ের "Ideology and Free Rider" শীর্ষক অধ্যায়টি দেখুন, North, 1981 ।

www.pathagar.com

কুর'আন শুধুমাত্র আদর্শ আচরনের একটি কাঠামো সরবরাহ করতে পারে এবং মুসলমানদেরকে সে মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে। আশা করা হয় যে, মুসলমানেরা তা মেনে চলবে। তথাপিও তাদের বিরাট অংশ তা নাও করতে পারে, বিশেষ করে যদি সাধারন ভাবে নৈতিকতার মানের পতন ঘটে। সুতরাং, শিক্ষা, উতসাহ এবং প্রতিরোধক সরবরাহ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করার আছে। এ অর্থেই "শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া"।[৫৮] যদি সে এ ভুমিকা কার্যকরভাবে পালন না করে তবে কুর-আন বর্ণিত আচরণ কাঠামোর ব্যাপকভাবে লংঘন হবে এবং তাতে শুধুমাত্র উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণের উপরই বিরুপ প্রভাব পড়বে না, এর ফলে সমাজে গোলমাল শুরু হবে এবং অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে।

রাষ্ট্রের ভুমিকার উপর গুরুত্বারোপ ইতিহাসের সকল প্রথম সারির পন্ডিতদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে।[৫৯] আল-মাওয়ার্দি জোর দিয়ে বলেছেন যে, একটি কার্যকর সরকার অবিচার ও অন্যায় প্রতিরোধ করার জন্য অপরিহার্য। এ কারনে তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই মহানবীর ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হতে পারে।[৬০] ইবনে তায়মীয়াহ আরো মনে করতেন যে, ইসলাম ও রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং অপরটির সাহায্য ব্যতীত অন্যটি কার্যকরভাবে তার ভুমিকা পালন করতে পারবে না। রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন না করলে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে, এবং শরিয়াহ'র প্রতিরোধক প্রভাব ব্যতীত রাষ্ট্র অধ: পতিত হয়ে একটি অন্যায্য ও অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।[৬১] সুতরাং, তিনি রাষ্ট্রকে

---

[৫৮] Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shariyyah*, 1966, p. 139। এটি আসলে একটা হাদিসের অংশ বিশেষ, যেখানে বলা হয়েছে: "শাসক হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ'র ছায়া, প্রতিটি নির্যাতিত মানুষ তার নিকট নিরাপত্তা চায়। যদি তিনি ন্যায়বিচার করেন, তাহলে তিনি পুরস্কারের দাবীদার ও প্রজারা ধন্যবাদার্হ হন। তবে, যদি তিনি অবিচার করেন, তাহলে দায়-দায়িত্ব তাঁর এবং প্রজাদের ধৈর্য ধরে থাকা আবশ্যক" (আল-বেয়াহাকি রচিত ইবনে উমর, *শু'আব আল-ঈমান,* ষষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৬:৭৩৬৯)।

[৫৯] এ'সকল পন্ডিতগণের মধ্যে রয়েছেন: আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২/৭৯৮), আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮), আবু ইয়ালা (মৃত্যু ৪৫৮/১০৬৫), নিজাম আল-মুলক (মৃত্যু ৪৮৫/১০৯২), আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১), ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮), ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬), শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৬/১৭৬২), জামালউদ্দিন আল-আফগানি (মৃত্যু ১৩১৫/১৮৯৭), মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু ১৩২৩/১৯০৫), মুহাম্মদ ইকবাল (মৃত্যু ১৩৫৭/১৯৩৮), হাসান আল-বান্না (মৃত্যু ১৩৬৮/১৯৪৯), সাঈদ মওদুদী (মৃত্যু ১৩৯৯/১৯৭৯), ও বাকির আল-সদর (মৃত্যু ১৪০০/১৯৮০)।

[৬০] আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকাম,* ১৯৬০, পৃ: ৫।

[৬১] দেখুন, Khadduri, 1984, p. 179.

৭—

www.pathagar.com

জনস্বার্থের হেফাজতকারী প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচনা করতেন এবং শরিয়াহ'র বাস্তবায়নকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মূলমন্ত্র মনে করতেন।[৫২]

রাষ্ট্রের নিকট কি আশা করা হয়? "রাজপুত্রের জন্য আরশি'র (Mirrors for Princes) উপর লিখতে গিয়ে অনেক পন্ডিতই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৩] তাঁদের একজন নিজাম আল-মুলক (মৃত্যু ৪৮৫/১০৯২) তাঁর রচিত 'সিয়াসাত নামা'য়, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'সরকারের নীতিসমূহ' এবং যা সেলজুক রাজবংশের (৪৪৭-৫৯০/১০৫৫-১১৯৪)[৫৪] দীর্ঘকালীন শাসক রাজা মালিকশাহ'র (মৃত্যু ৪৮৫/১০৯২) অনুরোধে রচিত হয়েছিল, যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা।

এ সকল লেখকদের কেহই রাষ্ট্রকে একটি কঠোর সংগঠনরূপে বা অর্থনীতির একটি বিরাট অংশের মালিক ও পরিচালকরূপে কল্পনা করেন নি। আল-দিমাস্কি ও ইবনে খালদুনসহ কতিপয় চিরায়ত মুসলিম পন্ডিত স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্রকে সরাসরি অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার নীতির প্রতি তাদের অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।[৫৫] ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে কদাচিৎ এরূপ প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

সর্বাধুনিক ধর্মীয় সংস্কারকদের মধ্যে শেখ হাসান আল-বান্না জোর দিয়ে বলেছেন যে, সরকারের অবস্থান আর্থ-সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্রে; যদি তারা দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তারা সবকিছুকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে ফেলবে এবং যদি তারা সংশোধিত হয় তাহলে তারা সবকিছুকেই সংশোধিত করতে সক্ষম হবে।[৫৬]

---

[৫২] ইবনে তায়মিয়াহ'র *আল-সিয়াসাহ আল-শরিয়াহ*, ১৯৬৬, হচ্ছে কুর'আনের এ আয়াতটির ব্যাখ্যা: "আল্লাহ তা'লা তোমাদের নির্দেশ করছেন তোমরা ঐ সকল লোকদের উপরই তোমাদের বিশ্বাস রাখবে যারা বিশ্বাসের উপযুক্ত" (আল-কুর:আন, ৪:৫৮)। তিনি মনে করতেন যে, অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষের মত সরকারী পদ-পদবীও একটি আমানত। বিশেষ করে পৃ: ৯-১৪ ও ১৩৮-৪৪ দেখুন।

[৫৩] এদের কতিপয় হচ্ছেন: আল-কাতিব (মৃত্যু ১৩২/৭৪৯), ইবনে আল-মুকাফ্ফা (মৃত্যু ১৩৯/৭৫৬), আল-নুমান (মৃত্যু ৩৬৩/৯৭৪), আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮), কায় কাউস (মৃত্যু ৪৭৫/১০৮২), নিজাম আল-মুলক (মৃত্যু ৪৮৫/১০৯২), আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১), আল-তুরতুশি (মৃত্যু ৫২০/১১২৭)।(বিস্তারিতের জন্য দেখুন, Essid, 1995, pp. 19-41)।

[৫৪] এ বইটি Hubert Darke কর্তৃক ফার্সী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়, যার নাম দেয়া হয়: *The Book of Government or Rules for Kings* (London, 1961), p.7.

[৫৫] আল-দিমাস্কী, ১৯৭৭, পৃ: ১২ ও ১৬; ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ১৮১-৩।

[৫৬] হাসান আল-বান্না, *মাজমুয়াহ রাসাইল,* (১৯৮৯), পৃ: ২৫৫।

www.pathagar.com

সাইয়িদ মওদূদী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'লা তাঁর নবীগণকে কেবলমাত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন নি। পরিকল্পনায় একটি কার্যকর কৌশলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রের জন্য একটি ন্যায়বিচার-কেন্দ্রিক শক্তিশালী ভূমিকা এ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৫৭] বাকির আল-সদর মনে করতেন জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইসলামি বিধি-বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[৫৮]

সুতরাং, ছেই'র সূত্র ইসলামি কাঠামোতে কোন অর্থপূর্ণ ধারনা প্রকাশ করছে না। সম্ভবত: এ কারনে এমন কোন চিরায়ত লেখক নেই যিনি রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার পক্ষ্যে ওকালতি করেছেন। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারনা এখন প্রায় নেই বললেই চলে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারন মহানবী (স:) নিজে রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য দেখা যায় না। অশিক্ষা, প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা এবং নৈতিক অধ:পতন ইত্যাদির দিকে তাকালে সার্বিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য না করে পারা যাবে না। এতে নৈতিক মুল্যবোধসমুহ ব্যক্তি পর্যায়ে আত্মস্থ করন শুধু সম্ভবই হবে না, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারও ত্বরান্বিত হবে এবং উন্নয়নেও গতি সঞ্চারিত হবে। অন্যান্য গণমুখী অঙ্গীকারের ব্যবস্থাগুলোও উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ উতসাহিত করার জন্য অপরিহার্য হতে পারে। সীমিত সম্পদ ব্যবহারে রাষ্ট্রকে স্পষ্টভাবে তার অগ্রাধিকারসমুহ ঠিক করে নিতে হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেওয়া ইসলামি রেওয়াজের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটা অবশ্য উতসাহ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে আবশ্যকীয় করতে পারে, এবং প্রতিরোধ ও ভারসাম্য রক্ষা এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা সম্বলিত উপযুক্ত আইনগত কাঠামো তৈরী করা আবশ্যক হবে। অতিমাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়াই লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক, মুল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ও বাজার ব্যবস্থায় পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার জন্য রাষ্ট্রকে উপযুক্ত আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করতে হতে পারে।

সুনির্দিষ্টভাবে বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে এরুপ একটি বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলকে ভর্তুকি মুল্যে কোন সেবা প্রদান করা। সে

---

[৫৭] এ ধারনাটি মওদূদী একাধিক স্থানে ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ সূরা ৫৭, আয়াত ২৫ (al-Hadid)-এর উপর তাঁর মন্তব্য দেখুন, *তাফহীম আল-কুরআন,* ৫ম খন্ড, পৃ: ৩২২-৩; *Islamic Law and Constitution*, 1967, pp. 247-8.

[৫৮] Al-Sadr, *Iqtisaduna*, 1981, p. 721. আরো দেখুন, Taleghani, 1982, p. 28

www.pathagar.com

সকল ব্যক্তি ও পরিবারকে সাহায্য করার প্রয়োজন হতে পারে যারা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে আছে এবং যারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, এবং তাও যতটুকু আবশ্যক ঠিক ততটুকু এবং বিদ্যমান সম্পদ দিয়ে যতটুকু করা যায় ঠিক ততটুকুই। সম্পদের স্বল্পতা এর চেয়ে বেশী কিছু করতে দিবে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুল্যায়ন করতে অনাগ্রহের কারনে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র বহুদেশেই আর্থিক সংকটের মোকাবেলা করছে। এর কারনে রাষ্ট্র আয়-রোজগার যাছাই করার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে, ইহার আওতা অতিরিক্ত হারে বেড়ে যাচ্ছে।

হিসবাহ

জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং ন্যায়ানুগ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগ 'হিসবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, [59] যার মধ্যে প্রকাশিত হয় মহানবীর উক্তি: "সবচেয়ে খারাপ লোক হচ্ছে তারা যারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না, এবং যারা সততার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে না ও পাপকে নিষিদ্ধ করে না"।[৬০] একজন মুহতাসিল হচ্ছেন তিনি "যিনি শাসক বা তাঁর সহকারী কর্তৃক নিযুক্ত হন জনসাধারনের অবস্থা জানা ও তাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে তাদের কাজকর্মের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য"।[৬১] ব্যপক অর্থে 'হিসবাহ' বলতে বুঝায় "নৈতিক উৎকর্ষতার পতন যদি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তবে তা (নৈতিক উৎকর্ষতা) যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা, এবং পাপকে প্রতিরোধ করা যদি পাপাচার স্পষ্ট হয়ে উঠে"।[৬২] সংকীর্ণ অর্থে 'হিসবাহ' হচ্ছে মানুষের মিথক্রিয়ায় ন্যায়বিচার ও সততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাকে মনিটর করা এবং প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ করা"। উদাহরণত: 'দ্বিতীয় খলিফা ওমর উটের পিঠে ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর কারনে দায়ী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন'।[৬৩]

আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮), আবু ইয়ালা (মৃত্যু ৪৫৮/১০৬৫), আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১), ইবনে হাজম (মৃত্যু ৪৫৬/১০৬৪), আবদ আল-রহমান আল-শায়জারী (মৃত্যু ৫৮৯/১১৯৩), ইবনে তায়মীয়াহ

---

[৫৯] দেখুন, ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ২২৫-৬।
[৬০] ইবনে আল-উখুবাহ, এন ডি, রচিত 'উমর ইবনে আল-খাত্তাব, ২য় খলিফা' থেকে উদ্বৃত, পৃ: ১৭-১৮।
[৬১] ইবনে আল-উখুবাহ, এন ডি, পৃ: ৭।
[৬২] আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকাম,* ১৯৬০, পৃ: ২৪০।
[৬৩] দেখুন, Rabah, Introduction to Ibn Taymiyyah's *Al-Hisbah,* 1967, p. d. (5).

www.pathagar.com

(মৃত্যু ৭২৮/ ১৩২৮), ইবনে আল উখুবাহ (মৃত্যু ৭২৯/ ১৩২৯), আল-নুয়ারী (মৃত্যু ৭৩২/ ১৩৩২), ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/ ১৪০৬), এবং আল-মাকরিজি-সহ (মৃত্যু ৮৪৬/ ১৪৪২) কতিপয় বড় বড় লেখক 'হিসবাহ'র উপর লিখেছেন।[৬৪] এ সকল লেখকগণ শরিয়ার আলোকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের পক্ষে জোরে-শোরে বলেছেন, যাতে অপরিহার্যরুপে বিবেচিত ন্যায়বিচার ও সততা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সবসময় কার্যকরভাবে সম্ভব না হলেও মুসলিম ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে এ কাজটি চলেই আসছিল।

'হিসবাহ'র লক্ষ্য কেবল মাত্র বাজার ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া এবং দাম, মজুরী, লাভ চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হতে দেওয়াই নয় (যা পুঁজীবাদি সমাজেও হয়ে থাকে), একই সময়ে নিশ্চিত করা যে, সকল অর্থনৈতিক এজেন্টসমুহ পরস্পরের প্রতি তাদের কর্তব্যসমুহ পালন করে এবং শরিয়াহ'র বিধি-বিধানসমুহ মেনে চলে।[৬৫] "কখনও যেন কোন বল প্রয়োগের ঘটনা না ঘটে, কোন প্রতারনা না হয়, কোন বিশেষ পরিস্থিতির বা চুক্তির কোন পক্ষের অজ্ঞতার সুযোগ যেন না নেওয়া হয়" তা নিশ্চিত করার জন্য সকল সতর্কতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, এবং পণ্যমুল্য বৃদ্ধির জন্য পণ্য আটকে রাখা বা ধ্বংস করার ঘটনাও যেন না ঘটে তাও নিশ্চিত করা আবশ্যক।[৬৬] ন্যায়বিচার ও সততার সীমা লংঘন করা হলে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে রাষ্ট্রের কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্ধে ভোগার প্রয়োজন নেই এবং বাজারের নিয়ামকসমুহ নিজেরাই বৈষম্য দুর করে পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য অপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই। এরুপ হস্তক্ষেপ যেন খাম-খেয়ালীপূর্ণ না হয়। কারন তাহলে এর কারনেই বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। বরং, বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষনের ভিত্তিতে এটা করা উচিত এবং যদি কোন সংগত কারনে মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে তা যেন স্বাভাবিক অবস্থায় একই রকম পণ্য ও সেবার দামের সহিত বেমানান না হয়।

একনায়কতন্ত্র চলবে না

মুক্তবাজার অর্থনীতির রাষ্ট্রের বিপরীত হওয়া সত্বেও ইসলামি রাষ্ট্রকে বড় বড় লেখক বা আইনশাস্ত্রবিদগণ কখনও একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ধারনা করেন নি।[৬৭] ব্যক্তিগত সম্পদের স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার

---

[৬৪] আরো পরিপূর্ণ তালিকার জন্য Shalaq, ১৯৮৯ এ Table 1 ও 2 দেখুন, পৃ: ৬৫-৬৬।
[৬৫] Islahi, 1988, p. 19.
[৬৬] দেখুন, M N Siddiqi, in Islahi, (1988), p. 16 । আরো দেখুন, Islahi, Chapter 3 ।
[৬৭] দৃষ্টান্তস্বরুপ, আল-মাওয়ার্দি তাঁর *আল-আহকাম আল-সুলতানিয়াহ*-তে রাষ্ট্রের দশটি দায়িত্ব আলোচনা করেছেন। সবগুলোই মানুষের কল্যান বিষয়ক, কিন্তু, উদ্যোগের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

প্রতি সম্মানবোধ সব সময়ই বিরাজমান ছিল। সমাজতন্ত্রের প্রভাবে কতিপয় মুসলিম লেখকের চিন্তায় জাতীয়করন ও প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি ঝোঁক এসেছিল, এবং আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়াসহ কতিপয় মুসলিম দেশের উচ্চবিলাসী রাজনীতিকগণ তা কাজে লাগিয়েছিলেন।

মুসলিম বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পেছনে মুল শক্তি ছিল সেনা বাহিনী। সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য দুর্নীতি দুর করার বাসনা, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকেই সব সময় যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। এ সকল লক্ষ্যসমূহ নিপীড়িত গণমানুষের নিকট বড় ধরনের আবেদন রাখতো। এ উদ্দেশ্য পুরনের জন্য ইসলামি কৌশল অধিকাংশ সামরিক একনায়কের পছন্দ হতো না, কারন তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঝোঁক ছিল এবং/অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর তাদের নিয়ন্ত্রন চিরস্থায়ী করার উচ্চবিলাস ছিল। এটা আরো সহজ হয় যখন অর্থনীতি সম্পূর্ণ তাদের করতলে থাকে। ইসলাম যেখানে শুরা, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, সেখানে ইসলাম তাদের উচ্চাভিলাস বাস্তবায়নে বাধা হবে বৈ কী। সুতরাং, তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য সমাজতনন্ত্রের চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে।

তবুও তারা ইসলামকে বাদ দিতে পারেনি। এটা খুব অজনপ্রিয় কাজ হতো। অতএব, তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে একই ব্র্যাকেটে বন্ধী করে ইসলামকেও কাজে লাগালো। পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর একটি ভাষনে এটা স্পষ্ট হয়েছে, যেখানে তিনি যুক্তি দেখান যে:

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহ পরস্পর বিরোধী নয়। ইসলাম সাম্যের শিক্ষা দেয় এবং সমাজতন্ত্র হলো তা অর্জনের আধুনিক কৌশল. . . ইসলামের প্রাধান্য ব্যতীত পাকিস্তান টিকতে পারবে না। সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সেই প্রাধান্যকে মোকাবেলা করে না। অপর দিকে সমাজতন্ত্র গোটা জনগোষ্ঠীকে ইসলামি মুল্যবোধের হেফাজতকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।[৮]

কাঠামোর মধ্যে (৩ নং দায়িত্বের অংশ)। দেখুন, আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া,* ১৯৬০, পৃ: ১৫-১৬।

[৮] Bhutto, 1968, pp. 14-15.

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসকগণ তাদের নিজের স্বার্থে কৃত সকল সরকারী হস্তক্ষেপকে বৈধতা প্রদানের জন্য সমাজতন্ত্র ও ইসলামকে ব্যবহার করেছে।[৬৯]

সমাজতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই দেয় নি। খাম-খেয়ালী জাতীয়করন, ভুল নীতি এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে সে সকল দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে যেখানে সমাজতন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গ্রামীন উন্নয়নের পরিবর্তে নগর এলাকায় বড় বড় শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ ও মুদ্রা সম্প্রসারন করে অতিরিক্ত ঘাটতি অর্থায়নের ফলে এ সকল অর্থনীতিকে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচুর খেসারত দিতে হচ্ছে। দুর্নীতি বেড়েছে এবং উন্নয়নের গতি হ্রাস পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার হতাশাব্যঞ্জক। আলজিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মত তেল উৎপাদনকারী দেশসমুহেও জনসাধারনের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, যেখানে তেল খাতের আয় কার্যকরভাবে ব্যবহার করলে সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব হতো। এ কারনে সমাজতন্ত্রের পক্ষে আনীত তিনটি যুক্তিই (দুর্নীতি দুরীকরন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করন, এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার) শুধুমাত্র প্রত্যাশাই রয়ে গেছে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব: আদর্শ এবং বাস্তবতা

মুসলিম ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ইসলামের কাংখিত যথাযথ ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্র সব সময় বাস্তবায়িত হয়নি। চমৎকার শাসকদের পাশাপাশি দুর্নীতিবাজ ও স্বৈরশাসকরাও ছিলেন যারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য জনগণকে শোষন করতো। এর ফলে শাসক ও ধর্মপ্রাণ উলেমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্থায়ীরুপ লাভ করেছে[70] – এ দ্বন্দ্ব মুসলিম সভ্যতার ছন্দপতনের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর ফলে কেউ মনে করতে পারেন যে, পাশ্চাত্যে মুক্তবাজার অর্থনীতির ডাক সম্ভবত: ভুল ধারনা প্রসূত ছিল না। সে যাহাই হোক, মুক্তবাজার অর্থনীতি ন্যায়বিচার বাস্তবায়নে সহায়ক হয়নি, হতে পারে না। কল্যাণ রাষ্ট্রেরও নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে। অতএব প্রশ্ন উঠে যে, উভয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্যপুর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব কী না। পাশ্চাত্যে বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও সরকারের ব্যর্থতার মধ্যে একটি যথাযথ ভারসাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। মুসলমানগণ কি সফল হতে পারে?

---

[৬৯] Desfosses and Levesque, 1975-এ সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আলজেরিয়া, এ পাকিস্তানের উপর লেখাগুলো দেখুন।

[৭০] দেখুন, Goitein, 1966, pp. 197-213।

www.pathagar.com

তাদের কোন বিকল্প নেই। একটি ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদের কারনে সফলতার জন্য লড়াই করে যাওয়া তাদের নৈতিক কর্তব্য।

মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের ধারনামতে একটি ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস একটি কঠিন কাজ হতে বাধ্য। জনকল্যানের জন্য জনগণের সম্পদের কার্যকর ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে শরিয়াহ'র কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ততসহ যথাযথ প্রতিরোধক ও ভারসাম্যসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। তবে, অধিকাংশ মুসলিম দেশেই গণতন্ত্রও নেই, প্রকৃত অর্থে শরিয়াহ'র শাসনও নেই। এমনকি অবৈধ শাসকগণ শরিয়াহকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে যাতে তাদের স্বৈরশাসন স্থায়ী হয়। উলেমাগন এমন ছোট-খাট বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন যে গুলোর সাথে একটি ন্যায়ানুগ ও নৈতিকভাবে সঠিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। বিগত শতাব্দিগুলোতে সরকারী সহায়তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা প্রগতির জন্য কোন কাজে আসছে না। যেরুপ শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক শিক্ষার সাথে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটাবে, তা আদৌ দেখা যায় না। যে সকল কারনে মুসলিম দেশ সমূহ এ অবস্থায় এসেছে তা ৩ ও ৬ অধ্যায়ে আলোচিত হবে এবং এ প্রবণতা রোধকল্পে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ৮ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় রূপকল্পের মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে কি? (মুসলিম বিশ্বে যুক্তি ও আসমানী জ্ঞানের বিরোধ এবং উহার আধুনিক তাৎপর্য)

দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবতা নিয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম আলোচনা করে থাকে। বিজ্ঞান আলোচনা করে প্রাকৃতিক জগত নিয়ে যা মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, আর ধর্ম আলোচনা করে একটি উচ্চ মার্গের বাস্তবতা নিয়ে যা অলৌকিক এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার আওতা-বহির্ভূত।তাদের জ্ঞানের উৎসগুলোও পৃথক। বিজ্ঞান নির্ভর করে মুলত: মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তি বিশেষত: যুক্তির উপর, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে চায়; এটা 'বিদ্যমান অবস্থা'র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে চায় যাতে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সে বিষয়ে ভবিষ্যত বানী করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞান যখন প্রাকৃতিক জগত নিয়ে আলোচনা করে, তখন তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বেশী সঠিক হয় এবং তার ভবিষ্যত বানী প্রদানের ক্ষমতা বেশী হয়। তবে, এটা যখন আলোচনা করে মানুষ নিয়ে, যে সব সময় একই নিয়ম মেনে চলে না, তখন তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা অতটা যথার্থ হয় না এবং ভবিষ্যত বাণী প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। বিপরিতক্রমে, ধর্ম জ্ঞানের জন্য নির্ভর করে আসমানী জ্ঞান ও যুক্তির উপর। ইহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ইহার বিশ্ববীক্ষা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংগতি রেখে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করে মানুষের বর্তমান 'বিদ্যমান অবস্থা' বদল করে একটি 'আদর্শ' বা 'প্রত্যাশিত অবস্থা'য় নিয়ে যাওয়া।

যদিও বিজ্ঞান ও ধর্ম পৃথক দু'টো পর্যায়ের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করে, উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি – মানব কল্যান ত্বরান্বিত করা। তবে, যদি কল্যানের ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমুহের যেগুলো বিজ্ঞান ও ধর্ম আলোচনা করে থাকে, সেগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিজ্ঞান ও ধর্ম তাদের মধ্যে বেশী বেশী সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব জাতিকে আরো বেশী কার্যকরভাবে সেবা করতে সক্ষম হবে। প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে মানুষের দক্ষতা বাড়ানোতে বিজ্ঞান সাহায্য করতে পারে। ধর্ম সে রকম মানুষ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে যে বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

জ্ঞান কাজে লাগাবে মানুষের ধ্বংসের জন্য নয়, মঙ্গলের জন্য। ধর্ম বিজ্ঞানকে একটি যথার্থ প্রেক্ষাপট প্রদান করতে পারে, যাতে বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতা বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ভুলে না যায়। 'বিদ্যমান অবস্থা' আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করে "প্রত্যাশিত অবস্থা' বাস্তবায়িত করে, ভবিষ্যত বানী করার সুযোগ করে দিয়ে, উন্নততর প্রযুক্তির যোগান দিয়ে, এবং প্রাপ্য সকল সম্পদের আরো দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ধর্মকে আরো কার্যকরী হতে সাহায্য করতে পারে।

সুতরাং, তাদের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব অপরিহার্য নয়। বিজ্ঞানকে ধর্ম-বিরোধী হওয়ার দরকার নেই, এবং ধর্মেরও বিজ্ঞান-বিরোধী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে, তাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তসমুহ পরস্পরের বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করার প্রবণতা রয়েছে। বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে যদি বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে না চায়, মানব কল্যানে নৈতিকতা ও অলৌকিকতার ভুমিকাকে অবহেলা করে, এবং তার নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্জিত সকল জ্ঞানকে বাতিল করে দেয়, যদিও তার কর্মপদ্ধতির এরুপ জ্ঞান অর্জন, যাছাই করন, কিংবা ভুল প্রমানিত করার ক্ষমতা নেই। বিরোধ হতে পারে যদি ধর্ম এমন অযৌক্তিক ধারনার অবতারনা করে যা বিজ্ঞানের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হয়। যদি বিরোধ সত্যিই দেখা দেয়, সেগুলো সমাধানের সর্বোত্তম পথ হচ্ছে যৌক্তিক আলোচনা। যদি কোন এক পক্ষ অসহিষ্ণু হয়, তার ধারনাসমুহের সমালোচনা বাতিলের চেষ্টা করে, এবং অপরের উপর তার ধারনাসমুহ বলপুর্বক চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে বিরোধ বাড়তে পারে, দৃষ্টিভঙ্গী কঠিন হতে পারে, এবং সহযোগিতার সম্ভবনা কমে যেতে পারে।

যদিও বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ অনাবশ্যক, তবুও বিভিন্ন সমাজে তা দেখা গেছে। অনেক কারনেই এরুপ বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, সকল সমাজে এরুপ বিরোধের কারন অনুসন্ধান করা এ পুস্তকের আওতা বহির্ভুত। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এরুপ দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হয়েছিল। যাহোক, ধর্মকে দুর্বল না করে বিজ্ঞানের উন্নতিকে সাহায্য করার পথে বিরোধ মীমাংসা করার বিষয়টি মাথায় না রেখে সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উতকর্ষতার যুগে ধর্মের প্রতি এক প্রকার বৈরী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞানের জন্য একটি পৃথক জ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল, যেখানে যুক্তিকে সকল সত্য যাছাই করার চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং যুক্তির নিরিখে টিকে না বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এরুপ সকল

www.pathagar.com

অধিবিদ্যাগত বিশ্বাস বাতিল করা হলো এবং মানুষের সকল বিষয়ে বিশ্বাস ও অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করা হলো। অর্থশাস্ত্রও ব্যতিক্রম ছিল না। এটা একই অপ্রয়োজনীয় পথ অনুসরন করলো, এবং, ইতিপুর্বে যেমন দেখা গেছে, যৌক্তিক অর্থনৈতিক মানুষের ধারনা, প্রত্যক্ষবাদ ও মুক্তবাজার ব্যবস্থার জন্ম দিল, যা খৃষ্টীয় বিশ্ববীক্ষার মধ্যে খাপ-খাওয়ানো যায়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বে এরূপ কোন যুক্তিবাদিতার আন্দোলন হয়েছিল কি না, এবং তা অনুরূপ কোন বিরোধের সৃষ্টি করেছিল কি না? যদি হয়ে থাকে তবে তার কারন কি ছিল ও পরিণতি কি হয়েছিল? এমন কি সম্ভবনা কি আছে যে, অনুরূপ বিরোধ পুণরায় উত্থিত হতে পারে যদি এ যাবৎ পর্যন্ত সুপ্ত মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আবার চালু হয়? যদি বিরোধ সত্যিই সৃষ্টি হয় তবে তা জ্ঞান-তত্ত্বকে পাল্টে দিবে কি, যেমনটি পাশ্চাত্যে হয়েছিল এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের প্রাধান্য যখানে এত বেশী? মুসলিম বিশ্বে যদি বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা একই ধর্ম-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে, যেমনটি তা পাশ্চাত্যে করেছিল, তাহলে ইসলামী অর্থশাস্ত্র তার অস্তিত্বের কারন হারিয়ে ফেলবে।

মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদি আন্দোলন

সত্য হচ্ছে যে, মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদি বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের কয়েক শতাব্দি পুর্বে দ্বিতীয় ও অষ্টম শতাব্দিতে। তখনও বিরোধ হয়েছিল, কিন্তু এর বিকল্প ধরন পাশ্চাত্যের বিপরীত ফলাফল এনেছিল। বিরোধটি বিজ্ঞান ও আসমানী বাণীর মধ্যে ছিল না; বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারনে এরূপ বিরোধ সম্ভব ছিল না। বরং বিরোধ ছিল আসমানি বাণী ও দার্শনিক ধ্যান-ধারনার মধ্যে। তবে, সে সময় মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ট সর্ম্পক ছিল, যেমনটি ছিল ইউরোপে ১৭০০ সালের দিকে। বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তখন যখন যুক্তিবাদিরা অলৌকিক ও যুক্তির বাইরের বিষয়সমুহকে কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছিল। শুধু একারনেই বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ দুষিত হয় নি। যেমনটি এ অধ্যায়ে পরবর্তিতে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে, ক্ষতি যা করা হয়েছিল তা ছিল জনগণের আস্থাবিহীন রাজনৈতিক শক্তির বলে জোরপুর্বক অনিচ্ছুক প্রচলিত ধারায় বিশ্বাসীদের উপর যুক্তিবাদিদের নিজস্ব ধারনা চেপে দেওয়া। তৎকালীন যুক্তিবাদিদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসা দু'টো পৃথক পন্ডিতগণের দল। এরা হলো মুতাজিলাইটস ও ফালাসিফাহ।

www.pathagar.com

মুতাজিলাইটসগণ[১] ছিলেন মুলত: ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, দার্শনিক নন। তবে, তাঁরা দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বেশ দক্ষ ছিলেন এবং তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চায় বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রদান করতে চাইতেন, অন্য দিকে গোঁড়া রক্ষণশীল চাইতেন মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভর করে এগুলো গ্রহণ করুক। যুক্তিবাদি পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল, কারন ইসলাম খুব দ্রুত গতিতে সাসানিয় ও বাইজান্টাইন সভ্যতায় বিস্তার লাভ করেছিল যা পূর্বে ইহজাগতিকভাবে বেশী অগ্রসর এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আরো বেশী উৎকর্ষতার প্রভাবাধীন ছিল। এরূপ যৌক্তিক পদ্ধতি গ্রহণ না করলে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব ছিল না, এমনকি অবিশ্বাসীদের বিরুপ প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। যুক্তিবাদিগণ মানব জীবন ও তাদের চারপাশের বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেল। এখানে তাদের লক্ষ্য ছিল এরুপ বলা যে, আল্লাহ খামখেয়ালীভাবে চালান না। তিনি নিয়ম-নীতি অনুসরন করেন এবং কতিপয় নিয়ম মেনে সবকিছু চালান, যা মানুষর পক্ষে জানা সম্ভব। এভাবে তাঁরা ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই বিজ্ঞানের জন্য একটি শক্ত ভিত্ রচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

এরুপ প্রশংসনীয় কাজে সাহায্যের জন্য তারা একটি যুক্তি নির্ভর কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলে যাকে 'ইলম আল কালাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[২] যাঁরা এ

---

[১] 'ইত্তাজালা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রত্যাহার, আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করা, এবং মুতাজিলা শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় সেই আন্দোলনকে যার অনুসারীগণ জনৈক পাপী মুসলমানের বিষয়ে খারিজি ও মুরিজিদের চরম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং মধ্য পন্থা অবলম্বন করে। দেখুন, আবু জারাহ, *তারিখ আল-মাধাহিব আল-ইসলামিয়াহ*, ১ম খন্ড, পৃ: ১৫৬-৭; ভালিউদ্দিন, ১৯৬৩, পৃ: ১৯৯-২০০। ওয়াসিল ইবনে আতা'র (মৃত্যু ১৩১/ ৭৪৮) নেতৃত্বে আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তিতে যারা সামিল হয়েছিল তারা হচ্ছে: আবু আল-হুদেয়ল (মৃত্যু ২২৬/ ৮৪১), জাফর ইবনে আল-বিশর (মৃত্যু ২২৬/ ৮৪১), আল-নাজ্জাম (মৃত্যু ২৩১/ ৮৪৫), আল-জাহিজ (মৃত্যু ২৫৫/ ৮৬৯), আল-জুব্বাই (মৃত্যু ২৯৫/ ৯০৮), ও আবদ আল-জব্বার (মৃত্যু ৪১৫/ ১০২৪)। আন্দোলনটি প্রায় পাঁচ শতক ধরে চললেও এর উৎকৃষ্ট সময় ছিল তৃতীয়/ নবম শতকের শেষ পচিঁশ বছর থেকে পঞ্চম/ একাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ব্যপী। তাদের মতামতের উপর বিস্তারিত ধারনার জন্যে দেখুন, আল-শাহরাস্তানি (মৃত্যু ৫৪৮/ ১১৫৩), ১৯৬১, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৩-৯১; আল-বাগদাদি (মৃত্যু ৪২৯/ ১০৩৭), পৃ: ৭৮-১৫০। আরো দেখুন, ভালিউদ্দিন, ১৯৬৩, পৃ: ২০৪-১৮; গিমারেট, ১৯৯৩, পৃ: ৭৮৩-৯৩; গার্ডেট, ১৯৭১, পৃ: ১১৪১-৫০।

[২] তাঁর রচিত *'ইসা আল-উলুম'*-এ আল-ফারাবি 'ইলম আল-কালাম'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এ ভাবে: এটি হচ্ছে এমন "একটি বিজ্ঞান যা কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও *শারি বা শরিয়ার প্রণয়নকারী আল্লাহ প্রণীত রীতি'র* জয় নিশ্চিত করতে এবং সেগুলোর বিপরিত সকল মতামতকে যুক্তি দ্বারা খন্ডন করতে সক্ষম করে তোলে"। আল-ইজি তাঁর কিতাব *আল-মাওয়াকিফ ফি*

www.pathagar.com

পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন তাদেঁরকে 'মুতাকালিমুন' বলা হতো, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'তার্কিক'। এ পদ্ধতি মুলত: মুসলমানদের, এবং, যেমনটি গার্ডেট বলেছেন, এটি "অবশ্যই মাজদিয়ান বা খৃষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের আরব সংকলন নহে"।[৩] মুলত: মুতাকালিমুন এবং মুতাজিলাইটস-এর মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল এবং এ দু'টো শব্দ মাঝে মাঝে সমার্থকরুপে ব্যবহৃত হতো। তারা মুসলমান জ্ঞান জগতের সকল ধারার পন্ডিতগণকেই আকৃষ্ট করেছিল। তাদের মধ্যে জাফর ইবনে আল-বিশর (মৃত্যু ২২৬/৮৪১) ও আবু মুসা আল-মুর্দার (মৃত্যু ২২৬/৮৪১) তাদের ধর্মীয় অনুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, যদিও অন্যান্যরা ধর্ম-কর্ম পালনে উদাসীন ছিলেন মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে।[৪]

গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত *ফালাসিফাহ* ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন মুলত: বুদ্ধিজীবী।[৫] তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিল, অধিকাংশ দার্শনিকগণ গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জোতির্বিদ্যা, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মত বিষয়ে যথেষ্ট স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তৎকালীন সময়ের মুসলিম পন্ডিতদের গবেষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা যতদুর সম্ভব পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়ে যেতেন। তাঁরা সাধারণত: সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন এবং তাঁরা এ সকল বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি সাধন করেছিলেন। অধিকন্তু, যেহেতু জ্ঞান তখনও বিভিন্ন বিভাগে বিভাজিত হয় নি, তাঁরা ধর্মীয় বিজ্ঞান সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং, ইবনে রুশদের (মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮) মত কেউ কেউ এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞরুপে পরিচিত ছিলেন। তাদেঁর মধ্যে ইবনে আল-রাওয়ান্দি (মৃত্যু ২৫০/৮৬৪) এবং আবু বকর আল-রাজি (মৃত্যু ৩১৩/৯২৫)-দের মত চরমপন্থী যেমন ছিলেন যাঁরা

'*ইলম আল-কালাম*-এ 'ইলম আল-কালাম'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এ ভাবে: এটি হচ্ছে এমন "একটি বিজ্ঞান যা প্রমান দিয়ে ও সন্দেহ দুর করার মাধ্যমে বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে"। (উভয় সংজ্ঞা কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে Gardet-এর অনুবাদ থেকে সংকলিত হয়েছে, ১৯৭১, পৃ: ১১৪১)। আল-গাজ্জালী 'ইলম আল-কালাম'-এর লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে: এর লক্ষ্য হচ্ছে, "ইসলামী বিশ্বাসের প্ররক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের সন্দেহের আক্রমন থেকে তাকে রক্ষা করা" (আল-গাজ্জালী, *আল-মুনকিদ,* পৃ: ১৪)।

[3] Gardet, 1971, p. 1142.

[৪] আবু জারাহ, *তারিখ,* ১ম খন্ড, পৃ: ১৬২-৩; আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত আল-ফালাসিফাহ,* ১৯৯৩, পৃ: ২৬।

[৫] স্বীকৃত প্রথম মুসলিম দার্শনিক হচ্ছেন আল-কিন্দি (মৃত্যু ২৫২/৮৬৬)। তাঁর পর খ্যাতিমান ছিলেন যারা তাঁরা হলেন: আবু বকর আল-রাজি (মৃত্যু ৩১৩/৯২৫), আল-ফারাবি (মৃত্যু ৩৩৯/৯৫০), ইবনে সিনা (মৃত্যু ৪২৮/১০৩৭), ইবনে বাজ্জাহ (মৃত্যু ৫৩৩/১১৩৯), ইবনে তোফায়েল (মৃত্যু ৫৮১/১১৮৫) ও ইবনে রুশদ (মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮)।

www.pathagar.com

মৌলিক ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ধারনা পোষন করতেন, আল-কিন্দি (মৃত্যু ২৫২/৮৬৬), আল-ফারাবি (মৃত্যু ৩৩৯/৯৫০), ইবনে সিনা (মৃত্যু ৪২৮/১০৩৭) এবং ইবনে রুশদ (মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮) –সহ তাদের অধিকাংশই ছিলেন তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থী। তাঁরা যুক্তি ও আসমানি বাণীর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পান নি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা দু'য়ের মধ্যে সাযুজ্য দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং আসমানি বাণী ও নবুওত, পারলৌকিক জীবন, এবং অন্যান্য ইসলামী বিশ্বাস ও চর্চা'র পক্ষে যুক্তি প্রদর্শণ করতেন। তাদেঁর মতবাদের সমর্থনে তাঁরা কুর-আন ও সুন্নাহ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতেন।

ইসলামী বিশ্বাস ও চর্চার বিষয়ে এরুপ মুক্ত ও যৌক্তিক আলোচনা জ্ঞানতত্ত্বের কতিপয় বিষয়ে একটি প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত উঁচু মানের বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল, যাদের কতিপয় নিম্নরুপ:

- আল্লাহ'র স্বরুপ কি? তিনি কি চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, এবং পদ সমেত দেহধারী? তা যদি না হন তবে তিনি কিভাবে দেখেন, শুনেন, ধরেন এবং চলাফেরা করেন, এবং মানুষের পক্ষে কি তাকেঁ দেখা সম্ভব? তাঁর গুণাবলী কি কি? এ সকল গুণাবলী কি তাঁর স্বত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ নাকি পৃথক? যুক্তির মাধ্যমে মানুষ কি তাকেঁ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারবে কিংবা এর জন্যে কি তারা আসমানি বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল? ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তার সবকিছুই কি তিনি জানেন, এমন কি মানুষ কি করতে যাচ্ছে তাও?
- যদি আল্লাহ চিরন্তন হন, তবে তাঁর সৃষ্টিও কি চিরন্তন? যদি না হয়, তবে এমন কোন সময় কি ছিল যখন তিনি স্রষ্টা ছিলেন না? এ রকম কি ধারনা করা যেতে পারে?
- মানুষ কতটা স্বাধীন বা ভাগ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত? যদি তাদের জীবন পুর্ব-নির্ধারিত থাকে, তবে তাদের কৃত কর্মের জন্য জবাবদিহি করা, তাদের পুরুস্কৃত করা বা শাস্তি দেওয়া শুধু কি স্রষ্টার জন্য?
- আস্তিক হওয়ার জন্য শুধু কি বিশ্বাসই যথেষ্ট, নাকি তার জন্য কর্মও আবশ্যক? একজন পাপী মুসলিমকে কি মুমিন না কাফির, নাকি মাঝা-মাঝি কোন কিছু বলা হবে?
- পরকালে কি শুধু আত্মার নাকি দেহেরও পুণরুজ্জীবন হবে? যদি দেহের পুণরুজ্জীবন হয়, তবে দেহের আকার কি তেমনই হবে যেমন তা ছিল পৃথিবীতে, না কি ভিন্ন রকম হবে?

- যদি কুর-আন আল্লাহ'র বাণী হয়ে থাকে, তবে তাকে এ দুনিয়ার মত সৃষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী বিবেচনা করা যেতে পারে, নাকি অন্যান্য স্বর্গীয় গুণাবলীর মত আদিম ও চিরন্তন?
- কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায় তা যুক্তির দ্বারা মানুষের পক্ষে কতখানি জানা সম্ভব এবং এর জন্য আসমানি বাণী কতখানি প্রয়োজনীয়? ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারার জন্মগত গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি না করে নিজ কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করবেন এরূপ একজন ন্যায়পরায়ন স্রষ্টার ধারনা করা যেতে পারে কি না?

এটা স্পষ্ট যে, এসব প্রশ্নের কোনটিরই বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। জবাবগুলো ধারনাপ্রসূত হতে বাধ্য এবং নিখুঁত জবাব প্রদান করা যাবে না। সুতরাং, এক কথায় জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে, এবং যুক্তিবাদি কিংবা রক্ষণশীলদের কোন দলই এক মতের অনুসারী হতে পারে নি।[৬] বিরোধের মূলে ছিল যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে কার্যকরভাবে এ সকল জ্ঞান-তাত্ত্বিক প্রশ্নের কতটুকু জবাব প্রদান করা সম্ভব ছিল। তবে, মনে হচ্ছে যুক্তিবাদি ও রক্ষণশীলদের উভয়ের মধ্যকার মধ্যপন্থীগণ, যারা কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, বিভিন্ন মাত্রায় যুক্তি ও আসমানি বাণী উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিল। সে যা'ই হোক উভয় দলের চরমপন্থীগণই অধিকতর মনযোগ পেতে সক্ষম হলো এবং, তারাই বিতর্কের সুর নির্ধারন করে দিল।

যুক্তির উপর বেশী বেশী গুরুত্বারোপকারী মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণ তাদের দাবী কার্যকরভাবে উত্থাপন করার জণ্য পাঁচটি স্বত:সিদ্ধ দাঁড়া করালো। এ সকল স্বত:সিদ্ধসমুহের দু'টো হচ্ছে তৌহিদ (একত্ববাদ) স্রষ্টার আদল (ন্যায়বিচার), যা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলমানগণ মেনে নিয়েছিল।[৭] এরূপ কোন স্বত:সিদ্ধ ধারনার উপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না, যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপিও, তাদের তাৎপর্যসমুহ অনুমানে করতে গিয়ে মতপার্থক্য দেখা গেছে।

---

[৬] যুক্তিবাদিদের মধ্যে মতভেদের বিষয়ে দেখুন, আল-শাহরাস্তানি, ১৯৬১, ১ম খন্ড, পৃ: ৪০-১১৩ ও ১৯৮-২০৭।

[7] অন্য তিনটি স্বত: সিদ্ধ ছিল এরূপ:

- পুরস্কার ও দন্ড উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে।
- পাপী বিশ্বাসীও নয় অবিশ্বাসীও নয়। তার অবস্থান দু'য়ের মধ্যবর্তি কোন এক স্থানে।সে একজন অপরাধী।
- একজন মুসলমানের দায়িত্ব সত্যকে জানা এবং পাপকে নিষিদ্ধ করা। (দেখুন, আল-শাহরাস্তানি, ১৯৬১, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৩-৬)।

www.pathagar.com

সকল ইসলামী বিশ্বাসের মূলে যা রয়েছে এবং যা আল্লাহর সার্বিক একত্ব ও অন্যান্যতার প্রতীক সেই তৌহিদ সম্পর্কে মুসলমানদের সাধারন ধারনা হচ্ছে মানুষের সীমিত ক্ষমতা ও সীমিত জ্ঞানের কারনে মানুষ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। কুর-আন নিজেই এটা স্পষ্ট করে দেয়, "তাঁর মত আর কিছুই নেই (আল-কুরআন, ৪২: ১১), এবং, "মানুষের চক্ষু তাঁকে পরিমাপ করতে অক্ষম (আল-কুরআন, ৬: ১০৩)।[৮] সুতরাং, কুর-আনের একটি নির্দেশের (আল-কুরআন, ৩: ৭) সাথে মিল রেখে মুসলমানদের সাধারন দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সে সকল আধিবিদ্যাগত বাস্তবতাসমূহ মেনে নেওয়া যেগুলো মানুষের যুক্তি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝা সম্ভব নয় এবং তারা এগুলো সম্পর্কে খুব গভীর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে না। এটা একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা বৈ কিছু হতো না, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি-তর্ক দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমান করা সম্ভব। কিন্তু কুর-আন ও সুন্নাহ-তে প্রকাশিত স্রষ্টার গুণাবলী ছাড়া তাঁর প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝা যাবে না। চরমপন্থী যুক্তিবাদিগণ অবশ্য দাবী করেন যে, যুক্তিবাদ নিজেই মানুষকে স্রষ্টার প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম। এটা করতে গিয়ে তারা স্বর্গীয় গুণাবলী, পুণ: রুত্থান ও পারলৌকিক জীবন, ফেরেশতা, আসমানি বাণী ও নবুওত, বিশ্বের স্থায়িত্ব, কুর-আনের সৃষ্টি, বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এবং পরকালে স্রষ্টাকে দেখার সক্ষমতা ইত্যাদির উপর নিষ্ফল ও বহুধা বিভক্ত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এ সকল চরমপন্থীগণ কঠিন অবস্থান গ্রহণ করে যা স্পষ্টত: ই কুর-আন ও সুন্নাহ'র পরিপন্থী ছিল এবং মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণের পক্ষেও তাদের মতামত গ্রহণ করতে কষ্ট হচ্ছিল।

আদল (ন্যায়বিচার) সম্পর্কে বিতর্ক আরো বাস্তব ও মানুষের অবস্থার সহিত প্রসঙ্গিক যদিও এটাও অনেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছিল তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

- আল্লাহ মানুষের জন্য যে নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেন তা তিনি নিজেও অনুসরন করেন। তিনি ঠিক তাই করেন যা ন্যায়ানুগ ও নৈতিকভাবে যথার্থ। তিনি অন্যায় বা অনৈতিক কোন কিছু করবেন এমনটি ধারনাও করা যায় না।
- সততা ও পাপাচার বিভিন্ন বস্তুর স্বভাবের মধ্যে মজ্জাগতভাবেই বর্তমান থাকে এবং স্রষ্টা খাম-খেয়ালিভাবে তাদেরকে সে রকম হতে বলেন বিধায়

[৮] এমনকি মহানবী (স:) তাঁর প্রার্থনায় এটাকে বারবার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এ বলে যে, "আমি তোমাকে (আল্লাহ তা'লা) পুরোপুরি প্রশংসা করতে অক্ষম; তুমি তোমার নিজের প্রদত্ত বর্ণনার মতই"।

www.pathagar.com

- যদি কুর-আন আল্লাহ'র বাণী হয়ে থাকে, তবে তাকে এ দুনিয়ার মত সৃষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী বিবেচনা করা যেতে পারে, নাকি অন্যান্য স্বর্গীয় গুণাবলীর মত আদিম ও চিরন্তন?
- কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায় তা যুক্তির দ্বারা মানুষের পক্ষে কতখানি জানা সম্ভব এবং এর জন্য আসমানি বাণী কতখানি প্রয়োজনীয়? ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারার জন্মগত গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি না করে নিজ কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করবেন এরূপ একজন ন্যায়পরায়ন স্রষ্টার ধারনা করা যেতে পারে কি না?

এটা স্পষ্ট যে, এসব প্রশ্নের কোনটিরই বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। জবাবগুলো ধারনাপ্রসূত হতে বাধ্য এবং নিখুঁত জবাব প্রদান করা যাবে না। সুতরাং, এক কথায় জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে, এবং যুক্তিবাদি কিংবা রক্ষণশীলদের কোন দলই এক মতের অনুসারী হতে পারে নি।[৬] বিরোধের মুলে ছিল যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে কার্যকরভাবে এ সকল জ্ঞান-তাত্ত্বিক প্রশ্নের কতটুকু জবাব প্রদান করা সম্ভব ছিল। তবে, মনে হচ্ছে যুক্তিবাদি ও রক্ষণশীলদের উভয়ের মধ্যকার মধ্যপন্থীগণ, যারা কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, বিভিন্ন মাত্রায় যুক্তি ও আসমানি বাণী উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিল। সে যা'ই হোক উভয় দলের চরমপন্থীগণই অধিকতর মনযোগ পেতে সক্ষম হলো এবং, তারাই বিতর্কের সুর নির্ধারন করে দিল।

যুক্তির উপর বেশী বেশী গুরুত্বারোপকারী মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণ তাদের দাবী কার্যকরভাবে উত্থাপন করার জণ্য পাঁচটি স্বত: সিদ্ধ দাঁড়া করালো। এ সকল স্বত: সিদ্ধসমুহের দু'টো হচ্ছে তৌহিদ (একত্ববাদ) স্রষ্টার আদল (ন্যায়বিচার), যা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলমানগণ মেনে নিয়েছিল।[৭] এরূপ কোন স্বত: সিদ্ধ ধারনার উপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না, যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপিও, তাদের তাৎপর্যসমূহ অনুমানে করতে গিয়ে মতপার্থক্য দেখা গেছে।

---

[৬] যুক্তিবাদিদের মধ্যে মতভেদের বিষয়ে দেখুন, আল-শাহ্‌রাস্তানি, ১৯৬১, ১ম খন্ড, পৃ: ৪০-১১৩ ও ১৯৮-২০৭।

[৭] অন্য তিনটি স্বত: সিদ্ধ ছিল এরূপ:

- পুরস্কার ও দন্ড উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে।
- পাপী বিশ্বাসীও নয় অবিশ্বাসীও নয়। তার অবস্থান দু'য়ের মধ্যবর্তি কোন এক স্থানে।সে একজন অপরাধী।
- একজন মুসলমানের দায়িত্ব সত্যকে জানা এবং পাপকে নিষিদ্ধ করা। (দেখুন, আল-শাহ্‌রাস্তানি, ১৯৬১, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৩-৬)।

www.pathagar.com

সকল ইসলামী বিশ্বাসের মুলে যা রয়েছে এবং যা আল্লাহ্‌র সার্বিক একত্ব ও অনন্যতার প্রতীক সেই তৌহিদ সম্পর্কে মুসলমানদের সাধারন ধারনা হচ্ছে মানুষের সীমিত ক্ষমতা ও সীমিত জ্ঞানের কারনে মানুষ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। কুর-আন নিজেই এটা স্পষ্ট করে দেয়, "তাঁর মত আর কিছুই নেই (আল-কুরআন, ৪২:১১), এবং, "মানুষের চক্ষু তাঁকে পরিমাপ করতে অক্ষম (আল-কুরআন, ৬:১০৩)।[৮] সুতরাং, কুর-আনের একটি নির্দেশের (আল-কুরআন, ৩:৭) সাথে মিল রেখে মুসলমানদের সাধারন দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সে সকল আধিবিদ্যাগত বাস্তবতাসমুহ মেনে নেওয়া যেগুলো মানুষের যুক্তি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝা সম্ভব নয় এবং তারা এগুলো সম্পর্কে খুব গভীর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে না। এটা একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা বৈ কিছু হতো না, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি-তর্ক দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমান করা সম্ভব। কিন্তু কুর-আন ও সুন্নাহ্-তে প্রকাশিত স্রষ্টার গুণাবলী ছাড়া তাঁর প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝা যাবে না। চরমপন্থী যুক্তিবাদিগণ অবশ্য দাবী করেন যে, যুক্তিবাদ নিজেই মানুষকে স্রষ্টার প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম। এটা করতে গিয়ে তারা স্বর্গীয় গুণাবলী, পুণ:রুত্থান ও পারলৌকিক জীবন, ফেরেশতা, আসমানি বাণী ও নবুওত, বিশ্বের স্থায়িত্ব, কুর-আনের সৃষ্টি, বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এবং পরকালে স্রষ্টাকে দেখার সক্ষমতা ইত্যাদির উপর নিষ্ফল ও বহুধা বিভক্ত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এ সকল চরমপন্থীগণ কঠিন অবস্থান গ্রহণ করে যা স্পষ্টত:ই কুর-আন ও সুন্নাহ্'র পরিপন্থী ছিল এবং মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণের পক্ষেও তাদের মতামত গ্রহণ করতে কষ্ট হচ্ছিল।

আদল (ন্যায়বিচার) সম্পর্কে বিতর্ক আরো বাস্তব ও মানুষের অবস্থার সহিত প্রসঙ্গিক যদিও এটাও অনেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছিল তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

- আল্লাহ মানুষের জন্য যে নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেন তা তিনি নিজেও অনুসরন করেন। তিনি ঠিক তাই করেন যা ন্যায়ানুগ ও নৈতিকভাবে যথার্থ। তিনি অন্যায় বা অনৈতিক কোন কিছু করবেন এমনটি ধারনাও করা যায় না।
- সততা ও পাপাচার বিভিন্ন বস্তুর স্বভাবের মধ্যে মজ্জাগতভাবেই বর্তমান থাকে এবং স্রষ্টা খাম-খেয়ালিভাবে তাদেরকে সে রকম হতে বলেন বিধায়

---

[৮] এমনকি মহানবী (স:) তাঁর প্রার্থনায় এটাকে বারবার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এ বলে যে, "আমি তোমাকে (আল্লাহ তা'লা) পুরোপুরি প্রশংসা করতে অক্ষম; তুমি তোমার নিজের প্রদত্ত বর্ণনার মতই"।

www.pathagar.com

তা অপিরহার্য নয়। সুতরাং, যুক্তি দিয়ে মানুষের পক্ষে ভাল-মন্দ বুঝে নেওয়া সম্ভব, যদিও পাথেয়রূপে ও সিদ্ধান্ত যাছাই করার জন্য তাদের আসমানি বাণীর সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

- যেহেতু স্রষ্টা ন্যায়পরায়ন, সেহেতু, পুর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের ধারনা সম্পূর্ণ অমুলক। মানুষ নিজেই তার নিজের ভাল-মন্দ কাজের জন্য দায়ী, সুতরাং, তাদেরকে পুরস্কৃত করা কিংবা শাস্তি প্রদান করা স্রষ্টার ন্যায়বিচারের প্রতিফলন।

একজন আধুনিক চিন্তাবিদের নিকট এ সকল ধারনাসমুহের প্রচুর আবেদন থাকতে পারে। এ ধরনের আবেদন তৎকালীন সময়েও ছিল, এবং মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিদের প্রাথমিক লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও ধারনা ইসলামের বিদ্যমান ধারার বিশ্বাসীদের মধ্যে কোন টানা-পোড়েন সৃষ্টি করতো না, যারা কিনা ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম-চর্চার ক্ষেত্রে কোন যুক্তির ব্যাখ্যা গ্রহণ করতো না। মতভেদ, যা সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে ছিল, তা কুর-আন ও সুন্নাহ'র আলোকে এবং যুক্তি-তর্কের দ্বারা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কেন ঘটলো না?

যুক্তিবাদিদের পতনের কারন

রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদি উভয় পক্ষের চরমপন্থীরা প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং গোটা বিতর্কের কাঠামো বদলে দিয়েছিল, যার ফলে একটি মারমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রক্ষণশীলদের মধ্যে হাম্বিয়াসের মত চরমপন্থীরা দাবী করলো যে, বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি হলো কুর-আন ও সুন্নাহ এবং সেখানে যুক্তির কোনই স্থান নেই। এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়ে ইবনে আল-রাওয়ান্দি ও আবু বকর আল-রাজিদের[৯] মত চরম যুক্তিবাদিরা দাবী করলো যে, যুক্তি ও আসমানি বানী পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং ন্যায়-অন্যায়সহ সকল কিছু শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারাই বিচার করা উচিত। তারা দর্শন ও ধর্মের মিলনের সকল প্রচেষ্টাকে গুরুত্বহীন করে ফেলে। তারা আসমানি বাণীর উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে একটি ধর্মতত্ত্ব তৈরীর উপর জোর দেয়, অগ্রসর হলো এমন একটি দিকে যা পরবর্তিতে পাশ্চাত্যে 'প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব' নামে পরিচিত হলো।[১০] যেমনটি হয়েছিল পরবর্তিতে জ্ঞান-

---

[৯] চরম যুক্তিবাদি ও তাদের মতামতের বিষয়ে বিস্তারিতের জন্যে দেখুন, Badawi, 1980; এবং Badawi, 1963, pp. 439-40.

[১০] দেখুন, John Hicks, 1967, p. 190। আরো দেখুন, Julian Huxley, 1957; Ronald Hepburn, 1958 ।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার আন্দোলনের সময়, তেমনি এরা যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না এমন সকল আধিবিদ্যাগত সত্যকে প্রত্যাখান করতে শুরু করলো। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হলে আসমানি বাণীকে পেছনে ঠেলে দিতে হয় এবং মুতাজিলাইটস-দের মুল লক্ষ্য অনুযায়ী যুক্তিকে বিশ্বাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ও সমর্থনের হাতিয়ার মনে না করে এটাকে বিশ্বাসের এক মাত্র নির্নায়ক হিসেবে মেনে নিতে হয়।

এর অর্থ কি এই যে, মানব সমাজে চরমপন্থী মতামতের কোন সুযোগ নেই? অবশ্যই নয়। কখনও কখনও চরমপন্থী মতামত মানব উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে। তবে, অন্তত: ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়সমুহের ক্ষেত্রে চরম দৃষ্টিভঙ্গী এড়িয়ে গেলে কতিপয় ক্ষেত্রে সামাজিক শান্তি রক্ষা হয়। তবুও, আশা করা হয় যে, সামনে উপস্থাপন করা হলে মানুষ এ সকল মতামত শান্তভাবে ধৈর্যের সহিত শুনবেন। যদি চরম দৃষ্টিভঙ্গী তাদের যথার্থতা প্রমান করতে না পারে এবং মতামতের বিষয়ে সাধারণ সমর্থন আদায় করতে না পরে, তাহলে চরম দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তা হলে কেন এ সকল চরম দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম বিশ্বে সমস্যার সৃষ্টি করলো? তাহলে কি মুসলিম বিশ্বে ধৈর্যের অভাব ছিল?

প্রাচীন মুসলমান সমাজে, যেখানে সাধারণত: স্থিরতা বিদ্যমান থাকতো, এরুপ ধৈর্যের অভাবের তেমন কোন প্রমান নেই এবং রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদিদের মধ্যকার বিরোধ তুলনামুলকভাবে মুক্তভাবে ও ঝামেলাবিহীনভাবে অগ্রসর হতো। এমনকি ইবনে আল-রাওয়ান্দির মত ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীর বক্তব্যও ধৈর্যসহকারে শোনা হয়েছিল এবং তার যুক্তিসমুহ কয়েক প্রজন্মের খ্যতিমান ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ যুক্তির মাধ্যমেই খন্ডন করেছেন।[১১] যুগের ধারা বিবেচনায় বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক সম্ভবত: মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হতো, বিশেষত: এ কারনে যে যুক্তিবাদি ও রক্ষনশীলদের মধ্যকার মধ্যপন্থীগণের মতভেদ মীমাংসার অযোগ্য ছিল না, যারা ছিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলে কি কারনে মুসলিম সমাজে দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে একই সমাজে বিভিন্ন ফিকহ্ সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি সহনশীল ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ থাকা সত্বেও তারা শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করতো।

এর জবাব সম্ভবত: রয়েছে জনগণের আস্থাবিহীন অবৈধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শক্তি প্রয়োগের মধ্যে। মানব সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে যদি

---

[১১] Kraus, 1971, p. 905.

www.pathagar.com

একটি গোষ্ঠী তার মতামত বলপুর্বক অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়, তাহলে নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে রুঢ়তার প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষ করে যদি শেষোক্ত শ্রেনী সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। মুতাজিলাইটসগণ আব্বাসীয় বংশের (১৩২/৭৫০-৬৫৬/১২৫৮) অধিকাংশ সময় ধরে প্রাপ্ত সরকারী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থনকে কাজে লাগিয়েছিল, এবং অন্য সকলের উপর তাদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী বলপুর্বক চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তারা বিশেষ করে মামুন আল-রশীদ (মৃত্যু ২১৮/৮৩৩), আল-মুতাসিম (মৃত্যু ২২৭/৮৪১), এবং আল-ওয়াথিক (মৃত্যু ২৩২/৮৪৬)-গণকে ব্যবহার করেছিল। ইসলামের দীক্ষা পরিস্কারভাবে লংঘন করে তারা আক্রমনাত্মক ও অস্থির হয়ে গেল এবং মুসলিম বিশ্বে 'মিনাহ' অন্য কথায় মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য ধর্মীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের (inquisition) প্রথা চালু করলো। তারা ঘুরে ঘুরে মানুষকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করলো এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে শাস্তি প্রদান করার হুমকী দিল: "কোন ফাকিহ, মুহাদ্দিত, মুয়াজ্জীন বা মুয়াল্লিম"-কে এরুপ পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি।[১২] মত প্রকাশের অধিকার, এ ঘটনার আগে যা ছিল ইসলামী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট, প্রায় হারিয়েই গেল।[১৩] অধিকন্তু, তাদের অগ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তারা তাদের প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার চালালো ও তাদের হাজতে রাখলো: "মিনাহ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের ভীড়ে কারাগারগুলো পরিপুর্ণ হয়ে গেল"।[১৪] মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (মৃত্যু ২১৮/৮৩৩), নাইম ইবনে হাম্মাদ (মৃত্যু ২২৮/৮৪২), ইউসুফ আল-বাইয়াতি (মৃত্যু ২৩১/৮৪৫), এবং আহম্মদ আল খুজাই (মৃত্যু ২৩১/৮৪৫)-দের মত কারাবন্দীগণ নির্যাতনের কারনে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৫] আহমদ আল খুজাইয়ের মাথা "সম্ভাব্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি ভয়ংকর হুশিয়ারী হিসেবে জনগণের দেখার জন্য বাগদাদে জনসমক্ষে রাখা হয়েছিল, এবং তার দেহও প্রদর্শণীতে রাখা হয়েছিল সামারা'য়"।[১৬] এমনকি আহমদ ইবনে হানবাল (মৃত্যু ২৪১/৮৫৫)-এর মত বিখ্যাত আইনশাস্ত্রবিদগণকেও ছাড়া হয়নি, যাঁরা ধর্মানুরাগ ও পান্ডিত্যের জন্য সাধারণের জনগণের চোখে শ্রদ্ধার উঁচু আসনে ছিলেন। আল-মুতাসিমের হুকুমে তাঁকে প্রচন্ডভাবে পিটিয়ে অজ্ঞান করা

---

[১১] আল-কিন্দির বই, *The Governors and Judges of Egypt,* (ed. R. Guest, London-Leiden, 1912) থেকে Hinds কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৯৩, পৃ: ৪।
[১২] আবু জারাহ, *তারিখ* ..., ১ম খন্ড, পৃ: ১৭৮।
[১৩] আল-কিন্দি, প্রাগুক্ত, থেকে Hinds কর্তৃক উদ্বৃত, 1993, পৃ: ৪।
[১৪] আবু জারাহ, *তারিখ* ..., ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৩।
[১৫] Hinds, 1993, p. 4. আল-তাবারি ও আল-ইয়াকুবি-দের বরাতে উদ্বৃত।

www.pathagar.com

হয়েছিল।[১৭] এতসব হয়েছিল কারন তিনি মুতাজিলাইট-দের মতামত মানতে রাজী ছিলেন না, যারা মনে করতো যে, কুর-আন রচিত হয়েছিল। এমনকি তারা ফুস্টাট-এর মসজিদে দেওয়াল-লিখন লিখেছিল যে, "দেবতা বলতে কিছু নেই, আছে আল্লাহ, রচিত কুর-আনের প্রভু," [১৮] এভাবে 'রচিত কুর-আন'-এর ধারনাকে ইসলামী বিশ্বাসের এক অবিসংবাদিত অংশ রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে 'উলেমাগণ' এমন একটি বিষয় নিয়ে এমন অপরাধমূলক কাজ কেন করলেন যা আজকাল অনেকের নিকটই কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নহে? বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের ফলে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে শত্রুতার আবহ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে উলেমাদের মনে সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধেছে, এবং, সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, তারা মনে করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের সংজ্ঞা প্রদান করতে রাষ্ট্রও তার অভিমত প্রকাশ করার প্রয়াস পাচ্ছে।[১৯] 'রচিত কুর-আন'র ধারনা তাদের মনে আশংকার সৃষ্টি করেছিল যে, এর তাৎপর্য হচ্ছে কুরআন চিরন্তনভাবে সত্য নয় এবং অবৈধ ও দুর্নীতিবাজ শাসকদের হাতে তার রদবদল বা বাতিল হওয়া সম্ভব। তারা এটা সহ্য করতে পারে নি এবং হাজতবাস কিংবা নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের ভয়ে টলে না গিয়ে তারা তাদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখলো।

ধর্মীয় তদন্তপ্রথা (মিনাহ্) এবং তার ফলে সরকারের বিরুদ্ধে উলেমাদের মনে সৃষ্ট তিক্ততা দেশের, বিশেষ করে বাগদাদের, জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে অস্থিরতা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এর ফলে এমনকি তৎকালীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পক্ষেও দেরীতে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর হলেও বুঝা সম্ভব হলো যে, ধর্মীয় তদন্তপ্রথা (মিনাহ্) জনপ্রিয় এবং কার্যকরী নয়। সুতরাং, ২৩৪/৮৪৯ সালে আল-মুতাওয়াক্কিল (মৃত্যু ২৪৭/৮৬১) এ প্রথার অবসান ঘটান। এ প্রথার কঠিন বাস্তবায়নের জন্য সম্ভবত: যিনি মূলত: দায়ী ছিলেন সেই প্রধান কাজী আহমদ ইবনে আবি দু'য়াদকে অপমান করা হলো, তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হলেন এবং ২৪০/৮৫৪ সনে নীরবে মারা গেলেন।

---

[১৭] দেখুন, আল-মাসুদি (মৃত্যু ৩৪৬/৯৫৭), *মুরুজ আল-দাহাব*, ১৯৮৮, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৫২; আবু জারাহ, *তারিখ ...*, *২য় খন্ড*, পৃ: ২৯৭-৩০২। আরো দেখুন, W M Patton, *Ahmad ibn Hanbal and the Mihnah*, Leiden, 1897, cited by Arberry, 1957, p. 19; Hinds, 1993, p. 3.

[১৮] আল-কিন্দি, প্রাগুক্ত, থেকে Hinds কর্তৃক উদ্বৃত, 1993, পৃ: ৪।

[১৯] দেখুন, Hinds, 1993, p. 6.

www.pathagar.com

মিনাহ'র অবসান হলেও এটা মুসলিম সমাজে দু'টো অনপনেয় দাগ রেখে গিয়েছে। এর একটি ভাল অন্যটি খারাপ। ভালটি ইসলামের যে কোন সংজ্ঞা প্রদানে রাষ্ট্রের কোনরূপ ভূমিকা পালন থেকে তাকে দূরে রাখা নিশ্চিত করলো। কুর-আন ও সুন্নাহ'র আলোকে জনগণের বিবেক (ইজমা) কর্তৃক ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। খারাপ প্রভাব উলেমাদের অধিকাংশকে দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে দূরে ঠেলে দিল। এর ফলে তারা আরো রক্ষণশীলতার দিকে ধাবিত হলো, যা এ অধ্যায়ের এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে।

আল-গাজ্জালী ও ইবনে রুশদ

বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও যুক্তিবাদি ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিষয়টির উপর যুক্তিসঙ্গত বিতর্ক চলতেই থাকলো। ফলশ্রুতিতে, চরম যুক্তিবাদিরা ধীরে ধীরে যুক্তিবাদিদের নিকট হেরে যেতে লাগলো। তাদের সন্দেহজনক মতবাদগুলো যুক্তির এক নতুন মতবাদের আক্রমনের সম্মুখে টিকলো না, যে মতবাদটি আশারীয় মতবাদ নামে পরিচিত। এটি ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের একটি যুক্তিসংগত ও বিশ্বাসযোগ্য সমর্থনমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করলো। এ মতবাদের নেতারা ছিলেন ইরাকের আবু আল-হাসান আল-আশারি (মৃত্যু ৩৩২/৯৪৩), এবং মধ্য এশিয়ার আবু মুনসুর আল-মাতুরিদি (মৃত্যু ৩৩৩/৯৪৫), যাদের আল-বাকিল্লানী (মৃত্যু ৪০৩/১০১২), আল-জুয়ানী (মৃত্যু ৪৭৮/১০৮৫), এবং আল-কুশারি (মৃত্যু ৪৬৫/১০৭২)-দের মত অনেক শক্ত-সামর্থ সমর্থক ছিল। প্রত্যেকেই ধর্ম, ইলম আল-কালাম ও দর্শন শাস্ত্রে ভালভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে, তারা সকলে সাধারণভাবে রক্ষণশীল ছিলেন, যদিও মাত্রায় হেরফের ছিল, আল-মাতুরিদি আল-আশারির চেয়ে অনেক কম রক্ষণশীল ছিলেন।[২০]

আল-গাজ্জালীই (মৃত্যু ৫০৫/১১১১) চরম যুক্তিবাদিদের উপর চমৎকার ও মারাত্মক আঘাত হানলেন। ৪৮৮/১০৯৫ সনে সমাপ্ত তার পুস্তক 'তাহাফুত আল ফালাসিফাহ্'[২১] (দর্শনের অসামঞ্জস্যতা)-তে তিনি যৌক্তিকভাবে "তাদের

---

[২০] আবু জারাহ, *তারিখ ...,* ১ম খন্ড, পৃ: ২১২।

[২১] আবু হামিদ আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত,* ১৯৯৩। *তাহাফুত* শব্দটি ইংরেজীতে *পতন, ভেঙ্গে যাওয়া, অসম্ভব, দেউলিয়াত্ব, অসামঞ্জস্যতা ও এলোমেলো* এরূপ বিভিন্ন ভাবে অনূদিত হয়েছে। *এলোমেলো* শব্দটিই সম্ভবত: অর্থের কাছাকাছি ভাব প্রকাশ করছে (Van Den Bergh, ১৯৬৯, পৃ: xiii; আরো দেখুন, Watt, 1963, p. 59)।এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আল-গাজ্জালীর অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে রয়েছে *আল-মুনকিদ মিন আল-দালাল* ও *ইহিয়া উলুম আল-দীন*।

www.pathagar.com

অধিবিধ্যাগত বিশ্বাসগুলোর অসামঞ্জস্যতা এবং তাদের তত্ত্বসমূহের স্ববিরোধিতাগুলো" স্পষ্ট করে দেন।[২২] তিনি সফল হয়েছিলেন। কারন তিনি "দর্শনের পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে এবং তার সাহসী মনের শক্তি ও স্বচ্ছতা নিয়ে তিনি দর্শনকে আক্রমন করেছিলেন"।[২৩] তবে, তিনি যুক্তিবাদিদের সবকিছু বাতিল করে দেওয়াতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে: "যদি তারা (দার্শনিকগণ) যা বলে তা যদি সাক্ষ্য-প্রমানে অর্থপূর্ণ মনে হয়, এবং কুর-আন ও সুন্নাহ'র সহিত বিরোধপূর্ন না হয়, তাহলে সেগুলো বাতিল করে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। যদি আমরা কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর উদঘাটিত সকল সত্য বাতিল করা শুরু করি, তবে আমরা অনেক সত্য বাতিল করতে বাধ্য হবো"।[২৪] কোন কিছু প্রয়োজনীয় মনে হলেই তিনি তা তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করতেন এবং দর্শন, ইলম আল-কালাম ও ইসলামি বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করতেন, এবং এভাবে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় তার সময়ে বিদ্যমান অনেক বিতর্কের যৌক্তিক সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্নালদেজ-এর ভাষায় বলা যায়, তিনি রচনা করেছিলেন "সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে প্রশস্ত ও সবচেয়ে উম্মুক্ত পদ্ধতি"।[২৫]

যুক্তিবাদিদের যে ২০টি তত্ত্ব আল-গাজ্জালীর নিকট আপত্তিকর মনে হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৩টি তত্ত্ব তাঁর বিবেচনায় ধর্মবিরোধী ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এগুলো ছিল বিশ্বের অবিনশ্বরতা, দৈহিক পুণ:রুত্থানের অসাধ্যতা, এবং প্রকৃত বস্তুসমূহ সম্পর্কে স্রষ্টার অজ্ঞতা।[২৬] তিনি যুক্তি দেখালেন যে, এ সকল তত্ত্ব, যেগুলোর জন্য দার্শনিকগণ গণিত ও যুক্তিবিদ্যার মত একই মাত্রার নিশ্চয়তা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা দাবী করেছেন, মূলত: অপ্রমানিত অনুমান ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার অযোগ্য কল্পনার উপর নির্ভরশীল।[২৭] অন্যান্য তত্ত্বসমূহ শরিয়ার সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়ায় এবং সেগুলোর পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকায় আল-গাজ্জালীর সেগুলো মেনে নিতে কোন সংকোচ বোধ করেন নি। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মত অনেকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা তিনি

[২২] আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত,* ১৯৯৩, পৃ: ২৮।
[২৩] Hourani, 1961, p. 5.
[২৪] আল-গাজ্জালী, *আল-মুনকিদ,* পৃ: ৩১।
[২৫] Arnaldez, 1971, p. 774.
[২৬] 'কুর'আন-এর রচনা' এ ২০টি তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, কারন এ ধারনাটি আল-গাজ্জালীর (৫০৫/ ১১১১) বহু পুর্বে ২৩৪/ ৮৪৯ সনে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কি'র শাসনামলে স্থগিত করা হয়েছিল।
[২৭] আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত,* ১৯৯৩, পৃ: ৩১।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন, কারন এরুপ ব্যাখ্যা বাতিল করা হলে তা ধর্মের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।[২৮] পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জোতির্বিদ্যা, গণিত এবং অন্যান্য ভৌত বিজ্ঞানের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষন না করেই তিনি সমর্থন করেন। আল-গাজ্জালী অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত বলেছিলেন যে, "যিনি মনে করেন যে, এ সকল বিজ্ঞানকে বাতিল করে দিলে ইসলামের উপকার হবে, তিনি ধর্মের (দ্বীন) বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করেছেন"।[২৯] তিনি মানবীয় বিষয়ে যুক্তির ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি জোর দিয়েছিলেন "বুদ্ধি হচ্ছে জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস, গুরু এবং ভিত্তি। বুদ্ধি থেকে আসে জ্ঞান যেমন গাছ থেকে আসে ফল, সূর্য থেকে আলো এবং চক্ষু থেকে আসে দৃষ্টিশক্তি"।[৩০] তবে, তিনি অধিবিদ্যাগত সত্য ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করার কাজে শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মানবজীবনে যুক্তি ও আসমানি বাণী উভয়ে অবশ্যই পরস্পরের পরিপূরক ভুমিকা পালন করবে।

ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের উপর আল-গাজ্জালীর যুক্তি সংগত সমর্থনকে আরো শক্তি যুগিয়েছিল তার বাকপটুতা, শরিয়ার উপর গভীর জ্ঞান, তার গভীর ধর্মানুরাগ এবং উঁচু মানের নৈতিক যোগ্যতা। এটা তার জন্য অনেক সম্মান এবং সুনাম নিয়ে এসেছে। মুসলিম বিশ্বে তিনি যথেষ্ট প্রভাব রেখে গেছেন, এবং এমনকি এখনও তাঁর রচনা অনেকে পড়েন ও উদ্ধৃত করে থাকেন। তার কারনেই মুতাজিলাইটস কর্তৃক প্রণীত এবং দর্শনের শব্দ-ভান্ডার ও প্রচুরযুক্তিসমৃদ্ধ ইলম আল-কালাম একটি ধর্মীয় বিজ্ঞানরুপে সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং ধর্মীয় পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

তবে, আল-গাজ্জালী যেমন ভিন্ন-মতাবলম্বী ও চরম যুক্তিবাদিদের আক্রমনের মুখে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে ইসলামের অনেক উপকার করেছেন, তেমনি আবার আকস্মিকভাবে চিন্তাধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসলেন যখন তিনি গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, সকল বস্তুর অস্তিত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ'র জন্য, যার ফলে তাৎণিক বা প্রত্যক্ষ কারনের ভুমিকাকে গুরুত্বহীন করে ফেলেন। তিনি বলেন, "সাধারণভাবে যাকে কারন ও যাকে কার্য (ফল) বলা হয় তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক অপ্রয়োজনীয়"।[৩১] এটা প্রমান করার জন্য

[২৮] প্রাগুক্ত, ৩৩।
[২৯] আল-গাজ্জালী, *আল-মুনকিদ*, পৃ: ২৫।
[৩০] আল-গাজ্জালী, *ইহিয়া*, ১ম খন্ড, পৃ: ৮৩।
[৩১] আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত*, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৯।

www.pathagar.com

তিনি যুক্তি দেখান যে, তৃষ্ণা ও পান করার মধ্যকার সম্পর্ক, ক্ষুধা-নিবারণ ও খাওয়া, দহন ও আগুনের সহিত সংযোগ, এবং রোগ সারানো ও ঔষধের প্রয়োগ পুর্বেই স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।[৩২] এটা তার জন্য কিছুটা বেমানান ছিল যে, তিনি প্রত্যক্ষ কারনের ভুমিকাকে অস্বীকার করবেন, অন্য দিকে গুরুত্ব দিবেন ভৌত বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে, যার অন্যতম মুল স্তম্ভ হচ্ছে কার্য-কারন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। যদিও মনে হয় না যে, তিনি এ বিষয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয় না, তিনি শেষ করেছিলেন চরম রক্ষণশীল শক্তিকে শক্তিশালীকরণের মধ্য দিয়ে, যে শক্তি মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সামর্থ্যকে দুর্বল করার জন্য দায়ী ছিল। সুতরাং, কৌতুহল হতে পারে তার মাপের এক জন পন্ডিত কার্য-কারন সম্পর্ককে অস্বীকার করে আশারীয়দের পদাংক অনুসরন করবেন কী কারনে। এটা সম্ভবত: হতে পারে চরম যুক্তিবাদিগণ কর্তৃক মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়সমুহ অস্বীকার করার কারনে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের পরিবেশের ফলে অপ্রত্যাসিত ফলাফল। তিনি হয়ত: আশংকা করছিলেন যে, মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ কারনের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা মেনে নিলে তা পরোক্ষভাবে মানব জীবনে স্রষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারেন এবং তিনি (স্রষ্টা) হয়ে যেতে পারেন একজন ঘড়ি বানানোর দেবতা। যদিও এ রকম ভয় এখন অমুলক মনে হতে পারে, তথাপিও আল-গাজ্জালী যে বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ মোকাবেলা করছিলেন সেখানে তা বাস্তব হতে পারতো।

আল-গাজ্জালী কর্তৃক প্রদত্ত মারাত্মক আঘাতের প্রায় ৮৫ বছর পর ইবনে রুশদ যুক্তিবাদি আন্দোলনকে পতন থেকে রক্ষা করতে সর্বশেষ একটি বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি একটি জবাব প্রস্তুত করেন যা ৫৭৬/১১৮০ সনে সমাপ্ত হয় এবং 'তাহাফুত আল-তাহাফুত' (অসামঞ্জস্যের অসামঞ্জস্যতা) শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৩৩] আল-গাজ্জালী ও ইবনে রুশদ-দের দুটো তাহাফুত দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দি থেকে সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দিতে মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান যুক্তিবাদ ও আসমানি বাণী সংক্রান্ত ধারনাসমুহের মধ্যকার বিরোধের মুল বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, একই বিরোধ যা পাশ্চাত্যে জেগে উঠেছিল পাঁচ শতাব্দি পরে।

---

[৩২] প্রাগুক্ত।

[৩৩] Simon Van Den Bergh-এর একটি ইংরেজী অনুবাদ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ইবনে রুশদ- এর বই *কিতাব ফাসল আল- মাকাল* ও *কিতাব আল- কাশফ আন মানাহিজ আল- আদিল্লা*-এর নির্বাচিত অংশের অনুবাদের জন্য আরো দেখুন, Hourani, 1961।

www.pathagar.com

আল-গাজ্জালী কর্তৃক দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আনীত অনেক অভিযোগই ইবনে রুশদ-এর মত মধ্যপন্থীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের যার চিন্তাধারা প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের সহিত সংগতিপূর্ণ ছিল। অনেকগুলো বিষয়ে চরম যুক্তিবাদিদের দুর্বলতা ইবনে রুশদ বুঝতে পেরেছিলেন, এবং, ধর্মে আসমানি বাণী ও যুক্তিবাদ উভয়ের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে তিনি একটি মীমাংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, “প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে আসমানি বাণী, কিন্তু, যুক্তি তার সাথে মিশে যায়। যিনি মনে করেন যে, শুধুমাত্র যুক্তির উপর ভর করে কোন একটি ধর্ম সৃষ্টি হতে পারে, তিনি স্বীকার করেন যে, সেই ধর্মটি অবশ্যই সে সকল ধর্মের তুলনায় অসম্পূর্ণ হবে যে সকল ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে আসমানি বাণী ও যুক্তি উভয়ই”।[৩৪] তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে, “ধর্মের ন্যায়ানুগ পথে চলা অপরিহার্য,”[৩৫] এবং “প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বেছে নেওয়া”।[৩৬] ধর্মের আবশ্যকতা স্বীকার করে তিনি আধুনিক দার্শনিকদের সমর্থনে বলেন যে, “দার্শনিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা ধর্মের নীতিসমুহের আলোচনা বা খন্ডন করা সমর্থন করে না”।[৩৭] তিনি এমনও বলেছিলেন যে, “যারা এ সকল (ধর্মীয়) বিষয়ে সন্দেহ পোষন করেন এবং এগুলো খন্ডন করতে বাকপটু, তারা ধর্মকে ধ্বংস করতে এবং সদগুণাবলী বাতিল করে দিতে চায়। নি:সন্দেহে তারা ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের লক্ষ্য ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা বৈ আর কিছু নয় . . . আল-গাজ্জালী তাদের বিরুদ্ধে ঠিকই বলেছিলেন”।[৩৮] তার ‘ফাসল আল মাকাল’ শীর্ষক পুস্তকে তিনি যুক্তিবাদ ও শরিয়াহ’র পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার একটি শক্তিশালী প্রসঙ্গের অবতারনা করেছিলেন।

তবে, ইবনে রুশদ প্রত্যক্ষ কারন সম্পর্কিত আল-গাজ্জালীর ভুলসমুহ সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি খুব জোরে-শোরে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, যদিও সকল বস্তু সৃষ্টির জন্য চূড়ান্ত বিচারে স্রষ্টাই দায়ী, তিনি নিজেই সকল বস্তুর জন্য একটি দ্বিতীয় কারন তৈরী করেছেন। তিনি যেমন না খেলেও পরিতৃপ্তি

---

[৩৪] ইবনে রুশদ, *তাহাফুত আল-তাহাফুত*, ১৯৯২, পৃ: ৫৮৪

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২৭।

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮৩।

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২৭।

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮৫-৬; পাঠক উপকৃত হতে পারেন যদি পৃ: ৫৮০-৬-এর গোটা ৪র্থ আলোচনাটি পাঠ করেন। এটা বোঝায় যে, ইবনে রুশদ-এর মতামত প্রচলিত মতামতের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং দার্শনিকদের প্রতি তার সমর্থন (অবিশ্বাসীদের উপর নয়) ভিত্তিহীন ছিল না।

www.pathagar.com

আনতে পারেন, পান না করলেও তৃষ্ণা মেটাতে পারেন, এবং আগুনের সাথে সংযোগ না হলেও পোড়াতে পারেন, কিন্তু তিনি সাধারণত: তা করেন না। যখন তিনি এরূপ কিছু করেন, তখন তা হয় একটি অলৌকিক ঘটনা, যা "স্বর্গীয় কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বাইরে"।[৩৯] এ কারনেই "পূর্বের কোন দার্শনিকগণই অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করেন নি, যদিও বিশ্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল"।[৪০] সুতরাং, "ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা সম্ভব এরূপ বস্তুসমূহের মধ্যে লক্ষণীয় প্রত্যক্ষ কারনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কূটতর্ক"।[৪১] ইবনে রুশদ-এর মতে কার্য ও কারনের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জ্ঞান অগ্রসর হয়ে থাকে: "কারন অস্বীকার করার অর্থ হলো জ্ঞানকে অস্বীকার করা, এবং জ্ঞানকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এ বিশ্বের কোন কিছুই সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয় এবং কোন প্রমানের তাগিদ অনুভব না করে শুধু অসংখ্য অনুমানই করা যেতে পারে"।[৪২]

তার মেধা ও গভীর পান্ডিত্য সত্ত্বেও ইবনে রুশদ বিরাজমান মতবাদকে দার্শনিকদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে পারেন নি। একারনে, যদিও তিনি ল্যাটিন মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন,[৪৩] মুসলিম চিন্তা-চেতনার উপর তাঁর প্রভাব ছিল সামান্য এবং মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশেষ হওয়ার সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন।[৪৪] "তাঁর কোন শিষ্য কিংবা অনুসারী ছিল না"।[৪৫] এটা মুসলিম বিশ্বের জন্য নি:সন্দেহে একটা দুর্ভাগ্য ছিল, শুধু কেবল যুক্তি-বিদ্যার জগতে নয়, ফিকহ'র ক্ষেত্রেও যেখানে তার 'বিদায়াত আল-মুজতাহিদ' নামক রচনাটি এখনও পন্ডিতদের উদ্বৃতির জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৪৬] যুক্তিবাদ ও পরীক্ষণকে শরিয়াহ'র মধ্যে যথাযথ স্থান প্রদানের জন্য তিনি যুক্তি ও আসমানি বাণীর মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক মিশ্রন ঘটানোতে বিশ্বাস করতেন এবং যারা

---

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২৭।

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১৯।

[৪২] প্রাগুক্ত, ৫২২। কার্যকরি কারন-এর উপর গোটা অধ্যায়টি পাঠ করা সমীচীন হতে পারে।, পৃ: ৫১৯-২৭।

[৪৩] "থমাস একুইনাস ৫০৩ বার এভারোজ উদ্ধৃত করেছেন" (Urvoy, 1991, p. 127)।

[৪৪] ইবনে রুশদ-এর *তাহাফুত আল-তাহাফুত* অনুবাদ করতে গিয়ে তার প্রদত্ত ভূমিকায় Van Den Bergh, ১৯৫৪, p. xii; Gardet, 1971, p. 1149.

[৪৫] De Boer, 1970, p. 200.

[৪৬] ইমরান নিয়াজী কর্তৃক এ বইটি দু' খন্ডে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে (১৯৯৪)।

www.pathagar.com

কঠোরভাবে ও বাছ-বিচার না করে পূর্বসূরীদের মতামত অনুসরন করে যেতেন, তিনি তাদের সমালোচনা করতেন।[৫৭] সমস্যার প্রতি তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তার দৃষ্টির গভীরতা, তার উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের গতি-প্রকৃতি নির্ধারনের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতো।

এমনকি যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা যুক্তিবাদিরা ভোগ করে আসছিল খলিফাগণ দুর্বল হয়ে পড়ায় (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন) ও নিজেদেরই জনসমর্থন আবশ্যক হয়ে পড়ায় তা আর চালানো যাচ্ছিল না। সুতরাং, সমাজের ইসলামী ভিত্তিকে অবহেলা করে জনগণকে লাগাতারভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হচ্ছিল না। ঐক্যমত্য মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকলো না।[৫৮] ফলে, ইবনে রুশদের মত পন্ডিতগণও মান-সম্মান হারালেন। যুক্তিবাদি আন্দোলন তার গতি হারালো এবং নিজেই যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লো। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আশারিয় আন্দোলন ফাঁকা মাঠ পেল। এটি মুসলিম বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারকারী মতবাদে পরিণত হলো, এবং আল-শাহরাস্তিনি (মৃত্যু ৫৪৮/১১৫৩), ফখর আল-দ্বীন আল-রাজি (মৃত্যু ৬০৬/১২০৯), আল-ইজি (মৃত্যু ৭৫৬/১৩৫৫) এবং আল-জুরজানি (মৃত্যু ৮১৬/১৪১৩)-দের মত বড় বড় সমর্থকদের কল্যাণে আজ পর্যন্ত তাই থেকে গেল।

ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮) তার 'কিতাব আল-মানতিক' (যুক্তিশাস্ত্রের বই) যখন লিখলেন, ততদিনে দার্শনিক আন্দোলন বিশ্বাস পুরো হারিয়ে ফেলেছে। তিনি তখন এমনও বলে ফেলেন যে, "ইসলামে কোন দর্শন নেই" এবং "দার্শনিকরা মুসলমান নয়"।[৫৯] এর কারন তাদের কার্য-কারন বিশ্লেষণের মধ্যে নহে, বরং তাদের এলোমেলো অনুমান ভিত্তিক দর্শনের মধ্যে নিহিত ছিল। তবে, তিনি কার্য-কারন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অন্বেষাকে সমর্থন করেছিলেন এবং আশারিয়গণকে প্রত্যক্ষ কারনের তত্ত্ব অস্বীকার করায় সমালোচনা করেছিলেন এ বলে যে, "মানুষ তাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারে যে, কতিপয় বস্তু আছে বলেই অন্য কতিপয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে"।[৬০] তার মতে যারা প্রত্যক্ষ কারন অস্বীকার করে তারা কুর'আন, সুন্নাহ, এবং ধর্মপ্রাণ পূর্বসূরীদের ঐক্যমত্য লংঘন করে।[৬১]

---

[৫৭] দেখুন, Dutton, 1994, p. 193.

[৫৮] দেখুন, Watt, 1963, p. 13.

[৫৯] Ibn Taymiyyah, Majmu al-Fatawa, Vol. 9, 1961-3, p. 186.

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৮।

[৬১] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬), যিনি নিজেই একজন বিখ্যাত যুক্তিবাদি এবং কার্য-কারন বিশ্লেষণের একজন সমর্থক, তিনি দার্শনিকদেরকে বর্ণনা করতেন খুব সাবধানে। কিন্তু তাঁর "দর্শন খন্ডন" (Refutation of Philosophy) নামক অধ্যায়ে তিনিও অনুমানভিত্তিক দর্শনকে যাদুবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা এবং আলকেমী ইত্যাদির মত অবিশ্বস্ত বিজ্ঞানের একই শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছিলেন।[৫২] তাঁর যুক্তি ছিল যে, দার্শনিকগণ নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতো না আবার এটাও বুঝতো না যে, মহাবিশ্ব এত বড় ও এত জটিল যে, এটাকে মানবীয় যুক্তি বা ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বুঝা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান পাওয়ার আশা করা তাদের জন্য ছিল একট বৃথা ছাতুরী।[৫৩]

আল-মাকরিজি (মৃত্যু ৮৪৬/১৪৪২), যিনি দার্শনিকগণকে বর্ণনা করার সময় ইবনে খালদুনের মত অতটা সাবধানী ছিলেন না, তিনি ইবনে তায়মিয়াহ'র চেয়ে আরেকটু বেশী অগ্রসর হয়ে দার্শনিকগণকে ইসলামের বিরোধীদের কাতারে স্থান দিলেন।[৫৪] এ রকম অভিযোগ ইবনে আল রাওয়ান্দির মত কতিপয় ভিন্নমতাবলম্বী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। তাদের অনেকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবেই বেঁচে ছিলেন, এবং তাঁরা সাধারণত: ইসলামের আওতার মধ্যেই রয়েছেন মর্মে বিবেচনা করা হতো। তবে, পুর্বে যেমন বলা হয়েছে, তাদের গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা এবং শক্তি প্রয়োগ তাদের ভাবমুর্তি তৈরী করে দিয়েছিল এবং সেরুপ প্রতিক্রিয়া অর্জন করছিল। এরুপ আচরণ যুক্তিবাদি আন্দোলনের জন্য যে ভাবমুর্তি তৈরী, তা আল-মাকরিজির বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এরুপ নেতিবাচক ভাবমুর্তি মুসলিম বিশ্বের জন্য গভীরভাবে দু:খজনক প্রতীয়মান হলো। এতে শুধুমাত্র যুক্তিবাদি আন্দোলনই দুর্বল হয় নি, এর ফলে মুসলিম বিশ্ব চেনা পথে হেঁটে ও নিজকে শক্তিশালীকরনের মাধ্যমে আরো রক্ষণশীলতার দিকে ধাবিত হয়েছে। যে প্রাণশক্তি ও গতিময়তা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের

---

[৫২] *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ৫১৪-১৯। অধিবিদ্যা, জাদুবিদ্যা ও জাদুকরী শক্তি, আলকেমী, দর্শন, ও জ্যোর্তিবিদ্যা-কে ইবনে খালদুন বিশ্বাসের অযোগ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (পৃ: ৪৯৫-৫৩১)। তবে, ইবনে রুশদও পুর্বে তার *তাহাফুত আল-তাহাফুত*-এ এ সকল শাস্ত্রসমূহের অনেকগুলোর এমন সমালোচনা করেছিলেন যা ইবনে খালদুনের চেয়ে তেমন ভিন্ন কিছু ছিল না। (দেখুন, ইবনে রুশদ, *তাহাফুত আল-তাহাফুত,* ১৯৯২, পৃ: ৫১)।

[৫৩] মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ৫১৪-১৯; আরো দেখুন, De Boer, 1970, p. 202.

[৫৪] Al-Maqrizi, *Khitat*, Vol. 2, p. 344.

www.pathagar.com

আমলে মুসলিম পন্ডিতদের বৈশিষ্ট ছিল, যখন কোন আলোচনাই নিষিদ্ধ ছিল না, সেই প্রাণশক্তি ও গতিময়তা দুর্বল হয়ে গেল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন দেখা যাবে, শুধুমাত্র দর্শন নয়, সংশ্লিষ্ট ভৌত বিজ্ঞানসমুহও ধর্মীয় মতবাদসমুহের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হলো। অধিকন্তু, যেহেতু সরকার বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় তেমন মনযোগ প্রদান করতো না, যা তারা পুর্বে করতো, সেহেতু, মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎদতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

সে যুগের মুসলিম পন্ডিতগণকে যদি যুক্তিবাদ বা রক্ষণশীলতার প্রতি তাদের আনুগত্যের আলোকে বিভাজন করা হয় তবে তারা নিম্নরুপ চারটি গৌষ্ঠীতে বিভক্ত হতে পারে: (ক) ইবনে আল-রাওয়ান্দি ও আবু বকর আল-রাজি-দের মত গোঁড়া যুক্তিবাদি যারা আসমানি বাণীর সহায়তা ব্যতীত কেবল মাত্র যুক্তির মাধ্যমে সকল আধিবিদ্যাগত সত্য অর্জন করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন; (খ) ইবনে রুশদ-এর মত মধ্যপন্থী যুক্তিবাদি যারা আসমানি বাণী ও যুক্তিবাদ উভয়ের আবশ্যকতা মেনে নিয়েছিলেন; (গ) আল-আশারী, আল-মাতুরিদি (মৃত্যু ৩৩৩/৯৪৫) এবং আল-গাজ্জালী-দের মত মধ্যপন্থী রক্ষণশীলগণ যারা যুক্তির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তবে অতটুকু নয় যতটুকু মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতো; এবং (ঘ) হাম্বিয়াহ-দের মত গোঁড়া রক্ষণশীলগণ যারা ধর্মীয় বিশ্বাস মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্ধ-বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা ও সমর্থনের জন্যও যুক্তির কোন ভূমিকা স্বীকার করতো না। চারটি গোষ্ঠীর মধ্যে গোঁড়া যুক্তিবাদিগন পরাজিত হলো, যেমনটি পরাজিত হয়েছে গোঁড়া রক্ষণশীলগণ। তবে, মধ্যপন্থী রক্ষণশীলগণ "ইতিহাসের এক বিচ্যুতি"-এর কারনে জয়লাভ করলো।[৫৫]

দুখ:জনক হচ্ছে যে, পরবর্তি কতিপয় শতাব্দি ধরে মধ্যপন্থী রক্ষণশীলগণ ধীরে ধীরে আরো রক্ষণশীলতা ও কঠোরতার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। ফলে এমন অবস্থা হলো যে, মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণের পক্ষেও মুক্ত বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখা কঠিন হয়ে গেল। পুর্বের শতাব্দিগুলোতে আল-আশারি, আল-গাজ্জালী, ইবনে রুশদ, এবং আরো অনেক অগণিত পন্ডিতগণের পক্ষে তাদের পছন্দ মত ধর্মীয় ও জাগতিক বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে যে কোন সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। কালান্তরে এরুপ কাজ আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল। উপনিবেশ হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান শিক্ষা তেমন ভালভাবে ফিরে আসে নি। তবে, দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় এখনও কঠিন,

---

[৫৫] দেখুন, Reinhart, 1995, p. 183.

www.pathagar.com

যা পুর্বের শতাব্দিগুলোতে তুলনামুলকভাবে সহজ ছিল। এটি পতনের কার্য-কারনের চক্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছিল, যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার আন্দোলনের (Enlightenment) সাথে তুলনা

সংক্ষেপে, যুক্তিবাদি আন্দোলনকে যা আঘাত করেছে তা হচ্ছে আন্দোলনের গোঁড়া অংশটি কর্তৃক যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে ব্যর্থতা, বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলপুর্বক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া। এর ফলে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক রাজনৈতিক রুপ গ্রহণ করলো, উত্তেজনা ছড়ালো এবং দৃষ্টিভঙ্গী কঠিন হয়ে গেল। সবচেয়ে আক্রমনাত্মক ছিল এরুপ কতিপয় ধারনা যা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, অথচ সেগুলো ছিল ইসলামের মৌলিক, সর্বজন-সম্মত এবং যুক্তির দ্বারা সমর্থনযোগ্য ইসলামী বিশ্বাস।[৫৬] সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে 'রচিত কুর-আন'-এর তত্ত্ব। এরুপ কৃত্রিমভাবে যে দ্বন্দ্ব তৈরী করা হয়েছিল তার মধ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের কতিপয় বিখ্যাত মননশীল ব্যক্তিকে নিস্ফল কাজের চুল-চেরা বিশ্লেষনে শতাব্দির পর শতাব্দি ব্যস্ত রাখা হয়েছে। যদি বল প্রয়োগ না করা হতো, তা হলে ভয় সম্ভবত: এত পরিমানে বাড়তো না, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো না, দৃষ্টিভঙ্গী কঠিন হতো না, এবং উলেমা ও সরকারের মধ্যে, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে মেরামতের অযোগ্য কোন ফাটল তৈরী হতো না। মুসলিম বিশ্বে ফিকহ ও ভৌত বিজ্ঞানের উন্নতিতে এরুপ ফাটল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক প্রতীয়মান হয়েছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা তা দেখতে পাব।

এভাবে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার আন্দোলনের পতনের কারনগুলো পাশ্চাত্যে ছিল ইহার সফলতার কারন। প্রথমত:, পাশ্চাত্যে গীর্জার দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার যা 'খারাপ জিনিসটিকে ধ্বংস করা'র জন্য ভলতেয়ারের আহ্বানকে সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং যা সে সকল আধিবিধ্যাগত বিশ্বাসের মুলে চিড় ধরিয়েছিল যেগুলোর প্রতীক ছিল গীর্জা।[৫৭] তার 'ট্রিটিজ অন টলারেশন'-এ ভলতেয়ার লিখেছিলেন যে, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসসমুহ সহ্য করবেন যদি গীর্জার লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় কথাবার্তা এবং মতপার্থক্য সহ্য করে। কিন্তু "গজপেলে সামান্যতম কোন অস্তিত্ব নেই এরুপ চাতুরীগুলোই খৃষ্টীয়

---

[৫৬] আল-গাজ্জালী, *তাহাফুত,* ১৯৯৩, পৃ: ২১৯-২০; আবু জারাহ, *তারিখ,* ১ম খন্ড, পৃ: ১৪৭-৯০।

[৫৭] দেখুন, E A Burtt, 1955, p. 237.

www.pathagar.com

ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারন"।[৫৮] ডুরান্ট আসলে বলেন যে, "গীর্জা হয়ত: হিব্রু বাইবেল ও খৃষ্টীয় বিশ্বাসের অতি-প্রাকৃতিক অনুমোদন বজায় রেখে চলতে পারতো যদি উহার কর্মচারীগণ সুন্দর ও ধর্মানুরাগী জীবন যাপন করতো"।[৫৯] এর বিপরীতক্রমে মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত ধর্মীয় গুরুদের সবাই না হলেও আবু হানিফা (মৃত্যু ১৫০/৭৬৭), মালিক (মৃত্যু ১৭৯/৭৯৫), শাফিই (মৃত্যু ২০৪/৮২০) এবং আহমদ ইবনে হানবাল (মৃত্যু ২৪১/৮৫৫)-দের মত অধিকাংশই ছিলেন বড় ধর্মানুরাগী ও সজ্জন ছিলেন, এবং জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। তারা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন না এবং, সাধারণত: রাজনৈতিক পদ-পদবী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন, যদিও দুর্নীতিপরায়ন ও অনৈসলামিক কাজ-কর্মের সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে এ ধরনের পদ-পদবীর লোভ দেখানো হতো।

দ্বিতীয়ত: হৌরানি যেমন যথার্থই বলেছিলেন, "ইসলামে প্রচলিত মতবাদ কখনও খৃষ্টিয় ধারার মত যাজক পরিষদ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। ইসলামে ধর্মীয়ভাবে নির্ধারিত যাজকতন্ত্র না থাকায় এ রকম কোন পরিষদ কখনও গঠিতও হয় নি"।[৬০] প্রচলিত মতবাদ সংজ্ঞায়িত হতো কুর-আন, সুন্নাহ এবং ইজমাহ বা মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যমত্যের আলোকে, যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা হতো উলেমাদের মধ্যকার মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে, একটি বহুল-উদ্ধৃত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস মতে যাঁরা ছিলেন নবীর উত্তরসুরী। মিনাহ বা ধর্মীয় তদন্ত প্রথা উঠে যাওয়ার সাথে সাথে শরিয়াহ'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমাপ্তি ঘটেছিল।[৬১] আনসারী যেমন যথার্থই বলেছেন, পাশ্চাত্যে পন্ডিতগণ সফলভাবে বাইবেলের যথোপযুক্ততা চ্যালেঞ্জ করলেও মুসলমানেরা অনেক পুর্ব থেকেই "কুর-আন ও নবীর সুন্নাহ'র বিরাট কর্তৃত্ব স্বীকার করেছেন"।[৬২] সকল বিশ্বাস, ধর্মীয় ও আইনগত তত্ত্বসমূহ এগুলো থেকে উদ্ভুত হয়েছে। যাদের মতামতের উপর ঐক্যমত্য সৃষ্টি হতো সেই উলেমারা জনগণের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দিত না। প্রকৃত পক্ষে জনগণ তাদের মতামত গ্রহণ করতো কুর-আন ও সুন্নাহ'র সহিত সেগুলোর সাযুজ্যতা, তাদের যুক্তির প্রবলতা এবং তাদের ধর্মানুরাগ, সততা ও পান্ডিত্যের কারনে।

---

[৫৮] Voltaire, *Selected Works*, p. 62, cited by Will Durant, *The Story of Philosophy*, 1970, p. 237.

[৫৯] Durant, *The History of Civilization*, 1954, Vol. 5, p. 571.

[৬০] Hourani, 1961, p. 29.

[৬১] Hinds, 1993, p. 6.

[৬২] Zafar Ishaq Ansari, 1992, p. 157.

www.pathagar.com

তৃতীয়ত: পাশ্চাত্যে ধর্মীয় তদন্তের পথ ধরেছিল গীর্জা, আর মুসলিম বিশ্বে তা করেছিল যুক্তিবাদিরা, যদিও গীর্জার মত অতটা নিষ্ঠুরভাবে নয়। গীর্জার মত জীবন্ত মানুষকে পুড়ে ফেলার মত কোন ঘটনা ইসলামের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তবুও, মিনাহ (ধর্মীয় তদন্ত) একটি খারাপ লক্ষণ রেখে গিয়েছিল। এরূপ ঘটেছিল এ কারনে যে, নির্যাতন সাধারণত: তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং নির্যাতিতদেরকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয়। পাশ্চাত্যে গীর্জা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনা ধর্মের ক্ষতি করেছে এবং মুসলিম বিশ্বে মুতাজিলাইটস কর্তৃক নির্যাতনের ব্যবহার যুক্তিবাদের ক্ষতি করেছে। যদি মুতাজিলাইটস, যাদের অনেকেই ছিলেন মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় পন্ডিত, ও রক্ষণশীলদের মধ্যকার বিতর্ক অবাধে বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হতো, তা হলে যুক্তিবাদ ও প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস উভয়েই সমৃদ্ধ হতো এবং আরো ভারসাম্যপূর্ণ মতামত প্রতিষ্ঠিত হতো।

চতুর্থত: গীর্জা যেমন এমন অনেকগুলো বিশ্বাসের প্রতীক ছিল যেগুলো যুক্তি দ্বারা সমর্থনযোগ্য ছিল না এবং যেগুলোর সপক্ষে কোন সমর্থন গজপেল-এ পাওয়া যাবে না, তেমনি দার্শনিক ও মুতাজিলাইটস-দের কতিপয় গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ভিত্তি কুর-আন কিংবা সুন্নাহ-তে নেই এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থনযোগ্য নয়। তুলনামুলকভাবে, উলেমা ও জনগণের বিশ্বাসগুলোর ভিত্তি কুর-আন ও সুন্নাহ-তে গ্রোথিত ছিল এবং তুলনামুলকভাবে সরল ও সহজবোধ্য ছিল।

মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদের ভবিষ্যৎ

আমরা এখন ফিরে আসবো ইতিপুর্বে উত্থাপিত সেই প্রশ্নটিতে যাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পুণ:রুত্থান যুক্তি ও আসমানি বাণীর বিরোধ উসকে দেবে কিনা এবং কাঠামোর পরিবর্তন আবশ্যকীয় করে ফেলবে কিনা যেমনটি তা পাশ্চাত্যে করেছিল। ইসলামী কাঠামোর মধ্যে যুক্তি ও আসমানি বাণীর মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী নয়।

মতভেদ রয়েছে এরূপ সকল বিষয়ে ইসলামের প্রথম দু'শতকে মুক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। ইবনে তামিয়া'র মত অনুসারে কোন আইনশাস্ত্রবিদকেই, তিনি যেই হউন না কেন, তার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বা তার মতবাদ গ্রহণ করতে বলপ্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করা হতো না।[৮৩] এমন কি একজন শাসকও তার সুবিধা ভোগ করতেন না। তিনিও ছিলেন মুসলমানদের একজন। তাঁর মতের সপক্ষে তিনি শুধুমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধির

---

[৮৩] Ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Vol. 30, p. 80.

www.pathagar.com

আলোকে তর্ক করতে পারতেন।[৬৪] সম্ভবত: একারনে খলিফা হারুন আল-রশীদ (মৃত্যু ১৯৩/৮০৯) তার সকল প্রজাকে মালিকের 'আল-মুয়াত্তা' অনুসরন করার জন্য বলবেন মর্মে ভাবছিলেন, তখন মালিক নিজেই তাঁকে এরুপ না করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।[৬৫] এটা ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নীতির বরখেলাপ হতো। এ সময়েই ইসলামী আইনশাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌছেঁছিল।[৬৬] যদি মুতাজিলাইটসগণ মুসলিম সমাজের এ উদাহরনটি মেনে চলতো, তবে তারা এত উত্তাপ ও উত্তেজনা হয়ত: ছড়াতো না। সেক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও রক্ষণশীলদের বিরোধ এরুপ বৈরী ও যুদ্ধংদেহী রুপধারন করতো না। দু'টো গুরুত্বপূর্ণ কারনে এরুপ বৈরীতার কোন যুক্তি নেই।

প্রথমত: কুর-আন নিজেই যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের জন্য জোরে-শোরে বলে থাকে। এরুপ জোর মুসলমানদের লেখায় কালে কালে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণত: ইবনে তায়মিয়াহ পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, কুর-আন, সুন্নাহ এবং উম্মাহ'র ঐক্যমত্য থেকে মুসলমানদের বিশ্বাস, প্রার্থনা ও মুল্যবোধ আহরণ করা "যুক্তিবাদের সহিত সাংঘর্ষিক নহে। কারন যা কিছু যুক্তির সহিত সাংঘর্ষিক তা বাতিল বলে গণ্য হয়"।[৬৭] তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, সম্ভবত: মানুষ বুঝতে পারে না যে, কুর'আন বা সুন্নাহ'র ভাষা এমন সব শব্দ দ্বারা গঠিত এবং তারা সে সকল শব্দ ভুল অর্থে গ্রহণ করতে পারে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সুতরাং, সমস্যা হচ্ছে ব্যাখ্যাকারীকে নিয়ে, কুর'আন বা সুন্নাহ কোন সমস্যা নহে।[৬৮] মুস্তফা আল-জারকা নামক একজন প্রখ্যাত ও বেশ সম্মানিত আধুনিক ধর্মীয় পন্ডিত স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, "যা কিছু যুক্তির বিরুদ্ধে ইসলামে তার কোন স্থান নেই"।[৬৯] অধিকন্তু, কুর-আন কিংবা সুন্নাহ-তে এখন পর্যন্ত এমন কিছু পাওয়া যায় নি যা কোন প্রতিষ্ঠিত সত্য বা বৈজ্ঞানিক সুত্রের সহিত সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত: আগে যেমন বলা হয়েছে, মুতাজিলাইটসগন ভিন্ন মতাবলম্বীদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য অনেক কিছুই করেছিল, এবং তাদের অনেক দৃষ্টিভঙ্গীই যুক্তিপূর্ণ এবং কুর'আন ও সুন্নাহ'র সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭০] বাড়া-বাড়ি

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, ৩৫ খন্ড, পৃ: ৩৬০।
[৬৫] প্রাগুক্ত, ৩০ খন্ড, পৃ: ৭৯।
[৬৬] দেখুন, মুস্তফা আল-জারকা, ১৯৬৭, ১ম খন্ড, পৃ: ১৪৭ ও ১৭১।
[৬৭] Ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Vol. 11, p. 490.
[৬৮] প্রাগুক্ত, ১১ খন্ড, পৃ: ৪৯০।
[৬৯] আরো দেখুন, মুস্তফা আল-জারকা, *আল-আকল ওয়া আল-ফিকহ*, ১৯৯৬, পৃ: ১৪।
[৭০] দেখুন, আবু জারাহ, ১ম খন্ড, পৃ: ১৯০।

www.pathagar.com

ও ধর্মীয় তদন্ত দ্বারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা না হলে সকল বিষয়াবলীই সম্ভবত: তুলনামুলক খোলা-খুলি ভাবেই আলোচিত হতো, এবং খুব সম্ভব ইবনে রুশদ-এর মত তুলনামুলক মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিও মধ্যপন্থী রক্ষণশীল বা আল-গাজ্জালীর মত আশারিয়-দের সাথে টিকে যেতেন। তাদের প্রাণবন্ত আলোচনা কালের প্রবাহে হয়ত বিদ্যমান বিবাদসমুহের যুক্তিসঙ্গত: সমাধান এনে দিত। এর ফলে পরবর্তিতে আশারীয়দের পক্ষে আরো রক্ষণশীলতা ও কঠোরতার দিকে ঝুঁকে পড়া এবং মুতাজিলাইটদের মত বল প্রয়োগ করে তাদের মতবাদ তুলে ধরা ও তার বিস্তার ঘটানো কঠিন হতো।[৭১] মধ্যপন্থী যুক্তিবাদি ও মধ্যপন্থী রক্ষণশীল উভয়ের টিকে যাওয়ার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি মুসলিম সমাজে একটি সুস্থতর প্রভাব ফেলতে পারতো। বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় হতে পারতো এবং মুসলিম বিশ্বে ফিকহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ও জাগতিক বিজ্ঞানসমুহের আরো উদারনৈতিক উন্নয়নকে উতসাহিত করতে পারতো।

সুতরাং মুতাজিলাইটসদের বাড়াবাড়ি নস্যাৎ করে দিয়েছিল বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার পরিবেশ যা বিগত শতাব্দিসমুহে বিদ্যমান ছিল। এর ফলে পেন্ডুলাম বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। সকল মুক্ত চিন্তাকে দোষী মনে করা হলো এবং ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রকাশে রক্ষণশীল ও খুব সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে উৎসাহিত করা হলো। পরিণতিতে 'ইজতিহাদ'-এর ক্ষতি হয়ে গেল। সৌভাগ্য বশত: এটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় নি।[৭২] সব সময়েই এর অনুকূলে কন্ঠ ধ্বনিত হয়েছে এবং পরেও কতিপয় উঁচুমানের যোগ্যতা সম্পন্ন, সম্মানিত এবং সৃজনশীল পন্ডিতদের কন্ঠে সেভাবে ধ্বনিত হতে থাকলো, যদিও প্রথম দিকের কয়েক শতাব্দির মত অতটা ঘন ঘন নয়।[৭৩]

মুতাজিলাইটসদের বাড়া-বাড়ি ছাড়াও আরো কতিপয় ঘটনা এরুপ কঠোরতা ও রক্ষণশীলতার প্রবণতাকে শক্তি যুগিয়েছিল। একটি ছিল অবৈধ ও দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর অবৈধ ক্ষমতা ও নির্যাতনমুলক করারোপকে বৈধতা

---

[৭১] আশা'রিয়দের বলপ্রয়োগের বিষয়ে জানার জন্য দেখুন, আল-মাকরিজি, *আল-খিতাত*, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৫৮।

[৭২] দেখুন, Wael B Hallaq, 1984, pp. 3-41; আরো দেখুন, Zebiri, 1993, p. 136।

[৭৩] Lewis স্বীকার করেন যে, "মুসলিম আইন স্থবির ছিল না, এটা দীর্ঘ ও জটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। আইন শাস্ত্রীয় রচনাসমুহ ভালোভাবে পরীক্ষা করলে আইন প্রণেতাগণ যে সকল পরিবর্তনের কারন, তাগিদ ও প্রভাবের অধীনে ছিলেন সেগুলো বোঝা যাবে"। (Bernard Lewis, "Sources for the Economic History of the Middle East," in Cook, 1970, p. 91)।

www.pathagar.com

প্রদানের লক্ষ্যে আইনগত সিদ্ধান্ত আদায়ের কাজে সাহায্য পাওয়ার বাসনা। সুতরাং, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিখ্যাত দার্শনিক/কবি মুহাম্মদ ইকবাল যেমন যথার্থই বলেছেন, "আরো ভাঙ্গনের আশংকায়, যা এরূপ অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই ঘটা স্বাভাবিক, ইসলামের রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ ইসলামের প্রথম যুগের পন্ডিতগণের ব্যাখ্যার বাইরে শরিয়ার আইনে কোন প্রকার উন্নয়ন অনুমোদন না করে তাদের সকল প্রয়াস জনগণের জন্য এক অভিন্ন সামাজিক জীবন বজায় রাখার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করলো। তাদের মুল পরিকল্পনা ছিল সামাজিক শৃংখলা এবং কোন সন্দেহ নেই যে, তারা আংশিকভাবে সঠিক ছিল, কারন, সংগঠন অবশ্যই কিছুটা হলেও অবনতির শক্তিকে প্রতিরোধ করে"।[৭৪]

রক্ষণশীলতাকে আরো শক্তিশালী করেছে এরূপ দ্বিতীয় কারন হলো বিদেশী শক্তির প্রাধান্য, যা শুরু হয়েছিল মঙ্গলদের দিয়ে। এর ফলে আশংকা দেখা দিল যে, বিদেশী দখলদারগন কতিপয় আইনজ্ঞকে তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করবে এবং শরিয়ার কাঠামো বদলে ফেলবে।

তৃতীয় একটি ঘটনা হলো মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অবনতিশীল পরিস্থিতি। ইবনে খালদুন যেমন মন্তব্য করেছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন একটি সমাজে তখনই ঘটে যখন সমাজ নিজে উন্নতির পথে এগোয়।[৭৫] আইনশাস্ত্র এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম সমাজ যখন সার্বিকভাবে স্থবির হয়ে যায় এবং পতনের প্রক্রিয়ায় থাকে, তখন আইনশাস্ত্রও বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাবেই। সৃজনশীল কাজের অনুকুল পরিবেশ শুধু কেবল অনুপস্থিতই ছিল না, বরং শরিয়ার সহিত সংগতিপূর্ন হোক বা না হোক যে কোন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব ছিল। ইবনে তামিয়াহ ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃত্যু ১১৭৬/১৭৬২) তাদের স্বাধীন ও প্রথা-বিরোধী মতবাদের জন্য প্রচুর বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অথচ তারা উভয়ে তাদের সময় বিদ্যমান ফিকহ শাস্ত্রের কঠিন ও স্থবির মতবাদের তুলনায় বেশ সৃজনশীল ও তুলনামুলকভাবে উদার প্রকৃতির পন্ডিত ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ফার্সী ভাষায় কুর-আন অনুবাদ করতে ভীষণ বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার ছেলেরাও উর্দু ভাষায় কুর-আনের অনুবাদ করতে গিয়ে একইভাবে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৭৬] তবে, যেহেতু সরকার পক্ষে বা

---

[৭৪] Iqbal, *Reconstruction*, 1954, p. 151.

[৭৫] Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, p. 434.

[৭৬] যদিও কুর'আনের এরূপ অনুবাদের বিরোধিতা বর্তমানে অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিন্তু, সে সময়ে এটা তেমন মনে হতো না। আরবারি (১৯৬৪) তার অনুবাদের ভূমিকায় যেমন

www.pathagar.com

বিপক্ষে কোন হস্তক্ষেপ করে নি, সেহেতু শেষ পর্যন্ত অধিকতর যুক্তি সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেল এবং এটা সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হলো যে কুর-আন কোন ভাষায় অনূবাদ করা নীতিগতভাবে দোষের কিছু নয়।

এভাবে আসমানি বাণীর সাথে বৈরীতায় না গিয়ে মুসলিম সমাজের পুণ: গঠণে যুক্তিবাদ প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে, যদি রাষ্ট্র, যুক্তিবাদের অনুসারী এবং রক্ষণশীলগণ একে অন্যের পা না মাড়ান, এবং সংঘর্ষ ও শক্তি প্রয়োগ পরিহার করেন। আর্থ-সামাজিকভাবে নিচু অবস্থান এবং আধুনিক শিক্ষার অভাবের কারনে উলেমাদের মর্যাদার অবনতি হওয়া সত্বেও মুসলিম বিশ্বে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদানে তাদের প্রাধিকার বহাল ছিল, যেমনটি গিবস্ ১৯৪৭ সালে যথার্থই স্বীকার করেছিলেন: "ইসলামের ভবিষ্যত নির্ভর করছে অতীতে তা যার উপর নির্ভর করতো সেখানে – প্রচলিত ধারার নেতাদের অন্ত: দৃষ্টি এবং নতুন নতুন টানা-পোড়েনের মুখে ইতিবাচক তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে সেগুলো উতরে যাওয়ার ক্ষমতার উপর, যে তত্ত্ব ভাঙ্গনের শক্তিসমূহকে মোকাবেলা ও নিয়ন্ত্রণ করবে।[৭৭] ইতিহাস বলে যে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যখন আব্বাসীয় খলিফাগণের মত[৭৮] কোন মতামত চাপিয়ে দিতে চায় যা উলেমাগণ ইসলামের আচার-আচরণের সহিত পরিস্কারভাবে সাংঘর্ষিক মনে করেন, তাহলে পরিণতিতে অতীতের মত উত্তেজনা ছড়ানো হবে, দৃষ্টিভঙ্গী কঠিন করে তোলা এবং বিরোধ ও মেরুকরণ সৃষ্টি করা হবে।[৭৯] এরুপ বিরোধ প্রায় নিশ্চিতভাবেই মুসলিম বিশ্বে পরিবর্তন ও উদারীকরনের প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দিবে।

তুরস্কে সত্তর বছরের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের উপর জনগণের বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় নি, এবং সেখানে পুণ: জাগরণ চলছে। মুসলিম

বলেছিলেন, "যেহেতু কুর'আন বিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহ তা'লার নিজের বাণীরুপে বিবেচিত, সেহেতু, প্রাচীনতম কাল থেকে কঠোর প্রথাগত মত হচ্ছে যে, এটি (কুর'আন) অনুবাদ করা যাবে না, এটা এমন এক আশ্চর্য বাণী যার অনুকরন করার প্রয়াস পবিত্র বাণীর অবমাননা হবে" (পৃ: xi)।

[৭৭] Gibb, 1947, p. 122.

[৭৮] রিচার্ড আন্টন "রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতার উপর অতি মাত্রায় বিশ্বাস" আরোপের বিরুদ্ধে সতর্ক করার মাধ্যমে উলামাগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে মুল্যবান আলোকপাত করেছেন (Antoun, 1989, p. 244)। এটা সম্ভবত: হতে পারে "উলেমা ও সংখ্যা-গরিষ্ঠ্য মুসলিম জনগনের মধ্যে বিরাজমান সখ্যতার" কারনে (Leonard Binder, 1964, p. 24)।

[৭৯] আইকারম্যান মন্তব্য করেন: "একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামে আমাদের সার্বজনীন উপাদান হচ্ছে বিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতির স্থির ও টেকসই দিকগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ" (Eickerman, 1989, p. 305)।

www.pathagar.com

দেশসমূহের কতিপয় স্বৈর-শাসকগণ জনগণের উপর নিজস্ব ধারায় ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে, এবং এটাও কার্যকরী নাও হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমাজের ইসলামী ভিত্তিকে আঘাত না করে মুক্ত ও বন্ধুত্বপূণ্ আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। কুর-আন ও সুন্নাহ্ উভয়ে ইসলামী রূপকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং ইসলামী সমাজের পুণ: গঠনে যদি কেহ এ দু'টোকে কিংবা শুধু সুন্নাহকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেয় তা হলে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। শরিয়াহ'র মধ্যে থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব মর্মে মনে হয় যে, এ রকম কুর-আন ও সুন্নাহকে বাদ দেওয়ার গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত হবে। রাষ্ট্রের যা করা উচিত তা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার যুক্তিবাদি ও রক্ষণশীলদের মধ্যে অবাধ ও উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া। সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস যোগ্য মতামত শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে।

সতর্ক বাণী হচ্ছে যে, যদি উলেমাগণ সহনশীল না হন, এবং তাদের স্থবিরতা ও অনমনীয়তার অবসান ঘটাতে প্রস্তুত না হয়ে এমনকি মধ্যপন্থী যুক্তিবাদের (যেগুলো ফিকহ'র মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ'র চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন) প্রতিও আক্রমনাত্মক ও কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখান, সেক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর মাধ্যমে পেন্ডুলামকে গোঁড়া যুক্তিবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে, যেমনটি পাশ্চাত্যে করা হয়েছিল, এবং, এ ভাবে শুধু ইসলামের নয়, উলেমাদের নিজেদের অবস্থানও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এটা যেন না ঘটে সে লক্ষ্যে আধুনিক বিজ্ঞান ও অন্তত: একটি পশ্চিমা ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজী, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমসমুহে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, এবং ধর্মীয় শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হলে উপকার হতে পারে। এর মাধ্যমে পশ্চিমা গ্রাজুয়েট ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল ও অনুকুল পরিবেশ তৈরী করার জন্য সহায়ক হতো, এবং, তা বিভিন্ন বিষয়ে আরো বেশী পারস্পরিক বুঝা-পড়া ও অর্থপূর্ণ আলোচনার পথ খুলে দিত।

তবে, সৌভাগ্যবশত:, জামাল উদ্দিন আল-আফগানী (মৃত্যু ১৩১৫/১৮৯৭), মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু ১৩২৩/১৯০৫), মুহাম্মদ ইকবাল (মৃত্যু ১৩৫৭/১৯৩৮) এবং অন্য অনেক বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও সংস্কারকদের কারনে বিভিন্ন সময়ে 'উলেমা'-দের কঠোরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। 'উলেমাগণ' অতীতের মত চুলচেরা বিতর্কে লিপ্ত হয় না। ইজতিহাদ-এর বিধান ধীরে ধীরে পুন: রুজ্জীবিত হয়েছে, এবং শরীয়াহ'র আওতার মধ্যে উদার

www.pathagar.com

নৈতিক চিন্তাধারা চোখ ছানা-বড়ো করে না কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, যেমনটি তা পুর্বে করতো। উদাহরণত:, অষ্টাদশ শতকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ'র জীবদ্দশায় উলেমাগন মনে হয় বুঝতে পেরেছিল, যদিও পুরোপুরি নয়, যে, ফিকহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রথাগত সময় থেকে দুনিয়া বহুদুর এগিয়েছে। তদানুযায়ী, বিভিন্ন বিষয়ের উপর গৃহীত কঠোর আইনগত মতামতগুলো তুলনামুলকভাবে আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গীর নিকট পরাজিত হয়েছে, যা কুর-আন ও সুন্নাহ'র সহিত কোন দ্বন্ধে না গিয়ে শুধু কেবল টিকেই যাচ্ছে না, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা প্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়েছে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় ও অপরিবর্তনীয় গীর্জা কিংবা যাজকীয় পরিষদের অবর্তমানে পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকুল হয়েছে। এর ফলে আইনশাস্ত্রের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল মতামতগুলোর মধ্যে পাস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। উপনিবেশের অর্গল থেকে প্রায় সকল মুসলিম দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য এরুপ স্বাধীনতা যে জরুরী তাগিদ নিয়ে এসেছে তা মনে হচ্ছে তুলনামুলকভাবে আরো উদারনৈতিক আইনশাস্ত্রাবিদগণকে শক্তি প্রদান করেছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফিকহ কমিটিগুলো, রাবিতা, এবং সদস্য দেশসমুহ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে মুল্যবান কাজ করছে। অনেকগুলো মুসলিম দেশে শরিয়াহ'র বিধানসমুহের পুণ: রুজ্জীবন উদারনীতিকরনের প্রক্রিয়াকে আরো শক্তি যোগাবে।

মনে হচ্ছে আরো নমনীয় ও অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিকরণের জন্য কুর-আন ও সুন্নাহ'র চাপ বেশী বেশী হারে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। কুর-আন বলছে যে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য দুর্ভোগ নয়, আয়েশ চায়" (আল-কুরআন ২: ১৮৫, আরো দেখুন ৫: ৬)। মহানবী (স:) বলেছিলেন, "ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সহজ; এটাকে কঠিন করার চেষ্টা যে করে সে এটার নিকট পরাজিত হয় (সে এটা প্রতিপালন করতে পারে না)"।[৮০] শরিয়াহ'র উদ্দেশ্য'র উপর লেখা ক্রমবর্ধমান বইপত্র এরুপ বোধোদয়ের বহি: প্রকাশ যে, শাস্ত্রীয় ভাষার ব্যাখ্যা প্রদানে এ সকল বিষয় বিবেচনা করা শাস্ত্রীয় ভাষার আক্ষরিক অর্থের মতই প্রয়োজনীয়। আশা করা যায়, এরুপ উন্নতি অবাধে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনশাস্ত্রের সকল মতামত এমন ভাবে একীভুত হবে যাতে বিভিন্ন বিষয়ে সেগুলোর সিদ্ধান্তসমুহ বিভিন্ন বিকল্প প্রকৃতি গ্রহণ করে যার থেকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা

[৮০] আবু হুরায়রা থেকে নেয়া; al-Suyuti কর্তৃক al-Bukhari ও al-Nasai –দের বরাতে উদ্বৃত, al-Suyuti, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৯।

www.pathagar.com

জাতি তাদের বিশেষ প্রেক্ষাপটে তাদের জন্য সব চেয়ে উপযোগীটি পছন্দ করে নিতে পারে।

তবে, সমস্যা হচ্ছে আধুনিক যুক্তিবাদিগণ তাদের অতীতের পুর্বসুরীদের মতই বহুদল ও বহুমতের গোষ্ঠী। সেখানে আছে মধ্যপন্থীরা। ইসলাম ও এর মুল্যবোধের বিষয়ে তারা ইতিবাচক এবং তারা সাধ্যমত সব কিছুই করছে যেন কঠোরতার কঠিন ভেদী ভেঙ্গে ফেলা যায়, একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোতে ইসলাম কর্তৃক মুখোমুখি হওয়া সকল বাধাসমুহ মোকাবেলা করতে যা প্রয়োজন। তারা যে কোন প্রকার সমস্যা তৈরী করছে না শুধু তা নয়, মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে অগ্রসরও হচ্ছে।

অবশ্য চরম ধর্মনিরপেক্ষদের নিয়ে গঠিত আরো একটি গোষ্ঠী আছে যারা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিতে এবং মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্যের ঢং-এ পুণ: গঠণ করতে চায়। তবে পশ্চিমা বিশ্বও সম-প্রকৃতির একক নয়। তার মধ্যে ধার্মিক, ধর্ম-বিরোধী এবং বিলাস-প্রিয় দল-উপদল রয়েছে। চরম ধর্মনিরপেক্ষরা চায় মুসলিমরা যেন শেষোক্তদের অনুসরন করে। তারা বিরোধ ও উত্তেজনা উসকে দিচ্ছে, এবং মুতাজিলাইটসদের মত তাদের আয়ত্তাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে স্বীয় মতামত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করছে। শক্তি প্রয়োগ অতীতে সফল হয় নি, এবং বর্তমানেও সফল হবার সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতপক্ষে, এটা রক্ষণশীল শক্তিগুলোর মধ্যে আরো আক্রমনাত্মক ও চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। সমাজকে আরো সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এটা মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমন অতীতে হয়েছিল।

গণতন্ত্রের বিস্তার পরিস্থিতিকে মধ্যপন্থার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচনে পরাজিত হতে না চায় তাহলে সমাজের সকল সেক্টরের নিকট তাদের আবেদন পৌঁছাতে হবে। যেহেতু, ইসলামের সাথে গণমানুষের একটি আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু, ধর্ম ও ইহজাগতিকতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হতেও পারে, যে রকম প্রয়াস পাশ্চাত্যে নেওয়া হয়েছিল এবং যা ইহজাগতিকতার সমর্থকগণ ঘটাতে চান। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের গোঁড়া সমর্থকগণও একইভাবে ব্যর্থ হতে পারেন, কারন, বর্তমান বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে এরুপ বিশ্বাস ঠিক মানানসই নয়। গণমানুষের অবস্থার উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী বাস্তবায়নের জন্য কেবল মাত্র সরকারী সম্পদের ব্যবহারে আরো বেশী

www.pathagar.com

সততার প্রয়োজনই হবে না, বরং, অগ্রাধিকার নির্বাচন ও আরো বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা-কৌশল প্রণয়নেরও প্রয়োজন হবে। ইহজাগতিকতার সমর্থক দুর্নীতিবাজ আমলা এবং প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের গোঁড়া সমর্থকগণ এগুলো নাও বুঝতে পারে। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী তাদের দুর্নীতি, জড়তা ও ভেতরের কিংবা বাইরের কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারনে, এবং শেষোক্ত দল আধুনিক অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, বিদেশী সব কিছুর প্রতি তাদের সন্দেহ ও অন্যত্র সফলভাবে প্রযুক্ত কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারনে। প্রয়োজন হচ্ছে ন্যায়ানুগ ও স্থিতিশীল উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপযোগী একটি কৌশল প্রণয়ন করা। এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের সাথে ব্যাষ্টির অর্থনীতির যথার্থ যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন, যা সম্ভব নাও হতে পারে যদি ইসলামী মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক বিশ্লেষন পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত করা না হয়, এবং অন্যান্য সমাজ থেকে শরীয়াহ’র পরিপন্থী নয় এমন সফল কৌশলগুলো গ্রহণ করা না হয়।

অর্থশাস্ত্র ও ফিকহশাস্ত্র

ইজতিহাদের ক্রমবর্ধমান পুন:রুত্থান ইসলামী অর্থশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রের মধ্যে আরো বেশী শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের প্রবণতা সৃষ্টি করবে – যে সংযোগ ফিকহ শাস্ত্রের অনমনীয়তা ও মুসলিম দেশসমূহে বিরাজমান প্রথাগত অর্থনীতির কারনে দুর্বল হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধানের বিভিন্ন উপায় পাওয়া যাবে এবং শরীয়াহ’র কাঠামোর মধ্যে কোন সমাধানটি গ্রহণযোগ্য তা বাতলে দিয়ে আইনশাস্ত্র তার দায়িত্ব পালনে সাড়া দিতে পারে। এভাবে অর্থশাস্ত্রবিদ ও ফুকাহা-দের মধ্যে বেশী বেশী মিথস্ক্রিয়া হতে পারে যা পরস্পরের বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে তাদেরকে আরো বেশী ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ করে দিবে। এরুপ সংযোগ ও বুঝা-পড়া উভয়ের জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়নের পথ দেখাতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহ’র সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এরূপ অগ্রগতি জ্ঞান-দর্শনে (নৈতিকতার মাত্রা সংমিশ্রণের আবশ্যকতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান বোধোদয়ের মাধ্যমে দু’টোর মধ্যে) মিলন ঘটা উচিত এবং তা বর্তমান কালের মুসলিম বিশ্বকে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক মুল্যবোধের গুরুত্বকে তুলে ধরার সুযোগ প্রদান করতে পারে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামি অর্থনীতি: কেমন হওয়া উচিৎ?

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় প্রচলিত ও ইসলামি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর আমরা দেখবো কিভাবে ইসলামি অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্যে, কর্ম-কৌশলে, পরিধিতে ও পদ্ধতিতে এরূপ পার্থক্য তাত্ত্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা

তাঁর এক প্রার্থনায় মহানবী (স:) অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় চেয়েছিলেন।[১] এ প্রার্থনা অনুসারে জ্ঞানের যে কোন শাখার সাফল্য বা ব্যর্থতার একমাত্র পরীক্ষা হতে পারে মানব কল্যানে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান, যা স্পষ্টত:ই হচ্ছে এ অধ্যায়ে বর্ণিত শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহ। অর্থশাস্ত্র এর ব্যতীক্রম হতে পারে না। ইসলামি অর্থশাস্ত্র প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের ন্যায় সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের উপর জোর দিলেও মুল লক্ষ্য হতে হবে লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়ন। এর ফলে প্রত্যেক ভারসাম্যপুর্ণ বাজার ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র এরূপ ভারসাম্যপুর্ণ বাজার ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যেতে পারে যা শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ কিংবা নিদেন পক্ষে লক্ষ্যসমুহের সহিত সাংঘর্ষিক নয়। তবে, যেহেতু পারেটো মান প্রত্যেক ভারসাম্যপুর্ণ বাজার ব্যবস্থার সহিত জড়িত হয়েই আছে, তার বদলে ইসলামি মান গ্রহণ করা বাঞ্ছিত হতে হতে পারে, যে মানকে বলা যেতে পারে এমন ভারসাম্যমুলক বাজার ব্যবস্থা যেখানে শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ দক্ষতা ও সমতার মানের বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয়।

---

[১] মহানবীর প্রার্থনার পুর্ণ ভাষ্য হচ্ছে: "হে আল্লাহ! উপকারে আসে না এরূপ কোন জ্ঞান থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই, বিনয়ী ও অনুগত নয় এ রূপ কোন হৃদয় থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই, কখনও সন্তুষ্ট হয় না এরূপ মানসিকতা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই, এবং মঞ্জুর করা হয় না এরূপ কোন প্রার্থনা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই; (মুসলিম, আল-তিরমিদি ও আল-নাসাই'র বরাতে যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আল-মুন্দারী কর্তৃক উদ্বৃত, ১ম খন্ড, ১৯৮৬, পৃ: ১২৪)। অন্য আর একটি হাদিসে মহানবী (স:) মুসলমানগণকে উপকারী জ্ঞান আহরণ করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য বলেছিলেন; (যাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে ইবনে মাযহা কর্তৃক উদ্বৃত, ২য় খন্ড, পৃ: ১২৬৩:৩৮৪৩; এবং আল-বেয়াহাকি কর্তৃক তার শু'আব আল-ইমান, ২য় খন্ড, পৃ: ২৮৫:১৭৮১ 'এ উদ্বৃত)।

একটি অর্থনীতির সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন তখনই হয় যখন উহা তার সীমিত মানব ও বস্তুগত সম্পদকে এমনভাবে কাজে লাগাবে যার ফলে যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিসহ চাহিদা পুরণের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমান পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। প্রলম্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না করে কিংবা পারিবারিক ও সামাজিক সাযুজ্য বা সমাজের নৈতিক গঠন নষ্ট না করে সামাজিকভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ফলাফল অর্জনের অক্ষমতার মধ্যে এরূপ দক্ষতার পরীক্ষা নিহিত আছে। একটি অর্থনীতি সর্বোচ্চ মানের সমতা অর্জন করেছে মর্মে তখনই দাবী করা যাবে যখন উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও সেবা এমনভাবে বন্টন করা হয় যেন(ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে) সকলের অভাব ভালোভাবে পুরণ হয় এবং কাজকর্মের, সঞ্চয়ের, বিনিয়োগের ও উদ্যোগ গ্রহণের স্পৃহাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত না করেই আয় ও সম্পদের সমবন্টন করা হয়।

এরূপ ভারসাম্যের বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে তা হবে দড়াবাজির কারনে, যা এর বাস্তবায়নকে বাতিল করে দেয়। প্রচলিত অর্থশাস্ত্র শুধু মাত্র ঐ সকল দড়াবাজিকেই স্বীকৃতি দেয় যেগুলো বাজার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা এবং বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারনে ঘটে থাকে। এর সাথে যুক্ত হতে পারে নৈতিক ব্যর্থতা যার ফলে শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য থেকে ভোক্তার অভিরুচি ও পছন্দের পরিবর্তন হতে পারে, ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমুহের পরিবর্তন হতে পারে, এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরনের পরিবর্তন হতে পারে। এ সকল দড়াবাজির আলোচনার মাধ্যমে অর্থশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে কেন এখন পর্যন্ত ইসলামের সর্বোচ্চ মান বাস্তবায়িত হয় নি এবং এর বাস্তবায়ন করতে হলে কি করা দরকার।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে সমতার সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য কি আবশ্যিকভাবে উৎপাদনশীল কাজে সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের ধারনাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? যদি তা হয় তাহলে এর কারনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বস্তুগত কল্যান কমে যাবে।[২] এভাবে পুরাতন মালের বিনিময়ে নুতন মাল কেনার প্রয়োজন হবে না। মুসলিম পন্ডিতগণ যুগে যুগে জোর দিয়ে বলে আসছেন যে, কেবল মাত্র বেশী বেশী সামাজিক শান্তি ও সংহতি উৎসাহিত করার মাধ্যমে শুধু নয়, আরো বেশী প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করার কারনে ন্যায়বিচার সম্পদের অধিকতর দক্ষ ব্যবহার ও প্রবৃদ্ধির সৃষ্টি করে। প্রচলিত উন্নয়ন অর্থনীতিও বিলম্বে এটার স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-

[২] এ প্রশ্নটি আমার নজরে আনার জন্যে আমি মুরাদ হফম্যানের নিকট কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

এর দশকে উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রবিদগণের একটি বড়দল সমতাকে শুধু অবহেলাই করেন নি, বরং জোরে-শোরে বলেছিলেন যে, "দরিদ্রদের অনুকূলে আয়ের পুণ: বন্টনের ফলে মাথাপিছু আরো বেশী উৎপাদনের অর্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার সম্ভবনা নেই"।[৩] প্রচলিত ধারনা হচ্ছে যে, কেবলমাত্র প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারলে চুইয়ে পড়ার কৌশল দিয়ে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্য ও আয় বন্টনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।[৪]

তবে, চুইয়ে পড়ার কৌশল অত্যন্ত অকার্যকর প্রমানিত হয়েছে এবং যে সকল দেশে বৈষম্য দুর করার প্রতি সামান্যই নজর দেওয়া হয়েছে সে সকল দেশে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে দিয়েছে। এর বিপরীতক্রমে জাপান, তাইয়ান এবং দক্ষিন কোরিয়ার অভিজ্ঞতা প্রমান করলো যে প্রবৃদ্ধি দ্রততর গতিতে অর্জিত পারে যদি একই সাথে সাম্যের উপর জোর দেওয়া হয়। এ কারনে উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রে গুরুত্বের পরিবর্তন আসলো। বোধোদয় হলো যে, "প্রথমে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং পরে বন্টন করা" সম্ভব নয়।[৫] জেরাল্ড মেয়ার্সের Leading Issues in Development Economics (১৯৬৪)-এর প্রথম সংস্করনে দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং আয় বন্টন কার্যত: অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু চতুর্থ সংস্করনেই (১৯৮৪) আয় বন্টনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হলো। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর অন্য একটি কর্মে তিনি এমনও বলেছিলেন যে, "দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসা" হচ্ছে "প্রকৃতই কাজের অর্থশাস্ত্র"।[৬] "পুন: বন্টনসহ প্রবৃদ্ধি", "দারিদ্র্য হ্রাস ও দুরীকরণ", এবং "মৌলিক প্রয়োজন মেটানো" ইত্যাদি আহ্বানের মধ্যে সাম্যের জন্য উদ্বেগ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে উন্নয়ন অর্থনীতি শুধুমাত্র "যৌক্তিকতার মুরুব্বী" হিসেবে থেকে যায় নি, এটা "গরীবের জিম্মাদার"ও হয়েছে। সুতরাং, অভিজ্ঞতা বলে না যে, সর্বোচ্চ মানের সাম্য অর্জন করার জন্য উৎপাদনশীল কাজে সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের ধারনা ও প্রবৃদ্ধিকে অবশ্যই জলাঞ্জলি দিতে হবে। বেশী বেশী সাম্য দ্রততর প্রবৃদ্ধি অর্জনকে উৎসাহিত করার সম্ভাবনাই বেশী এবং এভাবে তা উৎপাদনশীল কাজে সম্পদের ব্যবহার এবং সাম্যের উচ্চমান অর্জনেও সহায়ক হবে।[৭]

---

[৩] Baur ও Yamey, ১৯৫৭, পৃ: ১৬৮। এ বিষয়ে আরো মতামতের জন্য দেখুন, Chapra, 1992, pp. 153-6.

[৪] Morawetz, 1977, p. 9.

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

[৬] Meier, 1984, pp. 5 and 184.

[৭] এ অধ্যায়টি চাপরার'র ১৯৯২ সালের বইটির ১৫৩-৬ ও ১৬৭-৮৮ পৃষ্ঠা থেকে প্রচুর পরিমানে গ্রহণ করেছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে পাঠকগণ বইটি দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

লক্ষ্যসমূহ ও কর্মকৌশল

এটা দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারনা করে: প্রথমত: লক্ষ্যসমূহ কি কি এবং দ্বিতীয়ত: সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হবে? ইসলামি আইনশাস্ত্রের (উসুল আল ফিকহ্) নীতির পর্যালোচনামূলক বহু লেখায় এ সকল লক্ষ্যসমূহের উপর অনেক আলোচনা করা হয়েছে।[৮] আন্ত:শাস্ত্রীয় পর্যালোচনার পদ্ধতি অনুসরন করা হলে এ আলোচনাটি সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক অংশটুকু ইসলামি অর্থশাস্ত্রের অংশ হয়ে যাবে।

আল গাজ্জালীর (মৃত্যু ৫০৫/১১১১) মতে: "শরিয়াহ'র লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত করা, যা তাদের বিশ্বাস (দ্বীন), তাদের মানবিক সত্ত্বা (নফস্), তাদের বুদ্ধিমত্তা (আকল), ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (নাসল), এবং তাদের ধন-সম্পদ (মাল) হেফাজতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যা কিছুই এ পাঁচটির হেফাজত নিশ্চিত করে তা জনস্বার্থ রক্ষা করে এবং তা বাঞ্ছিত"।[৯] অর্থনীতিতে এ পাঁচটি লক্ষ্যের তাতপর্য পরে আলোচনা করা হবে, তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু মুসলিম সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে এ সকল আদর্শ অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, সেহেতু, "হেফাজত করা" শব্দটিকে অবশ্যই এ সকল আদর্শের 'স্থিতাবস্থা রক্ষা'র অর্থে গ্রহণ করার দরকার নেই; বরং, এ সকল আদর্শের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার প্রয়োজন হতে পারে, যেন সেগুলো অব্যাহতভাবে মানুষের কল্যান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। কতিপয় আইনশাস্ত্রবিদ এ পাঁচটির সাথে আরো কিছু যোগ করতে ও তাদের অনুক্রমে রদ-বদল আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে যে, তাদের এ প্রয়াস অধিকাংশ আইনশাস্ত্রবিদের সমর্থন পায় নি। প্রায় তিন শতক পরে লিখতে গিয়ে আল শাতিবি (মৃত্যু ৭৯০/১৩৮৮) আল গাজ্জালীর তৈরী করা এ তালিকা ও অনুক্রম সমর্থন করেন, এবং তার দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, শরিয়াহ'র সাথে সাযুজ্যতার দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এ তালিকা ও অনুক্রম সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়।[১০]

লক্ষ্যসমূহের এরুপ আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায় যে, বিশ্বাস, স্বীয় সত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ধন-সম্পদ-এর শ্রীবৃদ্ধি করা মানুষের

---

[৮] এ আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসারের জন্যে দেখুন, চাপরা, ১৯৯২, পৃ: ৭-৯; al-Raysumi, 1992, pp. 25-55, ও ২য় অধ্যায়ের ফুটনোট ৩। আরো দেখুন, মুহাম্মদ রশিদ রিদা, ১৩৫২ হিজরি, যিনি ১৬৬-৩৪৪ পৃষ্ঠায় কুর আনের দশটি লক্ষ্য আলোচনা করেছেন।

[৯] আল-গাজ্জালী, ১৯৩৭, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩৯-৪০;

[১০] আল-শাতিবি'র তালিকা ও ক্রমের জন্যে দেখুন, আল-মুয়াফাকাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৬-৭। আরো দেখুন, al-Raysumi, 1992, পৃ: ৪১-৫৫, বিশেষ করে পৃ: ৪৮।

www.pathagar.com

সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্র বিন্দু। এভাবে মানুষ নিজেই লক্ষ্য ও পাথেয় হয়ে যাচ্ছে। আল গাজ্জালী ও অন্যান্য সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম পন্ডিতদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও পাথেয় নিবীঢ়ভাবে সম্পর্কিত এবং একটি বৃত্তাকার কার্য-কারন সম্পর্কের প্রক্রিয়ার অধীন। লক্ষ্যের বাস্তবায়ন পাথেয়কে শক্তিশালী করে এবং লক্ষ্যের বাস্তবায়নকে আরো বেগবান করে। যে প্রশ্নের জবাব এখনও দেওয়া হয় নি তা হচ্ছে কেন আল গাজ্জালী ও আল শাতিবি উভয়ে বিশ্বাস, স্বীয় সত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ধন-সম্পদ-কে এমন একটি অনুক্রমে উপস্থাপন করেছেন যা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনুক্রমের আমুল বিপরীত, যেথায় বিশ্বাসের কোন স্থান নেই এবং জীবন, বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-কে গুরুত্বপুর্ণরূপে বিবেচনা করা হলেও এগুলোকে কতগুলো বহি: স্থিত চলক হিসেবে দুরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গত: কারনেই এগুলো যতখানি গুরুত্ব পাওয়া উচিত তা পায় না।

বিশ্বাসের ভুমিকা

বিশ্বাসকে প্রথম স্থানে[১১] রাখা হয়েছে কারন এর থেকে উৎসারিত হয় সেই বিশ্ববীক্ষা যা প্রভাবিত করে সমগ্র মানবতাকে – তার আচার-আচরনকে, জীবন ধারাকে, অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দকে, এবং অন্যান্য মানুষ, ধন-সম্পদ ও পরিবেশের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীকে। এটি মানুষের বস্তুগত ও মনস্তাত্তিক চাহিদাসমুহের প্রকৃতি, পরিমান ও গুণগতমান এবং সেগুলো মেটানোর পদ্ধতিকে গুরুত্বপুর্ণভাবে প্রভাবিত করে। এটি মানব সত্ত্বার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য তৈরী, ব্যক্তি-মানুষের মনে শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করা, এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি বন্ধ করার চেষ্টা করে। এটি হচ্ছে সেই নৈতিক ফিল্টার যা ধন-সম্পদের ব্যবহারকে তাৎপর্যপুর্ণ ও উদ্দেশ্যপুর্ণ করে, এবং এর কার্যকর পরিচলনার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে থাকে। ব্যক্তিগত পছন্দসমুহকে সামাজিক প্রয়োজনের আলোকে পরিবর্তন করে, এবং সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমুহ বাতিল করে এমন কাজে সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করে বা কমিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের পরিমন্ডলে আটকে রাখাই এ নৈতিক ফিল্টারের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সাযুজ্য রক্ষাকে উৎসাহিত করা হতে পারে। এরূপ সাযুজ্যতা অনিবার্যভাবে বিরাজ করে না। কিন্তু প্রচলিত অর্থশাস্ত্র তা করে মর্মে খাম-খেয়ালীভাবে ধরে নেয়।

এর অর্থ এ নয় যে, মুল্য ও বাজার ব্যবস্থার গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। নৈতিক ফিল্টারকে বাজার ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত করা হয় নি। সম্পদের

---

[১১] আল-শাতিবি এমনও বলেন, 'বিশ্বাসের স্বার্থ পার্থিব জীবনের স্বার্থের উপর নিরংকুশ প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে; (আল-শাতিবি, আল-মুয়াফাকাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৭০)।

www.pathagar.com

বরাদ্দ ও বন্টনকে দ্বৈত ফিল্টারের আওতায় এনে এটা তার পরিপুরক হিসাবে কাজ করে। প্রমিত লক্ষ্যসমুহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের আচার-আচরন ও পছন্দ-অপছন্দের মাত্রা বদলে দিয়ে এটা অসীম সম্পদ অর্জনের আকাংখা সংক্রান্ত সমস্যাকে তার উৎসমুখে – ব্যক্তির অন্তর্নিহিত চেতনায় - আঘাত করে। বাজার মুল্যের দ্বিতীয় ফিল্টার পার হওয়ার আগে ধন-সম্পদ অর্জনের আকাংখা এরুপ নৈতিক ফিল্টার দ্বারা পরিশোধিত হয়ে থাকে।

যদি ধন-সম্পদ অর্জনের আকাংখা প্রথমে এরুপ নৈতিক ফিল্টার কর্তৃক পরিশোধিত হয়, তাহলে বাজার মুল্যের ফিল্টার প্রমিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনের অনুকুল ভারসাম্যমুলক বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আরো বেশী কার্যকর হতে পারে। এটা আরো বেশী কার্যকর হতে পারে যদি আর্থিক মধ্যস্থতার কাঠামোকে ইসলামি মুল্যবোধের আলোকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয় যেন তা একটি সম্পুরক ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।[১২] সেক্ষেত্রে, সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করার শক্তি যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস পাবে। নৈতিক ফিল্টার সচেষ্ট হবে মানুষের সেই সহজাত প্রবণতা হ্রাস করতে যা অনুকুল প্রেক্ষাপটের অনুপস্থিতিতে সম্পদ বরাদ্দের প্রমিত লক্ষ্য অর্জন করতে দেয় না।

তবে, প্রশ্ন হচ্ছে যদিও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নৈতিক ফিল্টার পাওয়া যায়, তাহলে কি সেই প্রেরণা যা ব্যক্তি-মানুষকে, বিশেষ করে যারা ধনী ও ক্ষমতাশালী, তাদের আকাংখাগুলোকে এ ফিল্টার ধারা পরিশোধন করতে অনুপ্রাণিত করে যদি তা তাদের স্বার্থে আঘাত করে? যুক্তি-তাড়িত কোন মানুষ জেনে-শুনে তার স্বার্থ বিরোধী কাজ করবে এমন আশা করা বাস্তবানুগ নয়। তাছাড়া, স্বীয় স্বার্থের পেছনে ছুটে বেড়ানো অবশ্যই দোষের কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন একটি অপরিহার্য ব্যাপার। এটা তখনই অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে যখন তা সীমা লংঘন করে প্রমিত লক্ষ্য অর্জনকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং, যেখানে আপন স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাত রয়েছে সেখানে বিশ্বাস কিভাবে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক স্বার্থের আওতার ভেতরে থেকে আপন স্বার্থ হাসিলের পথে চলতে প্রেরণা যোগাবে?

এ জগতের বাইরে পরকাল পর্যন্ত টেনে নেয়ার মাধ্যমে আপন স্বার্থকে কিছুটা বেশী দীর্ঘ মেয়াদ প্রদান করে বিশ্বাস এ কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়াস পায়।

---

[১২] দেখুন, চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১০৭-২৫, এবং ১৯৯২, পৃ: ৩২৭-৩৪।

www.pathagar.com

স্বার্থপরভাবে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ইহজগতে একজন ব্যক্তির আপন স্বার্থ হাসিল করা সম্ভব হতে পারে, তবে সামাজিক কর্তব্যসমূহ পালন না করে তার পরকালের স্বার্থ হাসিল করা যাবে না। এই দীর্ঘতর মেয়াদের আপন স্বার্থ তৎসহ সর্বশক্তিমানের নিকট ব্যক্তির দায়বদ্ধতা এবং পরকালের পুরস্কার ও দন্ডের বিধান ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক কর্তব্য পালনে সচেতন করে তুলতে পারে এবং মুল্যবোধ রক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে পারে, এমনকি যদিও তা তাদের স্বল্পমেয়াদী স্বার্থে আঘাত করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সার্বিক মঙ্গলের আলোকে তার সম্পদের দাবী পেশ করতে পারে, এবং, এভাবে আপন স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধের মধ্যেও শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

বিশ্বাসের আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে এরুপ একটি পরিবেশ তৈরী করা যা পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি দৃঢ় করা এবং মানুষে মানুষে মায়া-মমতা ও সহযোগিতা উৎসাহিত করার জন্য উপযোগী। এরুপ পরিবেশ ব্যতীত পরিশোধন ও অনুপ্রানিত করার উভয় পদ্ধতি ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। দলবদ্ধভাবে (জামাতে) প্রার্থনা করা, রমযান মাসে রোজা রাখা, হজ্জব্রত পালন, জাকাত দেয়া, ও যারা নৈতিক রীতি-নীতি মেনে চলে তাদের সম্মান করা এবং যারা এগুলো মেনে চলে না তাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যম ইসলামে এরুপ পরিবেশ তৈরী করা হয়। যথার্থ অনুকুল পরিবেশ বিরাজমান থাকলে তা বাজার ব্যবস্থায় মানবিক উপাদানগুলোকে সংস্কার করতে সহায়তা করতে পারে, এবং তার মাধ্যমে মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের উৎপাদনমুখী সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করনে মুল্য ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা দুর করতে পারে। উদাহরণত: সাধারণ জীবন যাপন করলে এবং অতি মাত্রার ভোগ-বিলাস কমিয়ে ফেলা হলে ধন-সম্পদের উপর বাড়তি লোভ কমে যাবে এবং তার ফলে মৌলিক অভাব মেটানোর কাজে আরো বেশী পরিমান সম্পদ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এর ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, এবং তার ফলে কর্মসংস্থান এ প্রবৃদ্ধিও বাড়বে। ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে এরুপ পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা না হওয়ার কারনে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

তবে, বিশ্বাস এককভাবে বাজার ব্যবস্থার বৈষম্যগুলো দুর করতে সক্ষম নয়। মানব সমাজে সব মানুষ নৈতিকভাবে সচেতন হবে এমন আশা করা অবাস্তব। তাছাড়া, নৈতিকভাবে সচেতন সমাজেও কোন কোন ব্যক্তি সম্পদ ব্যবহারে সামাজিক অগ্রাধিকার সম্পর্কে অসতর্ক থাকতেই পারে। এরুপ পরিস্থিতিতে উপরে

www.pathagar.com

বর্ণিত দ্বৈত ফিল্টার পদ্ধতি অপরিহার্য হলেও যথেষ্ট কার্যকর নাও হতে পারে। রাষ্ট্রকে একটি সম্পুরক শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে। এ কাজটি রাষ্ট্রকে এমনভাবে করতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেসরকারী খাতের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ খর্ব না করা হয়। সমাজের নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করণ ও একটি অনুকুল পরিবেশ তৈরী করার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান, এবং রোধক ও ভারসাম্য রক্ষার বিধান সম্বলিত একটি সুচিন্তিত আইনগত কাঠামো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় সম্ভবত: নেই। সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যান্য সমাজে যে সকল কৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার অনেকগুলো মুসলিম দেশসমুহেও গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি বাস্তবিকভাবেই এ সকল কৌশলগুলো কার্যকরী হয়ে থাকে।

ইসলামি মুল্যবোধসমুহ বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে যত বেশী প্রেরণা প্রদান করা হবে, এবং ধন-সম্পদ ও লোভের মধ্যে একটি যথাযথ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং আর্থিক মধ্যস্থতা যতবেশী কার্যকরী হবে, রাষ্ট্রের কাংখিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনে তার ভুমিকাও তত কম হবে। তাছাড়া, জনগণের নিকট রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহি যত বেশী হবে, এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা যত বেশী হবে এবং সংবাদ মাধ্যম, আইনসভা, এবং বৈষম্য ও দুর্নীতির উদঘাটন ও শাস্তি প্রদানে আদালতের সফলতা যত বেশী হবে, কর্তব্য পালনে ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যকরতাও তত বেশী হবে।

মানবসত্তা, বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধন-সম্পদ

ধন-সম্পদকে সব শেষে স্থান দেওয়া হয়েছে একারনে নয় যে এটা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, বরং এ কারনে যে, ধন-সম্পদ অবশ্যই সমান ভাবে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য কোন কাজে আসে না যদি বাজার ব্যবস্থার সুন্দর ও সমান পরিচালনের জন্য মানুষ নিজে সংশোধন না হয়। যদি ধন-সম্পদকে সবার উপরে স্থান দেয়া হতো এবং নিজেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরুপে বিবেচিত হতো, তাহলে এটা বিবেকবর্জিত কর্মকান্ড উস্কে দিত এবং বৈষম্য, ভারসাম্যহীনতা এবং বাড়াবাড়ি গুরুত্ব পেত, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখ-শান্তি কমিয়ে দিত। সুতরাং, বিশ্বাস ও ধন-সম্পদ উভয়টি মানুষের প্রয়োজন হলেও কেবল মাত্র বিশ্বাসই সম্পদের উপার্জন ও ব্যয়কে শৃংখলাপুর্ণ ও অর্থপুর্ণ করে তুলতে পারে এবং তদদ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিলের কাজ আরো সফলভাবে করতে পারে। মুলধারার অর্থশাস্ত্র অনুমান করে যে, প্রতিযোগিতামুলক বাজার ব্যবস্থায় বিশ্বাসের বা সরকারী হস্তক্ষেপের সাহায্য ব্যতীত বাজারের নিয়ামকসমুহ নিজেরাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

www.pathagar.com

মধ্যস্থানের তিনটি লক্ষ্য (মানবসত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম) মানুষের নিজের সহিত সম্পর্কিত, যার কল্যান সাধন শরিয়াহ'র মুল লক্ষ্য। তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পুরণ করে। বিশ্বাসও এ সকল চাহিদা পুরণের জন্য নৈতিক অঙ্গিকার সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন ব্যবস্থায় যে শক্তিশালী দিক্ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে, তা ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে শুধু মাত্র মুল্য ও বাজার ব্যবস্থা থেকে আসে না, কারন ব্যক্তি- স্বার্থ হাসিল করা এবং যতবেশী সম্ভব চাহিদা সৃষ্টি করা ও পার্থিব সম্পদ অর্জন করা ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে মানুষের সকল কর্মকান্ডের মুল কেন্দ্রবিন্দু।

এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যা দৃঢ়তর ও আরো স্থিতিশীল হয় যখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের জন্য মায়া- মমতা দেখায় ও ত্যাগ স্বীকার করে, বিশ্বাস যার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে, এবং যারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ভাল ভাবে কাজ করতে পারে যদি পিতা- মাতা শিশুদের লালন- পালনের জন্য তাদের নিজেদের বস্তুগত স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি থাকে। পিতা- মাতার কেবল মাত্র স্বীয় স্বার্থ রক্ষার মানসিকতা পারিবারিক জীবন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক গরল হিসেবে আভির্ভুত হতে পারে।

এভাবে, আমাদের কাঠামোতে মানবিক সত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুক্ত করে মানব জীবনের বিচিত্র সকল প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব হতে পারে। এটা গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক চলকসমুহের ব্যাখ্যায় সহায়ক হতে পারে, যেমন ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কাজ, উৎপাদন, এবং সম্পদের এমন একটি বরাদ্দ ও বন্টন ব্যবস্থা যা সকলের কল্যান সাধন করতে সহায়তা করে – যা বাজার ব্যবস্থা ও তার ফলাফলের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসের কারনে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

সামাল দেওয়া কি অসম্ভব?

কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন এ যুক্তিতে যে, বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ধন- সম্পদ ইত্যাদির প্রচলন করে ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে সামালের অযোগ্য করা হয়েছে। আসলে বিষয়টি এ রকম নয়, কারন একজন অর্থশাস্ত্রবিদের মুল আগ্রহ বিশ্বাসের অতিন্দ্রীয় বিষয়ে নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার বিশ্ববীক্ষা, মুল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রভাব, এবং সেগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর। অর্থশাস্ত্রবিদ এগুলোর নীতিগত তাৎপর্য তুলে ধরে মুসলিম দেশসমুহকে দীর্ঘ মেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না করে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহায্য করতে

www.pathagar.com

চাইতে পারেন। তিনি আরো আলোচনা করতে পারেন কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের আচরন এমন ভাবে বদলে দেওয়া যায় যেন তাদের অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ, ভোগ, আয় রোজগার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আচার-আচরন ঠিক এমন হয় যা ইসলামের লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী। রাষ্ট্রের যে ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ও সম্ভব তাও এ আলোচনার অংশ হতে পারে।

যখন একজন অর্থশাস্ত্রবিদ মানবসত্ত্বা নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাকে মানুষের জৈবিক, বংশানুক্রমিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে না। বরং, তিনি ব্যক্তি সত্ত্বার সে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করেন যেগুলো সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনকে এমন ভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তা পরিপুর্ণ মানবিক বিকাশে সহায়ক হয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পার্থিব জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে। এটা ভোগ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, আয় বন্টন এবং গোষ্ঠীগত কল্যান (বিশেষত: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য)-এর বিষয়ে এমন এক প্রকার আলোচনার সুত্রপাত করতে পারে যা মানুষের অন্তরের সুখ ও সন্তুষ্টি এবং সামাজিক শান্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

যখন তিনি (অর্থনীতিবিদ) বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন মানব মনের জীববিদ্যা ও রসায়ন সম্পর্কে তাঁর সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি পরীক্ষা করবেন যে প্রকার মানসিক ও বস্তুগত অবস্থা বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত, এবং কারিগরি অগ্রগতিতে অবদান রাখে, এবং ইসলামের লক্ষ্য অনুসারে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি স্থাপনে অবদান রাখে। আল রাইসুনী যথার্থই বলেছেন যে, "বুদ্ধিমত্তার হেফাজত ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে শরিয়াহ'র গুরুত্বারোপ কেবলমাত্র নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা এবং যারা এগুলোতে লিপ্ত হয় তাদেরকে শাস্তি প্রদানের মধ্যেই সীমিত নয়। কখনও কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য না দেখে কি বুদ্ধিমত্তার অপচয় হয়েছে? সেগুলোর অপচয় হয়েছে অজ্ঞতা, নিস্পৃহা, অকার্যকর ব্যবহার ও অন্ধ অনুকরণের কারনে"।[১৩] সুতরাং, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা ও সরকারের ব্যর্থতার কারন পর্যালোচনা করা, এবং এরুপ ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য মুলবোধ, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা পর্যালোচনা করা থেকে অর্থশাস্ত্রবিদ বিরত থাকতে পারে না।

যখন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলেন, তখন তিনি তাদের জীববিদ্যা ও বংশগত দিক্ নিয়ে ব্যস্ত হন না। বরং, তিনি তাদের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির

---

[১৩] al-Raysumi, 1992, পৃ: ২৭০।

www.pathagar.com

দিকে তাকান। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রজন্মের আচার-আচরনের সে সকল দিক্ পর্যবেক্ষনের দরকার হতে পারে যা পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক অস্থিরতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, ঋণ গ্রহণ ও ঋণের সুদাসল পরিশোধ, নবায়নের অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে নি:শেষ করন, পরিবেশ দূষণ, এবং সার্বিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মত বিভিন্ন চলকের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও কল্যাণকে প্রভাবিত করতে পারে।

এরুপ ভাবে ইসলামের লক্ষ্যসমুহ বিবেচনার মধ্যে রাখা হলে তা অর্থনৈতিক বিশ্লেষন পদ্ধতিতে আরো অর্থপুর্ণ আঙ্গিক প্রদান করতে সাহায্য করে। এভাবে, মানব জীবনকে দেওয়াল দ্বারা বিভাজন করা হয় না। যার ফলে প্রতিটি অংশ স্বশাসিত হয়ে যায় এবং অন্য অংশে কি হচ্ছে সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন থাকে। বরং, মানব জীবনকে একটি সমন্বিত একক রুপে বিবেচনা করা হয়। নিজস্ব বিশেষায়িত ক্ষেত্র থাকা সত্বেও প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্র গোটা মানবিক সত্ত্বা ও সকল শাস্ত্রের পরস্পরের উপর প্রভাব বিবেচনায় গ্রহণ করে থাকে। মানব কল্যান যেন সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তা নিশ্চিত করতেই এরুপ করা হয়।

সংজ্ঞা ও আওতা

সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, এটি হচ্ছে জ্ঞানের একটি শাখা যা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অযথা খর্ব না করে, অব্যাহতভাবে সামষ্টিক অর্থনীতির ও প্রতিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না করে কিংবা পারিবারিক এবং সামাজিক সংহতি ও সমাজের নৈতিক কাঠামোকে দুর্বল না করে সীমিত সম্পদের এমন বরাদ্দ ও বন্টনের মাধ্যমে মানব কল্যান সাধনে সহায়তা করে, যা ইসলামের লক্ষ্যসমুহের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ।[১৩] মানব

[১৩] বিভিন্ন ইসলামী পন্ডিতগণ কর্তৃক ইসলামী অর্থশাস্ত্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ সকল সংজ্ঞাসমুহের কতিপয় কালানুক্রমিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো:

এস এম হাসানুজ্জামান, "ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে শরীয়াহ'র নিষেধাজ্ঞা ও বিধি-বিধানের জ্ঞান ও প্রয়োগ যা মানুষকে সন্তুষ্টি প্রদান ও আল্লাহ তা'লা ও সমাজের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে বস্তুগত সম্পদ অর্জন ও বন্টনের ক্ষেত্রে অবিচার রোধ করে থাকে"(হাসানুজ্জামান, ১৯৮৪, পৃ: ৫২)।

এম এ মান্নান, "ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত একটি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে" (মান্নান, ১৯৮৬, পৃ: ১৮)।

খুরশিদ আহমাদ, ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে "অর্থনৈতিক সমস্যা ও তৎপ্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ ইসলামী প্রেক্ষাপটে অনুধাবনের একটি সুসংগঠিত প্রয়াস" (আহমাদ, ১৯৯২, পৃ: ১৯)।

www.pathagar.com

কল্যানকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যসমুহ তাত্ত্বিক আলোচনা ও কৌশল প্রণয়ন উভয়কে একটি দৃঢ় দিক্ নির্দেশনা দিতে সহায়তা করে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদি হয়ে থাকে মানব কল্যান সাধন, তাহলে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই এরুপ কল্যান সাধনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে অর্থপুর্ণভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে হবে। মানব কল্যান সাধনে সহায়তা করতে পারে এরুপ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের ভারসাম্যপুর্ণ অনুপাত কাঠামো সমাজে আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান নাও থাকতে পারে এবং তা তৈরী করার দরকার হতে পারে। 'সার্বভৌম' ভোক্তা সার্বভৌম নাও থাকতে পারে। সুতরাং, ভোক্তার অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত নাও হতে পারে। সে গুলোকে অর্থনৈতিক মডেলের অন্ত:ভুক্ত করার দরকার হতে পারে এবং সামাজিক মুল্যবোধ ও লক্ষ্যসমুহের আলোকে সংস্কার করা আবশ্যক হতে পারে। এমনকি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহকেও তাদের কর্মপদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমুলক শৃংখলা প্রবর্তনের জন্য এ সকল মুল্যবোধের আওতাভুক্তকরণ দরকার হতে পারে। এর ফলে বাদ দিতে হতে পারে সেই (ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের) ভারসাম্যপুর্ণ অনুপাত কাঠামো সংক্রান্ত অনুমান যেখানে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র অবাস্তবভাবে ধরে নিয়েছে যে প্রতিটি বাজার ব্যবস্থায় এরুপ অনুপাত কাঠামো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বজায় থাকে। অর্থশাস্ত্রের কাজ হচ্ছে এরুপ ভারসাম্যপুর্ণ অনুপাত কাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তাকারী সকল বিষয়সমুহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ও পরামর্শ প্রদান করা।

সৌভাগ্য বশত: প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনুমান মতে মানুষ সব সময় কেবল মাত্র স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য কাজ করে না; তারা আদর্শ বা পরার্থপর কাজও করে থাকে। তাদের আচরন এ দু'টি চরম বিপরীত প্রান্তের মধ্যে ওঠা-নামা

এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে "তাদের সময়ের অর্থনৈতিক সমস্যাসমুহের প্রতি মুসলিম চিন্তাবিদগণের প্রতিক্রিয়া। এ প্রয়াসে তারা কুর'আন, সুন্নাহসহ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য পেয়েছেন" (সিদ্দিকী, ১৯৯২, পৃ: ৬৯)।

এম আকরাম খান, "ইসলামী অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীর সম্পদ সংগঠিত করে মানুষের কল্যান সাধনের বিষয়ে গবেষণা করা" (খান, ১৯৯৪, পৃ: ৩৩)।

সৈয়দ নওয়াব হায়দার নাকভি, "ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে একটি আদর্শ মুসলমান সমাজের মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমুলক আচার-আচরণ" (নাকভি, ১৯৯৪, পৃ: ১৩)।

লুই ক্যান্টরি, "ইসলামী অর্থশাস্ত্র হচ্ছে অধিকতর মানুষ-কেন্দ্রিক ও অধিকতর সমাজ-কেন্দ্রিক একটি অর্থশাস্ত্র প্রণয়ণের সাধারণ প্রয়াস, যা চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতাকে অস্বীকার করতে চায়" (আবু আল-রবি, ১৯৯৪, পৃ: ৮২)।

www.pathagar.com

করে থাকে। [১৫] নীতিগতভাবে এটি বাজার ব্যবস্থার মত, যা যথার্থভাবে প্রতিযোগিতাপুর্ণ কিংবা যথার্থভাবে একচেটিয়া নাও হতে পারে। অতএব প্রচলিত অর্থশাস্ত্র সুষম প্রতিযোগিতাপুর্ণ ও অসম প্রতিযোগিতার ও একচেটিয়া পরিবেশে ভোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের আচরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইহা সুষম প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করে। কারন ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখায় যে, সুষম প্রতিযোগিতা উৎপাদনমুখী কাজে সম্পদ ব্যবহারের সর্বোচ্চ মান অর্জন করার জন্য উপযোগী। অর্থশাস্ত্র কেন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বীয় স্বার্থ রক্ষাকারী ও আদর্শ আচরনের উপর গবেষণা করবে না তার কোন কারন নেই।

উভয় রকম আচরণের উপর গবেষণার মাধ্যমে যে পরিস্থিতি এরূপ আচরণের জন্য দায়ী তা ব্যাখ্যা করা এবং সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা করা সহজ হতে পারে। এর ফলে 'বিদমান অবস্থা'র একটি অধিকতর বাস্তব চিত্র পাওয়া যেতে পারে, এবং শুধু কেবল ভবিষ্যৎ বাণী করার ক্ষমতাই বাড়বে না, বরং লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যকর কৌশল প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। একটি সমাজের অধিকাংশ লোকের আচার-আচরণ আত্ম-কেন্দ্রিক নাকি আদর্শ মানের হবে তা সমাজটির বিশ্ব-বীক্ষা, ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র, অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, বিশেষ পরিস্থিতি, এবং উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করায়, উৎসাহ, সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ও প্রতিরোধমুলক শাস্তির বিধান করণে সরকারের ভুমিকার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে যে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে তা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের চেয়ে অনেক অনেক বেশী হবে। এর প্রথম কাজ হতে পারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, বাজার ব্যবস্থা, এবং সরকারগুলোর প্রকৃত আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করা। প্রচলিত অর্থশাস্ত্র এটাই করতে চায়। কিন্তু শুধু মাত্র আত্ম-কেন্দ্রিক আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করার ও আত্ম-কেন্দ্রিক আচরণকে পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি ও অভাব মেটানোর ইহজাগতিক অর্থে সংজ্ঞায়িত করার স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতার কারনে তা করতে পারছে না। সুতরাং, কোন অবাস্তব অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন বিশেষ দিকের মধ্যে নিজকে সীমিত না রেখে ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে মানুষের বাস্তবিক আচরণ নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

---

[১৫] কুর'আন অনুসারে মানুষের ন্যায় পথে এবং অন্যায়ের পথে চলার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং, তারা আধ্যাত্মিকতার শিখরে আরোহন করতে ও অনৈতিকতার সর্বনিম্নে নেমে যেতে সক্ষম (দেখুন, আল-কুর'আন, ৯১:৮; ৯২:৪ ও ৯৫: ৪-৮; আরো দেখুন, এ আয়াতগুলোর উপর মুহাম্মদ আসাদের মন্তব্য)।

www.pathagar.com

যেহেতু, প্রকৃত আচার-আচরণ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতেও পারে নাও হতে পারে, ইসলামি অর্থনীতির দ্বিতীয় কাজ হতে পারে লক্ষ্য অর্জনে কিরূপ আচার-আচরণ বিরাজ করা প্রয়োজন তা জানানো। যেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে, নৈতিক মুল্যবোধগুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জন করা, সেহেতু, ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে ইসলামি মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনায় গ্রহণ এবং সেগুলো ব্যক্তির অভিরুচী, পছন্দ-অপছন্দ ও আচার-আচরণে কী প্রভাব ফেলছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হতে পারে।

তবে, আচার-আচরণের প্রকৃত অবস্থা ও আদর্শিক অবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকার কারনে, ইসলামি অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় কাজ হতে পারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর অনুসৃত বাস্তব আচরণের কারন ও প্রত্যাশিত আদর্শ আচরণ না করার কারন জানতে চেষ্টা করা।

তাছাড়া, জ্ঞান অন্বেষণের একটি প্রাথমিক লক্ষ্য যেহেতু মানুষের অবস্থার উন্নয়ন, সেহেতু, ইসলামি অর্থশাস্ত্রের চতুর্থ কাজ হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য একটি কার্যোপযোগী কৌশল বাতলে দেওয়া – এমন একটি কর্মকৌশল যা বাজার ব্যবস্থায় সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম সকল পক্ষের আচরণ যত দুর সম্ভব লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। বল প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তিকে প্রত্যাশিত পথে চলতে বাধ্য করা যায় না। শক্তি-প্রয়োগ কখনও সফলতা আনে নি এবং তা কখনও সফল নাও হতে পারে। এটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে কঠোর করে তোলে। তথাপি, মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জন করতে হলে পরিবর্তন হয়ত: অপরিহার্য। সবচেয়ে ভাল কৌশল হচ্ছে হযরত মুহাম্মদসহ সকল পয়গম্বরগণের (তাদেঁর সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পথ অনুসরন করা। তাদেঁর সকলের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো, যা ব্যতীত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন করা কঠিন ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত অনুপ্রেরণা প্রদান করে, এবং এগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ সংস্কারের মাধ্যমে তাঁরা এটা অর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন।

এ কাজে ইসলামি অর্থশাস্ত্র পুরো-পুরি সফল নাও হতে পারে, যেমনটি প্রচলিত অর্থশাস্ত্রও একটি সম্পুর্ন প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সফল হয়নি। তবে, একচেটিয়া বাজার, ব্যবসায়ী সংঘ এবং প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রন করে, করারোপ করে এবং শাস্তি প্রদান করে প্রতিযোগিতাকে যতদুর সম্ভব আদর্শ অবস্থার কাছাকাছি নিয়ে

www.pathagar.com

আসা হয়। একই ভাবে, সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও সমাজ-চ্যুতি, করারোপ, ফী ধার্য করন ও শাস্তির বিধান করন, এবং আবশ্যকীয় ও সম্ভাব্য অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ম-বিরোধী আচরন নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। এভাবে, এমন একটি কর্ম-পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হতে পারে যার ফলে নিয়ম-বিরোধী আচরণ ন্যুনতম পর্যায়ে রাখা যায়। আচরণ পরিবর্তনে যতটুকু সফলতাই আসুক না কেন তা অসাম্য দুর করতে ও মানবিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন করতে কল্যান রাষ্ট্রের বোঝা-লাঘবে সহায়তা করবে।

এরূপ সার্বিক পদক্ষেপ ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে মুসলিম দেশসমুহের সকল সমস্যা বিশ্লেষন করার কাজে শুধু সাহায্যই করবে না বরং এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায়ও বাতলে দিবে এবং লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর আচরণ বাস্তবে কেমন (প্রচলিত অর্থশাস্ত্র) এবং তাদের আদর্শ আচরন কেমন হওয়া উচিত (ইসলামি অর্থশাস্ত্র) মুলত: এ ধরনের আলোচনার মধ্যে নিজকে সীমিত রেখে ইসলামি অর্থশাস্ত্র এ কাজ সম্পাদন করতে পারবে না। ইসলামি অর্থশাস্ত্র যদি কেবল মাত্র অর্থশাস্ত্রের চলকসমুহের মধ্যে, বিশেষত: নিকট অতীতের চলকগুলোর মধ্যে, সীমিত থাকে তাহলেও তার কাজ সম্পাদনে সফল নাও হতে পারে। বরং, তাকে বিবেচনায় গ্রহণ করতে হতে পারে সকল মুখ্য নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সমুহ যা অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে। যেহেতু এ সকল বিষয়সমুহ প্রভাবিত করে এবং সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে এরা নিজেরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। সেহেতু, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক মাত্রার অনুপ্রবেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঘটবে। সেক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের শক্তির পথ প্রদর্শণকারী একটি বহু-শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠবে।

কাজটি নি:সন্দেহে কঠিন, তবে সৌভাগ্য বশত: ইসলামি অর্থশাস্ত্র একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে না। মানবিক, সামাজিক, রীতি মাফিক, অনুদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের অব্যাহত অবদান হিসেবে প্রাপ্ত অনেক লেখা থেকে ইসলামি অর্থশাস্ত্র উপকৃত হতে পারে। যেখানেই পাওয়া যাক না কেন প্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে উপকার নিতে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়।[১৬] ইসলামি অর্থশাস্ত্রীয় লেখায় এরূপ বাধ্যবাদকতা

---

[১৬] মহানবী (স:) বলেছিলেন: 'জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে হলেও গমন কর, কারন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য' (আনাস ইবনে মালিক থেকে আল-বেয়াহাকি কর্তৃক তার শুরুআব আল-ইমান, ২য় খন্ড, পৃ: ২৫৪: ১৬৬৩ এ উদ্বৃত)। এটা একটা দুর্বল হাদিস।

www.pathagar.com

এখন সম্পূর্ণ স্বীকৃত। ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি অর্থ ও রাজস্ব অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারের কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপনায় সম্পাদক মুহাম্মাদ আরিফ বলেন: "পুর্ববর্তি আলোচনা ঈঙ্গিত প্রদান করে যে, পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রের ধারনাসমুহ, বিশ্লেষনী কৌশল, এবং নীতি-পদ্ধতি সম্পুর্ণরুপে বর্জন বা গ্রহণ করার কোন ভিত্তি ইসলামি অর্থশাস্ত্রে নেই"।[১৭] অতএব ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে শুন্যতা পুরণে এবং জ্ঞানের পরিধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অতীতের ন্যায় গ্রীস, পারস্য, চীন, ভারত থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে এবং তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দির মত একইভাবে তার দক্ষতা দেখাতে হবে।

সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণী ও ভবিষ্যৎ বক্তার ভুমিকা থেকে আরো অগ্রসর হয়ে সকল প্রাসঙ্গিক চলক ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্ম-কৌশল বিশ্লেষণ করতে হতে পারে। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও কৌশলগত উভয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। যদিও স্বতন্ত্রভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, ইসলামি অর্থশাস্ত্র কর্তৃক ব্যবহৃত অনেকগুলো চলক আবশ্যিকভাবে পরিমাপযোগ্য নয়। তবুও, নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এগুলোকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। এর ফলে ইসলামি অর্থশাস্ত্র আরো কঠিন একটি শাস্ত্রে পরিণত হতে পারে। তথাপিও, এরুপ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পথ থেকে মুসলিম অর্থশাস্ত্রবিদগণের পিছিয়ে আসা উচিত নয়। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের সফলতা মানবজাতির অনেক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানব কল্যান সাধনে তাদেরকে আরো কার্যকর অবদান রাখার সুযোগ দিবে।

কার্য প্রণালী

কেবলমাত্র ব্যাখ্যা প্রদান,[১৮] ভবিষ্যৎ বাণী করা,[১৯] ও যুক্তি দিয়ে বোঝানোর[২০] চেয়ে মানব কল্যান সাধনই যদি ইসলামি অর্থশাস্ত্রের কাজ হয়ে থাকে, তবে এর জন্য একটি কার্য-প্রণালী উদ্ভাবন করতে হবে যা এ কঠিন কাজের জন্য উপযুক্ত। এর তুলনামুলক সীমিত লক্ষ্য সত্বেও প্রচলিত অর্থশাস্ত্র অর্থনীতির

তবে, ইসলামের রীতি-নীতির সাথে সংগতি পূর্ণ বিধায় এবং স্থান নির্বিশেষে জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করার কারনে এটা বহুল প্রচারিত। ইসলামের উন্নতির প্রথম শতাব্দিগুলোতে প্রকৃত পক্ষে এটিই ছিল মুসলমানদের প্রচলিত রীতি।

[১৭] আরিফ, ১৯৮২, পৃ: ৩।

[১৮] ন্যাজেল, ১৯৬১।

[১৯] ফ্রিডম্যান, ১৯৫৩।

[২০] ক্র্যামার, ১৯৮৪।

www.pathagar.com

কার্য-প্রণালীর প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদান করতে পারে নি। যদিও ১৯৮০-এর দশকে এ বিষয়ের উপর প্রচুর লেখা-লেখি হয়েছিল। সামাজিক জগতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যক্তিগত মুল্যায়নের পরিধি সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদের কারনে সম্ভবত: এরূপ হয়েছিল। এক দিকে, প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় সামাজিক জগৎকেও একটি শৃংখলাপুর্ণ জগৎরূপে ধরে নেওয়া, এবং মুলত: অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় মানুষের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদিদের আত্ম-বিশ্বাস। অন্য দিকে, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের বিশ্বাস ও পক্ষপাতদুষ্ট মতামতের ফলশ্রুতিতে সেগুলোর ব্যাখ্যায় সহজাত পক্ষপাতদুষ্টতার কারনে নিয়ম-বদ্ধ কার্য-প্রণালীর বিরোধিতা রয়েছে।[২১]

ক্রেমারের মতে তাত্ত্বিক মতভেদসমুহ অভিজ্ঞতালব্ধ সকল সাক্ষ্য-প্রমান জড় করে মীমাংসা করা সম্ভব হয় নি যে, "অর্থশাস্ত্রের মধ্যে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর কলা-কৌশল রয়েছে। একই রকম মান ও সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের অনুপস্থিতিতে অর্থশাস্ত্রবিদগণকে বিবেচনাপ্রসূত মতামতের উপর নির্ভর করতে হয়, এবং তাঁরা তাঁদের এরূপ মতামত সকলকে বোঝানোর জন্য যুক্তি তুলে ধরেন। এ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভঙ্গী ও সামাজিক শৃংখলার মত যুক্তি-বহির্ভুত উপাদানের অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকে"।[২২] সুতরাং, জ্ঞানের সকল সম্ভাব্য উৎসসমুহ ব্যবহার না করে সম্ভবত: কোন উপায় নেই। মনে হচ্ছে যে, যাদের কোন একটি বিশেষ কার্য-প্রণালী অনুসরন করার ধারনায় আস্থা নেই, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে তারাই প্রাধান্য বিস্তার করছে। ফেয়েরাবেন্দ বেশ খোলা-খুলি ভাবেই বলেছেন যে, "বিজ্ঞান কতিপয় নির্ধারিত বিধিমালা অনুসারে চলতে পারে এবং ঐ সকল নির্ধারিত বিধিমালা অনুসরন করেই তার চলা উচিত, এবং এ সকল নির্ধারিত বিধিমালার সহিত 'সামঞ্জস্যতার মধ্যে বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা' নিহিত থাকার ধারনা অবাস্তব ও ভুল"।[২৩] সুতরাং, কল্ডোয়েলের প্রতিক্রিয়া যথার্থই কার্য-প্রণালীগতভাবে বহুবাচনিক।[২৪]

প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে কার্য-প্রণালীর বিষয়ে এরূপ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি অর্থশাস্ত্রের কোন প্রস্তাবনা গ্রহণ বা বর্জনের জন্য একটি একক কার্য-প্রণালীর

---

[২১] দেখুন, হাউজম্যান, ১৯৯২।
[২২] ক্র্যামার, ১৯৮৪, পৃ: ২৩৪।
[২৩] P. Feyerabend, *Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge*, এ বইয়ের ১৯৭০ সালের সংস্করণ (পৃ: ৯১), থেকে লরেন্স বোল্যান্ড কর্তৃক "Scientific Thinking without Scientific Knowledge", Blackhouse, 1994, পৃ: ১৫৪-এ উদ্বৃত।
[২৪] Caldwell, 1982, pp. 243-7.

www.pathagar.com

খোঁজ করা সম্ভবত: বৃথা, কারন ইসলামি অর্থশাস্ত্রের পরিধি অনেক ব্যাপকতর ও তার কাজ আরো কঠিন। সম্ভবত: কার্য-প্রণালীগত বহুবাচনিকতাই সবচেয়ে উপযোগী, এবং মনে হচ্ছে অতীতে মুসলিম পন্ডিতগণ এটিই পছন্দ ও গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, সিদ্দিকী যথার্থই বলেছেন যে, "অর্থশাস্ত্রে ইসলামি বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকতা মুক্ত, যা নমনীয় কার্য-প্রণালীর আওতায় বিষয়ের তাৎপর্য ও লক্ষ্যের উপর জোর দিয়ে থাকে"।[২৫]

কতিপয় যৌক্তিক পদক্ষেপ

তবুও, কোন প্রস্তাবনা বা অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাতিল করার পুর্বে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। এ সকল পদক্ষেপগুলোর প্রথমটি হচ্ছে বিবেচ্য প্রস্তাবনাটি ইসলামের 'একনিষ্ঠ' বা 'যৌক্তিক কাঠামো'র আলোকে সামঞ্জস্যপুর্ণ বিবেচিত হওয়ার যোগ্য কি না। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এরুপ পরীক্ষা নেওয়া অপরিহার্য। কারন, "ইসলামি অর্থশাস্ত্র শুরু হয় স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত লক্ষ্য ও মুল্যবোধের ধারনা নিয়ে এবং এগুলো ব্যতীত ইসলামি অর্থশাস্ত্রের ধারনাই করা যায় না"।[২৬] নিরপেক্ষতার ছদ্মাবরনে এগুলো না এড়িয়ে অর্থশাস্ত্রবিদগণ মুল্যবান অবদান রাখার সুযোগ পেতেন যদি শুরুতেই তাঁরা তাঁদের অনুসিদ্ধান্তগুলো শরিয়াহ'র যৌক্তিক কাঠামোর আলোকে পর্যালোচনা করে নেন।

কার্য-প্রণালীর এই প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে কোনরুপ সংকোচ বোধ করার প্রয়োজন নেই কারন সকল বিজ্ঞানেই, বিশেষত: অর্থশাস্ত্রে, সামঞ্জস্যতার শর্ত প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[২৭] কুহনের মতে বিশেষ কোন একটি বিশ্ববীক্ষা গ্রহণের উপর বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভরশীল এবং পরবর্তি সকল গবেষণা এই বিশ্ববীক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হয়ে থাকে।[২৮] "তত্ত্ব হচ্ছে এক প্রকার কাঠামোগত একক" এবং "নিখুঁত কাঠামোগত তত্ত্বের আকারেই ধারনাগুলো সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য অর্জন করে থাকে"।[২৯] "কর্মসূচীর প্রণেতার কার্য-প্রণালীগত সিদ্ধান্তের কারনে" কোন কর্মসূচীর মুল অংশ মিথ্যা হয়ে যায় না।[৩০] যে বিজ্ঞানী এরুপ মুল অংশ

---

[২৫] Siddiqi, 1988, p. 155.

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

[২৭] ফেয়ারাব্যান্ড সম্ভবত: ঐ সকল বিজ্ঞান দার্শনিকদের একজন যারা সামঞ্জস্য অবস্থার প্রতি সম্মতি প্রদান করে নি। দেখুন, তার *Against the Method*, 1993, পৃ: ২৪।

[২৮] Kuhn, 1970.

[২৯] Chalmers, 1982, pp. 77, and 79.

[৩০] Lakatos, 1974, p. 133.

www.pathagar.com

পরিবর্তন করেন তিনি সেই বিশেষ গবেষণা কর্ম থেকে নিজকে প্রত্যাহার করে নেন।[৩১] সেই মতে, যা কিছুই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কাঠামোর সহিত খাপ খায় না, তা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রেও বাতিল করে দেওয়া হয়। সম্ভবত: এ কারনেই প্রাতিষ্ঠানিক, মানবতাবাদি এবং সামাজিক অর্থশাস্ত্র ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেতে সক্ষম হয় নি। এগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কাঠামোর সহিত ভাল ভাবে খাপ খায় না।

সুতরাং, প্রথম পদক্ষেপটি প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে সাধারণভাবে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড অবশ্যই সীমিত হয়ে যাবে না, বিশেষত: একারনে যে, ইসলামি কাঠামোর মৌলিক অংশের পরিধি খুব বেশী বড় নয় এবং খুঁটি-নাটি বিষয়গুলো খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে না। তবে, মুসলিম সভ্যতার অবনতি ও ফিকহ্ শাস্ত্রের স্থবিরতার কয়েক শতাব্দি ধরে সংঘটিত অতি-অগ্রসরতা থেকে এই মৌলিক অংশকে আলাদা করার প্রয়োজন হতে পারে। শরিয়াহ'র লক্ষ্যসমুহ ও স্থান-কাল বিবেচনায় না নিয়ে মুল রচনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নাও হতে পারে। এটা যদি করা হয় তাহলে এর দ্বারা যৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক, অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ, এবং মানবীয় বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ইসলামের কাঠামোর সাথে কোন বিরোধে না গিয়ে, একটি 'কোমল মৌলিক বিশ্বাস'র বিকাশের জন্য নমনীয় ও উদারনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে।[৩২]

এর পর আসে কার্য-প্রণালীর দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ – যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তাবনার যৌক্তিক বৈধতার পর্যালোচনা। এ কাজটিই মুতাজিলাইটসগণ করার চেষ্টা করেছিল। তারা যুক্তি দেখালো যে, ইসলামের সকল দীক্ষা মানুষের কল্যান সাধনের জন্য নিবেদিত।[৩৩] তবে, তাদেরকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এ কারনে যে, তাদের কেউ কেউ এত চরম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল যে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এমন সব কিছুকে তারা বাতিল করে দিত এবং তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা বল প্রয়োগ করতো। ইবনে রুশদ-এর (মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮) মধ্যপন্থীগণ যুক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি আশারীয়দের মত মধ্যপন্থী রক্ষণশীলগণও শরিয়াহ'র দীক্ষার সমর্থনে যৌক্তিক বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নি,

---

[৩১] Chalmers, 1982, p. 81.

[৩২] স্থান-কালের বিষয়টির উপর একটি পর্যালোচনার জন্যে দেখুন, আবু সোলায়মান, ১৯৯৩, পৃ: ৬৩-৯৬।

[৩৩] দেখুন, আল-শাতিবি, *আল-মুয়াফাকাত*, ২য় খন্ড, পৃ: ৬।

www.pathagar.com

এবং তাদের পাঠ্যক্রমে 'ইলম আল-কালাম' অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীলগণ ব্যতীত, যারা কিনা হেরে গিয়েছিল, অন্য সব পন্ডিতগণ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শরিয়াহ'র যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছিলেন। উদাহরণত: এটা আল-শাতিবি'র (মৃত্যু ৭৯০/১১৯৮) "আল-মুয়াফাকাত" ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র (মৃত্যু ১১৭৬/১৩৮৮) "হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ"-তে প্রতিফলিত হয়েছিল, যাদের উভয়ের মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে, শরিয়াহ'র নির্দেশিত প্রতিটি মূল্যবোধ ও কাজের পেছনে শক্ত যুক্তি রয়েছে। এগুলো ইসলামের লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নে সহায়তা করে। মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু ১৩২৩/১৯৯৫), তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ রশীদ রিদাসহ (মৃত্যু ১৩৫৪/১৯৩৫)[৩৩] প্রায় সকল আধুনিক লেখকের লেখায় একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

কার্য-প্রণালীর তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে যতদুর সম্ভব উদ্ভূত সকল প্রস্তাবগুলোকে বর্তমান ও অতীতের মুসলিম ও অমুসলিম সমাজ সমুহের ঐতিহাসিক দলিলপত্র ও পরিসংখ্যানগত তথ্যাদির আলোকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা। অন্ত: সার শুন্য নয় তবে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক এমন প্রস্তাবনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তাবনাকে ঘটনার আলোকে যাছাই করতে হয়। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে, ভবিষ্যৎ বাণী করতে, ও আরো কার্যকরভাবে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর জন্যে, এবং 'বিদ্যমান অবস্থা' থেকে 'যা হওয়া উচিত' সেই অবস্থায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আরো আস্থার সহিত পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে অর্থশাস্ত্রবিদগণকে এটা সহায়তা করে।

কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের মধ্যেই কতিপয় মুখ্য চলকের উল্লেখ রয়েছে যার উপর মানুষের কল্যাণ বা দুর্দশা নির্ভর করে। এটা করা হয়েছে একটি কার্য-কারন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এভাবে যে, যদি 'ক' হয় তা হলে তার পর 'খ' হবে, যেখানে 'ক' হচ্ছে প্রয়োজনীয় রীতি-নীতি বা প্রতিষ্ঠান, এবং 'খ' হচ্ছে ফলাফল যা সকল জীবিত প্রাণী বিশেষত: মানুষের মঙ্গলের জন্য 'ক' অর্জন করতে সক্ষম। ঠিক যেমন যথার্থ অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রস্তাবনা, তত্ত্ব ও সূত্রের উদ্ভাবন ঘটে, তেমনি ইসলামের লক্ষ্যসমুহ এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত আচরণের বিভিন্ন প্রকারভেদসহ কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত পরিশোধন, অনুপ্রাণিতকরণ, পুণ: গঠন ও সরকারের ভুমিকা'র মধ্যকার সম্পর্কও মুল্যবান প্রস্তাবনার উদ্ভব ঘটাতে পারে। এরুপ প্রস্তাবনাসমুহ যতদুর সম্ভব এমনভাবে

---

[৩৩] দেখুন, তাদের তাফসির আল-কুর'আন আল-হাকিম, এম রশিদ আল রিদা কর্তৃক লিখিত, ১৯৫৪, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৬৭-৭০।

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে হবে যেন সেগুলো থেকে তত্ত্ব ও সূত্র পাওয়া যায়। এরুপ পরীক্ষা-নীরিক্ষার ফলে আমরা কুরআন ও সুন্না'র ভাষা আরো ভালভাবে বুঝতে পারবো এবং বাস্তবতার সাথে মিলেনা এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাতিল করে দিয়ে বিভিন্ন ধারনার মধ্যে একটি বড় ধরনের মিলন ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রস্তাবনাগুলো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করাও ইসলামি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন নিজেই এরুপ পরীক্ষা-নীরিক্ষার উপর জোর দেয়। কুরআনে বর্ণিত আদর্শ তত্ত্বগুলোর সত্যতা বা ইতিবাচকতা তুলে ধরার লক্ষ্যে মানুষকে অতীত-সভ্যতার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে তাকাতে উৎসাহী করার জন্য কুরআনে প্রচুর আয়াতের উপস্থিতি রয়েছে। কুরআন বলছে, "পৃথিবী ঘুরে দেখে আস তাদের শেষ পরিণতি যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে" (৩: ১৩৭)। এটিসহ আরো কয়েকটি আয়াতে[৩৫] এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআনে বর্ণিত আদর্শ তত্ত্বসমুহ ঘটনার আলোকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যেতে পারে।

প্রস্তাবনা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা মুসলিম ইতিহাসে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়। আল-কিন্দি'র (মৃত্যু ২৫২/৮৬৬) কথায় এটি প্রতিফলিত হয় যখন তিনি বলেন, একজন পন্ডিতের পক্ষে "প্রমান করা হয় নি এমন বিবৃতি প্রদান করা উচিত নয়"।[৩৬] ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬) বিশ্বাস করতেন যে, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমানের সাহায্য নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানেও কার্য-কারন সম্পর্ক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা সম্ভব।[৩৭] তিনি তাঁর প্রস্তাবনার সপক্ষে ৪০৫টি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন,[৩৮] এবং বলেছিলেন যে, "অতীতকে বর্তমানের মত দেখায়, ঠিক যেমন পানিকে পানির মত দেখায়"।[৩৯] সম্ভবত: তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, "সামাজিক ঘটনাসমুহ মনে হয় ঐ সকল বিধি-বিধানসমুহ মেনে চলে (যদিও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়ামকগুলোর মত সম্পূর্ণ ব্যতীক্রমহীনভাবে নয়) যেগুলো সামাজিক ঘটনাবলীর একটি নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট ধাঁচ ও অনুক্রম অনুসরন করার জন্য যথেষ্ট অপরিবর্তনীয়। সুতরাং, এ সকল বিধি-বিধানের বিষয়ে ধারনা অর্জন করা হলে তা সমাজতত্ত্ববিদগণকে তার চারপাশের

---

[৩৫] দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, ৬: ১১; ৭: ৮৪ ও ৮৬; ৭: ১২৮; ১০: ৩৯; ১২: ১০৯; ২৭: ৫১; ৩৫: ৪৪; ৪০: ২১; ৪৭: ১০; ৬৫: ৯।

[৩৬] রোজেনথাল কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৪৭, পৃ: ৫৩।

[৩৭] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ১ ও ২।

[৩৮] আল-আজমেহ, ১৯৯০, পৃ: ৬১।

[৩৯] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ১০।

www.pathagar.com

ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে"।[৪০] তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, "অতীতের ঘটনাবলী ও বর্তমান ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রচুর পরিমান তথ্য যোগাড় করে এ সকল বিধি-বিধানসমুহ উদ্ভাবন করা সম্ভব হতে পারে"।[৪১]

মানব জীবনে ও মহাবিশ্বে কার্য-কারন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আল্লাহতা'লা তাঁর প্রজ্ঞার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এ প্রজ্ঞা মানব কল্যান সাধনের জন্য নিবেদিত শরিয়াহ'র সকল আদর্শ তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছে।[৪২] এটা প্রমান করে যে, তিনি খাম-খেয়ালীভাবে কাজ করেন না। বরং, তিনি তাঁর প্রজ্ঞার সহিত মানানসইভাবে নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে কাজ করেন। এ ধারনাকে তিনি (শাহ ওয়ালীউল্লাহ) অনেকগুলো উদাহরন দিয়ে ও কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে সমর্থন করেছেন: "এবং তুমি কখনও আল্লাহর সুন্নাহ বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না" (আল-কুরআন, ৩৩:৬২, ৩৫:৪৩, এবং ৪৮:২৩)।[৪৩] ইসলাম কর্তৃক জ্যোতির্বিদ্যা (গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও তার উপর নির্ভরশীল মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যা) ও যাদুবিদ্যা অননুমোদন করার বিষয়টি যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি এ যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। কারন, আল্লাহ নক্ষত্র, যাদু ও যাদুর সম্মোহনি শক্তিকে তাঁর সৃষ্ট কার্য-কারন সম্পর্ক অকার্যকর করা এবং মানুষের ক্ষতি বা কল্যাণ করার জন্য এমন কোন অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতা প্রদান করেন নি।[৪৪]

পরীক্ষা-নীরিক্ষায় নিরপেক্ষতা অবশ্যই জরুরী, এবং সুপরিচিত চিকিতসক ইবনে আবি উসেইবিয়াহ'র (মৃত্যু ৬৬৮/১২৭০) এক চাচা রশীদ আল-দ্বীন সুপারিশ করেছিলেন যে, লেখকগণ প্রত্যেকটি প্রতিবেদন ও লেখা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় গ্রহণ করবেন (অনুরাগ বা বিরাগ ছাড়া), তারা তুলনামুলক বিশ্লেষণের পাল্লায় বিবেচনা করবেন, এবং যদি সম্ভব হয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের

---

[৪০] Issawi, 1950, p. 7.

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ: ৮।

[৪২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৪।

[৪৩] আল্লাহ্র সুন্নাহ বা নির্ধারিত বিধান তাঁর প্রতিষ্ঠিত কার্য-কারন সম্পর্কের ভেতরের বিধানাবলীকে নির্দেশ করে। আরো দেখুন, আয়াত ৩৫:৪৩-এর উপর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর মন্তব্য।

[৪৪] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ: ৬২-৬; আরো দেখুন, ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা'য় জাদুর উপর লিখিত অধ্যায়টি, পৃ: ৪৮৬-৫০৩।

www.pathagar.com

আলোকে পরীক্ষা করবেন।[৪৫] ক্রেমারের মতে: "আরবদের সবচেয়ে বড় দক্ষতা দেখা যায় তাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পরিসরে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে। অবিশ্বাস্য পরিশ্রমের সহিত তারা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে, একই ভাবে অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য থেকে তারা যা শেখে তা সংগ্রহ করে ও সাজিয়ে রাখে"।[৪৬] কেবল মাত্র যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধমে ইসলামি অর্থশাস্ত্র ইসলামি নীতি-আদর্শ, আইনশাস্ত্রীয় ও দার্শনিক রচনাবলী থেকে তার পৃথক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ কারনে নাকভী যথার্থই বলেছিলেন যে, মুসলিম অর্থশাস্ত্রবিদগণকে "তাদের তত্ত্বসমুহের কঠিনতম পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য, এবং পূর্ব থেকেই সকলের জানা বা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রচুর বিপরীতমুখী সাক্ষ্য-প্রমান পাওয়া গেলে 'পুরাতন' তত্ত্ব বাতিল করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। লক্ষ্য হওয়া উচিত ইসলামি অর্থশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি"।[৪৭]

পরীক্ষা-নীরিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কারনে এরুপ মনে করার কোন দরকার নেই যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পক্ষে কথা বলা হচ্ছে, যার মুল শর্ত হচ্ছে প্রত্যেকটি কথাই প্রত্যক্ষ ও প্রমানযোগ্য হতে হবে,[৪৮] এবং যা শুধুমাত্র "গোঁড়া ধরনের অভিজ্ঞতাবাদ" নয়,[৪৯] বরং "পার্থিব, ইহজাগতিক, ধর্ম-বিরোধী, এবং আধিবিদ্যা-বিরোধী"।[৫০] বিজ্ঞানের দার্শনিকগণের মধ্যে কতিপয় অনুসারী ব্যতীত যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের এখন আর কোন সমর্থক নেই, এবং অর্থশাস্ত্রবিদ বা গুরুত্বপূর্ণ কোন তাত্ত্বিকদের মধ্যে কদাচিত কোন সমর্থক রয়েছেন।[৫১] ইসলামি অর্থশাস্ত্র পার্থিবও নয়, ইহজাগতিকও নয়, এমনকি কোন বক্তব্য প্রত্যক্ষবাদি কিংবা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানযোগ্য হওয়ার কোন শর্তও এটি আরোপ করতে পারে না। তথ্যের পরিমাপ ও প্রাপ্তি ব্যতীত পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্ভব নয়, এবং কলা-কৌশলের যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও প্রতিটি চলক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, যদিও কোন চলক পরিমাপ করা সম্ভব হয়, যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া নাও যেতে পারে। সুতরাং, কতিপয় অত্যন্ত কৌতুহলদ্দীপক তত্ত্ব এখনই পরীক্ষায় প্রমানযোগ্য নাও হতে পারে, তবে তাদের কয়েকটি পরবর্তিতে প্রমান করা যেতে পারে। পরিমাপের কলা-কৌশল, এবং

---

[৪৫] রোজেনথাল কর্তৃক উদ্বৃত, পৃ: ১৯৪৭, পৃ: ৫৮।
[৪৬] V Kramer থেকে রোজেনথাল কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৪৭, পৃ: ৩।
[৪৭] নাকভি, ১৯৯৪, পৃ: xxi;
[৪৮] Lipsey, 1989, p. 19.
[৪৯] Chalmers, 1982, p.xiii.
[৫০] Herbert Feigl, 1973, Vol. 14, p. 877.
[৫১] Rosenberg, 1992, pp. 24-5; Hoover, 1995, p. 719.

www.pathagar.com

যে প্রকারের তথ্যাদি এখন পাওয়া যায়, তা ইবনে খালদুনের মত পন্ডিতগণের সময় পাওয়া যেত না এবং তার ফলে তাঁরা অনেক কিছু করতে সক্ষম হন নি যা এখন আমরা করতে সক্ষম। সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্র বিনা দ্বিধায় প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান কর্তৃক উদ্ভাবিত পরিমাপের কলা-কৌশল ও বিশ্লেষণের হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে এবং প্রচলিত জ্ঞানজগতের অনেক তত্ত্ব গ্রহণও করতে পারে। এদের সবগুলোর মুল যে আবশ্যিকভাবে ইহজাগতিক কাঠামোর মধ্যে গ্রথিত তা কিন্তু নয়।[৫২] সুতরাং তারা যে ইসলামি বিশ্ববীক্ষার যৌক্তিক কাঠামোর সহিত সাংঘর্ষিক হতে হবে তাও নয়। জ্ঞানের উন্নতি ঘটে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায়। যাবির ইবনে হাইয়ান (মৃত্যু ২০০/৮১৫) বলেছিলেন যে, "দার্শনিকগণ যুগে যুগে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ধারা থেকে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন ও তাকে এক অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেছেন, এবং এভাবেই তাদের লক্ষ্যসমুহ অর্জন করেছেন"।[৫৩]

একটি সাবধান বাণী

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ বাণী করার জন্য কার্য-কারণের যৌক্তিক সম্পর্কের অনুসরণ আমাদের জন্য যেমন আবশ্যকীয়, তেমনি দু'টি জরুরী বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথমত: মানুষের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সবকিছু ব্যাখ্যা করতে বা সবকিছু সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সে সক্ষম নয়। আমরা জানতে পারি "সম্পর্কের অংশ বিশেষ – "যেন একটি অন্ধকার জঙ্গলে ছোট একটি টর্চ লাইটের আলোতে অগ্রসর হচ্ছি"।[৫৪] আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে এত বেশী ঘটনা রয়েছে যে আমরা যদি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপরই জোর দিতে থাকি তাহলে আমরা সম্ভবত: সেগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব না। যদি আমরা আমাদের আলোচনা থেকে সেগুলোকে বাদ দেই, তাহলে আমরা অর্থশাস্ত্রের পরিধিকে সংকুচিত করে ফেলবো এবং মানুষের কল্যান সাধনে অর্থশাস্ত্রের সক্ষমতা কমে যাবে। ইসলামি অর্থশাস্ত্র ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্যাদির আলোকে যতদুর সম্ভব তার আদর্শ ও ইতিবাচক তত্ত্বগুলোকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে পারে, যার ফলে ইহা বাস্তবের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত থাকে এবং এরুপ তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যস্ত না থাকে যার সাথে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সহিত সম্পর্ক ক্ষীণ।

---

[৫২] এ বিষয়ে দু'টো ভিন্ন মতের জন্যে দেখুন, জারকা, ১৯৮৬, পৃ: ৫৬-৭।

[৫৩] Goichon কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৭১, পৃ: ৩৭৮। ইবনে মাতরান ও ইবনে আব্দ রাব্বিহ (মৃত্যু ৩২৮/৯৪০)-দের মতামত দেখুন, রোজেনথাল, ১৯৪৭, পৃ: ৬৯।

[৫৪] IIIT, 1989, p. 37.

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: মুসলমানেরা সহজাতভাবে বিশ্বাস করে যে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও কুরআন-সুন্নাহ্'র প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে বিরোধের সম্ভবনা ক্ষীণ। কোন আপাত: বিরোধ প্রস্তাবনা বা সাক্ষ্য-প্রমানের ভুল ব্যাখ্যার কারনে কিংবা বাস্তবায়নে অদক্ষতা কিংবা পর্যবেক্ষণের ভুলের কারনে সৃষ্টি হতে পারে। তবে, ইসলামি অর্থশাস্ত্রের খুব কম প্রস্তাবনাই সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আসবে। তাদের অধিকাংশই ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামি রচনাবলী বা প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে অথবা গবেষকের নিজস্ব অনুমান বা পর্যবেক্ষণ থেকে এবং মুসলমান ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আসবে। এদের সবগুলোই মিথ্যা প্রমান করা যেতে পারে। সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান নয় এরূপ ঈঙ্গিত করা যুক্তিসঙ্গত: নয়।

একটি মাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমান দ্বারা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রেও তত্ত্বগুলোকে বাতিল করে দেওয়া হয় না।[৫৫] সুতরাং, ইসলামি অর্থশাস্ত্রে কেন এরূপ করা হবে? ব্ল্যাকহাউজের মত আমরাও জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, "গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বিতর্ক গাণিতিক অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে কি কখনও দীর্ঘ দিনের জন্য নিষ্পত্তি হয়েছে"।[৫৬] সুদের হারের স্বত:স্ফূর্ত সাযুজ্যতার মত অনেক মৌলিক ধারনা প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে রয়েছে যেগুলোর সত্যতা যাছাই করা বা মিথ্যা প্রমান করা সম্ভব নয় মর্মে ধরে নেওয়া হয়। "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও হাতে-কলমে পর্যবেক্ষণের মিশ্রণ",[৫৭] এবং চিরায়ত অর্থশাস্ত্রবিদগণ সব সময়েই বলে আসছেন যে, "চূড়ান্ত বিচারে অর্থশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ পর্যবেক্ষণযোগ্য উৎপাদন-বিধি ও অ-নিরপেক্ষ আত্ম-বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ প্রস্তাবনার উপর নির্ভর করে"।[৫৮] ইসলামি অর্থশাস্ত্রকে 'অতি অন্ধ-বিশ্বাসী' ও 'অতি পর্যবেক্ষণবাদি'-দের মাঝখানে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে হতে পারে।

বিজ্ঞান, অদৃশ্য বস্তু ও ভাববাদি মতামত

তবে, এ পর্যায়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি পেশ করা যেতে পারে। প্রথমত: যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, কুরআন-সুন্নাহ্'র এক বিরাট অংশ আল্লাহ্, পরকাল, এবং মনের প্রশান্তি'র মত অদৃশ্য বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো

---

[৫৫] Blackhouse, 1994, p. 14. প্রকৃতপক্ষে Kuhn যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একবার একটি তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য বিস্তার করা শুরু করলে বিজ্ঞানীরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পেলেও সেই তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গী বাতিল করে দিতে অস্বীকার করে থাকেন।

[৫৬] Blackhouse, 1994, p. 66.

[৫৭] Caws, 1967, Vol. 7, p. 343.

[৫৮] Blaug, 1985, p. 698.

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণযোগ্য নয় এবং এ কারনে এগুলো বিজ্ঞানের ভিত্তি হতে পারে না। এটি কোন বৈধ আপত্তি হতে পারে না, কারন যদিও এ সকল বস্তু নিজেরাই অদৃশ্য, তবুও মানুষের আচরণ ও অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর তাদের প্রভাব বাজারের নিয়ামক শক্তিসমুহের উপর 'অদৃশ্য হাত'র প্রভাবের মত বা অদৃশ্য 'পছন্দ-অপছন্দ ও উপযোগ'র মতই পর্যবেক্ষণযোগ্য। এ সকল ধারনার বিষয়বস্তুগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য কিনা তা জরুরী নয়, তবে মানুষের আচরণের উপর এগুলোর প্রভাব পর্যবেক্ষণযোগ্য কিনা তা জরুরী, বিশেষত: এগুলো সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে সেই ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করে কিনা যা মানবিক লক্ষ্য অর্জনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন। এটা এখন ভালভাবে স্বীকৃত যে, দাম ও মুনাফা একমাত্র চলক নয় যা সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনকে প্রভাবিত করে। যদি আল্লাহ্ তা'লা ও পরকালে বিশ্বাস দ্বারা ভোক্তা ও উৎপাদককে নৈতিক মুল্যবোধ গ্রহণে ও স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণের তীব্রতা হ্রাস করতে অনুপ্রাণিত করা যায় এবং, এভাবে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা যায়, তাহলে, অর্থশাস্ত্রবিদগণ কেন এটিকে বিবেচনায় গ্রহণ করবে না। সম্পদ ব্যবহারে নৈতিক মাপকাঠির কার্যকর পরিচালনা সম্পদের অধিকতর উৎপাদনশীল ও সুষম ব্যবহার চালু করণে মুল্য ব্যবস্থার পরিপূরক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর আচরণ কিরুপ হবে ও ইসলাম সম্মত কল্যাণ অর্জনের জন্য কিরুপ কলা-কৌশল গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ্ পথ প্রদর্শন করে। এর জন্য ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের প্রয়োজন হয় এবং প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ব্যক্তিগত মুল্যায়নকে অনুমোদন না করার একটি কারন হচ্ছে এটা সেই প্রসঙ্গের অবতারনা করে যে লোকজনের কেমন আচরণ করা উচিত অথচ সংজ্ঞানুযায়ী তার সত্যতা যাছাই বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারছে না।[৫৮] এ কারনে সমস্যামুখী অর্থশাস্ত্র মুলত: কিভাবে অর্থনৈতিক এজেন্টগুলো ও অর্থনীতিগুলো প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে এবং অর্থনৈতিক কৌশলগুলোর ফলাফল কী এগুলো আলোচনার মধ্যে নিজকে ব্যস্ত রেখেছে। ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কোন সম্পর্কের অনুপস্থিতির একটি কারন সম্ভবত: এরুপ দৃষ্টিভঙ্গী। অধিকাংশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপযোগী করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক আচরন নির্ধারনের জন্য যদি সম্পূরক ব্যক্তিগত মুল্যায়ন করতে অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে লক্ষ্য বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। মান্নান যথার্থই বলেছেন যে,

[৫৮] Lipsey, 1989, p. 16; Blaug, 1985, p. 7.

www.pathagar.com

"সমাধানমুখী ও সমস্যামুখী অর্থশাস্ত্র পরস্পরের সহিত এমনভাবে যুক্ত যে তাদেরকে আলাদা করার যে কোন প্রচেষ্টা বিপথগামী করতে পারে এবং হিতে-বিপরীত হতে পারে"।[৬০] সুতরাং, সমস্যামুখী ও সমাধানমুখী অর্থশাস্ত্রের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রচলিত অর্থশাস্ত্র সৃষ্টি করতে চায় তা অযৌক্তিক মনে হয়।

সমাধানমুখী অর্থশাস্ত্রকে ইসলাম শুধু মাত্র এরুপ ব্যক্তিগত মুল্যায়ন হিসেবে দেখে না, যা পর্যবেক্ষণলব্ধ সাক্ষ্য-প্রমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কুরআন ও সুন্নাহ যে সকল মুল্যবোধ বা প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেগুলো মুলত: সেই মুল্যবোধ ও মানব কল্যাণের সহিত তাত্বিকভাবে সম্পর্কিত, যদিও কার্য-কারন সম্পর্ক ও যৌক্তিকতা, 'ইল্লাহ বা হিকমা', সব সময় খোলা-খুলিভাবে নির্দেশিত নাও হতে পারে। মধ্যপন্থী যুক্তিবাদিগণও মনে করেন যে, যা কিছু নৈতিকভাবে ন্যায়ানুগ মানুষের সেটাই করা উচিত, এ কারনে নয় যে তা সৃষ্টার ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী বিধায় তা করা আবশ্যক এবং, তা আচার-আচরণের সবচেয়ে যুক্তি-সঙ্গত পথ।[৬১] এ কারনে যুক্তিসঙ্গত আচরণ ও নৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত আচরণ সমার্থকরুপে বিবেচিত হয়। এরা উভয়ই এমন আচরণের প্রতিভূ যা চূড়ান্তভাবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বার্থ রক্ষাকারী রুপে প্রতিভাত হয়েছে।

তৃতীয়ত: এমন যুক্তিও উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের আদর্শ আচরণ ও তাদের প্রকৃত আচরণের মধ্যে বিরাজমান বিস্তর পার্থক্যের কারনে কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য ইসলামি রচনাবলী থেকে সংগৃহীত তত্ত্বসমুহ সব সময় পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানযোগ্য নয়। তবে, পার্থক্য সব সময় বড় ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে এমন সময় ছিল যখন মুসলিম সমাজে ইসলামি আদর্শ ছিল একটি বাস্তবতা এবং 'আদর্শ' সম্পূর্ণ বা আংশিক 'বিরাজমান' ছিল। তাছাড়া, ইসলামের অনুমোদিত অনেকগুলো রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সংস্কৃতি ও সভ্যতারও ঐতিহ্য এবং সেখানেও অনুসৃত হতো। সুতরাং, মুসলিম ও অমুসলিমদের ঐতিহাসিক প্রমানাদির সহায়তায় পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা সম্ভব হতেও পারে।

বাস্তবানুগ অনুমান

প্রস্তাবনার গঠনে অনুমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং, মৌলিক অনুমান মিথ্যা হলেও কতিপয় সঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব হলেও বাস্তবানুগ

---

[৬০] Mannan, 1986, p. 9.

[৬১] এ তত্ত্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যার জন্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র বই *হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ* দেখুন।

www.pathagar.com

অনুমান দিয়ে শুরু করা অপেক্ষাকৃত ভাল হতে পারে, যাতে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ বাণীর ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তথাপি, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হচ্ছে যে, কোন শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অনুমান "অবশ্যই বাতিল বা পরিবর্তন করা উচিত হবে না"। সেগুলো "কতিপয় সহায়ক অনুসিদ্ধান্তের প্রতিরক্ষা বেষ্টনী, প্রাথমিক শর্তাদি দ্বারা এমনভাবে সুরক্ষিত যে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না"।[৬২] অতএব, এ জাতীয় অনুমানগুলো "পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য নয়"।[৬৩]

এরূপ আশা করা বেশী কিছু নয় যে, মানুষের আচরণের বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের সকল মৌলিক অনুমানসমুহ, বিশেষ করে স্বার্থ, যুক্তিবাদ ও বুদ্ধি'র স্বত:স্ফূর্ত মিল সম্পর্কিত বিষয়ক আচরণগুলো, এবং যে সকল আচরণের উপর প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের গোটা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানিত হোক, যাতে করে নিশ্চিত করা যায় যে এ সকল অনুমানগুলো মিথ্যা প্রমানিত হলে সম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে না। এর কোন ব্যাখ্যা নেই যে, কেন প্রচলিত অর্থশাস্ত্র আধিবিদ্যাগত বিষয়সমুহ এখনও মিথ্যা প্রমানিত না হওয়া সত্বেও সেগুলো থেকে দুরে থেকেছে, এবং এ গুলোকে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের প্রস্তাবনাগুলোর অনুমানগত ভিত্তিরূপে ব্যবহারের জন্য, ফ্রীডম্যানের ভাষায়, একটি "ইতিবাচক সুযোগ" মর্মে এখনও বিবেচনা করছে না – এমন অনুমান যা "বর্ণনাগতভাবে মিথ্যা" রূপে পরিচিত।[৬৪]

---

[৬২] Chalmers, 1982, p. 80; Italics in the original.
[৬৩] Lin, 1976, p. 16.
[৬৪] Friedman, 1953, p. 14.

www.pathagar.com

৫ম অধ্যায়

চিরায়ত ইসলামি অর্থশাস্ত্রের আর্থ- সামাজিক গতি- প্রকৃতি

কুরআনের ব্যাখ্যাকারী, আইনশাস্ত্রবিদ, ইতিহাসবিদ, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দার্শনিকদের লেখায় একটি আন্ত: শাস্ত্রীয় বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থশাস্ত্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২/ ৭৯৮)[১], আল- মাসুদি (মৃত্যু ৩৪৬/ ৯৫৭), আল- মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/ ১০৫৮), ইবনে হাজম (মৃত্যু ৪৫৬/ ১০৬৪), আল- সারাক্ষি (মৃত্যু ৪৮৩/ ১০৯০), আল- তুসি (মৃত্যু ৪৮৫/ ১০৯৩)[২], আল- গাজ্জালি (মৃত্যু ৫০৫/ ১১১১), আল- দিমাস্কি (মৃত্যু ৫৭০/ ১১৭৫- এর পর)[৩], ইবনে রুশদ (মৃত্যু ৫৯৫/ ১১৯৮), ইবনে তাইমিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/ ১৩২৮), ইবনে আল- উখুয়া (মৃত্যু ৭২৯/ ১৩২৯), ইবনে আল- কাইয়্যিম (মৃত্যু ৭৫১/ ১৩৫০), আল- শাতিবি (মৃত্যু ৭৯০/ ১৩৮৮), ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/ ১৪০৬), আল- মাকরিজি (মৃত্যু ৮৪৫/ ১৪৪২), আল- দাওয়ানি (মৃত্যু ৯০৬/ ১৫০১), এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহ (মৃত্যু ১১৭৬/ ১৭৬২) সহ বহু পন্ডিতগণ কয়েক শতাব্দি ব্যপী এর ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন।[৪] বর্তমান সময়ের তুলনায় অতীতে মুসলিম ইতিহাসের বিরাট অংশ জুড়ে মৌখিক ধারা ও পান্ডুলিপির উপর জ্ঞানের প্রচার নির্ভরশীল ছিল বিধায় এ প্রক্রিয়া অতীতে সম্ভত: কিছুটা শ্লথ ছিল। কালের

---

[১] অন্যানের মধ্যে তিনি ইসলামে করারোপের উপর তার বইটির (কিতাব আল- খারাজ, ১৩৫২ হিজরী) জন্য বিখ্যাত। চিরায়ত লেখকগণ কর্তৃক করারোপ ও সরকারী অর্থায়নের উপর আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। বর্তমানে টিকে আছে এরুপ অল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে চারটি হচ্ছে: ইয়াহিয়া ইবনে আদম আল- কোরায়েশী (মৃত্যু ২০৩/ ৮০৮), কিতাব আল- খারাজ; আবু ওবায়েদ (মৃত্যু ২২৪/ ৮৩৯), কিতাব আল- আমল; ইবনে জানযাওয়িহা (মৃত্যু ২৫১/ ৮৬৫), কিতাব আল- আমল; এবং কুদামা ইবনে জাফর (মৃত্যু ৩৩৭/ ৯৪৮), কিতাব আল- খারাজ। বিশ্লেষনী বিষয় বস্তুর দিক থেকে এগুলোর মধ্যে আবু ইউসুফের বইটি সর্বোত্তম। কিতাব আল- খারাজ শীর্ষক তিনটি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন বেন সেমেশ (১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯)।

[২] ইসলামের ইতিহাসে বহু তুসি রয়েছে। এখানে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন নিজাম আল- মুলক আল- তুসি। অন্যান্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন নাসির আল- দ্বীন আল- তুসি (মৃত্যু ৬৭২/ ১২৭৪)।

[৩] তাঁর মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যায় না। তবে, সম্পাদক বুশরা আল- শোরাবজি'র মতে তিনি তার গ্রন্থ আল- ইশারাহ ইলা মাহাসিন আল- তিজারাহ (১৯৭৭) যে বছর শেষ করেছিলেন তা হচ্ছে ৫৭০/ ১১৭৪।

[৪] তাদের কীর্তির সংক্ষিপ্ত বিবরনের জন্য দেখুন, Spengler, 1964; DeSomogyi, 1965; Mirakhor, December 1987; Siddiqi, 1992; Islahi, 1996;

www.pathagar.com

উত্থান-পতন ও একাধিক বহি: শত্রু বিশেষত: মঙ্গলদের আক্রমনের কারণে কতিপয় পান্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল।[৫]

তবে, এ সকল পন্ডিতগণ অর্থশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তখনও বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন গড়ে উঠে নি। তারা ছিলেন একাধিক বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রের গুরু। সম্ভবত: এ কারনে তারা আন্ত: শাস্ত্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের আলোচনার মুল লক্ষ্য মুলত: : অর্থনীতির চলকসমুহের মধ্যে সীমিত থাকে নি। তারা সার্বিক মানবিক কল্যাণকে দীর্ঘ সময় ধরে অনেকগুলো অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, জনমিতি সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক বিষয়সমুহের মধ্যে এমন একটি মিথস্ক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল রুপে বিবেচনা করতো যে, এরুপ মিথস্ক্রিয়ায় একটির সাহায্য ব্যতীত অন্যটি প্রত্যাশিত সম্পূর্ণ অবদান রাখতে পারতো না। এ পুরো কাঠামোর মধ্যে ন্যায়বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ন্যায়বিচার ব্যতীত সমাজ কার্যকরভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না, বরং তার পতন হতে পারে ও ভেঙ্গে যেতে পারে এরুপ একটি সম্যক উপলব্ধি ক্রিয়াশীল ছিল। ন্যায়বিচারের উপর এরুপ গুরুত্বারোপ নি: সন্দেহে ইসলামি বিশ্ব-বীক্ষায় ন্যায়বিচারের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকারই ফলশ্রুতি।

ইবনে খালদুনের অবদান

শতাব্দির পর শতাব্দি এরুপ বিচিত্র অবদান মনে হচ্ছে চূড়ান্ত রুপ লাভ করেছে ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমাহ'-তে, যার শাব্দিক অর্থ 'সূচনা', এবং যা সাত খন্ড ইতিহাসের মধ্যে প্রথম খন্ড, সংক্ষেপে যেগুলোকে বলা হয় 'কিতাব আল-ইবার' বা (ইতিহাস) 'শিক্ষার বই'।[৬] ইবনে খালদুনের মতে ইতিহাস হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার কারন ও উৎপত্তি, অন্য কথায় কিভাবে ও কেন সেগুলো ঘটছে তা ব্যাখ্যা করে, এবং

---

[৫] দেখুন, *Rosenthal, 1947, p. 191*

[৬] বইটির পুর্ণ নাম সহজেই অনুবাদ করা যেতে পারে এভাবে: *"The Book of Lessons and the Record of Cause and Effect in the History of Arabs, Persians and Berbers and their Powerful Contemporaries"*. বর্তমানে মুকাদ্দিমাহ'র বিভিন্ন আরবী সংস্করন পাওয়া যায়। আমি যে সংস্করনটি ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে আল-মাকিয়াবাহ আল-তিজারিয়াহ আল-কুবরা কর্তৃক প্রকাশের সন উল্লেখ না করে মিসরে প্রকাশিত সংস্করন। এটি সকল স্বর-বর্ণ উল্লেখ করে লেখা বিধায় এর পাঠ অপেক্ষাকৃত সহজ। ফ্রান্জ রোজেনথাল মুকাদ্দিমাহ তিন খন্ডে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৬৭ সালে। মুকাদ্দিমাহ'র নির্বাচিত অংশ ১৯৫০ সালে চার্লস ইসায়ি কর্তৃক *An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaledun of Tunis* (1332-1406) শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বংশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার মধ্যেই ইতিহাস সীমাবদ্ধ থাকে না।[৭] এরুপ কার্য-কারন বিশ্লেষনের তাগিদ ইবনে খালদুন অনুভব করে থাকতে পারেন কারন তার সময়ের পুর্বেই মুসলিম সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং, একজন বিবেকবান মুসলমান হিসেবে একটি পাল্টা স্রোতধারা দেখার জন্য তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। একজন সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, যে সকল বিষয় একটি সভ্যতাকে মামুলী অবস্থা থেকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় ও তারপর এক সময় তার পতন শুরু করে, সে সকল বিষয় চিহ্নিত করার জন্য ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে এরুপ পাল্টা-স্রোতধারা কল্পনা করা যায় না। 'মুকাদ্দিমাহ' এরুপ উপলব্ধির ফসল এবং এ বইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাসক বংশ, রাষ্ট্র বা সভ্যতার উত্থান-পতনের নিয়ামকসমুহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কর্মপদ্ধতির (*সুন্নাত আল্লাহ্*)[৮] প্রতিফলক এ সকল নিয়ামকসমুহ, যা কেবল মাত্র আংশিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ-তে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে।

ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণের কেন্দ্র-বিন্দু যেহেতু মানুষ[৯], তাই তিনি শাসক বংশ কিংবা সভ্যতার পতনকে জনগণের কল্যাণ বা দুর্দশার সহিত একান্তভাবে নির্ভরশীল রুপে দেখেন। তার বিশ্লেষণ মতে এরুপ উত্থান ও পতন শুধু মাত্র অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেগুলো ব্যক্তি, সমাজ, শাসক ও প্রতিষ্ঠানসমুহের গুনাবলীর নিয়ামক। অতএব, শাসক বংশ ও সভ্যতার উত্থান-পতনে পারস্পরিক ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত নৈতিক, মনস্তাত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, জনমিতি সংক্রান্ত, ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর ভুমিকা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'মুকাদ্দিমাহ' ঐসব বিষয়সমুহ চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছে যা সেগুলোর মানকে প্রভাবিত করে।

---

[৭] *মুকাদ্দিমাহ,* পৃ: ৩ ও ৪; আরো দেখুন, মুহসিন মেহদী, ১৯৬৪, পৃ: ৩১।

[৮] *সুন্নাত আল্লাহ কথাগুলো বলতে বোঝায় আল্লাহ তা'লা খামখেয়ালীভাবে কাজ করেন না। তিনি কতিপয় নির্ধারিত বিধি প্রণয়ন করেছেন- কোন ধাতু গরম করা হলে তা প্রসারিত হবে; শীতল করা হলে তা সংকুচিত হবে। একই ভাবে একটি সমাজ কোন এক পথে চললে তা উন্নত হবে; না চললে তার পতন হবে। আরো দেখুন, চতুর্থ অধ্যায়ের ফুটনোট ৪৩।*

[৯] Rosenthal, 1967, Vol. 1, p. lxxi. *ইবনে খালদুনের পুর্বেই মানুষের কেন্দ্রীয় অবস্থান স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরুপ, ইবনে খালদুনের ৩০০ বছর পুর্বে লিখতে গিয়ে আল-জুয়েনি (মৃত্যু ৪৭৮/১০৮৫) বলেছেন যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে জনগণ; সম্পদ জনগণকে সহায়তা করার জন্যেই (আল-জুয়েনি, ঘিয়াথ, ১৯৭৯, পৃ: ২৮৩)।*

www.pathagar.com

'মুকাদ্দিমাহ'য় অর্থশাস্ত্রীয় সূত্রের উপর প্রচুর আলোচনা রয়েছে যার একটি বড় অংশ নি: সন্দেহে অর্থশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের মৌলিক অবদান। তবে, মুসলিম বিশ্বে তার পুর্বসুরী ও সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতামতের আরো স্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত গঠন ও প্রকাশের জন্যেও তিনি কৃতিত্বের দাবীদার। কতিপয় অর্থশাস্ত্রীয় সূত্রের বিষয়ে ইবনে খালদুনের উপলব্ধি এত গভীর ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন যে, প্রায় ছয় শতাব্দি পুর্বে প্রস্তাবিত তার তত্ত্বসমুহকে নি: সন্দেহে তাদের অগ্রসর আধুনিক সংস্করনের পুর্বসুরীরুপে বিবেচনা করা যায়।

আন্ত:শাস্ত্রীয়, প্রগতিশীল কাঠামো

ইবনে খালদুনের গোটা কাঠামো সম্পূর্ণভাবে না হলেও একটি বড় অংশ সংক্ষিপ্তভাবে রাজার উদ্দেশ্যে তার প্রদত্ত নিম্নের উপদেশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে:

> শরীয়াহ'র বাস্তবায়ন ব্যতীত শাসকের সামর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয় না . . .
> শাসক ব্যতীত শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় না;
> জনগণের সমর্থন ব্যতীত শাসক শক্তি অর্জন করতে পারে না;
> সম্পদ ব্যতীত জনগণকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না; উন্নয়ন ব্যতীত সম্পদ অর্জন করা যায় না;
> ন্যায়বিচার ব্যতীত উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়;
> ন্যায়বিচারের মাপকাঠি দিয়েই আল্লাহ মানুষকে মূল্যায়ন করবেন; এবং
> শাসককে ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।[১০]

ইবনে খালদুনের নিজের ভাষায় উপদেশগুলোতে রয়েছে "রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আটটি জ্ঞানগর্ভ সূত্র, পারস্পরিক শক্তি অর্জনের জন্য তাদের একটিকে অপরটির সাথে এমন বৃত্তাকারভাবে যুক্ত করা হয়েছে যে, শুরু বা শেষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না," (পৃষ্ঠা ৪০; এ অধ্যায়ে বর্ণিত সকল উদ্ধৃতি 'মুকাদ্দিমাহ' থেকে গৃহীত)। এর মধ্যে ইবনে খালদুনের ব্যাখ্যার আন্ত: শাস্ত্রীয় ও প্রগতিশীল চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি আন্ত: শাস্ত্রীয় কারন এটি গুরুত্বপূর্ণ

---

[১০] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ৩৯; একই উপদেশের পুণরাবৃত্তি করা হয়েছে ২৮৭ পৃষ্ঠায়। ইবনে খালদুন নিজেই বলছেন যে, তার গ্রন্থটি হচ্ছে মোবেদান নামক একজন জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম যাজকের উপদেশের ব্যাখ্যা, যা তিনি দিয়েছিলেন বাহরাম ইবনে বাহরামকে এবং যা আল- মাসুদি কর্তৃক তার *মুরুজ আল- ধাহাব, ১৯৮৮ (১ম খন্ড, পৃ: ২৫৩)* -এ উল্লিখিত। ইবনে খালদুন এ বিষয়টি স্বীকার করেন (পৃ: ৪০), কিন্তু, একই সময়ে ব্যাখ্যা দেন যে, "এরিস্টোটল ও মোবেদানের দীক্ষা ছাড়াই আল্লাহ'র সহায়তায় আমরা এ সকল বিধি-বিধানের বিষয়ে অবহিত হয়েছি" (পৃ: ৪০)।

www.pathagar.com

সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চলকসমূহসহ শরীয়াহ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, জনগণ, সম্পদ, উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারকে এমন বৃত্তাকার ও পারস্পরিক নির্ভরশীলভাবে সংযুক্ত করেছে যে, তারা এক অন্যকে প্রভাবিত করে ও একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেহেতু, এরুপ বৃত্তাকার প্রক্রিয়া একটি ক্রমানুক্রমিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে – তিন প্রজন্ম বা প্রায় একশ বিশ বছর ব্যাপী – সেহেতু, এটি গোটা বিশ্লেষণে গতিশীলতার এক মাত্রা যুক্ত করে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কীভাবে রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো কালের পরিসরে সভ্যতার উন্নতিতে ও অবনতিতে, বা উত্থান-পতনে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে থাকে। দীর্ঘ সময়ের উপর এরুপ বিশ্লেষণে 'সবকিছু অপরিবর্তিত থাকা'র কোন শর্ত নেই, কারন কোন চলকই অপরিবর্তনীয় থাকে না। চলকসমূহের যে কোন একটি উদ্দীপক শক্তিরুপে কাজ করে। কিন্তু অন্যগুলো একই প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, নাও পারে। যদি অন্যগুলো একই প্রতিক্রিয়া না দেখায়, তাহলে এক এলাকার অবক্ষয় অন্য এলাকায় বিস্তৃত নাও হতে পারে এবং তখন কালের পরিসরে অবক্ষয়ের এলাকাটিকে সংস্কার করা যেতে পারে কিংবা সভ্যতার অবক্ষয় অনেক ধীর গতিতে ঘটবে। তবে, যদি অন্য এলাকাগুলো একইরুপ প্রতিক্রিয়া দেখায় তাহলে অবক্ষয় পারস্পরিক সম্পর্ককৃত ক্রমানুক্রমিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এমন গতি পেতে পারে যে কালের পরিসরে পরিণতি থেকে কারন চিহ্নিত করা কঠিন হবে। কার্য-কারন সম্পর্কের এরুপ বৃত্তকে পরবর্তিকালে 'সমতার বৃত্ত' নাম দেওয়া হয়েছিল।[১১]

কার্য-কারন সম্পর্কের এরুপ প্রক্রিয়ার দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হচ্ছে উন্নয়ন (g) ও ন্যায়বিচার (j)। উন্নয়ন (g) জরুরী, কারন মানব সমাজগুলোর স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে এগুলো স্থবির থাকতে চায় না; সেগুলো অগ্রসর হয় অথবা পতনের দিকে চলে। উন্নয়ন বলতে এখানে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বোঝানো হয় নি। এটা সার্বিক মানবিক উন্নয়নকে ধারন করে এমনভাবে যে একটি চলক অন্যগুলোকে (G, S, N and W) সমৃদ্ধ করে এবং প্রকারান্তরে অন্যদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, তার দ্বারা জনগণের (N) প্রকৃত কল্যাণ সাধনে অবদান রাখে, এবং তার মাধ্যমে সভ্যতার টিকে থাকাটাকেই নিশ্চিত

---

[১১] কার্য-কারন সম্পর্কের বৃত্ত অটোমান শাসনামলে (চতুর্দশ থেকে বিংশ শতক) সংক্ষিপ্ত করে এভাবে পড়া হতো: 'সামরিক বাহিনী ব্যতীত কোন রাজকীয় কর্তৃত্ব হতে পারে না; সম্পদ ব্যতীত কোন সামরিক বাহিনী হতে পারে না; জনগণ সম্পদ উৎপাদন করে; সুলতান ন্যায়ানুগ শাসনের মাধ্যমে জনগণকে সাহায্য কর;। (N Berkes এর *Turkiye Iktisad Tarihi*, Cilt 2, Istanbul, 1972, p. 325 থেকে Meyer, 1989, p. 307-এ হুবুহ উল্লিখিত)। সামরিক বাহিনীর উপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি লক্ষ্য করুন, যা ইবনে খালদুনের মডেলে ছিল না।

www.pathagar.com

করে না, তার উন্নতিও নিশ্চিত করে। তবে, ন্যায়বিচার (j) প্রতিষ্ঠা ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়, যা এখানে শুধু মাত্র অর্থশাস্ত্রের সংকীর্ণ অর্থে প্রকাশিত হয় নি, বরং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা' সার্বিক অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। ভ্রাতৃত্বোবোধ ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এবং প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সৎভাবে পালন করে, কৃতকর্মের জন্য প্রত্যেককে তার প্রাপ্য পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে, এবং কারো প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা ও অবিচার না করার মাধ্যমে একটি দয়ালু সমাজ সৃষ্টি না করে সার্বিক অর্থে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

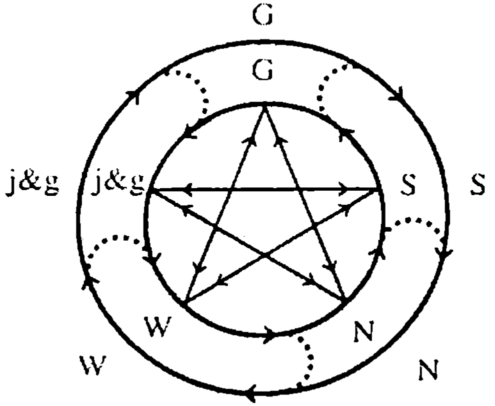

অন্যান্য চলকসমূহের মধ্যে শরীয়াহ বলতে বুঝায় মানুষের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে অনুপ্রানিত করার জন্যে মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান বা আচরণের রীতি-নীতি, এবং ন্যায়বিচার(j), উন্নয়ন(g) ও সকল মানুষের জন্য কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিকভাবে ক্ষতিকর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। এ সকল রীতি-নীতি আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, লিখিত কিংবা অলিখিত হতে পারে। নিজস্ব মুল্যবোধের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সকল সমাজেই এরুপ আচরণ বিধি রয়েছে। মুসলিম সমাজে এ সকল বিধির মুল ভিত্তি হচ্ছে শরীয়াহ (S)। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার সহিত বাস্তবায়িত না হলে শরীয়াহ (S) কোন অর্থপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। এটা নিশ্চিত করা সমাজ (N) ও সরকারের (G) একটি অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণ, সরকারের (G) কার্যকর ভুমিকা পালন ও জনগণের (N) কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গতি আসে সম্পদ (W) থেকে। মানব কল্যাণ সাধনে আর্থ-সামাজিক,

www.pathagar.com

জনমিতি সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক চলকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কিত ভুমিকা এবং এর মাধ্যম সভ্যতার উত্থান-পতনে সেগুলোর একইরুপ ভুমিকা হচ্ছে ইতিপুর্বে আল-গাজ্জালি, ইবনে আল-কাইয়িম, আল-শাতিবি ও অন্যান্য কর্তৃক মানব কল্যাণকে শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহের গুরুত্বপূর্ণ অংশরুপে যে যথার্থ বিবরণ দিয়েছেন তার উন্নততর সংস্করন।

কেউ যদি ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণকে একটি কার্যকর সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে চায় তাহলে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

$$G = f\ (S, N, W, g \text{ and } j)।$$

এ সমীকরণটিতে ইবনে খালদুনের মডেলের গতি-প্রকৃতি প্রকাশিত হয় নি বটে, তবে, তাঁর আলোচিত সকল গুরুত্বপূর্ণ চলক বিবেচনায় গ্রহণের মাধ্যমে এতে আন্ত: শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ সমীকরণে G-কে একটি নির্ভরশীল চলকরুপে দেখানো হয়েছে কারন ইবনে খালদুনের একটি বড় লক্ষ্য ছিল শাসক বংশের (রাষ্ট্রের) বা সভ্যতার উত্থান-পতনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। তার মতে শাসকের শক্তি বা দুর্বলতা নিহিত থাকে তার অন্ত: র্নিহিত রাজনৈতিক ক্ষমতার শক্তি বা দুর্বলতার ভেতর। শরীয়াহ'র বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে, ও সম্পদের উন্নয়ন ও সুষম বন্টন দ্বারা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে (G) অবশ্যই তার নিজের দীর্ঘকাল টিকে থাকার স্বার্থে জনগণের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করতে হবে।

তবে, একটি সাধারণ কার্য-কারন সম্পর্ককে অবশ্যই যেমন পাল্টে দেওয়া যায় না, ইবনে খালদুন কর্তৃক গুরুত্বারোপকৃত মানব সমাজের বৃত্তাকার ও পারস্পরিক নির্ভরশীল কার্য-কারন সম্পর্কের মধ্যেও সাধারণভাবে একই প্রবণতা দেখা যায়। যে কোন একটি স্বাধীন চলককে নির্ভরশীল চলকরুপে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং অন্যগুলোকে স্বাধীনরুপে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে যে, সমাজের পতনের জন্য দায়ী উদ্দীপক, ইবনে খালদুনের ব্যাখ্যায় যা হচ্ছে G-এর ব্যর্থতা, সকল সমাজে একই রকম নাও হতে পারে। এটা অন্য চলকগুলোর যে কোন একটি হতে পারে। উদাহরণত: এটা হতে পারে পরিবারের ভাঙ্গন, যা (পরিবার) মডেলের N-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ফলে প্রথমে শিশুদের যথাযথ লালন-পালনের অভাব দেখা দিবে এবং তারপর মানব প্রজাতির (N) মানের অবনতি ঘটবে – যে মানুষ হচ্ছে যে কোন সভ্যতার ভিত্তি-মুল। এটি হতে পারে একটি অর্থনীতির দুর্বলতা (W) যা একটি ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (S) কারনে বা সহায়ক নয় এরুপ মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের (S) ফলশ্রুতিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

জনগণ (N), ন্যায়বিচার (j) ও রাষ্ট্রের (G) ভূমিকা

মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক এবং একত্রে বসবাস করতে পছন্দ করে (পৃষ্ঠা ৪১)। এটা এ কারনে যে, ব্যক্তিগত সামর্থ্যের দ্বারা সে তার মৌলিক চাহিদা পুরণ করতে এমনকি নিজকে রক্ষা করতেও অক্ষম। অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের জরুরী প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অবিচারের মধ্যে তারা একত্রে বসবাস করতে বা সহযোগিতা করতে পারে না। এগুলো সামাজিক জীবনকে অসম্ভব করে তোলে। সুতরাং, এর জন্য প্রয়োজন গোষ্ঠীগত অনুভূতি (আসাবিয়াহ্) এবং একটি প্রতিরোধক শক্তি বা সরকার (ওয়াজি) যা সংঘাত ও অবিচার প্রতিরোধ করবে এবং মানুষকে একত্রিত রাখবে।

ভাষাগতভাবে 'আসাবিয়াহ্' শব্দটি আরবীতে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এদের একটি হচ্ছে ভাল এবং ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ধারনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাই মানুষকে (N) সাধারন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আত্ম-স্বার্থ হাসিলের লাগাম টেনে ধরতে, ও পরস্পরের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে, এবং তার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি উৎসাহিত করতে এবং সভ্যতার উত্থান-পতন ও উন্নয়নে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালনে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। এ অর্থে শরীয়াহ (S) এর প্রশংসা করেছে এবং একে উৎহিত করেছে। অন্য যে অর্থে 'আসাবিয়াহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে কারো নিজের গোষ্ঠির প্রতি অন্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট আনুগত্য। এর ফলে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে নিজের গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়, এবং অসাম্য, পারস্পরিক ঘৃণাবোধ ও বিরোধ উস্কে দেওয়া হয়। এ অর্থে এটি শরীয়াহ'র দীক্ষার পরিপন্থী এবং মহানবী (স:)-এর নিন্দা করতেন।[১২] উভয় অর্থই কুরআনের আয়াতে প্রতিফলিত

---

[১২] মহানবী (স:)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নিজের গোত্রকে ভালবাসা 'আসাবিয়া' কী না। তিনি জবাব দেন, "না! আসাবিয়া হচ্ছে অবিচারের শিকার নিজের গোত্রকে সাহায্য করা" (ফুসেলাহ'র পিতা, *কিতাব আল-ফিতান* (৩৬), *বাব আল-আসাবিয়াহ* (৭) থেকে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩০২: ৩৯৪৯-এ উদ্বৃত)।

তিনি আরো বলেন, 'অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যিনি যুদ্ধ করেন, ও আসাবিয়া'র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেন, তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের অজ্ঞতার পথে যুদ্ধ করেন' (আবু হুরায়রা, কিতাব আল-ফিতান (৩৬), বাব আল-আসাবিয়াহ (৭) থেকে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩০২-৩৯৪৮-এ উদ্বৃত)।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যুদ্ধ-লব্ধ মালামাল, যশ কিংবা মর্যাদার জন্য যখন কেহ যুদ্ধ করে তখন সেই যুদ্ধকে আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ বলা যাবে কী না। জবাবে তিনি বলেন, 'যিনি শুধু মাত্র আল্লাহ'র বার্তাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করেন, কেবল মাত্র তিনি আল্লাহ'র রাস্তায় যুদ্ধ করেন' (আল-বুখারীর বরাতে আবু মুসা থেকে আল-বেয়াহাকি কর্তৃক তার শু'আব আল-ঈমান-এ উদ্বৃত)।

www.pathagar.com

হয়েছ: "ন্যায় ও ধর্মীয় কাজের অগ্রগতির জন্য পরস্পরের সহিত সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপাচার ও সীমা-লংঘনকে উৎসাহিত করার জন্য পরস্পরকে সহায়তা করো না" (আল-কুরআন, ৫:২)। ইবনে খালদুন 'আসাবিয়াহ' শব্দটি প্রথমোক্ত অর্থে ব্যবহার করেন।

তবে, 'আসাবিয়াহ' অনেকগুলো চলকের উপর নির্ভরশীল, যেগুলো ইবনে খালদুন তার চক্রাকার কার্য-কারন সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ও এটি শক্তিশালী হয় যদি পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালিত হয় এবং উন্নয়নের ফলাফলের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় (W ও g)। ন্যায়বিচারের (j) অভাব মানুষের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তাদেরকে হতাশ করে, এবং তাদের সংহতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটি প্রকারান্তরে শুধু কেবল মানুষের কর্ম-স্পৃহার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে না, তাদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদ্যোগ, উদ্যম ও অন্যান্য ভাল গুণাবলী ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দেয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজের ভাঙ্গন শুরু করে ও পতন ঘটায়।

ন্যায়বিচারের (j) জন্য একটি আচরণ-বিধি প্রয়োজন হয়। শরীয়াহ (S) এরুপ একটি আচরণ-বিধির যোগান দেয়। কিন্তু কোন নৈতিক বিধিই কার্যকর হয় না যদি মানুষ সেগুলোর তাৎপর্য না জানে ও একটি দক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) নিশ্চিত না করে যে, বড়-ছোট সকলেই সেগুলো মেনে চলবে (পৃ: ৪৩)। ধরনের সাথে ধারনের যে সম্পর্ক সভ্যতার সাথে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষেরও একই সম্পর্ক (পৃ: ৩৭১ ও ৩৭৬)। "সভ্যতা ছাড়া রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের চিন্তা করা যায় না এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ছাড়া সভ্যতার কথা ভাবা যায় না" (পৃ: ৩৭৬)। ইবনে খালদুন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, 'প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক' কর্তৃপক্ষ যা প্রত্যেককে স্বীয়-স্বার্থ হাসিল করতে ও ইন্দ্রীয় সুখ লাভ করতে সহায়তা করে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'যৌক্তিক রাজনৈতিক' কর্তৃপক্ষ যা প্রত্যেককে তার পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম-নীতির আলোকে ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করতে সহায়তা করে; এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা শরীয়াহ'র দীক্ষা অনুসারে প্রত্যেককে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে (পৃ: ১৯০-১)। যদি এ তিনটি বিষয়ে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে সম্ভবত এগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ মুক্ত সমাজ বা নিষ্ক্রীয় রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ কল্যাণ রাষ্ট্র, ও ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র বা খিলাফত বলা যেতে পারে।[১৩]

---

[১৩] ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য দেখুন, Chapra, 1979; আরো দেখুন, Chapra, *Challenge*, 1992, Chapters 1, 3 and 5।

www.pathagar.com

ইহজাগতিক ও পারলৌকিক বিষয়ে শরীয়াহ'র ইচ্ছা অনুসারে চলতে প্রত্যেককে বাধ্য করা ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য হবে (পৃ: ১৯০-১)। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকারক, অসততা, প্রতারণা ও অসাধুতামূলক সকল আচরণ নিয়ন্ত্রনে রাখার দরকার হতে পারে। চুক্তির শর্তপুরণ ও সম্পত্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করার দরকার হতে পারে এবং জনগণের মনে এমন সব গুণাবলীর প্রবেশ ঘটাতে হতে পারে, যা সামজিক প্রশান্তি ও ন্যায়বিচারের সহিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।[১৪]

এর ফলে প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্নটির উদ্রেক ঘটে তা হচ্ছে ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র তার লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিপ্রয়োগ করবে নাকি যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা প্ররোচিত করবে? "অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়" (পৃ: ১৮৮-৯) শীর্ষক একটি অধ্যায়ে ইবনে খালদুন নিষ্ঠুর ও নির্যাতনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন না করতে রাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছেন (পৃ: ১৮৮)। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, "দয়ালু ও সদাশয় শাসক জনগণকে সুখী করার জন্যে এবং তাদের সৃজনশীল ও উন্নয়ন তৎরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে" (পৃ: ৩০১)। এটা মহানবী (স:)-এর দু'টো হাদিসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছেন: "যার মধ্যে দয়া-মায়া নেই তার মধ্যে ভাল কিছু নেই"; এবং "আল্লাহ দয়ালু এবং তিনি দয়া পছন্দ করেন; তিনি দয়ার জন্য যে প্রতিদান দেন, তিনি নিষ্ঠুরতা বা অন্য কিছুর জন্য সেরুপ কোন প্রতিদান প্রদান করেন না"।[15] সুতরাং, ইসলামি রাষ্ট্রকে শিক্ষা, যুক্তি দ্বারা প্ররোচিত করণ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি অনুকুল

---

[১৪] কেবল মাত্র সাম্প্রতিক কালেই অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়নের রাজনৈতিক মাত্রা ব্যাখা-বিশ্লেষণের একটি মাত্রা হিসেবে মনযোগ আকর্ষণ করা শুরু করেছে। ডগলাস নর্থ জোর দিয়েই বলেছেন যে, বাজে আচরণ নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রেখেই অর্থনীতিসমুহ আশানুরুপ উন্নতি করতে পারে। সরকার এগুলো করতে সক্ষম। যদি সরকার তা না করে, তাহলে মানুষ এমন আচরণ করতে পারে যার ফলে সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং সামাজিক বিশৃংখলা বাড়তে পারে ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে পারে। (দেখুন, "Ideology and Free Rider", North, 1981)। ১১ টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে উইলিয়ামসন সফল অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের কেন্দ্রীয় অবস্থান তুলে ধরেছেন (দেখুন, Williamson, 1993)। ইসলামী প্রেক্ষাপটে যা গুরুত্বপুর্ণ তা শুধু কেবল বাজে আচরণ নিয়ন্ত্রনের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং শিক্ষা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকর সংস্কারের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যাশিত আচরনকে উৎসাহিত করা ও এ সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও জরুরী।

[১৫] যাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আ□ইসাহা থেকে মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহি, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২০০৪: ২৫৯২ ও ২৫৯৩, কিতাব আল-বির ওয়া আল-সিলা ওয়া আল-আদাব: বাব ফাদল আল-রিফক □এ উল্লিখিত।

www.pathagar.com

পরিবেশের উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভর করতে হবে (পৃ: ৩৯, ৪৩, ১৫৭)। তবে, উৎহ প্রদান করা ও প্রতিরোধকের ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি বাতিল করে দেওয়া যায় না। অন্য দু'টো অধ্যায়ে[16] ইবনে খালদুন জোরে-শোরেই বলেছেন যে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল চারিত্রিক গুনাবলীই একজন শাসকের থাকা আবশ্যক। তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল, যুক্তিবাদি ও সাধু হতে হবে, এবং চতুরতা, শঠতা ও মিথ্যাচার এড়িয়ে চলতে হবে। তাকে সকল অঙ্গিকার, চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা পুরণ করতে হবে, জনগণের নিকট সহজলভ্য হতে হবে, জনগণের নালিশ শুনতে হবে, তাদের দু:খ-দুর্দশা দুর করতে হবে, তাদের, বিশেষত: গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অভাব পুরণ করতে হবে, এবং অবিচার ও নির্যাতন দুর করতে হবে। তিনি যুক্তি দেখান যে, শাসক নিজে দুর্বল এবং তার জন্য অন্যদের সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং, যদি তিনি তার দায়িত্ব পুরো-পুরি পালন করতে চান, তাহলে তার সহায়তার জন্য তাকে খাঁটি ও যোগ্য লোক নিয়োগ করতে হবে (পৃ: ২৩৫-৪৩)।

এ বিষয়ের উপর লিখতে গিয়ে অপর সকল মুসলিম পন্ডিতগণের মত ইবনে খালদুনও মনে করতেন যে, এরুপ ভুমিকা পালন করা ঐচ্ছিক নয় আবশ্যিক (পৃ: ২০২)।[17] এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন অধ্যায়ে পর্যাপ্ত আলোচনার অতিরিক্ত হিসেবে তিনি "মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ অনুকুল পরিবেশের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব" নামে গোটা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন (পৃ: ৩০২-১১)। তার মতে, অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে গুণাবলী তৈরীর জন্য লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে (পৃ: ৪২৯), বিজ্ঞান ও শিল্প-কারখানাকে উৎসাহ প্রদান করে (পৃ: ৪০০, ৪৩০, ও ৪৩৪), অবকাঠামো (রাস্তা, সেতু, ইত্যাদি) নির্মাণ করে (পৃ: ৩৪৭), আইন-শৃংখলা (পৃ: ৩৪৭) নিশ্চিত করে, সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করে ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং একটি সৃশৃংখল ও সুষম বাজার ব্যবস্থা বজায় (পৃ: ২২৫) রেখে রাষ্ট্র এরুপ নেতৃত্ব দিতে পারে। যদি রাজনৈতিক সংগঠন তার

---

[১৬] এগুলো হচ্ছে: "রাজনৈতিক ক্ষমতার যোগ্যতার লক্ষন হচ্ছে ভালো গুনাবলীর অনুসরন করা এবং তার উল্টোটা" (পৃ: ১৪২-৪), এবং "মানব সভ্যতার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন" (পৃ: ৩০২-১১)।

[১৭] খলিফা হারুন আল-রশীদকে (মৃত্যু ১৯৩/৮০৯) আবু ইউসূফ বলেছিলেন যে, "সংস্কার ও পুণ:গঠনের চেয়ে অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ পছন্দ বেশী পছন্দ করেন না, এবং দুর্নীতি, বিকৃত মানসিকতা ও অবক্ষয়ের মত আর কোন কিছুকে আল্লাহ এমন অপছন্দ করেন না" (আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরী, পৃ: ৫)। সুতরাং, প্রথমোক্তটির ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে ও শেষোক্তটি প্রতিরোধ করার জন্য যা যা করা দরকার তা করা শাসকেরই কর্তব্য (প্রাগুক্ত)।

www.pathagar.com

ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করে তাহলে সেটি উন্নয়নে (g) ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। জনগণের অভাব পুরণ হবে এবং তারা কঠিন, বিবেক-বিবেচনাপূর্ণ ও দক্ষ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। যদি তা না হয় তাহলে অবক্ষয় শুরু হবে।

এর জন্য রাষ্ট্রের যে সম্পদ প্রয়োজন তা একটি সঠিক ও দক্ষ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। রাজস্ব আদায়ের জন্য রাষ্ট্রকে যে সকল নীতি অবশ্যই পালন করতে হবে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে ইবনে খালদুন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো পরবর্তিতে 'রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন' শীর্ষক উপ-শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং, যদি একটি দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন শরীয়াহ বাস্তবায়ন (পৃ: ৪৩, ১৮৮, ১৯১-২, ২১৮) না করে তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। ন্যায়বিচার না থাকলে ভ্রাতৃত্ববোধ (আসাবিয়াহ) থাকবে না, এবং যদি 'আসাবিয়াহ' না থাকে তাহলে শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পরিবেশ থাকবে না, এবং, আইন-শৃংখলা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিও থাকবে না (পৃ: ১৫৮, ১৫৯ ও ২০২)। ভ্রাতৃত্ববোধ, আইন-শৃংখলা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি না থাকলে রাজনৈতিক প্রশাসনকে (G) দুর্বল ও অকার্যকর করবে। এটি অন্য সকল আর্থ-সামাজিক চলকের (S, N, W ও j) দুর্বল হয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং অবক্ষয় ও পতনের পথে নিয়ে যায়।

তবে, ইবনে খালদুনের চক্রাকার কার্য-কারন সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করলেও এটি কখনও কঠোর শাসনের একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না (পৃ: ১৮৮)। তার টিকে থাকার স্বার্থেই সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেবল মাত্র ক্ষমতা আছে বলেই সরকারের এরুপ ধারনা করা উচিত নয় যে, সরকার যা খুশী তা-ই করতে সক্ষম (পৃ: ৩০৬)। বরং, বাজার ব্যবস্থা যেন নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে সেই লক্ষ্যে[18] এবং উন্নয়ন (g) ও ন্যায়বিচার (j) বাস্তবায়নের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত (পৃ: ৩০৬)। অপরাপর মুসলিম পন্ডিতদের মত রাষ্ট্র সম্পর্কে তার ধারনা হচ্ছে এরুপ একটি রাষ্ট্র যা কল্যাণমুখী, যা অতিরিক্তি ব্যয় করে না, যা সম্পত্তির উপর জনগণের অধিকারকে সম্মান করে, ও যা জনগণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয় না (পৃ: ২৯৬)। অর্থ ব্যয় ও ন্যায়ানুগ নীতি অনুসরনের মাধ্যমে রাষ্ট্র উন্নয়ন

---

[১৮] ইবনে খালদুনের আগেও অর্তনীতিতে বাজারের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সমঝোতা ছিল। ইবনে তায়মিয়াহ সহ কতিপয় লেখকদের রচনায় এটা বেশ পরিষ্কার (ইবনে তায়মিয়াহ'র জন্যে দেখুন, Islahi, 1988)।

www.pathagar.com

ত্বরান্বিত করে, এবং অতিরিক্ত করারোপ ও ভুল নীতি অনুসরন করে রাষ্ট্র উন্নয়ন নিরুৎসাহিত করে (পৃ: ২৭৯-৮১)। অন্য কথায় ইবনে খালদুন এমন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে যার শক্তি ও শক্তির ফসল উভয়ই সুষমভাবে বন্টন হয়ে থাকে, এবং যা ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে (পৃ: ৪৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৮ ও ১৬৭)।

জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে বিরাট অংকের ব্যয় করতে হয় বিধায় ইবনে খালদুন রাষ্ট্রকে একটি বৃহদাকার বাজার (পৃ: ২৮৬ ও ৪০৩) রুপে বিবেচনা করলেও রাষ্ট্রের সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়াকে তিনি অবাঞ্চিত মনে করেন (পৃ: ২৮১)।[19] এর ফলে জনগণের (N) সুযোগই কেবল কমে যাবে না, বরং শেষতক রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হবে (পৃ: ২৮১-৩)।[20] বরং, রাষ্ট্র এমন কাজ করা উচিত যাতে মানুষ আরো দক্ষতার সহিত ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে এবং যা তাদেরকে বাড়া-বাড়ি ও অন্যায়-অবিচার করা থেকে বিরত রাখতে পারে। সুতরাং, ইবনে খালদুন এমন একটি রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন যা সম্পূর্ণ মুক্ত রাষ্ট্রও নয় আবার কর্তৃত্ববাদি রাষ্ট্রও নয়। বরং, এটি হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যা শরীয়াহ'র প্রয়োগ নিশ্চিত করে এবং মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার হাতিয়ার রুপে কাজ করে।

শরীয়াহ'র (S) ভুমিকা

মানব সমাজের কল্যাণের জন্য যে আচরণ-বিধি দরকার তা তখনই সবচেয়ে কার্যকর হয়, যখন সেগুলো বিনা বাধায় মেনে নেওয়া হয় এবং সকলে স্বেচ্ছায় সেগুলো মেনে চলে। আচরণ-বিধিসমুহের মেনে চলা ও প্রতিপালন সবচেয়ে ভাল হয় মর্মে প্রতীয়মান যখন সেগুলো স্বর্গীয় উৎস থেকে নাজিল হয় (পৃ: ১৫৭)।[21] শরীয়াহ জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে (পৃ: ১৪৩)। ইহা সৌহার্দ উৎসাহিত করে ও বিভেদ কমায় (পৃ: ১৫৭), একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে একত্রে রাখার জন্য এটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাবকরুপে প্রমাণিত হয়েছে (পৃ: ৩৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৫৮)। এটি জনগণের (N) মধ্যে সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত অধ্যাবসায়, সততা, অখন্ডতা, মিতব্যয়িতা ও গোষ্ঠীগত অনুভুতির

---

[১৯] আরো দেখুন, আল-দিমাস্কি (মৃত্যু ৫৭০/১১৭৫-এর পর), যিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এ বলে যে, কতিপয় বিজ্ঞজন বলেছেন যে, যদি শাসক গোষ্ঠী জনগণের সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহন করে, তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে (১৯৭৭, পৃ: ৬১)।

[২০] এ অবস্থাকে বর্তমানে বলা হয় বেসরকারী খাতকে বলপূর্বক বের করে দেওয়া।

[২১] আধুনিক কালের ইতিহাসবেত্তাদের একইরুপ মতামতের জন্য দেখুন, টয়নবী, ১৯৫৭, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৯৫-৬; ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮০; ডুরান্টস, ১৯৬৮, পৃ: ৫১।

www.pathagar.com

মত গুণাবলী সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, যা উন্নয়ন, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক দেখ-ভাল, সহযোগিতা, সামাজিক সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে, এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকর আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখে।[22] এটি সম্পদের ব্যবহারে একটি মিতব্যয়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং তার মাধ্যমে সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। জনগণের (N) মধ্যে এ সকল গুণাবলী না থাকলে বৈষম্য, ভারসাম্যহীনতা, অসন্তোষ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে, যা শেষতক অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টির কারন হতে পারে। পরকালে স্রষ্টার নিকট, যাঁর নিকট থেকে কোন কিছুই লুকানো যায় না, মানুষের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত শরীয়াহ'র ধারনা গোপণভাবে অন্যদের স্বার্থহানি করে ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করণে একটি মোক্ষম কৌশল হিসেবে কাজ করতে পারে। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষগুলোর নিজেদের পক্ষে এরুপ সকল আচরণ দুর করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি তারা এরুপ চেষ্টা করে, তাহলে তার জন্য চড়া মূল্য দিতে হতে পারে।

অধিকাংশ মুসলমানের নিকট কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে, ইবনে খালদুন তার মডেলে শরীয়াহকে একটি নির্ভরশীল চলকে পরিণত করেছিলেন। স্রষ্টার প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে ইবনে খালদুনের মত তারাও বোঝেন যে, শরীয়াহ (S) হচ্ছে "যা কিছু ভাল ও যা কিছু ভালোর দিকে পথ দেখায় সেগুলোর পথ-প্রদর্শক" (পৃ: ৩০৪)। ইবনে খালদুনের অবস্থান স্পষ্ট হয় তখন যখন আমরা বুঝতে পারি যে, শরীয়াহ (S) শুধু মাত্র কতিপয় সার্বিক ও সংক্ষিপ্ত নীতি উপস্থাপন করে, যাকে স্থান-কাল ভেদে মানুষের (N) পরিবর্তনশীল চাহিদার আলোকে বিবর্ধিত করতে হবে। এর বাস্তবায়নও প্রয়োজন হয়। যদি 'উলেমাগণ' অতি উদার কিংবা অতি কঠোর ও বাস্তবতা-বিবর্জিত হয়, যদি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) ধর্ম-নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ন হয় এবং শরীয়াহ'র বাস্তবায়নে তার ভুমিকা পালন করতে আগ্রহী না হয়, এবং যদি জনগণ এতই দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত থাকে যে উলেমাগণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব হয়, তাহলে শরীয়াহ'র (S) বিকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেনা। সুতরাং, G ও N (উলেমাগনসহ) তাদের ভুমিকা যথাযথরুপে পালন না করলে শরীয়াহ কার্যকর হবে না। সুতরাং, এ অর্থে শরীয়াহকে (S) একটি নির্ভরশীল চলক হিসেবে কল্পনা করা কঠিন কিছু নয়।

---

[২২] সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস বর্তমানে স্বীকার করছে যে, সম্পদের পরিমান ও প্রযুক্তির মানের চেয়ে অর্থশাস্ত্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের বিধানাবলী অর্থনৈতিক ফলাফল নির্ধারনের ক্ষেত্রে বেশী ভূমিকা পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

এর ফলে শরীয়াহ'র প্রাধান্য বা এর অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো অনিবার্যভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। এটি মহানবী (স:)-এর উক্তির প্রতিফলন ব্যতীত আর কিছু নয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের মাধ্যমে যা নিয়ন্ত্রন করেন না তা তিনি শাসকের (G) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করেন",[২৩] এবং, "দারিদ্র্য অবিশ্বাসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে"।[২৪] আল-মাওয়ার্দির বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য যে কোন লোকই বুঝতে পারেন, শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারনে অবিচার মানব সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে ও সভ্যতার অবক্ষয় নিয়ে আসে (পৃ: ৩৯)। সুতরাং, ইবনে তামিয়াহ যথার্থই বিশ্বাস করেছিলেন যে, ইসলাম ও অবিচার সহাবস্থান করতে পারে না – দু'টির একটি অপরটির উপস্থিতিতে দুর্বল হয়ে পড়বে।[২৫]

ইবনে খালদুনের মডেলের এ দিকটির সমর্থনে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। পরের অধ্যায়ে যেমনটি দেখা যাবে, তফসীর ও ফিকহ'র বিকাশ মুসলিম বিশ্বের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যদিও শরীয়াহ'র মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথ যত্নের সহিত সংরক্ষিত হয়েছে। অন্তত: আংশিকভাবে হলেও এটি ব্যাখ্যা করে কেন ফিকহ্ বিশদভাবে বিকাশ লাভ করে নি, ও কেন তা মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগে কতিপয় নিষ্ফল আলোচনার কূটতর্কে জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং যখন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলকগুলো অব্যাহত বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছিল তখন কেন শরীয়াহ'র যথেষ্ট পরিমান বাস্তবায়ন ঘটেনি, তাদের (চলকগুলোর) সামর্থ যখন এরুপ বাস্তবায়নের ভিত্তিরুপে কাজ করে। সুতরাং, কারো মনে সন্দেহের সামান্যই সুযোগ থাকে যে, কোন বিশেষ সময়ে শরীয়াহ (S) রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের (G) উপলব্ধি, শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং জনগণসহ (N) ধন-সম্পদ (W), সমৃদ্ধি (g) ও ন্যায়বিচারের (j) অগ্রগতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকে।

---

[২৩] আল-মাওয়ার্দি কর্তৃক উদ্ধৃত, আদাব, ১৯৫৫ পৃ: ১২১।

[২৪] আনাস ইবনে মালিক থেকে আল-বেয়াহাকি কর্তৃক তাঁর শু□আব আল-ইমান, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৬৭, নম্বর ৬৬১২-এ উল্লিখিত।

[২৫] ইবনে তায়মিয়াহ, আল-হিসবাহ, ১৯৬৭, পৃ: ৯৪। ইবনে তায়মিয়াহ কর্তৃক তার সমাজে বিদ্যমান রীতি-নীতির আলোকে তৈরী প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এরুপ উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছে, যা সে সময় প্রচলিত দু□টো প্রবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে: □স্রষ্টা অবিশ্বাসী ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেন, কিন্তু, কোন মুসলিম রাষ্ট্রকেও স্রষ্টা টিকিয়ে রাখেন না, যদি তা ন্যায়পরায়ন না হয়□, এবং, □ন্যায়বিচার ও অবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী চলতে সক্ষম. কিন্তু, অবিচার ও ইসলাম নিয়ে পৃথিবী চলতে পারে না□।

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ (W) ও উন্নয়নের (g) ভূমিকা একটি সমাজের কল্যাণের জন্য W ও g আবশ্যকীয় এবং তাদের উপর সমাজের দুর্বলতা বা সবলতা নির্ভরশীল। কিন্তু কিভাবে এগুলোর উন্নতি সাধন করা যেতে পারে? ইবনে খালদুন একটি অবিসংবাদিত জবাব দেন। এগুলো ভাগ্যের উপর (পৃ: ৩৬৬) নির্ভর করে না কিংবা সোনা-রুপার খনির উপর নির্ভর করে না (পৃ: ৩৬৬)।[২৬] বরং, সেগুলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (পৃ: ৩৬০ ও ৩৬৬), শ্রমের আকার ও বিভাগ (পৃ: ৩৬০), বাজারের বৃহদাকৃতি (পৃ: ৪০৩), রাষ্ট্রীয় উৎসাহ ও সুবিধা (পৃ: ৩০৫) ও কৌশলাদির (পৃ: ৩৬৫) উপর নির্ভর করে, যা আবার সঞ্চয় বা "জনগনের অভাব মেটানোর পর বেঁচে যাওয়া উদ্বৃত্তের" উপর নির্ভর করে (পৃ: ৩৬৫)।[২৭] কর্মকান্ড যত বেশী হবে, আয় তত বেশী হবে। উচ্চ মুনাফা বেশী হারে সঞ্চয় ও বেশী বেশী বিনিয়োগ (পৃ: ৩৬৫) সৃষ্টি করবে, যা পালাক্রমে অধিকতর উন্নয়ন (g) ও সম্পদ (W) সৃষ্টিতে অবদান রাখবে (পৃ: ৩৬০)।[২৮] বিনিয়োগের ভূমিকা তিনি আরো গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেন যখন তিনি বলেন, "গুদামে বা সিন্ধুকে পুরে রাখলে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে না। সম্পদের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারন ঘটে তখন যখন জনগণের অধিকার প্রদান করতে ও তাদের ক্লেশ দুর করতে তা জনকল্যাণে ব্যয় করা হয়" (পৃ: ৩০৬)। এর ফলে "জনগণ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়, রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়, সমৃদ্ধির যুগ আসে, ও রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়" (পৃ: ৩০৬)। যে সকল বিষয়সমুহ প্রভাবকরুপে কাজ করে সেগুলো হচ্ছে করের নিম্ন-হার (পৃ: ২৮৬-৮৭), জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, এবং প্রচুর গাছপালা, পানি ও জীবনের জন্য জরুরী সুবিধাদিসহ একটি স্বাস্থ্যকর বাহ্যিক পরিবেশ (পৃ: ৩৪৭-৯)। শ্রম-বিভাগ ও বিশেষায়িত জ্ঞানের উপরও সম্পদ নির্ভরশীল; বিশেষায়িত জ্ঞান যত বেশী হবে সম্পদের প্রবৃদ্ধিও তত বেশী হবে (পৃ: ৩৬০)। তবে, শ্রম- বিভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না যদি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম একটি সুনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা চালু না থাকে (পৃ: ৩৬০-২)।

আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি হলে তা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনে আরো বেশী অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। এর ফলে

---

[২৬] আরো দেখুন, আল-দিমাস্কি, ১৯৭৭, পৃ: ২৩-৪ ও ২৮; মুল্য নির্ধারন, বিনিময়ের মাধ্যম ও মুল্যের ধারক হিসেবে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

[২৭] আল-দিমাস্কি (১৯৭৭) আরো বলেছেন যে, □সম্পদের বিকাশের জন্য ৫টি বিষয় আবশ্যক, প্রথমটি হচ্ছে, কেহ আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করবে না এবং কারো ব্যয় তার আয়ের সমান হবে না□ (পৃ: ৮)।

[২৮] বিনিয়োগের গুরুত্বের জন্য দেখুন, আল-দিমাস্কি, (১৯৭৭) পৃ: ৯১।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারন ঘটে (পৃ: ৩৬২), আরো বেশী উন্নয়ন হয়, যা আবার জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে, অন্যান্য স্থান থেকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক ও শিক্ষিত লোকজনের অভিবাসনকে উৎসাহিত করে (পৃ: ৩৬৩), এবং এভাবে সমাজের মানব ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুলধনকে আরো শক্তিশালী করে। জনসংখ্যার এরুপ বৃদ্ধির ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে শিল্প-কারখানা স্থাপন ত্বরান্বিত হয়, আয় বেড়ে যায়, বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা উৎসাহিত হয় (পৃ: ৩৯৯ ও ৪২৯), উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত হয় (পৃ: ৩৬৩ ও ৪০৩)। শুরুতে উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মূল্য হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় (পৃ: ৩৬৩)। তবে, যদি চাহিদা বাড়তেই থাকে ও সরবরাহ চাহিদার সাথে তাল মেলাতে সক্ষম না হয়, তাহলে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়, ফলে পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে যায় (পৃ: ৩৬৩)। বিলাস সামগ্রীর চেয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দ্রুততর গতিতে বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং গ্রাম এলাকার চেয়ে শহর এলাকায় পণ্যের দাম দ্রুততর গতিতে বাড়ে (পৃ: ৩৬৪-৫)। শ্রম ও কর খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ কারনে মুল্য আরো বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় এবং জনসংখ্যার প্রবাহে বিপরীত স্রোতের সৃষ্টি করে (পৃ: ৩৬৪)। উন্নয়নে অবক্ষয় শুরু হয়, তার সাথে সমৃদ্ধি ও সভ্যতারও অবক্ষয় শুরু হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে সমৃদ্ধি যেমন বাড়ে, তেমনি এর ফলে বাতাস ও বাহ্যিক পরিবেশ আরো দূষিত হয়, মহামারী ছড়ায় ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (পৃ: ৩০২)। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ফলে বিলাসিতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। যদিও বিলাসিতার কারনে শুরুতে চাহিদা ও আয় বৃদ্ধি পায়, ও দেশের আরো উন্নয়ন ঘটে ও রাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধি পায় (পৃ: ১৭৪-৫), এর ফলে শেষতক নৈতিকতা কলুষিত হয় (পৃ: ১৫৭, ৩৫৭, ও ৩৯৯) এবং অর্থ ব্যয়ের উপর নৈতিক নিয়ন্ত্রন দুর্বল হয়ে যায়। অসংযমের কাছে সংযম পরাস্ত হয়।[29] মানুষের মধ্যে তখন বিলাসী পণ্য সংগ্রহের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করার প্রবণতা দেখা যায়। ন্যায়ের পথে থেকে যখন এ সকল পণ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হলে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। যে সকল ভাল গুণাবলী ও সৃজনশীল ক্ষমতা মানুষকে সংহতি ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, সেগুলো এভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে (পৃ: ১৬৭, ১৭৪, ও ৩৭৩)। তাছাড়া, উন্নয়নের সুফলের সুষম বন্টন হয় না (পৃ: ১৬৮)। ফলে কর্মস্পৃহা ও সৃজনশীলতা হ্রাস পায় এবং উন্নয়নে ছন্দ-পতন ঘটে।

---

[২৯] প্রায় সকল চিরায়ত মুসলিম পন্ডিতগন সংযমের পক্ষে বলেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, আল-দিমাস্কি, ১৯৭৭, পৃ: ৮০-৯৬।

www.pathagar.com

আয় কমে যাওয়ার ফলে রাজস্ব আয়ও কমে যায়, যা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত নয়। রাষ্ট্র তখন বেশী বেশী করারোপ করতে থাকে এবং শক্তি ও সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রন গ্রহণের প্রয়াস পায়। অধিকাংশ কর পরিশোধকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কর্মে ও আয় উপার্জনের আগ্রহে বিরূপ প্রভাব পড়ে (পৃ: ২৮২)। সুতরাং, আয় কমে গেলে রাজস্ব আয়ও কমে যায় (পৃ: ২৮২)।[30] এর ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও কল্যাণ খাতে অর্থ ব্যয় করতে অপারগ হয়। উন্নয়ন কমে যায়, মন্দা আরো গভীর হয়, অবক্ষয়ের নিয়ামকসমুহ গতি পায়, এবং শাসক বংশকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায় (পৃ: ১৬৮ ও ২৮০-১)।

ইবনে খালদুনের অন্যান্য অবদানসমুহ

সুতরাং, মনে হচ্ছে যে, বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারনসমুহ সমাজের উন্নতি বা অবক্ষয়কে উৎসাহিত করার জন্য পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত ও গতিশীলভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে ইবনে খালদুনের একটি স্পষ্ট ধারনা ছিল। তবে, তাঁর কীর্তি এখানেই শেষ নয়। এ সকল বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বুলাকিয়া'র মতে ইবনে খালদুন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে "উৎপাদনের তত্ত্ব, মূল্য সম্পর্কিত তত্ত্ব, বন্টন সম্পর্কিত তত্ত্ব, কালচক্রের তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন যেগুলোর সমন্বয়ে একটি সুগঠিত সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, এবং এগুলোই তাঁর ইতিহাসের কাঠামো"।[৩১] এত সব কিছুর একটি সার্বিক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। সরবরাহ, চাহিদা, মূল্য নির্ধারন ও রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে তাঁর কতিপয় অবদান নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সরবরাহ ও চাহিদা

মূল্য নির্ধারনে সরবরাহ ও চাহিদার প্রভাব ইবনে খালদুন বুঝতে পেরেছিলেন (পৃ: ৩৯৬)।[৩২] এটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কারনে যে, উনবিংশ শতকের

---

[৩০] ইবনে খালদুনের বহু পুর্বে আবু ইউসুফ বলেছিলেন যে, ন্যায্যতা নিশ্চিতকরন ও অবিচার দুর করা হলে আল্লাহ'র তরফ থেকে বেশী বেশী পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও কর রাজস্ব আদায় বাড়ে এবং দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে ও বেশী বেশী আশীর্বাদ পাওয়া যায় (আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরী, পৃ: ১১১)।

[৩১] বুলাকিয়া, ১৯৭১, পৃ: ১১০৬।

[৩২] ইবনে খালদুনের পুর্বে অন্যান্য লেখকগন মুল্য নির্ধারনে চাহিদা ও সরবরাহের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইবনে তায়মিয়াহ লিখেছিলেন:

www.pathagar.com

শেষে ও বিংশ শতকের শুরুতে সরবরাহ ও চাহিদার ভুমিকা পাশ্চাত্যে ভালভাবে স্পষ্ট হয় নি। উলিয়াম পেটি (১৬২৩-৮৭), রিচার্ড ক্যান্টিলন (১৬৮০-১৭৩৪), জেমস স্টুয়ার্ট (১৭১২-৮০)-এর মত প্রাক্ চিরায়ত অর্থশাস্ত্রবিদগণ, এবং এমনকি অর্থশাস্ত্রের চিরায়ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এডাম স্মিথের (১৭২৩-৯০) মত অর্থশাস্ত্রবিদ মূল্য নির্ধারনের জন্য সাধারণভাবে উৎপাদনের ব্যয়, বিশেষত: শ্রম খাতের ব্যয়ের উপর জোর দিত। ইংরেজী লেখায় সরবরাহ ও চাহিদার প্রথম ব্যবহার দেখা যায় সম্ভবত: ১৭৬৭ সালে।[33] তথাপিও, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাজার মূল্য নির্ধারনে চাহিদা ও সরবরাহের ভুমিকা পুরো-পুরি উপলব্ধি করা যায় নি।[34]

ইবনে খালদুন বেশ জোরে-শোরেই বলেছিলেন যে, চাহিদার বৃদ্ধি বা সরবরাহের ঘাটতি হলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, এবং চাহিদা কমে গেলে বা সরবরাহ বেড়ে গেলে মূল্য পতন ঘটে (পৃ: ৩৯৩ ও ৩৯৬)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'খুব নিম্ন' মূল হার অব্যাহত থাকলে তা দক্ষ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিকর হয় এবং তারা বাজার থেকে বিদায় হয়ে যায়, তেমনি 'খুব উচ্চ' মূল্য হার ভোক্তাদের ক্ষতি করে। দু'টি চরম অবস্থার মাঝা-মাঝি একটি যুক্তিসঙ্গত: অবস্থা কাংখিত, কারন সেরুপ অবস্থা ব্যবসায়ীদেরকে শুধুমাত্র সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মাত্রার লাভই দেবে না, বরং বিক্রয় বৃদ্ধি করে বাজার থেকে প্রতিবন্ধকতা দুর করবে ও একটি নির্দিষ্ট পরিমান ব্যবসা ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে (পৃ: ৩৯৮)। তবুও, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্বল্প মূল্য কাংখিত ছিল কারন তা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গরীবদেরকে স্বস্থি দিত (পৃ: ৩৯৮)। আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে, ইবনে খালদুন একটি স্থিতিশীল মূল্য সূচক খুঁজে পেয়েছিলেন, আরো পেয়েছিলেন

মুল্যের উত্থান বা পতন অবশ্যই কেবল মাত্র কতিপয় ব্যক্তির অন্যায়ের কারনে ঘটেনা। উৎপাদনের স্বল্পতা কিংবা চাহিদার তুলনায় আমদানী কম হওয়ার কারনেও তা ঘটতে পারে। কোন পণ্যের চাহিদা বাড়লে ও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে গেলে মুল্য বেড়ে যায়। তবে, চাহিদা কমলে ও সরবরাহ বাড়লে মুল্য কমে যায় (ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমু আল-ফতোয়া, ১৯৬১-৩, ৮ম খন্ড, পৃ: ৫২৩)।

ইবনে তায়মিয়াহ্‌রও পুর্বে প্রায় ৫ শতক আগে আল-জাহিয (মৃত্যু ২৫৫/৮৬৯) লিখেছিলেন যে: বাজারে প্রাপ্ত যে কোন জিনিস সস্তা এ কারনে যে সেগুলো বাজারে পাওয়া যায়, এবং কোন জিনিসের দাম বেশী এ কারনে যে চাহিদা আছে কিন্তু পাওয়া যায় না (আল-তাবাস্সুর, ১৯৮৩, পৃ: ১৩), এবং কোন কিছুর সরবরাহ বাড়লে তার দাম কমে যায়, শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত যা বাড়লে মুল্যও বাড়ে (প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩)।

৩৩ Thweatt, 1983.

৩৪ Groenewgen, 1973.

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে কম খরচে জীবন ধারনের একটি ব্যবস্থা যা প্রবৃদ্ধি ও সমতার দৃষ্টিকোন থেকে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-স্ফীতি হ্রাস করনের বিরক্তিকর পালার চেয়ে ভাল। প্রথমোক্তটি সমতার জন্য ক্ষতিকারক এবং শেষোক্তটি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দক্ষতা কমিয়ে দেয়। তবে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্বল্প-মূল্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারন করে দেওয়া সমীচীন নয়; এর ফলে উৎপাদনের উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায় (পৃ: ২৭৯-৮৩)।

ইবনে খালদুনের মতে যে সকল কারন সরবরাহের নিয়ামক সেগুলো হচ্ছে: চাহিদা (পৃ: ৪০০ ও ৪০৩), লাভের আপেক্ষিক হার (পৃ: ৩৯৫ ও ৩৯৮), মানবীয় প্রচেষ্টার পরিমান (পৃ: ৩৮১), শ্রম বাজারের আয়তন এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা (পৃ: ৩৬৩, ৩৯৯-৪০০), শান্তি ও নিরাপত্তা (পৃ: ৩৯৪-৫ ও ৩৯৬) এবং গোটা সমাজের কারিগরি প্রেক্ষাপট ও সমৃদ্ধি (পৃ: ৩৯৯-৪০০)। এর সব কিছুই তার উৎপাদন তত্ত্বের উপাদান ছিল। মূল্যের পতন হলে ও ক্ষতি হলে পুঁজি হারিয়ে যায়, সরবরাহের উৎসাহ কমে যায়, ফলত: মন্দা শুরু হয়। পরিণতিতে ব্যবসা ও শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চাহিদার নিয়ামকগুলো ছিল আয়, জনসংখ্যার আয়তন, জনসাধারনের অভ্যাস ও রীতি-নীতি এবং সমাজের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি। প্রথাগত অর্থশাস্ত্রবিদগণের তুলনায় অনেক সামনে এগিয়ে ইবনে খালদুন এতটা প্রাগ্রসর চিন্তা করলেও চাহিদা ও সরবরাহের তফশীল, চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য মূল্য (যা আধুনিক অর্থশাস্ত্র আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে) সম্পর্কে সম্ভবত: তাঁর কোন ধারনা ছিল না।

ইবনে খালদুন স্বয়ংসম্পূর্ণতার সম্ভাব্যতা বা প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং শ্রম বিভাগ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এ বলে যে: "এটি সর্বজনবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি মানুষ নিজে তার সকল ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এ লক্ষ্যে তাদের সকলে পরস্পরকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের একটি গোষ্ঠী যে পরিমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম তা ব্যক্তিগত সহযোগিতার সক্ষমতার তুলনায় বহুগুন বেশী" (পৃ: ৩৬০)। এ বিবেচনায় সম্ভবত: তিনিই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের অগ্রদূত।[৩৮]

---

[৩৮] ইবনে খালদুনের বহু আগে বহু পন্ডিত শ্রম বিভাগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ, আল-সারাখশী বলেছিলেন যে: □বস্ত্রের জন্যে কৃষকের তাঁতীর

রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন

ইবনে খালদুন স্পষ্টভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তি উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রও উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র উৎপাদনকে উৎসাহিত করে এবং করারোপের মাধ্যমে রাষ্ট্র উৎপাদনকে নিরুৎহিত করে (পৃ: ২৭৯-৮১)। যেহেতু, পণ্য ও সেবার সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে সরকার, এবং সকল উন্নয়নের প্রধান উৎস (পৃ: ২৮৬ ও ৪০৩), রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় কমে গেলে শুধু কেবল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডই শ্লথ হয়ে যায় না ও লাভ কমে যায় না, রাজস্ব আয়ও কমে যায় (পৃ: ২৮৬)। সরকার যত বেশী অর্থ ব্যয় করবে, অর্থনীতির জন্যেও তত কল্যাণ হবে (পৃ: ২৮৬)। বেশী হারে অর্থ ব্যয় করা হলে সরকার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তমূলক কর্ম সম্পাদন করতে (পৃ: ৩০৬ ও ৩০৮) ও আইন-শৃংখলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। শৃংখলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যতীত উৎপাদনের জন্য উৎপাদকদের কোন উৎসাহ থাকে না। তিনি বলেছেন যে, "(শহরগুলোর দ্রুত উন্নতির) একমাত্র কারন হচ্ছে যে সরকার সেগুলোর কাছে অবস্থান করে ও সরকার সেগুলোর ভেতরে অর্থ ঢেলে দেয়, যেমন (একটি নদীর) পানির মত যা তার চার পাশের সবকিছুকে সবুজ করে রাখে, নিকটস্থ ভুমিতে জল সেচ করে, অথচ দুরের সবকিছু শুষ্ক থেকে যায়" (পৃ: ৩৬৯)।

করারোপের বিধি-বিধানের (সাম্য, নিশ্চয়তা, পরিশোধের সুবিধা ও আদায়ে দক্ষতা) জন্য বিখ্যাত এডাম স্মিথ (মৃত্যু ১৭৯০)-এর বহু পুর্বে তার 'মুকাদ্দিমাহ'য় ইবনে খালদুন করারোপের রীতি-নীতি সম্পর্কে বলিষ্ঠভাবে বলেছিলেন।[36] খলিফা আল-মামুনের এক সেনানায়ক তাহির ইবনে আল-হুসায়েন কর্তৃক তার পুত্র আল-রাক্কাহ'র (সিরিয়া) গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে

প্রয়োজন রয়েছে, এবং তাঁতীর প্রয়োজন আছে কৃষককে তার খাদ্যের জন্যে এবং সুতার জন্যে যা থেকে বস্ত্র তৈরী হয় ", এবং এ ভাবে তাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব কাজের মাধ্যমে পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে "" (আল-সারাখশী, আল-মাবসাট, ৩০ খন্ড, পৃ: ২৬৪)। এক শতক পরে লিখতে গিয়ে আল-দিমাস্কি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন: "স্বল্পায়ুষ্কালের কারনে কোন এক ব্যক্তি নিজের উপর সকল শিল্পের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয় না। যদি সক্ষম হন, তাহলেও তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুতেই দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন না। সকল শিল্পই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নির্মান শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় ছুতারের এবং ছুতারের প্রয়োজন হয় কামারের এবং কামারের দরকার হয় খনি-শ্রমিকের এবং এ সব শিল্পের জন্যে প্রয়োজন হয় দালান-কোঠার। সুতরাং, পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে মানুষ বাধ্য হয় পরস্পারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নগর এলাকায় কেন্দ্রীভূত হতে" (১৯৭৭, পৃ: ২০-১)।

[৩৬] দেখুন, এডাম স্মিথ, ১৯৩৭, পৃ: ৭৭৭-৯।

www.pathagar.com

তাহিরকে উপদেশ দিয়ে লেখা একটি পত্র থেকে উদ্বৃত করে তিনি বলেন: "সুতরাং, সকলের উপর সার্বিকভাবে করারোপ কর, সম্ভ্রান্ত বা ধনী ও তোমার নিজের কর্মচারী, সভাসদ বা অনুসারী কাউকেই মাফ করবে না। এবং এমন কারো উপর এমন পরিমান কর আরোপ করবে না যা সে পরিশোধ করতে অক্ষম (পৃ: ৩০৮)।[৩৭] এ অনুচ্ছেদটিতে তিনি সমতা ও নিরপেক্ষতার নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যত্র তিনি সুবিধার নীতি ও উৎপাদনের নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি তাঁর আগেও আইনশাস্ত্রবিদগণ এসকল নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বিশেষত: এমন একটি কর ব্যবস্থার উপর যা ন্যায়ানুগ হবে, নীপিড়নমূলক হবে না।[৩৮]

লাভ ও উৎপাদনশীলতার উপর কর ব্যবস্থার প্রভাব ইবনে খালদুন এমন স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন যে মনে হচ্ছে তিনি আদর্শ কর ব্যবস্থার ধারনা বুঝতে পেরেছিলেন। প্রফেসর আর্থার ল্যাফারের প্রায় ছয়শত বছর পুর্বে তিনি 'মুকাদ্দিমাহ'র দু'টো পুরো অধ্যায়ে ল্যাফারের ধারনার মুল বিষয় অনুমান করেছিলেন।[৩৯] প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিষয় হচ্ছে, অধিকতর লাভ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের উপর থেকে যতদুর সম্ভব করের বোঝা হ্রাস করা" (পৃ: ২৮০)। এটি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে,

---

[৩৭] এ চিঠিটি খলিফা হারুন আল-রশিদের নিকট আবু ইউসুফের লেখা চিঠির চেয়ে অনেক বেশী বিশদভাবে লেখা (১৩৫২ হিজরী)। এটি আরো বেশী সম্পূর্ণ ও আরো অনেক বেশী ইস্যুকে নিয়ে লেখা হয়েছিল।

[৩৮] সকল প্রকৃত খলিফাগন বিশেষত: উমর, আলী এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ জোর দিতেন ন্যায়পরায়নতা ও শিথিলতার সহিত যেন কর আদায় করা হয় এবং তা যেন জনগণের সহ্য ক্ষমতার বেশী না হয়। কর আদায়কারীগন কোন অবস্থাতেই জনগণকে তাদের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করবে না (আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরী, পৃ: ১৪, ১৬ ও ৮৬)। আবু নিজে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, একটি ন্যায়পরায়ন কর ব্যবস্থা কেবল মাত্র রাজস্ব আয়ই বাড়াবে না, দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখবে (আবু ইউসুফ, ১৩৫২ হিজরী, পৃ: ১১১; আরো দেখুন, পৃ: ১৪, ১৬, ৬০, ৮৫, ১০৫-১৯ ও ১২৫); আল-মাওয়ার্দিও যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, কর ব্যবস্থা কর দাতা ও সরকারী খাজাঞ্চিখানা উভয়ের উপরই ন্যায় বিচার করা উচিৎ, বেশী আদায় করা হলে জনগণের অধিকারের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়, কম আদায় করা হলে সরকারী খাজাঞ্চিখানার অধিকারের প্রতি অবিচার করা হয় (আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকাম আল-সুলতানিয়াহ, ১৯৬০, পৃ: ২০৯; আরো দেখুন, পৃ: ১৪২-৫৬ ও ২১৫)। বিভিন্ন মুসলিম পন্ডিত কর্তৃক করারোপ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, "Literature on Mirrors Princes" এর উপর অধ্যায়টি, Essid, 1995, pp. 19-41.

[৩৯] এগুলো হচ্ছে : "On tax revenues and the reason for their being low and high" (pp. 279-80) এবং , "Injustice ruins development" (pp. 286-90)।

www.pathagar.com

"কর ও শুল্ক হার কম হলে মানুষ কাজ করতে উৎসাহ পায়। সুতরাং, ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়, যা করের নিম্ন হারের কারনে মানুষের জন্য প্রশান্তি আনে . . . সকল প্রকার কর একত্রে যোগ করলে রাজস্ব আয়ও বাড়ে" (পৃ: ২৭৯)। তিনি আরো বলেছেন যে, কালের প্রবাহে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বেড়ে যায় এবং মোট রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্যে করের হার বেড়ে যায়। এরূপ বৃদ্ধি যদি ক্রমান্বয়ে ঘটে তাহলে মানুষ অভ্যস্থ হয়ে যায় এবং শেষতক লাভের উপর একটি বিরূপ প্রভাব পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিরুৎসাহিত হয় ও হ্রাস পায় এবং রাজস্ব-প্রাপ্তিও কমে যায় (পৃ: ২৮০-১)। সুতরাং, রাজত্বের শুরুর দিকে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি করের নিম্ন হার থেকে অধিক পরিমান রাজস্ব আয় করে, অথচ রাজত্বের শেষ দিকে একটি বিপর্যস্থ অর্থনীতি করের উঁচু হার থেকে অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব পেয়ে থাকে (পৃ: ২৭৯)। এর কারনগুলো তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "জেনে রাখুন, মানুষের ধন-সম্পদের উপর অন্যায় আচরণের ফলে মানুষ আয়-রোজগারে ও সম্পদ অর্জনের উৎসাহ কমে যায় . . . এবং, যদি আয়-রোজগারে মানুষের আগ্রহ কমে যায় তাহলে তারা কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। নির্যাতন যত বেশী হবে, আয়-রোজগারের প্রচেষ্টার উপর তার প্রভাবও তত বেশী হবে . . . 'এবং, যদি মানুষ আয়-রোজগার থেকে বিরত থাকে ও কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়, তাহলে বাজার স্থবির হয়ে পড়বে ও মানুষের অবস্থা আরো খারাপ হবে" (পৃ: ২৮৬-৭); রাজস্ব আয়ও কমে যাবে (পৃ: ৩৬২)। এ কারনে তিনি করারোপের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করার জন্য ওকালতি করেছেন (পৃ: ৩০৮)।

অর্থনীতিতে সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রভাবও ইবনে খালদুন ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কেইনসের পুর্বসুরী। তিনি বলেছেন: "সরকারী অর্থ ব্যয় কমে গেলে রাজস্ব আয়ও কমে যায়। এর কারন হচ্ছে রাষ্ট্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার ও সভ্যতার উৎস। শাসক যদি রাজস্ব আয় জমা করে রাখে, বা তা যদি হারিয়ে যায়, এবং শাসক যদি সেগুলো যেভাবে খরচ করা উচিত সেভাবে খরচ না করে, তাহলে তার সভাসদ ও সমর্থকদের আর্থিক সামর্থ কমে যাবে, যেমন কমে যাবে তাদের কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীল লোকজনের আর্থিক ক্ষমতা যা সভাসদ ও সমর্থকদের মাধ্যমে তাদের নিকট পৌঁছে (গুণক-প্রভাব)। সুতরাং, তাদের মোট ব্যয় কমে যায়। যেহেতু তারা জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ এবং তাদের ব্যয় বাজারের একটি বড় অংশ, সেহেতু, ব্যবসা-বাণিজ্য কমে যাবে এবং ব্যবসায়ীদের লাভ কমে যাবে, যার ফলে রাজস্ব আয়ও কমে যাবে . . . সম্পদের প্রবাহ জনগণ থেকে

www.pathagar.com

শাসক, শাসক থেকে জনগণ ও জনগণ থেকে শাসকের নিকট চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং, যদি শাসক অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে জনগণ তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে (পৃ: ২৮৬)।

পরবর্তি কালের অগ্রগতি

এভাবে তিন প্রজন্ম ব্যপী বা প্রায় একশ' বিশ বছর সময়কালে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জনমিতি সংক্রান্ত কারনগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে সমাজের উত্থান-পতন ঘটে তা দেখানোর জন্য ইবনে খালদুন একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-ধারার পথ-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং, অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে এ রকম একটি বাস্তবতা-বিবর্জিত ধারনার ভিত্তিতে নব্য-চিরায়ত অর্থশাস্ত্রবিদগণের মত শুধু মাত্র বাজার ব্যবস্থার মূলত: একটি স্বল্প-মেয়াদী স্থবির বিশ্লেষণের কাজে জড়িত হওয়ার মত ভুল তিনি করেন নি। এমনকি যে সময় প্রায় সবগুলো উপাদান অরিবর্তিত থাকে (short-run) তখনও মানব সমাজে অবিরাম ঘটমান বিচিত্র রকমের পরিবর্তনের ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধমে সব কিছু একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে পারে, যদিও এগুলো এত ক্ষুদ্র হতে পারে যে অনুধাবনযোগ্য নয়। সুতরাং, যদিও অর্থশাস্ত্রবিদগণ আলোচনার সুবিধার জন্য 'অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা'র অনুমান গ্রহণ করতে পারেন, সকল উপাদানসমূহের অনিবার্য পরিবর্তনের কালে (long-run) সমাজের সার্বিক অর্জন বাড়ানো ও মানুষের বর্ধিত মঙ্গলের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক কৌশলের জন্য ইবনে খালদুনের বহুশাস্ত্রীয় পদ্ধতি সম্ভবত: অধিকতর সহায়ক হতে পারে। নব্য-চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এ কাজ করতে অপারগ। কারন, যেমন নর্থ যথার্থই জানতে চেয়েছেন, "অর্থনীতি কীভাবে বিকশিত হয় তা জানা না থাকলে নীতি-কৌশলের সুপারিশ করা হবে কিভাবে"। সুতরাং, তিনি নব্য-চিরায়ত অর্থশাস্ত্রকে "উন্নয়নের আবহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নীতি-কৌশল সুপারিশের জন্য একটি অনুপযুক্ত হাতিয়ার" হিসেবে বিবেচনা করেন।[৪০] সমাজের উত্থান-পতনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য ইবনে খালদুন যেহেতু একটি চমৎকার মডেল তৈরী করেছেন, সেহেতু, টয়নবি যথার্থই বলেছেন যে, "দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশস্ততা ও গভীরতা" বিবেচনায় এবং "নির্ভেজাল জ্ঞানের কারনে" ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমাহ' থেকে 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি' শীর্ষক গ্রন্থ দু'টিতে "এরুপ একটি ইতিহাস শাস্ত্রের ধারনা ও প্রণয়ন করেছিলেন

[৪০] নর্থ, ১৯৯৪, পৃ: ৩৫৯।

www.pathagar.com

যা সকল স্থানে, সকল কালে, যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত এ জাতীয় লেখার মধ্যে নি: সন্দেহে সবচেয়ে বিখ্যাত"।[৪১]

দুর্ভাগ্যবশত: ইবনে খালদুনের অর্থপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান ইসলামি অর্থশাস্ত্রের বিকাশের লক্ষ্যে পরবর্তিকালের পন্ডিতগণ কর্তৃক সমৃদ্ধ করা হয় নি। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, এর কারন ছিল সম্ভবত: এ রকম যে, ইবনে খালদুন এমন এক সময় বাস করতেন যখন ইসলামি বিশ্বের পতন ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৪২] সম্ভবত: তিনি ছিলেন "তার জগতে এক মাত্র আলোক- বর্তিকা"।[৪৩] ইবনে খালদুনের নিজের মতে, শাস্ত্রীয় বিকাশ তখনই ঘটে যখন সমাজ নিজে প্রগতিশীল হয় (পৃ: ৪৩৪)। মুসলিম ইতিহাসে এ তত্ত্ব স্পষ্টভাবেই প্রমানিত হয়েছে। দ্বিতীয়/ অষ্টম শতকের মাঝা- মাঝি থেকে ষষ্ঠ/ দ্বাদশ শতকের মাঝা- মাঝি পর্যন্ত চার শতাব্দি ধরে মুসলিম বিশ্বে দ্রুত শাস্ত্রীয় বিকাশ ঘটেছে এবং অন্তত: আরো দু' শতক ধরে তা বেশ শ্লথ গতিতে অব্যাহত ছিল, তারপর ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেয়েছে। কখনও কখনও এ নিরুত্তাপ জগতে দু'একটি উজ্জল নক্ষত্রের আভির্ভাব ঘটেছিল বটে। অর্থশাস্ত্রও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মুসলিম বিশ্বে এটি বিস্মৃতির গহ্বরে অব্যাহতভাবে নিপতিত ছিল। ইবনে খালদুনের পর আল- মাকরিজি, আল- দাওয়ানী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র মত কতিপয় বিচ্ছিন্ন পন্ডিতগণ ব্যতীত আর কেহ কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন নি। তাদের অবদানও কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইবনে খালদুনের আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি- প্রকৃতির মডেলের অধিকতর বিকাশ ঘটায় নি। সুতরাং, ইবনে খালদুনের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ভিত্তি ও পদ্ধতির সহিত মিল রেখে ইসলামি রুপ- কাঠামোর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আকারে একটি পৃথক জ্ঞানের শাস্ত্র হিসেবে অর্থশাস্ত্র বিকাশ লাভ করে নি। ইসলামের সামাজিক ও নৈতিক দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই এটি থেকে যায়। এ কারনে রোজেন্থাল যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন:[৪৪]

"আমরা সহজভাবে এটুকু বলতে পারি যে, তিনি ছিলেন এক জন বড় আকারের মননশীল মানুষ, যিনি চিন্তা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যিনি ছিলেন এমন একটি সভ্যতার উত্তরসূরী যা মেয়াদ কাল শেষ

---

[৪১] টয়নবি, ১৯৩৫, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩২১ ও ৩২২।
[৪২] চতুর্দশ শতকে মুসলিম বিশ্বের পতন ও ভাঙ্গনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্যে দেখুন, মহসিন মেহদি, ১৯৬৪, পৃ: ১৭- ২৬।
[৪৩] টয়নবি, ১৯৩৫, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩২১।
[৪৪] রোজেনথাল, ১৯৬৭, ১ম খন্ড, পৃ: lxxxvii.

www.pathagar.com

করে ফেলেছে, এবং তিনি জন্মেছিলেন এমন একটি দেশে যার ছিল একটি প্রাণবন্ত অতীত ঐতিহ্য – যদিও তা পুর্বের মাহাত্মের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে টিকে রয়েছে – যিনি নিজের মেধা ও ঐতিহাসিক অবস্থানের সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন এমন একটি সৃজনশীল কর্মে যা মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ সফলতার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে"।

আল মাকরিজী

রাজত্বের শেষের দিকে যখন জনপ্রশাসন দুর্নীতিপরায়ন ও অদক্ষ হয়ে পড়ে, এবং দমন নীতি গ্রহণ করে ও নিপীড়নমূলক করারোপ করে, তখন কৃষকদের কোন আগ্রহ থাকে না ও চাষাবাদ করা থেকে বিরত থাকে –এরূপ বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে ইবনে খালদুন একটি বাজে সরকার ও খাদ্য শস্যের উচ্চমূল্যের সহিত কার্য-কারন সম্পর্ক ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খাদ্য শস্য উৎপাদন ও মওজুদ এ যাবত অব্যাহতভাবে চলমান সমৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। মওজুদের অভাবে দুর্ভিক্ষ হলে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।[৪৫] তার সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারনা সম্পন্ন এক জন বাজার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল-মাকরিজি সার্কাশীয় বা বুরজি মামলুকদের (৭৮৪-৯২২/১৩৮২-১৫১৭) একজন স্পষ্টভাষী সমালোচক ছিলেন।[৪৬] ৮০৬-৮/১৪০৩-৬ সময় কালে মিসরের অর্থনৈতিক সংকটের কারন নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি তার 'ইগাথাহ আল-উম্মাহ বি কাশফ আল-ঘুম্মাহ' (দুর্ভোগের কারন প্রকাশ করে দিয়ে সমাজকে সহায়তাকরণ) নামক পুস্তকে ইবনে খালদুনের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেছিলেন।

তিনি শনাক্ত করেছিলেন যে, সার্কাশীয় যুগে রাজনৈতিক প্রশাসন খুব দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ন হয়ে পড়েছিল। সরকারী কর্মচারীগণকে দক্ষতার পরিবর্তে ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ প্রদান করা হতো। ঘুষের অর্থ পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কর্মচারীরা নীপিড়নমূলক করারোপ করতো। কাজ-কর্মে ও উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়লো এবং উৎপাদন কমে গেল। পরিস্থিতি আরো নাজুক হলো যখন অতিরিক্ত তাম্র-মুদ্রা বা কাগজে নোট ছেপে সরকারী বাজেট ঘাটতি মেটানো হলো। এ

---

[৪৫] মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ৩০১-২।

[৪৬] মিসরের ক্রীতদাস বা মামলুকগণ বংশের শাসনকাল দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশটি ছিল বাহরি (বা তুর্কী) মামলুক (৬৪৮-৭৮৪/১২৫০-১৩৮২), যারা সাধারণভাবে তাদের সমসাময়িকদের ইতিহাসে প্রশংসিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশ ছিল বুরজি মামলুক (সার্কাসিয়ান, ৭৮৪-৯২২/১৩৮২-১৫১৭)। এ সময়টি পর পর কয়েকটি অর্থনৈতিক সংকটে ক্লিষ্ট ছিল। (বিস্তারিতের জন্যে দেখুন, Allouche, 1994)।

www.pathagar.com

সব কারন দুর্ভিক্ষের সাথে একত্রিত হয়ে বড় আকারের মুদ্রা-স্ফীতি, গণ-দুর্ভোগ ঘটালো ও দেশে দারিদ্র্য নিয়ে আসলো। এ কারনে আল-মাকরিজি দুর্নীতি, সরকারের খারাপ নীতি ও দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি অনেকগুলো চলক বিবেচনায় গ্রহণ করে বিরাজমান 'পদ্ধতিগত সংকট'-এর সামাজিক-রাজনৈতিক নির্ধারকসমূহ খোলাশা করে ফেলেন। এ সব কিছু সম্মিলিতভাবে দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রভাব বাড়াতে ভূমিকা পালন করেছে, যা হয়ত: অন্য পথে আরো কার্যকরভাবে জনগণের উপর তেমন কোন বিরুপ প্রভাব ব্যতীতই সামলানো সম্ভব হতো। এটি স্পষ্টত: ই সেনের অধিকার তত্ত্বের (entitlement theory) পুর্বসুরী, যা অবৈধ সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাকে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায়ী করে থাকে।[৪৭] আল-মাকরিজি সার্কাসীয় মামলুকদের সম্পর্কে যা লিখে গেছেন তা পরবর্তিকালের অটোমান যুগের জন্যও সত্য হয়েছিল।[৪৮]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী

শাহ ওয়ালীউল্লাহ নামে পরিচিত শাহ ওয়ালীউল্লাহ আল দেহলভী ১১১৮/১৭০৭ সালে মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর চার বছর পুর্বে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের [৪৯] ৪৯ বছরের শাসন কালের পর প্রচুর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় - শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র ৫৯ বছরের জীবনে দশজন শাসকের পরিবর্তন হয় – যা পরবর্তিকালে মুগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন নিয়ে এসেছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সমাজ বিকাশের প্রাচীনতম পর্যায় থেকে আইন, শৃংখলা ও ন্যায়বিচারের জন্য রাষ্ট্র ও সবশেষে মানুষের আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক কল্যাণ সাধনের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চারটি স্তরে সমাজের বিকাশ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি যেমন মনে করতেন যে মানুষের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য, তেমনি তিনি মনে করতেন যে দায় বা অবক্ষয়ের নয়, মঙ্গলের উৎস রুপে কাজ করতে হলে এরুপ ক্ষমতার মধ্যে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। তার সময় কালে বিদ্যমান বিভিন্ন অবস্থার বিষয়ে লিখিত বহু লেখায় তিনি এরুপ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, শাসক কুলের বিলাসী জীবন-ধারা, ব্যয়-বহুল সামরিক অভিযান, সরকারী কর্মকর্তাদের ক্রম-বর্ধমান দুর্নীতি ও অদক্ষতা এবং বিরাট

---

[৪৭] Sen, 1981.

[৪৮] দেখুন, Meyer, 1989.

[৪৯] আওরঙ্গযেব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১০২৭/১৬১৮-এ, ১০৬৮/১৬৫৮-এ সিংহাসনে বসেছিলেন, এবং ১১১৮/১৭০৭-এ মৃত্যু বরন করেছিলেন।

www.pathagar.com

সংখ্যক কাজবিহীন সভাসদদের জন্য বিপুল অংকের বৃত্তি, কৃষক, ব্যবসায়ী ও কারিগর, যারা ছিলেন জনসংখ্যার আসল উৎপাদনশীল অংশ তাদের উপর নীপিড়নমূলক কর আরোপ করতে তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং, এ সকল লোকজন তাদের পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল, রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল এবং দেশ দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল।[50] এভাবে ইবনে খালদুন ও অপরাপর মুসলিম পন্ডিতগণের পদাংক অনুসরন করে আল-মাকরিজি ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারনগুলোকে সমন্বয় করে তাদের সময়ের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলো ও তাদের সমাজগুলোর উত্থান-পতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন।

[৫০] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৯২, ১ম খন্ড, পৃ: ১১৯-৫২।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমানদের পতনের কারণ :

মুসলিম ইতিহাসে ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ

আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ভেতরে পরিবর্তন না ঘটায়।

(আল-কুরআন, ১৩: ১১, আরো দেখুন ৮: ৫৩)

আমাদের ভেতরের মিথ্যাই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(জর্জ মেরিডিথ)[১]

সূচনা

ইবনে খালদুনের আর্থ-সামাজিক গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত মডেলের সাহায্যে আমরা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের জবাব দিতে পারি যা ইসলামী অর্থশাস্ত্রের দেওয়া প্রয়োজন – কেন মুসলিম বিশ্বের দ্রুত উত্থান ঘটেছিল ও কয়েক শতক ধরে তা অব্যাহত ছিল এবং কেন তার এমন পতন ঘটেছিল যে এটি তার সৃষ্টিশীল জীবনীশক্তি (elan vital) হারিয়ে ফেলেছিল, এবং কেবল মাত্র উপনিবেশে পরিণত হয় নি, বর্তমানে যে সব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তা মোকাবিলা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে? একটু পেছনে গিয়ে কোথায়, কীভাবে পতন শুরু হয়েছিল তা না দেখলে এ সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। এটি একটি কঠিন কাজ। তবে, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ সব প্রশ্নের জবাব না পাওয়া গেলে বিগত কয়েক শতাব্দি ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে যে উল্টো-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল তা রোধ করার জন্যে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের পক্ষে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না।

অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি[২] বিশেষত: ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দির পর মুসলমানদের পতনের জন্য দায়ী ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন কারনের উপর গুরুত্ব আরোপ

---

[১] George Meridith, Toynbee কতৃর্ক উদ্বৃত, ১৯৩৫, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১২০।

[২] এদের কতিপয়: Hitti, 1958; Arsalan, 1962; Issawi, 1966 and 1970; Saunders (ed), 1966; Inalcik, 1970; Lambton, 1970; Musallam, 1981; Imam, 1397 AH; al-Najjar, 1409 AH; Kuran, 1997। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারন সম্পর্কে Lutfi Pasha, Kochu Bey, Hajji Khalifah, Huseyn Hazarfenn and Sari Mehmed Pasha-দের মতামত Lewis (1962) বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: নৈতিক অবক্ষয়; গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসের উত্থানের পর ইসলামী প্রগতিশীলতার বিলুপ্তি; জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডে ভাটা; অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও অনৈক্য, অব্যাহত বৈদেশিক আক্রমন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ যা দেশকে সম্পূর্ন বিপর্যস্ত ও দুর্বল করে ফেলেছিল; আর্থিক ভারসাম্যহীনতা ও জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতার, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হ্রাস, কৃষি, হস্তশিল্প ও ব্যবসায় মন্দা; খনি ও মূল্যবান ধাতব বস্তুর ফুরিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া; প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা অর্থনীতিকে কেবল দুর্বলই করে নি, সার্বিক জনসংখ্যার অবক্ষয়ও নিয়ে এসেছিল। এ সকল কারণগুলোর বিরুপ প্রভাব অস্বীকার করা না গেলেও আশা করা যায় যে, একটি চলমান ও গতিশীল সমাজ অবাধে এ সকল কারণগুলো আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে, এবং বিভিন্ন চলকের স্থির ও কোন একটির পরিবর্তনশীলতার স্বল্পকালীনসময়ের (short run) জন্য না হলেও চলকসমুহের পরিবর্তনশীলতার দীর্ঘকালীন সময়ে (long run) তাদের বিরুপ প্রভাব পুষিয়ে নেওয়ার জন্য একটি যথার্থ কর্ম-কৌশল গড়ে তুলতে ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। মুসলমানগণ কেন এটি করতে সক্ষম হয় নি? এমন কোন কারণ কি ছিল যা তাদেরকে ভেতরের ও বাইরের থেকে শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বাধা দিচ্ছিল? কি ছিল সেই কারণ? এ সব কারণগুলোকে একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ঘটনাপুঞ্জীরুপে একত্রিত করত: একটি ঐতিহাসিক দর্শনে পরিণত করে দেখানো যেতে পারে যে কীভাবে তাদের বেশীরভাগই কতিপয় বড় ঘটনার মাধ্যমে এমনভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছিল যে, মুল কারণ অনুধাবন না করে সেগুলোর প্রভাব মোকাবেলা করা ও প্রতিরোধ করা কঠিন ছিল।

মুসলমানদের উত্থান ও পতন কোন সরল রৈখিক ঘটনা ছিল না। কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক বার এর উত্থান ও পতন হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও, পতন ঠেকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে, যেহেতু, মুল কারণ থেকেই গিয়েছিল, সেহেতু, উল্টো-স্রোত অব্যাহত ছিল এবং পতন প্রক্রিয়ার গতি বাড়তেই থাকলো। এ আলোচনার উদ্দেশ্য এটা প্রমান করা নয় যে, পতনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যদি উস্কানি ক্রিয়াশীল না থাকতো তাহলে পতন হতো না। কোন সমাজই ১৪০০ বছর ধরে অব্যাহত অগ্রগতি ধরে রাখতে সক্ষম হয় নি এবং মুসলিম সমাজ এর ব্যতিক্রম হবে এমন আশা করা অবাস্তব চিন্তা। সুতরাং, এ আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যত, অতীত নয়। তবে, ভবিষ্যত এমন ঘনিষ্টভাবে অতীতের সাথে সম্পৃক্ত যে, যদি আমরা অবক্ষয়ের সকল কারণ সঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারি এবং দেখাতে না পারি যে, কীভাবে সেগুলো সক্রিয় হয়েছিল ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে সেগুলো গতি সঞ্চার

www.pathagar.com

করেছিল, তা হলে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য কোন কার্যকর কৌশল বাতলানো সম্ভব হবে না।

অতীতে ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬) ও গীবন (মৃত্যু ১২০৮/১৭৯৪), এবং আধুনিক কালে স্পেংলার (১৯৪৭), শুইটজার (১৯৪৯), সরোকিন (১৯৫১), টয়নবি (১৯৫৭), নর্থ (১৮৭৩), কেনেডি (১৯৮৭) ও আরো অনেক পন্ডিতগণ সভ্যতার উত্থান ও পতন আলোচনা করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মূল্যবান স্বচ্ছ-ধারনা পাওয়া গেলেও, 'মুকাদ্দিমাহ' বা তার 'কিতাব আল-ইবার'-এর সূচনায় আলোচিত ইবনে খালদুনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির মডেলকেই (পুর্বের অধ্যায়ে আলোচিত) মুসলমানদের উত্থান ও পতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ এটি সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম সভ্যতার জন্যেই তৈরী করা হয়েছিল, যা তার জীবদ্দশায় ইতোমধ্যেই পতন প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল। ইবনে খালদুনের জন্মের (৭৩২/১৩৩২) একশতকের তিন-চতুর্থাংশ আগে ৬৫৬/১২৫৮ সালে মঙ্গলীয়দের হাতে বাগদাদ ও তার চারপাশের এলাকার লুট-পাট, অগ্নি-সংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের পর আব্বাসীয় বংশ ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধ (৪৮৮-৬৯০/১০৯৫-১২৯১), মঙ্গলীয়দের আক্রমনগুলো (৬৫৬-৭৫৮/১২৫৮-১৩৫৫), ও প্লেগের মহামারীর কারনে মহামৃত্যুসহ (৭৪০/১৩৪০) আরো অনেকগুলো কারনে অধিকাংশ মধ্যাঞ্চলীয় মুসলিম দেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, সার্কাশীয় মামলুকগণ, যাদের সময়ে ইবনে খালদুনের জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কেটেছিল, ছিলেন দুর্নীতিপরায়ন, অদক্ষ এবং তারা এমন নীতি অনুসরন করতো যার মাধ্যমে পতন ত্বরান্বিত করা ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। এরূপ অবস্থায়, ইবনে খালদুনের মত একজন নৈতিক ও মানসিক সক্ষমতাসম্পন্ন লোক "ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সামর্থপূর্ণ 'আসাবিয়াহ'র সন্ধানে ব্রতী না হওয়াটাই অস্বাভাবিক"।[৩]

দ্বিতীয়ত: আগের অধ্যায়ে যেমন দেখানো হয়েছে, ইবনে খালদুন পতনের জন্য কোন একটি কারণকে দায়ী করেন নি। তার মডেলটি বহুশাস্ত্রীয় ও তা একটি প্রগতিশীল চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্কের পদ্ধতি অনুসরন করে। এ মডেলে সমাজের সকল ক্ষেত্রসমূহ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একটির অবক্ষয় শুরু হলে তা যদি সংশোধন না করা হয়, তা হলে সেটি অন্যগুলোর

---

৩ Talibi, 1986, p. 828.

www.pathagar.com

দুর্বলতা তুলে ধরার জন্য সক্রিয় হয় এবং প্রকারান্তরে সেটির অধিকতর অবক্ষয়ের কারণ ঘটায়। দীর্ঘ সময় ব্যাপী অবক্ষয়ের এরুপ চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্ক এমনভাবে পরস্পরের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে যে কোনটি কারণ আর কোনটি ফলাফল তা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং, ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে পৃথক করা বা সুড়ঙ্গের শেষের আলো দেখার জন্য (সমস্যার সমাধানের জন্য) শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চলকসমুহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, অর্থপূর্ণও নয়। মুসলমানদের ইতিহাসে ইবনে খালদুনের মডেল প্রয়োগ করার জন্য মুসলিম ইতিহাসের সকল দিকের প্রতি সমালোচনামুলক দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক। এ অধ্যায়ের শিরোনাম "মুসলমানদের পতনের কারণ"-হওয়ার কারনে পাঠকের মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তার একটি জবাব দেওয়া এর মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে – যখন ইসলামী অর্থশাস্ত্রের উপর লেখা একটি বইতে মুসলমানদের অবক্ষয় আলোচনা করার জন্য এরুপ একটি শিরোনাম আরো বেশী যথার্থ হতো। একটি প্রগতিশীল চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্কের মডেলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবক্ষয়কে ধারন করা অসম্ভব। যখন একটি সমাজের পতন শুরু হয়, প্রকৃতপক্ষে এর সবকিছুতে পতন শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুধুমাত্র তার একটি অংশ মাত্র।

তবে, ইবনে খালদুনের মডেল ব্যবহার করতে গিয়ে আমি তা পুরোপুরি অনুসরন করিনি। তা করতে গেলে আলোচনাকে শুধু শুধুই সীমিত করা হতো। আমি যা করেছি তা হচ্ছে আমি একই চলকগুলো বহাল রেখেছি কিন্তু তাদের পরিধি বৃদ্ধি করেছি যাতে ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমাহ' রচনা করার পর থেকে বিগত প্রায় ছয় শত বছর ধরে জ্ঞান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কলা-কৌশলে যে সকল পরিবর্তন এসেছে সেগুলো যেন বিবেচনায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়, এবং অন্যান্য পন্ডিতগণের বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত স্বচ্ছ ধারনাসমুহ থেকে যেন উপকৃত হওয়া যায়। উদাহরণত: N (জনগণ) –কে একটি বিশুদ্ধ সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা না করে নারী ও পুরুষ; উলেমা, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ মানুষ; পরিবার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীসমুহ, এবং সমাজসহ বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি রুপে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমানে নারীদের ভূমিকা অনেক বেশী এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। N (জনগণ)-এর নারী ও পুরুষ উভয় অংশের

www.pathagar.com

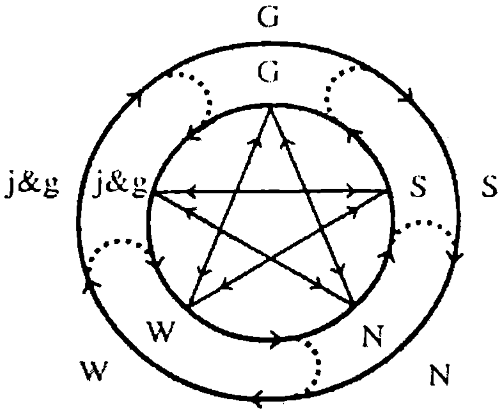

শিক্ষার জন্য অনেক বেশী সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, যার সাংকুলান করা সম্ভব নয় যদি পরিবার, সমাজ ও সরকার সমন্বিতভাবে চেষ্টা না করে। যদি উলেমাগণ তাদের নিজেদেরকে বর্তমান কালের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত না রাখেন, তবে ফিকহ (S -এর অংশরূপে) মুসলমানদেরকে নুতন নুতন চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্যে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হবে না। জাতীয়করন ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতীতও বর্তমানে সরকারের (G) ভূমিকা অনেক বেশী, এবং সরকারকে ন্যায়বিচার (j) ও উন্নয়নে (g) আরো বেশী কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। এমনকি j ও g –এর পরীধিও বর্তমানে অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্পদ (W) বলতে এখন শুধুই ধন-সম্পদ বোঝায় না, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাজার ব্যবস্থা, মুদ্রা ও অর্থ-ব্যবস্থা, সরকারী ও বেসরকারী সেক্টর ইত্যাদির মত তার সকল সাংগঠনিক উপাদানসহ সার্বিকভাবে গোটা অর্থনীতি, মুল লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষম ব্যবহার।

প্রথম ভাগ: ইসলাম ও নৈতিক অবক্ষয় কি পতনের কারণ?

ইসলাম কি পতনের কারণ?

ইসলাম বিরোধী ও ইহজাগতিক শক্তিগুলোর মধ্যে এরুপ একটি বিশ্বাস রয়েছে মর্মে মনে হয় যে, তারা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয় যে, মুসলমানদের পতনের চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্ক সক্রিয়করন করে ইসলাম নিজেই। তবে অনেক পন্ডিত যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঘটনাটি এ রকম নয়।[৪] তবে, টয়নবি (১৯৫৭), হিট্টি (১৯৫৮), হজসন (১৯৭৭), বেক (১৯৯৪) ও লুইস

[৪] Rodinson, 1974; Eric Jones, 1988; Kuran, 1997.

www.pathagar.com

(১৯৯৫) এ থেকে অনেক দুর বেরিয়ে গেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইসলাম মুসলমান সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। কেন একটি বেদুইন সমাজ গোড়া থেকে যাত্রা করে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে এত দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল তার জবাব কেবল মাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সে সময়ে এই বেদুইন সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল তীব্র গোষ্ঠীগত কলহ, সম্পদের স্বল্পতা, নিষ্ঠুর জলবায়ু ও কঠিন ভু-প্রকৃতি। সাসানিয় ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ন্যায় শক্তিশালী প্রতিবেশীদের মত এর কোন পার্থিব সম্পদ ছিল না। যদিও প্রলম্বিত ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের কারনে নি:শেষিত হয়ে গিয়েছিল, তবুও এ সকল প্রতিবেশীগণ শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থনৈতিকভাবে ও সামরিক দিক থেকে বেশী শক্তিশালী ছিল। সুতরাং, প্রশ্ন হচ্ছে: কি কারনে বেদুইন সমাজের মধ্যে এমন পরিবর্তন এসেছিল যে এটি কেবল মাত্র তার প্রতিবন্ধকতাগুলোই জয় করে নি, তার ছত্র-ছায়ায় আসা সকল সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল? টয়নবির ভাষায় বলতে গেলে, ইসলাম "সুপ্ত আধাত্মিক শক্তির অসাধারণ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজকে উদ্ভাসিত করেছিল, এবং, তার দ্বারা ছয় শতাব্দি ধরে ইসলাম তার পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জন করেছিল"।[৫]

ইসলাম (S) উন্নয়নের সকল উপাদানগুলোকে ইতিবাচক পথে সক্রিয় করেছিল। ইসলাম জনগণের (N) উপর সবচেয়ে বেশী মনযোগ দিয়েছিল, কারণ এটি যে কোন সমাজের উত্থান বা পতনে মুল শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। ইসলাম তাদেরকে নৈতিকভাবে ও বস্তুগতভাবে ভাল মানুষরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল, এবং মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংস্কার করার জন্য চেষ্টা করেছিল। মানুষের জীবনের মধ্যে একটি তাৎপর্য ও লক্ষ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামের বৈপ্লবিক বিশ্ব-বীক্ষা জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দিয়েছিল। এটি তাদেরকে দিয়েছিল ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সমতা, আত্ম-সম্মানবোধ ও বেঁচে থাকার জন্য এক মহান লক্ষ্য। এটি জীবনকে দিয়েছিল পবিত্রতা, ব্যক্তিকে দিয়েছিল সম্মান ও সম্পত্তি। মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য উভয়ই জরুরী বিবেচনা করে এটি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল। সে অনুসারে, এটি

---

[৫] Toynbee, Somervell-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৯৫৭, ২য় খন্ড, পৃ: ৩০। Baeck বলছেন যে, "ইসলামকে দিয়েই তারা (আরবরা) পরাশক্তির মর্যাদা অর্জন করেছিল এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার এক বিরাট অংশের আলোকবর্তিকা হয়েছিল। বিস্মৃতি থেকে দ্বাদশ শতকের পাশ্চাত্যের ল্যাটিনের মর্যাদার শিখরে উঠে এসেছিল ইসলাম এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় কৃষ্টি ও ইতিহাস সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (Baeck, ১৯৯৪, পৃ: ৯৫)।

www.pathagar.com

কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদেরকে মাজদিয় বা তৎকালীন খৃষ্টীয় বিশ্বাসে তাদের মর্যাদার তুলনায় সমাজে আরো উঁচু ও সম্মানজনক স্থান প্রদান করে। এটি গোত্রের প্রতি আনুগত্যের বদলে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে, এবং এভাবে ব্যক্তিগত জগতকে প্রসারিত করে উন্নীত করা হলো জাতীয় পর্যায়ে, যার সবাই একই বিশ্বাসের অনুসারী, এবং প্রসারিত করা হলো মানব জাতির পর্যায়ে যার সকলে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন। কারণ তারা সবাই স্রষ্টার পরিবারের সদস্য।

যেহেতু, কাহেন যেমন যথার্থই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, "কুর-আনের আইনের অন্তর্নিহিত প্রবণতা হচ্ছে বঞ্চিতদেরকে আনুকূল্য প্রদর্শণ," ইসলামের অসাধারণ একটি অবদান হচ্ছে দুর্বল ও নির্যাতিতদের অবস্থার উন্নয়ন।[৬] ধনী ও ক্ষমতাশালীদেরকে হত্যা করে বা সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা ও বাজার ব্যবস্থা বাতিলকরণের মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয় নি, বরং ব্যাক্তি মানুষকে অন্যের প্রতি তার কর্তব্য পালনে সচেতন করা এবং পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থায় স্বীয়-স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট রাখার লক্ষ্যে নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার, সামাজিক সংহতি ও (নারী ও শিশুসহ) সকলের কল্যান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তা অর্জন করা হয়েছিল। তবে, এটাও যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং, ইসলাম আরো একটু অগ্রসর হয়ে আইন-শৃংখলা বজায় রাখা ছাড়াও ন্যায়বিচার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করলো। এমন একটি বিচার ব্যবস্থা চালু করা হলো যা বড়-ছোট সকলের জন্য সমানভাবে আইন প্রয়োগ করলো। নর্থ কর্তৃক প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিধান পূরণ করা হলো।[৭] সুতরাং, স্কাটজমিলার ঠিকই বলেছেন যে, "যে সকল কারণগুলো ইউরোপের জন্য সফলতা এনে দিয়েছিল সেগুলো অনেক আগেই ইসলামের মধ্যে বিরাজমান ছিল"।[৮]

মানুষ ও প্রতিষ্ঠানসমুহের আমুল পরিবর্তন

ইসলামের দ্রুত বিস্তারের ফলে "সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অসাধারণ প্রয়োগের মাধ্যমে" মানুষ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমুহের পরিবর্তন দ্বারা বাইরে কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। যে সকল উপজাতি শত শত বছর ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল তারা এখন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এর ফলে

---

৬ Cahen, 1970, p. 542.

৭ North, 1973, pp. 2-3; and 1990, pp. 3-10.

৮ Schatzmiller, 1994, p. 405.

www.pathagar.com

একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও ভাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। শুরুতে লোকজন এটিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, সরকার পুরো-পুরি ন্যায়পরায়ণ ছিল এবং সরকার সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করছিল, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে নয়। এর ফলে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়েছিল, এবং মধ্য-প্রাচ্যের সকল বাণিজ্যিক পথে যথাযথ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল। পুর্বে এগুলো অকার্যকর ছিল আরবে দীর্ঘ মেয়াদী জাতিগত যুদ্ধ এবং সাসানীয় ও বাইজান্টাইনদের মধ্যকার বিধ্বংসী যুদ্ধ-বিগ্রহের কারনে, যারা যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য প্রচুর করারোপ করতো, ও এভাবে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হতো।

অর্থনীতিগুলোতে অর্থের প্রচলন, পণ্য, পুজিঁ ও মানুষের অবাধ ও নিরাপদ চলাচলের মাধ্যমে মুসলমান শাসিত গোটা এলাকা একটি সম্প্রসারিত সাধারণ বাজারে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং জনসাধারনের আয় প্রচুর পরিমানে বেড়ে যায়। উন্নয়নের সুফল সবাই ভোগ করলো, যদিও ইসলাম যেভাবে চেয়েছিল ঠিক সেরুপ সমান ভাবে নয়। ন্যায়বিচার বজায় থাকার কারনে ন্যায়পরায়নতা, সততা, কঠোর পরিশ্রম, পুজিঁর সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য আগ্রহ বেড়ে গেল। শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধার কারনে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি পেল, প্রযুক্তিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটলো।

ইবনে খালদুনের তত্ত্ব অনুসারে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম কতৃর্ক জনগণকে (N) তেজোদ্দীপ্ত করণের মাধ্যমে, শরীয়াহ (S) প্রদত্ত মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমুহ, এবং শরীয়াহ (S) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সকল পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন (j) নিশ্চিতকরণের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে এ সব কিছু মুসলিম সভ্যতার অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ (W) সার্বিক (g) উন্নয়নের কতিপয় গুরুত্বপূর্ন কারণ। এর অর্থ এ নয় যে, একটি আদর্শ অবস্থা বিরাজ করছিল। তবে, এটা বোঝায় যে, মুসলিম সমাজের অগ্রগতির জন্য যে ইতিবাচক শক্তি কাজ করছিল তা নেতিবাচক শক্তির প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ণ

ঐ সময়ের বেদুইন ও গ্রামীণ সমাজে ইসলামের বৈদেশিক প্রভাব হতে কৃষিই প্রথম উপকৃত হয়েছিল। কৃষির দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন অন্যান্য

www.pathagar.com

সমাজে অগ্রগতির অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল।[৯] কৃষির এই অনুঘটকের ভূমিকা মুসলিম সমাজে অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল, যা অনেক লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণত: খলিফা আল-মুতাসিম (মৃত্যু ২২৭/৮৪১) বলেছিলেন:

> কৃষির অনেক সুবিধা রয়েছে। কৃষি জমির উন্নয়ন সাধন করে এবং মানুষের পুষ্টির যোগান দেয়। এটি কর বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে ও সম্পদ বাড়ায়। এটি গৃহপালিত প্রাণীদের খাবারের যোগান দেয়, মূল্য হ্রাস করে, আয়ের উৎস বাড়ায়, এবং অর্থনীতিকে সম্প্রসারিত করে।[১০]

ইসলামের বিস্তারের পর ঘুমন্ত কৃষি বিভাগ ও গ্রামীন সেক্টর অকস্মাত জেগে উঠলো ও প্রাণবন্ত হয়ে গেল কারণ আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিরাট বাজার পাওয়া গিয়েছিল, মালবাহি শকটগুলোকে পথে অপেক্ষায় থাকার ভয় ছিল না বা অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হতো না। এটি প্রত্যেককে তার নিজের ও সমাজের উন্নতির জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে উৎসাহিত করলো।

ইসলামের দাওয়াতে ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব প্রদানের সহিত সামঞ্জস্য রেখে হযরত মুহাম্মদ (স:) ও প্রথম চার খলিফাগণ অধিকৃত এলাকার কৃষি জমিগুলোতে 'ফে-ই' বা সকলের সাধারন মালিকানার দয়ালু নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এরূপ জমি মুল মালিক বা চাষার হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যা ছিল বাইজান্টাইন ও সাসানিয়দের অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত যারা অধিকৃত এলাকার কৃষি জমি তাদের সামরিক অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও সৈনিকদের মধ্যে বিলি-বন্টনের জন্য বাজেয়াপ্ত করতো।[১১] তাদের সকল 'ইকতা' বা ভূ-

---

[৯] বিশ্ব ব্যাংক যথার্থই বলেছে: "বস্তুত: যে সকল দেশে কৃষির ভাল উন্নতি হয়েছিল, সে সকল দেশে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে", এবং উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে শত শত বছর ধরে বিতর্ক চললেও ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমান বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রগতিশীল কৃষি ব্যবস্থা শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের সাথে সাথেই বিকশিত হয়েছিল – কোথাও কোথাও কৃষি খাত নেতৃত্বও দিয়েছিল" (IBRD, World Development Report, 1982, pp. iii and 39)।

[১০] Al-Masudi কর্তৃক তার Muruj al-Dhahab, 1988, Vol. 4, p. 47-এ উদ্বৃত। Al-Mutasim কর্তৃক ব্যবহৃত প্রকৃত শব্দটি হচ্ছে 'উমরান', যার অর্থ হচ্ছে উন্নয়ন। তবে, প্রসঙ্গ ও মুসলমানদের বিকাশের পর্যায় বিবেচনায় নিলে মনে হয় যে, তিনি সম্ভবত: কৃষির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন।

[১১] দেখুন, Hodgson, 1977, Vol. 1, p. 242; Ziaul Haque, 1977; আরো দেখুন, Cahen, 1990, p. 1031; Lambton, 1990, p. 1045।

www.pathagar.com

সম্পত্তির অনুদান ছিল আকারে ছোট, পতিত ও মালিকানাবিহীন জমি। এরূপ মানবিক নীতি অধিকৃত অঞ্চলে কেবল মাত্র প্রশাসনিক গতিধারা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোকে অব্যাহতই রাখতো না, বরং বংশ-পরম্পরায় ন্যায়বিচার ও ইসলামের সাম্য-নীতিকেও ত্বরান্বিত করতো।[১২] এমনকি মূল অধিবাসীদের নিকট থেকে জমি ক্রয়ের জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি প্রদান করা হতো না।[১৩] জমির সাধারণ মালিকানার তাৎপর্য ছিল এ রকম যে, রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যে উৎপাদিত ফসল ভাগাভাগি করা হতো। 'খারাজ' আকারে কৃষকগণকে রাষ্ট্রের অংশ প্রদান করতে হতো। ইসলামের স্বর্ণযুগে এ হার ছিল মূল উৎপাদনের শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ, যা মোটেই অসহনীয় ছিল না, কারণ এটি ছিল উর্বর জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪] যেহেতু, করের হার নির্ধারিত ছিল না, এবং তা ছিল প্রকৃত উৎপাদনের একটি ক্ষুদ্র অংশ, সেহেতু, যে বছর খারাপ ফসল হতো সে বছর করের ভারে কৃষকদের কোমর ভেঙ্গে যেত না। বন্যা, খরা ও কোন অনিবার্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ফসল নষ্ট হলে নবীজির রেখে যাওয়া নজীর মোতাবেক 'খারাজ' স্বয়ংক্রিয়ভাবে মওকুফ হয়ে যেত।[১৫] এ প্রথা অনেক দিন যাবত চালু ছিল। এমনকি সালযুদিকগণ (৪৪৭-৫৯০/১০৫৫-১১৯৪) ক্ষমতায় আসার পর যখন করের এরূপ হার বেড়ে গেল তখনও "সালযুদিক প্রশাসন কর্তৃক খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর উপর আরোপিত কর" সম্ভবত: "বাইজান্টাইনদের অপসৃয়মান রাজস্ব ব্যবস্থাধীন কর- হারের চেয়ে কম ছিল মর্মে ধারনা করা যায়"।[১৬]

নিম্ন কর হারও বোঝা মনে হতে পারে যদি তা করদাতাগণকে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা না দিয়ে থাকে। এ কারনে মুসলিম আইনশাস্ত্রে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বাঁধ নির্মাণ ও সেচের জন্য খাল কাটা রাষ্ট্রের

---

[১২] দেখুন, Abu Yusuf, 1352 AH, pp. 24 ff; Yahya Ibn Adam al-Qurashi (মৃত্যু ২০৩/৮১৮), 1384 AH, pp. 41-2; আরো দেখুন, Ziaul Haque, 1977, p. 171; Cahen, 1970, p. 571.

[১৩] Yahya Ibn Adam al-Qurashi, 1384/1965, p. 52.

[১৪] দেখুন, Abu Obayd, 1968, pp. 59-66, বিশেষ করে ১১০, ১১৪, ১১৮ অনুচ্ছেদসমূহ দেখুন; Abu Yusuf, 1352 AH, pp. 24 ff; Yahya ibn Adam al-Qurashi, 1384 AH, pp. 41-2; আরো দেখুন, Hitti, 1958, pp. 349, 384-6; Cahen, 1990, p.1031; Lambton, 1990, p. 1038; Ziaul Haque, 1977, p. 171.

[১৫] Aghinides, 1916, p. 389.

[১৬] Bosworth, 1995, p. 959.

www.pathagar.com

নৈতিক দায়িত্ব মর্মে বলা হয়েছে।[১৭] সুতরাং, 'খারাজ'-এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণসহ জনকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। উমাইয়া, আব্বাসীয় ও অটোমান শাসকদের প্রথম দিকের শাসক-বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, খাবুর, ওরন্টিস ও বারাদা ইত্যাদি নদীর উপর বড় আকারের সেচ প্রকল্প নির্মাণ ও তাদের যথাযথ সংরক্ষণের সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।[১৮] কখনও কখনও পাথর কেটে মাটির নীচে দিয়ে নিয়ে যাওয়া লম্বা লম্বা নালা দিয়ে পাহাড় থেকে পানি নিয়ে যাওয়া হতো উঁচু সমতল বা মরুভূমিতে।[১৯] আল-মাকরিজির (মৃত্যু ৮৪৫/১৪৪২) মতে নীল নদীর উপত্যকায় বাঁধ ও সেতু সংরক্ষণের জন্য দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাজার শ্রমিক কাজ করতো।[২০]

অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে ন্যায়ানুগ করারোপ ও আদায়কৃত অর্থের উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের কারনে কৃষকগণ মুসলিমদেরকে পছন্দ করেছিল বাইজান্টাইন ও সাসানীয়দের বদলে, যারা প্রচুর ও নির্ধারিত অংকে করারোপ করতো ও আদায়কৃত অর্থ জনকল্যানে ব্যয় করতো না। নির্ধারিত অংকের কর পরিশোধের জন্য খারাপ ফসল হলে কৃষকগণ প্রায়শ:ই সর্বনাশা শর্তে ধার-দেনা করতে বাধ্য হতো। অনেক উত্থান-পতনসহ করের নিম্ন-হার অটোমান যুগের প্রথম কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন সুলতান তার প্রজাকুলকে সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।[২১] ১৫৪১ সালে মার্টিন লুথার ইউরোপীয় শাসকগণকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, লোভী রাজন্যবর্গ, ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত ধনীদের হাতে নির্যাতিত দরিদ্র জনগণ এরুপ খৃষ্টীয়দের পরিবর্তে তুর্কীদের অধীনে বসবাস করার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।[২২]

সম্ভবত: এরুপ মানবিক নীতির কারনেই মুসলিম বিশ্বে কৃষি বিপ্লব ঘটেছিল।[২৩] এটাই কৃষকগণকে তাদের জমি ও যন্ত্রপাতি আরো কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ ও সক্ষম করেছিল। ফসল উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশল চালু করা

---

[১৭] আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২/৭৯৮), আল মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮) ও সকল নামকরা ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের লেখা থেকে এর উপর প্রদত্ত গুরুত্ব বেশ স্পষ্ট।

[১৮] Al-Shihabi, 1965, p. 901.

[১৯] Hodgson, 1977, Vol. 1, p. 301.

[২০] Al-Maqrizi, al-Khitat, Vol. 1, p. 74.

[২১] দেখুন, Inalcik, 1994, pp. 16 and 17.

[২২] Luther- এর "Admonition to Prayer against the Turks" (১৫৪১) থেকে Lewi s কতৃর্ক উদ্বৃত, ১৯৯৫, পৃ: ১২৮।

[২৩] কৃষি বিপ্লবের জন্যে দেখুন, Cahen, 1970, p. 512; Watson, 1981 and 1983.

www.pathagar.com

হয়েছিল এবং বহু নতুন শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। পানির ব্যবহারে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ওয়াটসনের মতে, "কৃষি বিপ্লবের ফলে খাদ্য উৎপাদন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, গ্রামাঞ্চল অনেক বর্ধিত গ্রামীন জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থানই শুধু করতো না, বরং বিরাট সংখ্যক শহুরে লোকের জন্যেও খাদ্য যোগান দিত"।[২৪] ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দি পর্যন্ত মিসরে উৎপাদিত গমের মুল্যের অসাধারন স্থিতিশীলতার পেছনে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে।[২৫]

নগর সমৃদ্ধি

গ্রামীণ উন্নয়ন অর্থনীতি ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়লো। এর ফলে প্রচুর নগরায়ন হলো এবং শহুরে ক্ষুদ্র শিল্প ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটলো, ও তার ফলশ্রুতিতে কৃষি ও শিল্প পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেল: "ইসলামী সমাজ কৃষি থেকে উৎপাদনের দিকে চলে গেল, যার ফলে এমন পেশা ও বৃত্তিমূলক সুযোগ সৃষ্টি হলো যা পুর্বে কখনও দেখা যায় নি"।[২৬] কালের পরিসরে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে সমৃদ্ধির স্থানান্তর হচ্ছে ইবনে খালদুনের চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্ক ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রগতিশীলতার অন্যতম মৌলিক উপাদান। পণ্য, পুঁজি, শ্রমিক ও উদ্যোক্তার এরূপ অবাধ চলাফেরার সুযোগসহ বিশাল সাধারণ বাজারের কারনে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হলো। সাম্রাজ্যের ভেতরে ও বহি: বিশ্বে ব্যবসায়িক সম্পর্কের এক বিশাল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হলো।[২৭] হারুন-আল-রশীদের (মৃত্যু ১৯৩/৮০৯) আমলে সুদূর চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছিল। উন্নয়নের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হলো এবং ইরাক বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থায়নের কেন্দ্রে পরিণত হলো।

জ্ঞানের অগ্রগতি

গ্রামীণ ও নাগরিক সমৃদ্ধির ফলে "একটি বর্ধিষ্ণু ও বৈচিত্রপূর্ণ নাগরিক সংস্কৃতি'র উন্মেষ ঘটেছিল।[২৮] গুরু-শিষ্য উভয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার লভ্যতা, যথাযথ সুবিধাদিসহ কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের উপযোগী পরিবেশের উপস্থিতি, তৎসহ এমন সহনশীল পরিবেশ, যা "তৎকালীন ইউরোপের

---

[২৪] Watson, 1981, পৃ: ৪৫।
[২৫] Cahen, 1970, p. 512।
[২৬] Schatzmiller, 1994, pp. 399-400.
[২৭] Cahen, 1970, p. 516.
[২৮] Lewis, 1960.

www.pathagar.com

অবশিষ্টাংশে অনুপস্থিত ছিল", ইত্যাদি মুসলিম বিশ্বকে পরিণত করেছিল বিদ্যা ও জ্ঞানের সকল বিষয়ের পন্ডিতগণের মিলন মেলায় (মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, জরোষ্ট্রিয়ান ও সাবিয়ান)"।[২৯] জ্ঞানের সকল বিষয়ের মুক্ত ও অবাধ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো যার ফলে জ্ঞানের সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল। বিশেষ করে হারুন আল রশীদের প্রায় সিকি শতকের রাজত্বের সময়ে একটি "অতি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ"[৩০] দেখা গিয়েছিল, যখন বাগদাদ শুণ্য অবস্থা থেকে বিত্ত ও বিদ্যার বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। "এটি ছিল ইসলামের সেরা সময়, যখন একটি নতুন, সমৃদ্ধ ও বিভিন্ন জাতি ও বিশ্বাসের মিলিত স্রোতধারা থেকে জন্মলাভ করা মৌলিক সভ্যতা পরিপক্কতা লাভ করেছিল"।[৩১] কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল ও এমন একটি বিচার ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরী হলো যা একটি দ্রুত বর্ধিষ্ণু সমাজের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন মেটালো। এগুলো ছাড়াও, গণিত, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, কালাম, সাহিত্য ও শিল্পকলায় মৌলিক ও দিগন্ত-উম্মোচনকারী অবদান রাখা হলো, যার ফলে অষ্টম শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দিকাল ব্যাপী এ সকল ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের প্রাধান্য বজায় থাকলো।[৩২] এমনকি এর শীর্ষ অবস্থান চলে যাওয়ার পরও অন্তত: পরবর্তি আরো দু' শতাব্দি ধরে যথেষ্ট পরিমান অবদান রাখা হয়েছিল।

যদি ইসলামের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার কারনে এরুপ না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমত: আরব বেদুইনদের উত্থান হতো না, এবং যদিও বা উত্থান হতো তা মহানবীর ওফাতের (১১/৬৩২) পর বা ৪১/৬৬১ সালে খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসানের পর আর টিকে থাকতো না। এটি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের পতনের পরও টিকেছিল, এবং ধর্ম-যুদ্ধের পৌণ:পুনিক আক্রমনও (১০৯৫-১২৯১) ঠেকিয়ে দিয়েছিল, এবং মধ্য এশিয়া থেকে চীন পর্যন্ত বিজয়ীদেরকেই ধর্মান্তরিত করেছিল।[৩৩] জর্জ সার্টন তদানুযায়ী তার Introduction to the History of Science –এ ইসলামের প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে, "ধর্ম বিশ্বাস মুসলমানদের জীবনে অভূতপূর্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মুসলমানদের মত এত একনিষ্ঠভাবে ভাবে আর কেহ তাদের ধর্মকে গ্রহণ করে নি, এবং নি:সন্দেহে

[২৯] Saunders, 1966, p. 24; আরো দেখুন, Gibb, 1962, p. 20; Lewis, 1995, p. 72,
[৩০] Hitti, 1958, p. 306.
[৩১] Lewis, 1960, p. 20.
[৩২] দেখুন, Sarton, 1927, বিশেষ করে, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ডের Book 1.
[৩৩] Buwayhids, Saljukids and Mongols.

www.pathagar.com

এটিই ছিল তাদের সংহতি ও শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সামর্থের মূল কারণ, যারা (তাদের শত্রুরা) ছিল বিভক্ত ও যাদের বিশ্বাস ছিল দুর্বল ও শীতল"।[৩৪]

মুসলিম সমাজগুলোকে ইসলাম যে উর্ধ্বমুখী গতি প্রদান করেছিল তা বিবেচনায় নিয়ে বলা যেতে পারে যে, মুসলিম সভ্যতার পরবর্তিকালের অবক্ষয়ের জন্য ইসলামকে দোষারোপ করা অযৌক্তিক। বদনামটা ইসলামের সত্যিই যদি প্রাপ্য হতো তাহলে সমস্যা ও অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কোন কিছুকে পরিত্যাগ করার মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার কারনে মুসলমানরা অনেক আগেই ইসলামকে পরিত্যাগ করতো। কুরআন নিজেই স্পষ্টভাবে বলছে যে, "আবর্জনা হারিয়ে যায়, যা কিছু মানুষের জন্য উপকারী তা পৃথিবীতে টিকে থাকে" (আল কুরআন, ১৩: ১৭)। এখন পর্যন্ত ইসলামের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেনি। বরং, কয়েক শতাব্দি ধরে ইসলামের কাছে ফিরে যাওয়ার একটি মধুর বাসনা ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। প্রকৃত পক্ষে, পুণ: জাগরণ শুরু হয়ে গেছে ও তা ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। ইসলামের স্বপ্ন মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করছে – এমন একটি সমাজের স্বপ্ন যেখানে ব্যক্তি- মানুষ নৈতিকভাবে উজ্জীবিত এবং মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের শক্ত বন্ধনে একে অন্যের সাথে আবদ্ধ রয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচার বিরাজ করে ও সকলের অভাব মেটানো হয়ে থাকে, যেখানে পরিবার খুব শক্তিশালী এবং যেখানে শিশুরা বাবা- মা উভয়ের ভালবাসা, মায়া- মমতা ও আদর- যত্ন পেয়ে থাকে, যেখানে অপরাধ, উদ্বেগ ও সামাজিক অস্থিরতা কমে যায় ও সামাজিক শান্তি বিরাজ করে, এবং যেখানে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। হজসন যথার্থই বলেছেন যে, "স্বপ্ন কখনও শেষ হয়ে যায় নি, উদ্যোগ কখনও পরিত্যাক্ত হয় নি; আধুনিক বিশ্বেও এ সকল আশা ও প্রয়াসসমূহ এখনও যথেষ্ট জীবন্ত"।[৩৫] এটি ইসলামের কৃতিত্ব যে, ভাষাগত ও জাতিগত পার্থক্য, রাজনৈতিক উত্থান- পতন, মুসলিম দেশসমূহের খন্ড- বিখন্ড হওয়া ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় সত্বেও ইসলাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে, এবং মুসলিম বিশ্ব মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং তা "সচেতন ও কার্যকরভাবে একটি অখন্ড ঐতিহাসিক সত্ত্বা হিসেবে টিকে আছে"।[৩৬]

---

[৩৪] Sarton, 1927, Vol. 1, p. 503 । Sorokin-এর মতে : "অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকে আরব সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমসাময়িক পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশী প্রাণশক্তি প্রদর্শণ করেছিল" (Sorokin, 1951, p. 328)।

[৩৫] Hodgson, 1977, Vol. 1, p. 77.

[৩৬] প্রাগুক্ত, ১৯৭৭, ২য় খন্ড, পৃ: ৩।

www.pathagar.com

কারণটি কি নৈতিক অবক্ষয়?

সুতরাং, ইসলাম যদি মুসলমানদের পতনের কারণ না হয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য কি নৈতিক অবক্ষয়কে দায়ী করা যেতে পারে? এ তত্ত্ব (সামাজিক) পরিবর্তন সংক্রান্ত ইবনে খালদুনের তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত নয়। যদিও মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় তাদের সৃজনশীলতা, প্রাণ-শক্তি ও সংহতি নি: শেষ করতে নি: সন্দেহে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল ও তাদেরকে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে অক্ষম করে দিয়েছিল, 'মুকাদ্দিমাহ' পাঠ করলে মনে হবে যে, নৈতিক অবক্ষয় নিজে কোন 'কারণ' ছিল না, এটি ছিল আসলে 'ফলাফল'। জনগণের (N) (নারী-পুরুষ) উভয় অংশের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের পরিপূর্ণ মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর এবং তাদের সমাজের উন্নয়নে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক, আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন হয়। এরূপ একটি অনুকূল পরিবেশের ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাওয়াই সম্ভবত: জনগণের (N) নৈতিক অবক্ষয়, ও তাদের প্রাণশক্তি ও সংহতি হারিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হতে পারে।

যদি মহানবীর (স:) প্রচারিত ইসলাম ও মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় মুসলমানদের পতনের জন্য দায়ী না হয়ে থাকে, তাহলে জীবনী-শক্তি ও উদ্যম হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কে? একটি মাত্র অধ্যায়ে এর উত্তর প্রদানের চেষ্টা করা হলে প্রশ্নটির প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে না। তবে, যেহেতু ইবনে খালদুনের মডেল অনুসরন করে ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নয়, বরং ভবিষ্যতের উন্নতির লক্ষ্যে একটি যথার্থ কর্ম-কৌশল বের করার জন্য কিছু জ্ঞান অর্জন করা, সেহেতু, পতনের জন্য মুসলিম সমাজের যে সকল দিকসমুহ মুখ্যত: দায়ী সেগুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করলে উপকার হবে। বিস্তারিত বর্ণনা ও পুণ: রাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে এ আলোচনা উমাইয়া, আব্বাসীয়, মামলুক ও অটোমান বংশসমুহের শাসকগণ কর্তৃক শাসিত ইসলামের কেন্দ্রীয় এলাকার মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে, এবং স্পেন, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, ইরান ও ভারতের মত অন্যান্য এলাকা বাদ রাখা হয়েছে। তবে, আলোচনাটি তেমন বড় ধরনের হের-ফের ছাড়াই এ সকল এলাকার জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ প্রায় একই রকম লুকায়িত শক্তির ধারা তাদেরকেও প্রভাবিত করেছিল।

দ্বিতীয় ভাগ: ঘটনার কারণ ও তার ফলাফল

ভুল পদক্ষেপ: খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসান

ইবনে খালদুন ও তার আগের পরের বহু স্বনামধন্য মুসলিম পন্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসান করে ৪১/৬৬১ সালে মুয়াবিয়াহ'র

www.pathagar.com

ক্ষমতা গ্রহণ, ৬০/৬৭৯ সালে তার পুত্র ইয়াজিদের উত্তরাধিকারসূত্রে মসনদে আসীন হওয়া ও উমাইয়া বংশের (৪১-১৩২/৬৬৩-৭৫০) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাস ভুল পথে অগ্রসর হয়েছিল। এর মাধ্যমে খিলাফতের নৈতিক বাধ্য-বাধকতার বা ইসলাম কর্তৃক মুসলমানদের জন্য নির্দেশিত রাজনৈতিক আদর্শের সুস্পষ্ট লংঘন ঘটিয়ে অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতার বীজ বপন করা হলো ও যথেষ্ট জবাবদিহি ব্যতীত নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের গোড়া পত্তন করা হলো। এরূপ লংঘন মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে মহানবীর জীবিত সাহাবীদের মধ্যে, প্রচুর অসন্তোষ জাগিয়ে তুললো।[৩৭] বিদ্রোহের ঘটনাও ঘটেছিল, তবে সেগুলো সফল হয়নি। মহানবীর চার ঘনিষ্ট সাহাবীদের অনুসৃত জীবন ধারা ও ইসলামের খিলাফত ও শুরা'র আলোকে একটি আমূল রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য সম্ভবত: তখনও উপযুক্ত সময় হয়নি। মুসলিম সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবৈধ রাজনেতিক ক্ষমতার বিরূপ প্রভাবের কারনে এভাবেই পতনের চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যা এ আলোচনার অগ্রগতির সাথে সাথে স্পষ্ট হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

খিলাফত ও গণতন্ত্র

খিলাফত হচ্ছে এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে খলিফা (রাষ্ট্র প্রধান) জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাঁর মুল দায়িত্ব হচ্ছে একটি ন্যায়ানুগ যথাযথ পদ্ধতি স্থাপন করা এবং শরীয়াহ'র দীক্ষার আলোকে ও শুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। যদিও শুরা'র শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরামর্শ সভা, অধিকাংশ বড় ও আধুনিক মুসলিম পন্ডিতগণ এর দ্বারা একটি নির্বাচিত স্বাধীন

---

[৩৭] জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মুয়াবিয়াহ যখন নিজকে অবৈধভাবে উমাইয়া বংশের প্রথম শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তখন মহানবীর ১০ জন প্রধান সাহাবীদের একজন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (মৃত্যু ৫৫/৬৭৪) তার সাথে দেখা করে মুসলমানগন কর্তৃক খুলাফায়ে রাশেদীনকে যা বলে অভিবাদন করা হয়, সে ভাষায় *'আমির আল-মুমেনিন'* (বিশ্বাসীদের নেতা) না বলে, *'আস-সালাম আলাইকা আইয়ুহাল-মালিক'* (হে, রাজাধিরাজ, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে অভিবাদন জ্ঞাপন করেছিলেন (Ibn al-Athir Izz al-Din Ali (d. 630/1233), al-Kamil, 1965, Vol. 3, 205)। Al-Jahiz (d.255/869) লিখেছিলেন যে, মুয়াবিয়াহ নিজকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার বছরই খিলাফত চসরোস ও সিজারের স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হয়ে গেল (Al-Jahiz, 1964-5, Vol. 2, pp. 10-11; আরো দেখুন, Lewis, 1995, p. 141। ইতিহাসবিদ al-Masudi তার *মুরাজ আল দাহাব-এ* উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণকে রাজা আখ্যায়িত করেছেন। (আরো দেখুন, *মুরাজ আল দাহাব, ১৯৮৮, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৪১-এ* তিনি উমাইয়াদের পতনের কারনগুলো আলোচনা করেছেন; এবং ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৮৭, যেখানে তিনি তার চার খন্ড রচনায় বর্নিত বড় ঘটনাগুলো পুণরালোচনা করেছেন)।

www.pathagar.com

সংগঠনকে বুঝিয়ে থাকেন, যা অত্যন্ত আবশ্যক (আল-কুর'আন, ৩:১৫৯ ও ৪২:৩৮), ও যার সিদ্ধান্ত ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে বিধায় তার প্রতিপালন বাধ্যতামূলক।[৩৮] সরকারী খাজাঞ্চিখানার ধন-সম্পদ হলো আমানত – ন্যায়ানুগভাবে রাজস্ব আদায় করতে হবে এবং জনগণের স্বার্থে যথাযথভাবে ও সমভাবে তা ব্যয় করতে হবে। শরীয়াহ'র নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে, এবং, অমুসলিমসহ প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার থাকতে হবে।[৩৯] শরীয়াহ'র আলোকে জনগণের কল্যাণের জন্য খলিফা তাঁর সকল ক্ষমতা যেন প্রয়োগ করেন ও তাঁর হেফাজতে থাকা সকল সম্পদ যেন ব্যবহার করেন তা নিশ্চিত করা শুরার কর্তব্য। খলিফা ও শুরার সদস্যগণ ততক্ষণই তাদের পদে বহাল থাকবেন, যতক্ষণ তাদের উপর জনগণের আস্থা থাকবে। শরীয়ায় তাদের নির্বাচনের পদ্ধতি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে এ বিষয়টি নির্ধারন করার এখতিয়ার জাতির (উম্মাহ) উপর বর্তেছে। প্রথম চার খলিফা নির্বাচন থেকে যা স্পষ্ট হয়েছে, তা হচ্ছে যে, বংশানুক্রমিকভাবে বা বলপুর্বক এ সকল পদ দখল করা ইসলামী নির্দেশের সহিত সাংঘর্ষিক। বর্তমান কালের বহুবাচনিক সমাজে সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হতে পারে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন।

এর মাধ্যমে গণতন্ত্র ও খিলাফত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। তবে, জনগণ কর্তৃক তাদের নেতা নির্বাচন ও জনগণের কাছে নেতাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা দু' ক্ষেত্রেই যেমন রয়েছে, তেমনি জনগন ও নেতা কেহই খিলাফতের অধীনে

---

[৩৮] দেখুন, Abu Faris, 1988, p. 20; pp. 19-30 । সায়ীদ কুতুব কুর'আনের আয়াত ৩:১৫৯ ("এবং, তাদের সাথে সকল বিষয়ে পরামর্শ কর, এবং একবার যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তখন আল্লাহ'র উপর বিশ্বাস রেখ, কারন আল্লাহ পছন্দ করেন তাদেরকে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখেন") - এর উপর তার মন্তব্যে জোর দিয়ে বলেন যে, "শুরার এরুপ সিদ্ধান্তের পর সংকোচ, দ্বিধা ও মত বদলের কোন অবকাশ নেই, কারন, এরুপ আচরণ কেবল অশেষ সিদ্ধান্তহীনতা, অসাড়তা ও নেতিবাচকতা নিয়ে আসে। শুরার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মনযোগের সহিত আল্লাহ'র উপর ভরসা রেখে তামিল করতে হবে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন" (Sayyid Qutb, 1986, Vol. 1, p. 497)। আয়াত ৪২:৩৮ ("এবং, তারা পরস্পরের সাথে আলাপ করে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে") - এর তার মন্তব্যে তিনি বলেছেন, আয়াতটি কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর জন্যেই প্রযোজ্য নয়, পারিবারিক ও সামাজিক কার্যাবলীতেও প্রযোজ্য (৫ম খন্ড, পৃ: ৩১৬৫-৬)। আরো দেখুন, আয়াত দু'টোর মুহাম্মদ আসাদের অনুবাদ ও মন্তব্য, পৃ: ৯২ এ ৭৪৬। আরো দেখুন, Mumtaz Ahmad (ed), 1986, বিশেষ করে সম্পাদকের ভূমিকা (পৃ: ১-২২) ও Fathi Osman –এর রচনা (পৃ: ৫১-৮৪)।

[৩৯] দেখুন, Mawdudi, 1966, pp. 83-102 and 157-75 । আরো দেখুন, Lewis, 1995, pp. 72-3।

www.pathagar.com

নিরংকুশভাবে স্বাধীন নয়। তারা সকলে শরীয়াহ'র লক্ষ্য, নৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও প্রতিষ্ঠানসমুহের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ, এবং তারা যতক্ষণ ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাদেরকে সেগুলো থেকে বিচ্যুত হতে অনুমতি দেওয়া হয় না। এ কারনে ভ্যাগলিয়েরীর বলেছেন যে, খলিফা ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান "যার কোন সমকক্ষ ছিল না এবং মুসলিম বিশ্বের বাইরে এ রকম কোন সমকক্ষ থাকার কথাও নয়"।[৪০]

ভ্যাগলিয়েরীর কথা হয়ত: ঠিক হতো যদি গণতন্ত্রে নৈতিক বাধ্য-বাধকতার অনুপস্থিতি ধরেই নেয়া যেত। তবে, ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ সত্বেও এটি সত্য নয়। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ পাশ্চাত্যকে গীর্জার অর্গল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। নৈতিক বাধ্য-বাধকতা সব সময়ই ছিল। এগুলো বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান, আইন-কানুন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি অনেক কারনের মধ্যে একটি, যার ফলে সার্বিকভাবে গণতন্ত্র পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে যতদুর সম্ভব আইনের প্রাধান্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, ন্যায়বিচার ও জন-কল্যান ত্বরান্বিত করতে পেরেছে।

ইসলামী ব্যবস্থায় সরকারকে কোন আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোন গীর্জা না থাকা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নৈতিকতার বাধ্য-বাধকতা থাকার বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে থাকে। তাই বলা যেতে পারে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও খিলাফতের মধ্যে তেমন কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। যদিও তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে সমাজের কোন নৈতিক বিধি লংঘন করা সম্ভব হলেও হতে পারে, তবে বাস্তবে সাধারণভাবে এমনটি হয় না। যদিও বা কখনও কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবে তা সমাজের মুল্যবোধের পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে যা আকস্মিকভাবে বা যখন তখন ঘটে না, বরং ধীরে ধীরে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে। কতিপয় গণতান্ত্রিক সমাজে জুয়া, মদ্যপান, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি ও অবিবাহিত জুটিদের একত্রে বাস-এর উপর আইনগত সমর্থন মুল্যবোধের পরিবর্তনের উদাহরন। যেহেতু, এগুলো ক্রমান্বয়ে পরিবারের ভাঙ্গনসহ অনেক প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে, এটি এ সকল সমাজের নৈতিক ও পার্থিব কল্যানের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাদের অব্যাহত অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য নষ্ট করে দিতে পারে, যদি তারা তাদের পথ না পাল্টায়। এ কারনে নৈতিক আইনের অবস্থান সর্বত্র সবার উপরে, এবং এর থেকে কোন 'মুক্তি' নেই। কুরআনের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে: "সত্য ও ন্যায়বিচারের বিষয়ে তোমার প্রভু চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন এবং এটি কেহ পরিবর্তন করতে

[৪০] Vaglieri, in Holt, Lambton and Lewis, 1970, Vol. 1, p. 57.

www.pathagar.com

পারবে না" (আল-কুরআন, ৬:১৫)। মুসলিম বা ধর্মনিরপেক্ষ কোন জাতির পক্ষেই এটি লংঘনের ফলে যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং, গণতন্ত্র ও খিলাফতের মধ্যকার পার্থক্য বাড়িয়ে বলা বাস্তব সম্মত হবে না।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহানবী (স:) "ক্রমান্বয়ে একটি সুসংহত নীতিমালা গড়ে তুলেছিলেন এবং কতিপয় টেকসই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন"।[৪১] তৎকালীন সমাজের ক্ষমতা কাঠামো অপসারিত করে তিনি খিলাফতের দীর্ঘতা নিশ্চিত করতে পারতেন – যে সমাজ কাঠামো মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করেছিল, তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, এবং লাগাতারভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ৮/৬২৯ সালে মক্কা বিজয়ের পর তাঁর হাতে এ সুযোগ এসেছিল এবং এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তবে, তিনি তা করেন নি। এরুপ করা হলে একটি খারাপ নজীর তৈরী হতো, যা তিনি করতে চান নি। একটি হাদিস থেকে বোঝা যায়, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যদিও তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে, ভবিষ্যতে কারো সন্তান পুরাতন ক্ষমতা কাঠামো পুণরুজ্জীবিত করতে পারে।[৪২] সম্ভবত: তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ক্ষমতা কাঠামো চিরতরে নস্যাত করা যায় না। এগুলোর হাত বদল হয় এবং এগুলো বারবার নিজেদের অস্তিত্ব জাহির কারার চেষ্টা করতে থাকে। সুতরাং, তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, অশুভ ক্ষমতা কাঠামোগুলোকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে উন্নত নৈতিক পদ্ধতি হচ্ছে তাঁর রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত অনুসরন করে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে, এবং কার্যকর নৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠা করে এগুলোকে এমনভাবে দুর্বল করে দেওয়া যাতে তারা নিরংকুশ ও অবাধ ক্ষমতা অর্জন বা প্রয়োগ করতে না পারে।

---

[৪১] Watt, in Holt, Lambton and Lewis, 1970, Vol. 1, p. 55.

[৪২] মহানবী (স:) বলেছিলেন, "আমার পর এমন শাসক আসবে যারা আমার নির্দেশিত পথ ও আমার সুন্নাহ অনুসরন করবে না। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকবে যাদের শরীর থাকবে মানুষের ও অন্তর থাকবে শয়তানের" (Muslim-এর *হুদায়ফাহ ইবনে আল-ইয়ামান,* ৩য় খন্ড, পৃ: ১৪৭৬:৫২, *কিতাব আল-ইমরাহ, বাব* ১৩)। অন্য একটি হাদিসের মতে, "আমার পর খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র আসবে" (আবু হুরায়রা থেকে সহি হাদিস আকারে al-Suyuti কর্তৃক তার al-Jami al-Saghir-এ উদ্বৃত (Vol. 2, p. 13), সূত্র: Musnad of Ahmad, al-Tirmidhi, Musnad of Abu Yala, ahih of Ibn Hibban)।

www.pathagar.com

অবৈধ ক্ষমতা সুসংহতকরণ

মহানবী (স:) যা অনুমান করেছিলেন তা ঠিকই ঘটেছিল। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাহেলিয়া যুগের ক্ষমতা কাঠামোগুলোর পুণরাবির্ভাব ঘটলো এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ইসলামী দীক্ষা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহে আর কখনও পুরোপুরি প্রতিফলিত হলো না। তখনকার প্রবনতা ছিল "শাসক ও তার এজেন্টদের জন্য, কম নয়, বেশী বেশী ব্যক্তিগত ক্ষমতা"।[৪৩] উমাইয়া বংশের ১২ জন শাসকের মধ্যে অষ্টম উমর ইবনে আবদ আল আজিজ (মৃত্যু ১০১/৭২০) সরকারীভাবে অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা বাতিল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেবল মাত্র আড়াই বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনের পর কায়েমী স্বার্থবাদিগণ তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। কায়েমী স্বার্থবাদিগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতো তাদের অধিকাংশের ভাগ্য এ রকমই হতো।

উমাইয়াদেরকে উচ্ছেদ করে ১৩২/৭৫০ সালে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এসেছিল। এর জন্য তারা যে কারণ দেখিয়েছিল তা ছিল উমাইয়াগণ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় দেহ-কাঠামোর মধ্যে যে সকল রোগ ঢুকানো হয়েছিল সে গুলোকে সংস্কার করা। তবে, তারা অঙ্গীকার রক্ষা করে নি। কেন করবে? এরুপ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করার মত কোন কিছু ছিল না। নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন হয়। তারা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতো যদি তারা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকতো এবং তাদেরকে নিয়োগ ও অপসারন করার ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকতো। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ব্যবস্থায় জনগণ এরুপ সুযোগ পায় না, এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে পরাক্রমশালী শাসকগণের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবশ্যই জনগণ বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের বিদ্রোহ সাধারণত: ও নির্দয়ভাবে দমন করা হতো। হারুন আল রশীদের রাজত্বকালে (১৭০-১৯৩/৭৮৬-৮০৯) আব্বাসীয়রা তাদের উন্নতির শিখরে পৌছেঁছিল, এর পর দ্রুত অবনতি ঘটেছিল এবং সাসানিয় ও বাইজান্টাইনীয়দের পদাংক অনুসরন করে অনিয়ন্ত্রিত ও খাম-খেয়ালীপুর্ণভাবে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছিল। তার দু' ছেলে আল আমিন ও আল মামুনের মধ্যে উত্তরাধিকারের দাবীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ লেগে গেল, এবং আল মামুন যখন মুসলিম জনগণের মতের বিপরীতে গিয়ে মুতাজিলাহ-দের কতিপয় অগ্রহণযোগ্য

[৪৩] Lewis, 1995, p. 144.

www.pathagar.com

মতামত চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করলো তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও জন অসন্তোষ শুরু হলো। পতন আরো ত্বরান্বিত হলো যখন আব্বাসীয়রা বুয়েহীদ(৩৩৪-৪৪৭/৯৪৫-১০৫৫) ও সালজুকিদ (৪৪৭-৫৯০/১০৫৫-১১৯৪)-দের হাতের পুতুল হয়ে গেল। বুয়েহীদ ও সালজুকিদ তৎসহ পরবর্তীকালে তাদের অনুসারীগণ এমন কোন বাধা অনুভব করতো না যা আব্বাসীয়রা নিজেদেরকে নবীজীর চাচা আব্বাসের সহিত সম্পর্কিত করার কারনে ও সংস্কার করার অঙ্গীকার করার কারনে অনুভব করতো।

মুসলিম ইতিহাসে মঙ্গলীয় (ইলখানিদ) (৬৫৬-৭৫৮/১২৫৮-১৩৫৫) ও তিমুরিদ (৭৩৭-৮০৭/১৩৩৬-১৪০৫) আক্রমনই ছিল সম্ভবত: সবচেয়ে নিষ্ঠুর, শোষনমূলক ও ধ্বংসাত্মক। ইলখানিদ ও তিমুরিদ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে অনেকগুলো রাষ্ট্রে পরিণত হলে মুসলিম বিশ্ব খন্ড খন্ড হয়ে সেগুলো বিভিন্ন শাসক বংশের অধীনে চলে গেল। একটি বড় আকারের সাধারণ বাজারের যে সুবিধা পুর্বে পাওয়া গিয়েছিল এবং যার ফলে উন্নয়ন গতি পেয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে হারিয়ে গিয়েছিল। অটোমান শাসকগণ কর্তৃক ৯২৩/১৫১৭ সালে মিসর ও সিরিয়া এবং ৯৪০/১৫৩৪ সালে বাগদাদ ও তাবরীজ বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের একটি বড় অংশের পুণ: রেকন্দ্রিকরণ না করা পর্যন্ত সে সকল সুবিধা আবার পুণ: প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

তবে, যেহেতু 'খলিফা' উপাধিটির সহিত যথেষ্ট পরিমান শ্রদ্ধাবোধ ও অন্যদেরকে প্রভাবিত করার শক্তি জড়িত ছিল, সেহেতু, অনেক শাসক, বিশেষ করে উমাইয়া (৪১-১৩২/৬৬৩-৭৫০), আব্বাসীয় (১৩২-৬৫৬/৭৫০-১২৫৮) ও অটোমান (৬৯৯-১৩৪২/১২৯৯-১৯২৪) বংশের শাসকগণ নিজেদেরকে 'খলিফা' হিসেবে পরিচিতি দেওয়াকে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক মনে করতেন। কিন্তু এর ফলে অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতার কালিমা মুছে যায় নি, যা ছিল মুসলিম ইতিহাসে ন্যায়পরায়ন 'উলেমা' ও শাসকদের মধ্যে বিরোধের মুখ্য কারণগুলোর একটি। 'খলিফা' নামটির অবসানের পর 'সুলতান' ও 'মালিক' উপাধিসমুহ ব্যবহার করা শুরু হলো। 'শুরা' ও 'বেয়া'হ' নামক প্রতিষ্ঠানগুলো ধরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল সকল ক্ষেত্রেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের প্রতিষ্ঠানগুলোর তামসাপূর্ণ নকল, এবং সেগুলো শাসকদের খাম-খেয়ালীপুর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রত্যাশিত ভুমিকা পালন করতো না। সকল শাসক বংশেই বিভিন্ন সময়ে কতিপয় ধার্মিক ও যোগ্য শাসক ছিলেন যারা খিলাফতের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্তত: কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া, অধিকাংশ শাসকই ছিলেন অসীম ক্ষমতাধর বাদশাহ এবং তাদের শাসন কার্যে

www.pathagar.com

ইসলামের দীক্ষা প্রতিফলিত হয় নি। শরীয়াহ'র (S) বিধান সুস্পষ্টভাবে লংঘন করে আইনের সমান অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হতে থাকলো। সুতরাং, হজসন ঠিকই বলেছিলেন যে, "ইসলামী সভ্যতা বাস্তব ক্ষেত্রে যেভাবে বিরাজ করছিল, তা ছিল ইসলামী বিশ্বাস থেকে বহু দূরে"।[৪৪] যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হতো না। যে সকল ব্যক্তিবর্গের রাষ্ট্রের জন্য তেমন বড় কোন অবদান রাখার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কিছুই ছিলনা সে সকল তোষামদকারীগণ সব সময় এ সকল সুলতানদেরকে ঘিরে রাখতো এবং সুলতানগণ যেরুপ শুনতে চাইতো সেরুপ কথা বলে সকল সুবিধা আদায় করে নিত। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, উত্তরাধিকারের জন্য গোত্র যুদ্ধ, সামরিক অভ্যুত্থান উম্মাহ'র সকল ধ্বন-সম্পদ নি:শেষ করে দিল, তার সৃজনশীল শক্তি দুর্বল করলো এবং সার্বিক অবক্ষয় নিয়ে আসলো। একই পরিবারের সদসদের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরও সব সময় রক্তপাতহীন ছিল না এবং এরুপ ক্ষমতাগ্রহন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক বাহিনী নিয়ামক শক্তিরুপে কাজ করতো মর্মে প্রতীয়মান। উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষ সব সময় নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে দিত, যা আবার উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরুপ প্রভাব ফেলতো, বিশেষত: যখন সাবেক শাসককে পরিশোধকৃত আয়কর নতুন শাসককে তার আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য পুনরায় প্রদান করতে হতো।

এখানে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, খিলাফত ও শুরার প্রতিষ্ঠানসমূহ অব্যাহত থাকলে তাতেই সকল সমস্যার সমাধান হতো ও তা সকল সংঘর্ষ ও সমস্যার অবসান ঘটাতো। এর ফলে তা ঘটতো না। তবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার (G) দায়বদ্ধতাসহ সরকারী নীতি ও সরকারী কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার জন্যে জনগণকে (N) স্বাধীনতা দেওয়া হলে সরকার আরো কার্যকরী হতো – এমন একটি সরকার যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আইন-শৃংখলা বজায় রাখা ও সার্বিক কল্যাণের জন্য সকল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতো।[৪৫]

---

[৪৪] Hodgson, 1977, Vol, 1, p. 71.

[৪৫] বিশ্ব ব্যাংক ঠিকই বলেছে যে, "উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হয় একটি কার্যকর পরিমন্ডল, যা বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একটি প্রভাবক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। নিশ্চয়ই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু, রাষ্ট্র-বিহীন উন্নয়নও ব্যর্থ হয়েছে ... । ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে যে, সুশাসন কোন বিলাসিতা নয়, এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কার্যকর রাষ্ট্র ব্যতীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়" (World Bank, World Development Report, 1997, p. 111)।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলো ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অনেক কিছুই করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে এ কারনে যে, দায়বদ্ধতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যত বেশী থাকবে, জনগণের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের (G) তত বেশী তাগিদ থাকবে। মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সঠিক সমাধান পাওয়া যায়, এবং দায়বদ্ধতা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে (G) দ্রুত সে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী সমাধানমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রানিত করে।

এর দ্বারা অবশ্যই বুঝানো হচ্ছে না যে, অবৈধ শাসকগণ কার্যকরী সরকার ব্যবস্থা দিতে পারে না। তারা তা পারেন, এবং মুসলিম ইতিহাসে অনেক ধার্মিক ও যোগ্য শাসকগণ তা করেছেনও। তবে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্য-বাধকতার কারনে তা হয় নি, বরং তাদের নিজেদের ইচ্ছার কারনে তা হয়েছিল, এবং তাদের মৃত্যুর পর কদাচিত তা অব্যাহত ছিল। খিলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি নির্ভেজাল ও শান্তিপুর্ণ প্রক্রিয়া বের করা সম্ভব হতো, যার ফলে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যুদ্ধ, রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানো সম্ভব হতো। এর ফলে ইসলামী দীক্ষার আলোকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জীবন ও সম্পত্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো। পুর্বের শতাব্দির মত ন্যায়পরায়ন ও যোগ্য ব্যক্তিগণকে উচ্চ পদে, বিশেষ করে 'কাজী' পদে নিয়োগ প্রদান অব্যাহত থাকতো, এবং তার মাধ্যমে অবিচার ও দুর্নীতি হ্রাস পেতো। করারোপেও আরো স্বচ্ছতা থাকতো। দীর্ঘকালীন ঘাটতি এড়ানো সম্ভব হতো, এবং সরকারী সম্পত্তির বিরাট অংশ ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের চেয়ে বরং জনকল্যানে ব্যয় করা হতো। উন্নয়নের যে গতি ইসলাম সঞ্চারিত করেছিল তা হারিয়ে যেত না।

মুসলিম বিশ্ব এখন পর্যন্ত জনগণের চোখে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ন ও যোগ্য ব্যক্তির নিকট নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপুর্ণ পথে ক্ষমতার লাগাম হস্তান্তরের, শরীয়াহ'র আলোকে সরকারী সম্পদের উৎপাদনমুখী ও সুষম বন্টন ও সরকারী নীতির মুক্ত ও নি:শংক সমালোচনা করার জন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি। সামরিক অভ্যুত্থান বা উত্তরাধীকারসূত্রে ক্ষমতা গ্রহণ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখনও চলছে। এমন কি যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেখানেও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এমন যে সামরিক বাহিনী, ভুস্বামী ও শিল্পপতিদের একটি ছোট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রন স্থায়ী করে নিতে পারে। সুতরাং, খিলাফত বা রাজ্যের নীতি দ্বারা শাসক বেশী অনুপ্রানিত হচ্ছেন কিনা তার উপর নির্ভর করে কম-বেশী

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ঘটনা ঘটতেই থাকে। জনগণ কর্তৃক সরকারী নীতির সমালোচনা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে, মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক ত্রুটির, যে ত্রুটিই সম্ভবত: রোগের মুল কারণ, আবশ্যকীয় সংশোধন কয়েকটি কারনে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হচ্ছে মর্মে মনে হচ্ছে, যা অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

শরীয়াহ'র নিয়ন্ত্রক প্রভাব

সমাজের অধ: পতন রোলার কোষ্টারের মত অত দ্রুত ঘটে না। ইবনে খালদুন ধারনা করেছিলেন যে শাসক বংশের ভাঙ্গনের জন্য তিন প্রজন্ম বা একশত বিশ বছর প্রয়োজন হয়। আমরা যেহেতু গোটা মুসলিম সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করছি, সেহেতু, তার নির্দেশিত সময় এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমাজের একটি ক্ষেত্র কাজ না করলে তার কাজ সমাজের অন্য ক্ষেত্রের উপর বর্তায়। খিলাফতের অবসান শরীয়াহ'র নিয়ন্ত্রনেরও পরিপুর্ণ অবসান ঘটায় নি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের হৃদয় ও মন শরীয়াহ'র প্রভাবে প্রভাবিত হতে থাকলো। ক্ষমতার অবৈধতা সত্বেও "প্রথম যুগের খলিফাগণ কর্তৃক প্রদর্শিত ক্ষমতা মোটেই স্বেচ্ছাচারী ছিল না . . . । এ ক্ষমতা ইসলামের রাজনৈতিক রীতি-নীতি ও প্রাচীনকালের আরবের স্বৈরাচার-বিরোধী অভ্যাস ও বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো"।[৪৬] এরুপ না ঘটলে বা শরীয়াহ'র প্রভাব, আংশিকভাবে হলেও, বার বার প্রযুক্ত না হয়ে থাকলে মুসলিম বিশ্ব অনেক আগেই সংকুচিত ও কোনঠাসা হয়ে পড়তো। টয়নবি যথার্থই বলেছেন যে, যে ধর্ম তার ভেতরের গুণাবলীর দ্বারা আনুগত্য অর্জন করতে সফল হয়েছে, ধর্ম-বহির্ভূত উদ্দেশ্যে উহার অপব্যবহারকারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উত্থান-পতনের সাথে সাথে উহা উত্থান বা পতন হয় না"।[৪৭]

সাধারণভাবে মানুষের মনে শরীয়াহ'র প্রভাব এত বেশী ছিল যে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজন্যবর্গও এটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারতো না। খিলাফতের সাথে সম্পর্কিত অন্তত: কতিপয় ধর্মীয় ও কল্যাণমুলক কার্য অব্যহাত রাখার জন্যে তারা এক প্রকার নৈতিক চাপের মধ্যে থাকতো। ইবনে খালদুন যাকে আখ্যায়িত করেছিলেন খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মিশ্রণ,[৪৮] তা চলে আসছে, এখনও চলছে, শাসকের নিজের ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর

[৪৬] Lewis, 1995, p. 140.
[৪৭] Toynbee, abridged by Somervell, 1957, Vol. 2, p. 31.
[৪৮] Ibn Khaldun, Muqaddimah, p. 208.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরামর্শ মেনে নিয়ে একটি বেতনভুক স্থায়ী সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১৫,০০০ যথেষ্ট মর্মে বিবেচনায় গ্রহণ করলে কারোই এরূপ (বিরাট বাহিনী পোষা) করা উচিত নয়।[৮৩] রাষ্ট্র যখন আর্থিক সংকটে ভোগে তখন সরকারের উচিত সামরিক ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস করা। তবে, সরকার তা করে নি। বরং, সরকার তার স্থায়ী সামরিক বাহিনীকে সম্প্রসারিত করেই চললো এবং কর বাড়িয়ে ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যয় হ্রাস করে আর্থিক সংকট মোকাবেলা করতে থাকলো। সম্ভবত: এরূপ বোধোদয় ঘটেনি যে, জনগণের অর্থনৈতিক দুর্ভোগই দেশে সেলালি বিদ্রোহসহ (১৫৯৬/১৬০৯) তার আগের ও পরের অনেকগুলো বিদ্রোহের অন্যতম বড় কারণ ছিল।

সারণী- ১

সৈন্য সংখ্যা ও বেতন বিল

বছর	সুলতান	সৈন্য সংখ্যা	বার্ষিক বেতন (মিলিয়ন আকসিস)	গড় বার্ষিক বেতন
৯৭০/১৫৬২	সুলেমান	৪১৪৭৯	১২৩.৩	২৯৭২.৫
৯৭৪/১৫৬৬	সুলেমান	৪৮৩১৬	১২৬.৪	২৬১৬.১
৯৯৭/১৫৮৮	তৃতীয় মুরাদ	৬৪৪২৫	১৭৮.২	২৭৬৬.০
১০০৪/১৫৯৫	তৃতীয় মেহমুদ	৮১৮৭০	২৫১.২	৩০৬৮.৩
১০১৮/১৬০৯	প্রথম আহমদ	৯১২০২	৩১০.৮	৩৪০৭.৮
১০২৭-৩১/১৬১৮-২২	দ্বিতীয় ওসমান	১০০০০০	-	-
১০৩১-২/১৬২২-৩	প্রথম মুস্তফা	১০০০০০	-	-

তথ্যসূত্র: সৈন্য সংখ্যা ও বার্ষিক বেতনের অংক লুইস কর্তৃক হাজী খলিফা'র গ্রন্থ 'দাস্তুর আল-আমাল লি ইসলাহ আল-খালাল' থেকে উদ্ধৃত, লুইস, ১৯৬২, পৃ: ৮০।

[৮৩] Lewis কর্তৃক Lutfi Pasha-এর Asafname থেকে উদ্বৃত, ১৯৬২, পৃ: ৭৩।

www.pathagar.com

নোট: আকসি (আকজাহ) অটোমানদের ব্যবহৃত একটি রৌপ্য মুদ্রা। এতে রৌপ্যের বিভিন্ন পরিমান ও এর বিনিময় হারের জন্য দেখুন, সেভকেত পামুক'র 'ইনালকিক', ১৯৯৪, এপেন্ডিক্স, পৃ: ৯৪৭-৮০।

গণবিচ্ছিন্ন ও জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ স্বৈর-শাসকগণের নিকট থেকে কর হ্রাস বা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমানো আশা করা বাতুলতা মাত্র। এ কারনে ব্যয়ের উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের সম্পদ ভীষনভাবে নি:শেষিত হয়ে গিয়েছিল এবং বাজেট ভারসাম্যহীনতা বেড়ে গিয়েছিল। ১০০৬/১৫৯৭ সালে বাজেট ঘাটতি ছিল মোট ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ (সারণী-২)। এটি সম্ভবত: হাবসবার্গদের সাথে প্রলম্বিত যুদ্ধের (১৫৯৩-১৬০৬) কারনে ঘটেছিল, যে বছর যুদ্ধের ব্যয় সর্বোচ্চ অংকে পৌঁছেছিল। তবে, ১০৬০/১৬৫০ সালে এ অংক মোট ব্যয় ৬৮৭.২ মিলিয়ন আকসের ২২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

সারণী-২

অটোমান সাম্রাজ্য
সরকারী আয়, ব্যয় ও বাজেট ঘাটতি
(মিলিয়ন আকসে)

বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি (-)	মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি
৯৭২/১৫৬৪	১৮৩.০	১৮৯.৬	+৬.৬	+৩.৫
১০০০/১৫৯১	২৯৩.৪	৩৬৩.৪	-৭০.০	-১৯.৩
১০০৬/১৫৯৭	৩০০.০	৯০০.০	-৬০০.০	-৬৬.৭
১০৫৮/১৬৪৮	৩৬১.৮	৫০০.৫	-১৩৮.৭	-২৭.৭
১০৬০/১৬৫০	৫৩২.৯	৬৮৭.২	-১৫৪.৩	-২২.৫

তথ্যসূত্র: রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের অংক লুইস কর্তৃক হাজী খলিফা'র গ্রন্থ 'দাস্তুর আল-আমাল লি ইসলাহ আল-খালাল' থেকে উদ্ধৃত, লুইস, ১৯৬২, পৃ: ৮১, তুলনা করুন ওগলি, ১৯৮৯, পৃ: ৬২৫, ও ইনালকিক, ১৯৯৪, পৃ: ৯৯।

নোট: রাজস্ব আয়ের মধ্য 'তিমার' রাজস্ব ধরা হয় নি (এর জন্য পরবর্তি অংশ দেখুন)।

www.pathagar.com

অটোমান শাসনের আগে ও পরের বস্তুত: সকল পন্ডিতগণই জরুরী অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট ঘাটতিকে অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন বিবেচনায় এ সকল বাজেট ঘাটতিকে অতি মাত্রায় বড় অংকের ছিল। কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্য ইচ্ছা করেই হোক বা পরিস্থিতির কারনেই হোক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হতো এবং সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। সুতরাং, অটোমান শাসকদের মোট ব্যয়ের সিংহ ভাগ ছিল যুদ্ধের ব্যয়।[৫৪] এ বিষয়ে অটোমান সাম্রাজ্য যদিও অনন্য ছিল না এবং ইউরোপের সর্বত্র এ রকম আরো অনেক দেশ ছিল, দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত যুদ্ধ ব্যয় শিক্ষা, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে এর অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল, যা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে জনগণের চাপের মুখে এত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে চাওয়া সম্ভব ছিল না। শাসকগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি পুরণ করার জন্যে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এ সকল পদক্ষেপগুলোর অধিকাংশই ন্যায়বিচারের ও সমৃদ্ধির পরিপন্থী ছিল, যে ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি ইতিপূর্বেকার ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা হয়েছিল।

ভূ- সম্পত্তি অনুদান প্রথা (ইকতা ও তিমার্স)

উন্নয়ন সংক্রান্তে অন্যতম একটি ক্ষতিকারক পদক্ষেপ ছিল অধিকৃত এলাকায় জমির ফসল ভাগা-ভাগির নীতি থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসা। মহানবী ও প্রথম চার খলিফার রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তের বরখেলাপ করে উমাইয়গণ শাসক পরিবারের সদস্য ও তাদের সমর্থকগণকে বড় বড় ভূমি অনুদান হিসেবে প্রদান করতো। বিদ্যমান অবিচার ও নৈতিক অবক্ষয়[৫৫] দূর করার অঙ্গিকার করে ক্ষমতায় আসলেও আব্বাসীয়রা প্রথম দিকের অতি সংক্ষিপ্ত কিছু সময় ব্যতীত সেই অঙ্গিকার রক্ষা করে নি। তারাও বিলাসী জীবন যাপনে লিপ্ত হলো এবং উমাইয়াগণকে তারা যে নীতির কারনে অপবাদ দিয়েছিল তারাও সেই একই নীতি অনুসরন করা শুরু করলো, বিশেষত: বিরাট বিরাট ভূ-সম্পত্তি অনুদানের নীতি। ভূ-সম্পত্তির অনুদান প্রথা ফাতেমীয় (২৯৭-৫৬৭/ ৯০৯-১১৭১), বুয়েহিদ (৩৩৪-৪৪৭/ ৯৪৫-১০৫৫), সালযুকিদ (৪৪৭-৫৯০/ ১০৫৫-১১৯৪), এবং অটোমানদের (৬৯৯-১৩৪২/ ১২৯৯-১৯২৪) আমলে আরো বৃদ্ধি পেল যতক্ষণ পর্যন্ত না ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এটি প্রায় একটি সামন্তীয় প্রথায় পরিণত হলো। পার্থক্য ছিল যে, সামন্ত প্রথার অধীনে একজন সামন্ত

---

[৫৪] Faroghi, 1994, p. 542

[৫৫] Al-Tabari, Tarikh, 1979, Vol. 9. Pp. 125-7- এ উল্লিখিত আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু আল- আব্বাস কর্তৃক মসজিদে তার প্রতি জনগণের আনুগত্যের জবাবে প্রদত্ত ভাষণ দেখুন।

www.pathagar.com

প্রভু বাধ্যতামূলকভাবে রাজাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করতে হতো, মুসলিম বিশ্বে রাজাকে এরুপ কোন সামরিক সাহায্য প্রদান করতে হতো না।

৬৫৬/১২৫৮ সালে কল্যাণ বা ইলখানিদদের বিজয় চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছিল।[৫৬] ৬৯৪/১২৯৫ সালে ঘাজন খানের ক্ষমতা গ্রহণের পুর্বে বিধর্মী কল্যাণদের শাসনের প্রথম ত্রিশ বছর অত্যোধিক নিষ্ঠুরতা ও শোষন চলছিল।[৫৭] অনেক শহর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, হাজার অধিবাসীকে হত্যা করা হয়েছিল, নারীদেরকে ধর্ষন করা হয়েছিল ও গ্রন্থাগারসূহ ধ্বংস করা হয়েছিল। "১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর ইবনে নাদিমের 'ফিহরিষ্ট'-এ বর্ণিত এক হাজার বইয়ের একটিও অবশিষ্ট ছিল না"।[৫৮] কল্যাণরা বিশাল বিশাল জমি স্থানীয়দের থেকে নিয়ে তাদের নিজস্ব লোকদেরকে প্রদান করলো, এবং বুয়েহিদ ও সালযুকিদ কর্তৃক জনগণের উপর ইতোপুর্বে ধার্যকৃত করের উপর আরো করের বোঝা চাপিয়ে দিল।

এর ফলে বহু কৃষক তাদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো এবং এভাবে বেদুইনদের জনসংখ্যা প্রচুর পরিমানে বেড়ে গেল।[৫৯] মাটির নীচের সেচ লাইনগুলো সংরক্ষণ না করার ফলে তারা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কৃষি খাত সংকুচিত হয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লো এবং গ্রামীণ অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণদের আগমনের পুর্বে বিরাজমান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সম্ভবত: আর কখনও পুরো-পুরি পুন:রুজ্জীবিত হয় নি।[৬০] কল্যাণদের আদর্শ ছিল "যুদ্ধ ও সামরিক কলা-কৌশল শিক্ষা অথচ তারা যে সমাজ দখল করেছিল তার আদর্শ ছিল স্থিতিশীলতা ও শান্তি"।[৬১]

কল্যাণদের অমিতব্যয়িতার ফলে বলপুর্বক করাদায় সত্বেও আর্থিক সংকট দেখা দিল। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইলখানিদ বংশের পঞ্চম শাসক গেইখাতু (৬৯০-৪/১২৯১-৫) কাগজের মুদ্রা চালু করার চেষ্টা করলো, যা জনগণ গ্রহণ করতে চাইলো না। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ভেঙ্গে পড়লো, এবং এর ফলে অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল।[৬২] যদিও ইলখানিদ বংশের

[৫৬] ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন ঘটেছিল।

[৫৭] দেখুন, Morgan, 1993, pp. 230-5

[৫৮] Sarton, 1927, Vol. 1, p. 662

[৫৯] Lambton, 1981, pp. 298, 300.

[৬০] Hodgson, 1977, Vol. 2, p. 8.

[৬১] Lambton, 1981, p. 299.

[৬২] Spuler and Ettinghausen, 1986, p. 1121.

www.pathagar.com

সপ্তম শাসক ঘাজন খান (৬৯৪-৭০৩/১২৯৫-১৩০৪) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ও অনেকগুলো সংস্কার চালু করেছিল, ইকন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয় নি। তিনি নিজের লোকদের স্বভাব পাল্টাতে পারেন নি, এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে কল্যাণ শাসনের যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারেন নি। কল্যাণদের দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের সাথে যুক্ত হয়েছিল তিমুরিদ-দের (৭৩৭-৮০৭/১৩৩৬-১৪০৫) ধ্বংসযজ্ঞ। তিমুরের হাতে বাগদাদের পতন ঘটেছিল ৮০৩/১৪০১ সালে এবং অন্যান্য মুসলিম এলাকার পতন ঘটেছিল তিন দশক ধরে ৮০৭/১৪০৫ সালে তার মৃত্যুর পূর্বে, যার ফলে ইতোমধ্যে ঘুনে ধরা অর্থনীতিকে এমন মারাত্মক আঘাত করা হলো যে অর্থনীতিকে সেখান থেকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সাফাভিদগণের ইরাক দখল কিছুটা স্বস্থি দিয়েছিল, যদিও যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু নয়, কারণ অন্য জায়গার মত এখানেও তাদের শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা।

কল্যাণদের দখলদারিত্বের পর মুসলিম বিশ্ব ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়, অনৈক্য দেখা দেয় ও ৯২৩/১৫১৭ সালে পুণরায় একত্রিত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত সে অবস্থা চলতে থাকে। ফাতেমীয় (২৯৭-৫৬৭/৯০৯-১১৭১), আইয়ুবীয় (৫৬৪-৬৪৭/১১৬৯-১২৫০), মামলুক[৬৩] (৬৪৮-৯২২/১২৫০-১৫১৭) ও অটোমানগণও (৬৯৯-১৩৪২/১২৯৯-১৯২৪) মঙ্গলীয় ও তিমুরীয়গণের চেয়ে তুলনামুলকভাবে দয়ালু শাসক ছিল। তথাপিও তারা আগের শতাব্দিসমুহে রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তসমুহ থেকে অনেক অনেক দুরে ছিল। যদিও কৃষি ক্ষেত্রে কিছুটা পুণ:রুজ্জীবন ঘটেছিল, তবে আগের উন্নয়নের ধারা পুণ:রুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ধাক্কাটি প্রদান করা সম্ভব হয় নি; বিশেষভাবে এ কারনে যে নিজেদের মধ্যে, সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে, জেনারেল ও সৈনিকদের মধ্যে অধিকৃত জমি মজুরী হিসেবে প্রদান করা অব্যাহত ছিল।[৬৪] যদিও ভূমি কর আদায় ও সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করার খরচ ও ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রথম দিকে এগুলো বেতনের বদলে প্রদান করা হয়েছিল, তবুও এগুলোর অনেক অপব্যবহার হয়েছিল এবং কৃষি উৎপাদন ব্যহত করেছিল, যা পরবর্তি অংশে দেখা যাবে।

---

[৬৩] ফাতেমীয়রা উত্তর আফ্রিকা ও মিসর শাসন করেছিল, আইয়ুবীয়রা মিসর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন শাসন করেছিল, এবং মামলুকরা মিসর শাসন করেছিল।

[৬৪] Hitti, 1958, pp. 329-30; আরো দেখুন, Rabie, 1970, pp. 129-38 । al-Maqrizi-এর মতে, "সালাউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব থেকে আজ পর্যন্ত মিসরের সকল ভূমি সুলতান, তার কর্মচারী ও সৈনিকদেরকে ভূমি অনুদান হিসেবে প্রদান করা হতো" (al-Maqrizi, al-Khitat, Vol. 1, p. 97)।

www.pathagar.com

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে অটোমানদের হাতে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত প্রায় সকল এলাকাসমূহ সামরিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ভূমি অনুদান হিসেবে বন্টন করা হয়েছিল। প্রথম দিকে এ সকল ভূমি অনুদান অধিকারীদের নিকট আমানত হিসেবে বিবেচিত হতো। সে গুলো হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। চাকুরীতে বহাল থাকার শর্তে সেগুলো অব্যাহত থাকতো এবং অবসরে গেলে সেগুলো বাতিল বা প্রতিস্থাপনযোগ্য হতো।[৬৮] তবে, অটোমান যুগের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূমি অনুদানগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করলো। অধিকাংশ অধিকৃত এলাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হলো যেগুলোর কর সরাসরি তাদের অধিকারীর হাতে চলে যেত, ফলে রাষ্ট্র রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতো এবং আরো বঞ্চিত হতো সামরিক সহায়তা থেকে যা ছিল মুলত: ভূমি অনুদানের একটি শর্ত। সামন্তবাদের এ পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে কয়েক শতাব্দি লেগেছিল। কিন্তু, তা হয়ে গেল বিশেষ করে যখন পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো মুসলিম দেশসমূহ দখল করে নেওয়ার পর যখন তারা বিশাল বিশাল ভূমি সেই সকল ব্যক্তিগণকে দিয়ে দিল যারা তাদেরেক (পাশ্চাত্য) ও তাদের দখলদারিত্ব পাকা-পোক্ত করতে সহায়তা করতো। মুসলিম দেশসমূহের কৃষিজমির এক বিরাট অংশের মালিক সেই ভূ-স্বামীগণ যারা উৎপাদনের এক বিরাট অংশ নিজেদের জন্যে রেখে দিত, এবং কৃষকদের জন্যে রাখতো অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। তারা কদাচিত কোন কর প্রদান করতো। কিন্তু প্রচুর রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতো।

অন্যায্য করব্যবস্থা

ভূমি অনুদানের মাধ্যমে সৃষ্ট বিরাট বিরাট জোত বড় কোন ক্ষতি সাধন করতে পারতো না যদি কর ব্যবস্থা মানবিক হতো। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, যা জ্যেষ্ঠত্যের উত্তরাধিকারের বিধান মানেনা এবং মৃতের সম্পত্তি সকল নারী ও পুরুষ উত্তরাধিকারের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিলি-বন্টনের বিধান করেছে, জমি উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে ফেলতো এবং খুব দ্রুত জমিদার পরিবারকে দুর্বল করে ফেলতো। তাছাড়া, অটোমান যুগ পর্যন্ত কম সংখ্যক শাসক বংশই সুপ্রতিষ্ঠিত একনায়কত্ব ধরে রাখার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে টিকেছিল। অধিকাংশ শাসক বংশই অভ্যন্তরীন কোন্দল বা বিদেশী আক্রমনের করনে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, যার ফলে বিদ্যমান অভিজাততন্ত্র ও ক্ষমতা কাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ কারনে, ভূমি অনুদান প্রথা সত্বেও অটোমান এলাকায়, বিশেষ করে আরব প্রদেশসমূহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব ছিল,

---

[৬৮] Cahen, 1986, p. 1090.

www.pathagar.com

এবং অটোমান যুগ শেষ হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত বড় বড় জোত খুব বেশী দেখা যায় নি।[৬৬] বড় বড় জোত নয়, ছোট ছোট জোতসমুহই পুরো অটোমান যুগ ধরে বাজারে সরবরাহ করার মত অতিরিক্ত উৎপাদন করতো।[৬৭]

যে কারনে ভূমি অনুদান প্রথা অব্যাহত সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা ছিল কৃষকদের উপর ক্রমবর্ধমান করের বোঝা। যেহেতু শাসক পরিবারগুলো ও তাদের অনুসারীরা কদাচিৎ কর পরিশোধ করতো, করের একটি বড় অংশ পরিশোধ করতে হতো কৃষকদেরকে, যারা ছিল মুসলিম সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ ও যারা মুলত: ভূমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপরই জীবিকা নির্বাহ করতো। বুয়েহিদ ও সালযুকিদ যুগে খামার-কর প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের এ দুর্গতি শুরু হয়েছিল। গভর্ণর ও জেনারেলগণকে কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হলো, কারণ তারা তাদের ক্ষমতাবলে আনুগত্য নিশ্চিত করতে পারতো ও রাষ্ট্রকে নির্ধারিত অংকের কর বার্ষিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে পরিশোধ করতে বাধ্য করতে পারতো। এ পদ্ধতির অনেক অপব্যবহার হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কর আদায়কারীগণ রাষ্ট্রকে যা পরিশোধ করতো তার চেয়ে বেশী অর্থ আদায় করতো, অবশিষ্ট অংশ নিজেরা রেখে দিত।[৬৮] এ পদ্ধতি আরো খারাপ হয়ে যায় ইলখান-দের সময়ে, যারা তাদের শাসনের শুরুতে বিদ্যমান করগুলোই আদায় করে নি, আরো অনেক করও সেগুলোর সাথে যোগ করেছিল।

মধ্য-নবম/পঞ্চদশ শতকে অটোমান যুগ পর্যন্ত আইয়ুবীয় (৫৬৪-৬৪৭/১১৬৯-১২৫০), মামলুক (৬৪৮-৯২২/১২৫০-১৫১৭), অটোমান (৬৯৯ ১৩৪২/১২৯৯- ১৯২৪) ও অন্যান্য শাসক বংশের বহু শাসকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রণীত সংস্কারের ফলে কর ব্যবস্থাকে তুলনামুলকভাবে আরো দয়ালু ও সহনীয় করে তুলেছিল। তবে, বিজয়ী

---

[৬৬] Quataert, 1994, p. 861.

[৬৭] Inalcik, 1994, p. 5.

[৬৮] কর আদায়ের দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষদেরকে প্রদান করার পদ্ধতিকে (tax farming) ফিকহ শাস্ত্রে *কাবালাহ* বলা হয়, যা অধিকাংশ ফিকহ বিশেষজ্ঞ অনুমোদন করেন নি, কারন এর ফলে নির্যাতন, অবিচার বৃদ্ধি পায় ও যা কৃষকের জন্যে ক্ষতিকর হয় (Al-Masuah al-Fiqhiyyah, Vol. 32, p. 243; Abu Yusu, al-Kharaj, 1352 AH, p. 105; Abu Ubayd, al-Amwal, 1968, pp. 99-100; al-Mawardi, al-Ahkam, 1960, p. 176)। Tax farming-এর আওতায় কৃষকদের নিকট থেকে আদায়কৃত কর ও সরকারকে প্রদত্ত অংকের মধ্যকার পার্থক্যকে ইবনে আব্বাস হারাম মর্মে আখ্যায়িত করেছেন, এবং উমর একে রিবা'র সমার্থক বলেছেন (Abu Ubayd, al-Amwal, p. 100; al-Mawardi, al-Ahkam, p. 176; and Ibn al-Athir (d. 606/1210), al-Nihayah, 1963, Vol. 4, p. 10)। আরো দেখুন, *কাবালাহ, ইবনে আল-মানজুর, লিসান,* ১১ খন্ড, পৃ: ৫৪৪; ও আবু আল-ফজল, ১৯৯২।

www.pathagar.com

মেহমুদ, মহান সুলেমান ও আন্যান্যদের সামরিক অভিযানের ফলে প্রয়োজনীয় যুদ্ধের খরচ বেড়ে গেলে কর ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আরো অসহনীয় যায়, যার ফলে আবু ইউসুফ, আল-মাওয়ার্দি, ইবনে খালদুন ও "মিররস ফর প্রিন্সেস"-'র উপর লিখিত অনেক বইয়ের লেখকগণ কর্তৃক গুরুত্বারোপকৃত 'কর ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের নীতি' থেকে কর ব্যবস্থা বহুদুরে সরে যায়।[৬৯] দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, ভমি অনুদান গ্রহীতাগণ কৃষকদের নিকট থেকে উৎপাদিত ফসলের বিরাট এক অংশ কর হিসেবে আদায় করলেও, তারা কদাচিত সরকারকে কোন কর প্রদান করতো, অথচ এ প্রথা মুলত: সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্যেই চালু করা হয়েছিল। অতএব, কৃষি যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও কমে গিয়েছিল।

কৃষকদের উপর নির্যাতনমুলক করারোপ ছাড়াও আরো অনেক প্রকার কর ধার্য করা হয়েছিল যা ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও ব্যবসায়ীদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে আরো ভূমিকা রেখেছিল। এগুলো ছিল *মুকুস* (এক বচনে *ম্যাকস*)[৭০]। *ম্যাকস*-এর বিরুদ্ধে আবু ওবায়েদ ছ'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন,[৭১] এবং ফিকহ্ বিশেষজ্ঞগণ অবিরাম এগুলো বাতিল করার জন্যে বলে গেছেন। জালাল আল-দ্বীন আল-সুয়ুতি (মৃত্যু ৯১১/১৫০৫) *ম্যাকস* এর নিন্দা জানিয়ে 'রিসালাহ্ ফি ধাম আল-মাকস্' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। তথাপিও *ম্যাকস* বাড়তেই থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না মামলুকদের সময়ে করের আওতা বহির্ভূত আর কোন কিছুই ছিল না। সালাহ্ উদ্দিন আল-আইয়ুবীসহ (মৃত্যু ৫৮৯/১১৯৩) অনেক শাসক এগুলোর অনেকগুলোই বাতিল করে কর ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন।[৭২] তবে, বিভিন্ন সরকারের বাজেট সমস্যার কারনে শেষ পর্যন্ত এ সকল কর পুণ: বহাল কর হয়।[৭৩]

---

[৬৯] "Mirror for Princes"-এর উপর Ibn al-Muqaffa(d. 139/756), al-Numan (d. 363/974), al-Mawardi (d. 450/1058), al-Khatib (d. 463/1071), Kai Kaus (d. after 475/1082), Nizam al-Mulk (d. 485/1092), al-Ghazali (d. 505/1111), al-Turtushi (d. 520/1126) -দের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যে দেখুন, Essid, 1995, pp. 19-41।

[৭০] *মুকুস* বলতে সকল প্রকার বিক্রয় কর ও আবগারী কর বা শুল্ককে বোঝায় (Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, 1968, p. 703-এ সম্পাদকের মন্তব্য দেখুন, আরো দেখুন, maks in Lisan)।

[৭১] Abu-Obayd, 1968, pp. 703-4, হাদিস নম্বর ১৬২৪-৯।

[৭২] সালাহ্ উদ্দিন কর্তৃক বাতিলকৃত *মুকুস*-এর একটি দীর্ঘ তালিকা আল-মাকরিজি প্রদান করেছেন (Khitat, Vol. 1, pp. 104-5)। তবে, তার পুত্র আল-আজিজ উসমান (মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮) সেগুলো কেবল পুন: বহালই করেনি, আরো বর্ধিতও করেছিল (প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫)।

[৭৩] এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিষয় Bj orkman, 1991, pp. 195-6 থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে আমরা সরকারের সার্বিক করারোপ সম্পর্কে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে উলেমাগণের বিরুদ্ধাচরনের আর্থ-সামাজিক কারণ জানতে পারি। তাদের আশংকার কারণ হচ্ছে যে, যদি সরকারকে কর আরোপ করতে দেওয়া হয় তাহলে সরকার কর্তৃক সীমা অতিক্রম ও অন্যায্য আচরণ করার প্রবনতা দেখা যায়। এর ফলে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিৎ নয় যে, ফিকহ'র অনেকগুলো মতামত তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির ফলাফল। করারোপের বিরুদ্ধে তাদের কড়া অবস্থান ছিল অবৈধ সরকারের প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কীভাবে কর আদায় করা হবে এবং কীভাবে তাদের সম্পদ ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে অবৈধ সরকারের জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা ছিল না। সে যাহাই হোক, গণতান্ত্রিক পরিবেশে সরকারের করারোপ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব বিধায় ফিকহ শাস্ত্রের একই মতামত ধরে বসে থাকার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।

এরুপ ব্যাখ্যা-বিশ্লষণের উপর কেহ এই বলে আপত্তি তুলতে পারেন যে, বর্তমান কালে অনেক কল্যান রাষ্ট্রে যে ভাবে উচ্চ হারে কর আরোপ করা হয়ে থাকে তার তুলনায় সে সময়ের করের হার সম্ভবত: এত বেশী ছিল না। এটি হয়ত: সত্য। তবে, এ সকল কর মুলত: কৃষক, ক্ষুদ্র কারিগর ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায় করা হতো, অন্য দিকে, প্রভাবশালী লোকজন আদৌ কোন কর পরিশোধ করতো না। সুতরাং, যারা কর পরিশোধ করতো তাদের বোঝা অসহনীয় ছিল। আরো দুর্ভাগ্যজনক হলো, কর দাতারা বিনিময়ে আদৌ কোন সুবিধা পেতেন না। কর বাবত প্রাপ্ত আয় শিক্ষা, অবকাঠামোগত সুবিধা ও উৎপাদন ব্যয়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা হতো না, বরং রাজকীয় সভাসদের বিলাস বাসন ও ব্যয় বহুল সামরিক সরঞ্জামের পেছনে ব্যয় করা হতো। যদি সবাই কর দিত ও কর বাবত আয় জনগণের উন্নয়ন ও কল্যানের জন্য ব্যয় করা হতো, তা হলে বিরোধিতা এত শক্তিশালী হতো না।

মুদ্রার অবমুল্যায়ন

বাজেট ভারসাম্যহীনতার কারনে মুদ্রার অবমুল্যায়ন ঘটাতে হলো। তৎকালীন ধাতব মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের যুগে দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ছিল ইসলামের সরকারী মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তি। তাছাড়া, ছোট-খাট বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন আকৃতির ও ওজনের ফালুস (তাম্র মুদ্রা) বাজারে ছাড়া হতো। মুদ্রার ঐক্য বজায় রাখা ও জনগণের স্বার্থে হারুন আল-রশীদের আমলে মুদ্রা পরিদর্শকের দপ্তর চালু করা হয়েছিল, এবং মুদ্রার সকল একক পরিদর্শনের আওতাধীন ছিল। পরিণতিতে, ওজন, নিপুনতা ও চেহারা বিবেচনায় প্রাচীন দিনারের মান ছিল অনেক বেশী।

www.pathagar.com

আব্বাসীয়দের প্রশাসনিক ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করলে এ অফিসের কার্য-ক্ষমতাও কমে যায়।[৭৪] তথাপিও, চতুর্থ/ দশম শতাব্দি পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে দিনারের মান অব্যাহত ছিল।[৭৫] এমনকি পরবর্তি শাসক বংশের সময়েও এর মান উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের সময়ের মানের তুলনায় সামান্যই কমেছিল। আইয়ুবীয় আমলে (১১৬৯-১২৫০) সালাহ্ উদ্দিনের ভাতিজা আল-কামিল (মৃত্যু ৬৩৫/ ১২৩৮) কর্তৃক দিনার ইস্যু করা সর্ম্পকে ৬২৫/ ১২২৮ সালের দিকে লিখতে গিয়ে ইবনে বা'রা বলেন, "আমীর আল-কামিলীর দিনারের মত মান সম্পন্ন দিনার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আর কোথাও ছিল না"।[৭৬]

আগের আমলে দিরহামের ওজনও মনে হচ্ছে স্থিতিশীল ছিল। ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিমাপের দিরহাম মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছিল। তবে, রৌপ্যের মুল্য ওঠা-সামা করার ফলে দিনার ও দিরহামের বিনিময় হারও ওঠা-নামা করলো। মহানবীর (স:) সময়ে দু'টো মুদ্রার অনুপাত ছিল দশ, এবং প্রথম চার খলিফার আমল (১১-৪১/ ৬৩২-৬৬১) পর্যন্ত সাধারণভাবে সে পর্যায়েই স্থিতিশীল ছিল মর্মে প্রতীয়মান।[৭৭] তবে, এরুপ স্থিতিশীলতা টিকে থাকতে পারে নি। দু'টো ধাতুই সরবরাহ ও চাহিদার বিভিন্ন শর্তের মুখো-মুখি হয়েছিল, যার ফলে তাদের পারস্পরিক মুল্যকে অস্থিতিশীল করে তোলে। উদাহরণত: উমাইয়া যুগের দ্বিতীয়ার্ধে (৪১-১৩২/ ৬৬১-৭৫০) অনুপাত ছিল ১২, অপর দিকে, আব্বাসীয় আমলে তা ১৫ বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল।[৭৮] অনুপাত ওঠা-নামা করেছিল, এবং মাঝে মাঝে তা ২০, ৩০, এমন কি ৫০-এ নেমেছিল।[৭৯] অবমুল্যায়নের ফলে এরুপ ঘটে নি, বরং স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মুল্য কমে যাওয়ায় এরুপ হয়েছিল। আল-মাকরিজির ও তার সমসাময়িক আল-আসাদির (মৃত্যু ৮৫৪/ ১৪৫০) মতে, এরুপ অস্থিতিশীলতার কারনে খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল,[৮০] যে ঘটনাকে ষোড়শ শতাব্দিতে গ্রেসামের সূত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। রাশিয়া, ইউরোপ ও দুর-প্রাচ্যে প্রচুর পরিমানে আরব দেশের মুদ্রা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সে সময়ে মুসলিম

---

[৭৪] Ehrencreutz, 1991, p. 117.

[৭৫] Miles, 1992, p. 297.

[৭৬] Miles কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৯১, পৃ: ২৯৮। ইবনে বা'রা লিখেছিলেন ৬১৫/ ১২১৮ থেকে ৬৩৫/ ১২৩৮ সময় কালে।

[৭৭] Al-Rayyis, 1961, p. 369; al-Qaradawi, 1969, p. 264.

[৭৮] Al-Rayyis, 1961, p. 374; al-Qaradawi, 1969, Vol. 1, p. 264; Miles, 1992, p. 320.

[৭৯] Al-Qaradawi, 1969, Vol. 1, p. 264; Miles, 1992, p. 320.

[৮০] Al-Misri, 1990, pp. 54 and 66.

www.pathagar.com

এলাকা ও অবশিষ্ট পরিচিত জগতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে আরব দেশীয় মুদ্রার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ভালভাবেই প্রমানিত হয়েছে।[৮১]

আধুনিক যুগে আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত কাগুজে মুদ্রা ছাপানোর প্রবণতা দেখা যায়। ৬৯৩/১২৯৪ সালে মঙ্গলীয়রাও কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, সে প্রচেষ্টায় জনগণ ভীষনভাবে বাধা প্রদান করেছিল, যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য তাৎক্ষণিক ও ব্যপক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল।[৮২] এরূপ অভিজ্ঞতার কারনেই সম্ভবত: ফিকহ্-শাস্ত্রবিদগণ কাগুজে মুদ্রার বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরবর্তিতে সরকার আর তা প্রচলন করে নি। তবে, সরকারগুলো মুদ্রা ছাপানোর অধিকারকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে তাদের ক্রমবর্ধমান আয় ও ব্যয়ের ফারাক কমানোর জন্যে গোপনে মুদ্রার অবমুল্যায়ন ঘটিয়ে অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণের সুযোগ হাত-ছাড়া করে নি। পরিণতিতে, ফিকহ্-শাস্ত্রবিদগণের বিরোধিতা সত্বেও মুদ্রার ওজন ও বিশুদ্ধতায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। বুর্জি (সার্কাসিয়) মামলুক (৭৮৪-৯২২/১৩৮২-১৫১৭) ও অটোমান (৬৯৯-১৩৪২/১২৯৯-১৯২৪) যুগে এটা বিশেষভাবে ঘটেছিল। ইউরোপে রৌপ্যের মওজুত গড়ে তোলার ফলে মামলুক যুগে রৌপ্য মুদ্রার স্থলে তাম্র মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল।[৮৩] তবে, অন্যায্য কর ব্যবস্থার কারনে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে সরকার বাজেট সমস্যায় পড়লে প্রচুর পরিমান তাম্র মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়। এর ফলে, মুদ্রার মুল্য হ্রাস পেল, মুদ্রা-স্ফীতি ঘটলো এবং উন্নয়ন আরো কমে গেল।[৮৪] অটোমান যুগেও 'আকসি' নামের সরকারী রৌপ্য মুদ্রার কয়েকবার অবমুল্যায়ন ঘটানো হয়।[৮৫] এ কারনে ও রৌপ্যের মুল্য কমে যাওয়ার কারনে রৌপ্য মুদ্রার মুল্য এত পরিমান কমে গেল যে, তাঞ্জিমাত যুগে (১৮৩৯-৭৬) মুদ্রার একক হিসেবে এটির প্রচলন বন্ধ করে দিতে হলো।

যেহেতু, সকল প্রকার মুল্যবোধে সততা ও নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ সম্পর্কে শরীয়া'র বিধানসমুহের সম্পূর্ণ লংঘনের মাধ্যমে মুদ্রার অবমুল্যায়ন

---

[৮১] দেখুন, Miles, 1991, p. 320; Kramer, 1952, p. 100.

[৮২] Spuler and Ettinghausen, 1986, p. 1122.

[৮৩] ইবনে খালদুনের সময় দেশে অর্থনৈতিক সংকট বিরাজমান ছিল বিধায় সমাজের উপর মুদ্রার অবমুল্যায়নের প্রভাব তাঁর *মুকাদ্দিমা'য়* বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল (পৃ: ২৬১-৪)।

[৮৪] Al-Maqrizi, Ighathah, 1956, pp. 14-15, 32-8; al-Saluk, 1971, Vol. 3, pp. 1130-4; আরো দেখুন, Allouche, 1994, pp. 16-17।

[৮৫] কেবল মাত্র মামলুক ও অটোমানগণই মুদ্রার অবমুল্যায়ন করতো না। অন্যান্য স্থানেও মুদ্রার অবমুল্যায়ন করা হতো। পঞ্চদশ থেকে অষ্টদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে মুদ্রার অবমুল্যায়নের হারের জন্য দেখুন, Brandel and Spooner, 1967, Figure 4, p. 458।

www.pathagar.com

ঘটানো হয়েছিল, সেহেতু, চতুর্দশ শতক ও ততপরবর্তিকালে মুদ্রা প্রচলনে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার ঘটনার ফলে মুদ্রা তত্ত্ব ও মুদ্রা নীতির উপর অনেক লেখা-লেখি হয়েছিল। বেকের মতে, মুসলমানগণকে "চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দিতে মুদ্রার অবমুল্যায়ন সংক্রান্ত রচনার পথিকৃত ও একই বিষয়ে সমালোচনামুলক রচনার উদ্ভাবক রুপে বিবেচনা করা যেতে পারে"।[৮৬]

বৈদেশিক ঋণ

করের বোঝা চাপিয়ে ও মুদ্রার অবমুল্যায়ন করেও যখন দুর্নীতিবাজ শাসকদের অমিতব্যয়ী পথ চলার সুযোগ হলো না, তখন তারা ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে চাইলো। ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে প্রতি বছরই অটোমান সাম্রাজ্যকে গ্রহণ ঋণ করতে হয়েছিল, যার অংক দাঁড়িয়েছিল ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এ, পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতার অবমুল্যায়ন সমন্বয় করলেও যা বর্তমানে ৬৫৪১ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশী হবে।[৮৭] আর্থিক সংকটের কারনে সে সময় তুরস্ককে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা হতো বিধায় তখন ঋণ দেওয়া হতো তুলনামুলক কঠিন শর্তে। দুর্ভাগ্যবশত: ঋণের অর্থ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হতো না, অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হতো, যা এখনও অনেক মুসলিম রাষ্ট্র করা হয়ে থাকে। এর ফলে ১৮৭৫ সালের ৬ অক্টোবর সরকার সুদ ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে খেলাপী হয়।

পরিণতিতে, পাওনাদারগণ কর্তৃক সুদসহ ঋণ আদায়ের জন্যে একটি 'ঋণ পরিষদ' গঠন করা হয়। এ কাউন্সিলের স্টাফ সংখ্যা ছিল ৮৯৩ জন, যা কিনা অটোমান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্টাফ সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল। পরিষদ একটি অত্যন্ত শক্তিধর প্রতিষ্ঠানে পরিনত হলো, যার সুদুরপ্রসারি প্রভাব ছিল অটোমান রাজ্যের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর। এর থেকে প্রতীয়মান যে কীভাবে অতিরিক্ত, বিশেষত: অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করলে সরকারকে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা হারাতে হয়। বৈদেশিক সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তখন দেশের সব কিছুর উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সরকারকে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম করে ফেলে। ইনালকিক যেমন যথার্থই

---

[৮৬] Baeck, 1994, p. 114.

[৮৭] অসমন্বয়কৃত ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের মুল অংকটি নেয়া হয়েছে Lewis, 1991, p. 677 থেকে। সমন্বয়কৃত অংকটি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের খুচরা বাজার মুল্য সূচী ছিল ১৮৭৪ সালে ২০৪.৮ এবং ১৯৯৪ সালে ৬৬৯৮.১ (১৬৯৪=১০০)।

www.pathagar.com

বলিছেলন: "নেতারা সম্ভবত: বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, বৈদেশিক শক্তির নিকট অর্থনৈতিক ও আর্থিক অধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয়ের হুমকীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়"।[৮৮]

দুর্নীতি ও রাজনৈতিক পদপদবী বিক্রয় -

দুর্নীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের একটি দুরারোগ্য ব্যাধি. . . সাবধান, দুর্নীতি হতে সাবধান, হায় খোদা! এর থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

(লুৎফি পাশা)[৮৯]

দীর্ঘ দিন যাবত অটোমান সাম্রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনকে ইউরোপের সেরা হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[৯০] প্রধান উজির নিয়োগ দেওয়া হতো যোগ্যতার ভিত্তিতে। একবার নিয়োগ দেওয়া হলে তার মেয়াদ কেবল মাত্র স্থায়ীই ছিল না, তিনি সকল প্রকার অবৈধ প্রভাব ও চাপ মুক্ত ছিলেন এবং গুরুতর কর্তব্য অবহেলা ব্যতীত তাকে পদ থেকে সরানো যেত না।[৯১] সে যাহাই হোক, ষোড়শ শতকে যখন সুলতান তার নিজের পছন্দের ব্যক্তিগণকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া শুরু করলেন তখন থেকে দক্ষতা কমে যেতে লাগলো। পরিণতিতে, প্রধান উজির রাজ প্রাসাদের সকল অমাত্যবর্গের হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে থাকলেন, এবং স্বল্প নোটিসে যে কোন সময় কেবল মাত্র বরখাস্তই করা হতো না, তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হতো ও এমনিক মৃত্যুদন্ডও দেওয়া হতো। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের মনোবল ও দক্ষতার উপর এর একটি বিরুপ প্রভাব পড়েছিল।

কোন সমাজই তার উন্নয়নের গতিধারা অব্যহত রাখতে পারে না যদি সরকারের মান কমে যায়। সুতরাং, ক্ষমতাসীনদের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর উপর ইবনে খালদুন তার মডেলে গুরুত্ব দিয়ে ঠিকই করেছিলেন। তবে, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতাবিহীন স্বৈর-শাসক গোষ্ঠীর প্রশাসন যোগ্য ও বিবেকবান নাও হতে পারেন যদি রাষ্ট্র প্রধান নিজেই সে রকম না হয়ে থাকেন এবং একটি যত্নবান ও স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করেন। আগের আমলে অটোমান সুলতানগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখাতেন ও জনগণ তাদের নিকট যেতে পারতো, এবং জনগণ তাদের নিকট অভিযোগ ও দরখাস্ত নিয়ে আসতো। তবে, মহান সুলেমানের আমল থেকে সুলতান বিজয় অর্জনের জন্যে ও অর্জিত

---

[৮৮] Inalcik, 1970, p. 369.

[৮৯] Lutfi Pasha, Asafname, Lewis কর্তৃক উদৃত, পৃ: ১৯৬২, পৃ: ৭২।

[৯০] Saunders, 1966, p. 15.

[৯১] *Kochu Bey'র Risale-থেকে* Lewis কর্তৃক উদৃত, 1962, পৃ: ৭৫।

www.pathagar.com

বিজয় রক্ষা করার জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে মনযোগ দেওয়ার মত কোন সময় পেতেন না। এভাবে তারা নিজেদরেক গুটিয়ে নিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পুর্বে যে সংহতি বিদ্যমান ছিল তার উপর বিরুপ প্রভাব পড়লো। এমনকি তারা নিজেদের সন্তানদের লেখা-পড়ার দিকে নজর দেওয়ার সময়ও পেল না। সুতরাং, ১৫৬৬ সালে সুলেমানের মৃত্যুর পর ১৩ জন অযোগ্য সুলতান ক্ষমতারোহণ করেছিলেন যাদের ইচ্ছা থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত যোগ্যতা ছিল না।

জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্যাবলী প্রধান উজিরের উপর ন্যস্ত থাকতো। উজিরগণ নিজেরা ন্যায়পরায়ন, যোগ্য ও শাসকদের নিকট দায়বদ্ধ থাকলে (পুর্বের শাসকদের সময় যেমন ছিল), এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যে ও নির্দশনার উপর কাজ করলে এ সব কাজে কোন ভুল হতো না। এর মাধ্যমে তাদের আনুকুল্যে একটি তুলনামুলক স্বচ্ছ ও কার্যকরী প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। তবে, ষোড়শ শতকে ও ততপরবর্তিকালে পুণ:পৌণিক আর্থিক সংকট ও লাগাতার সম্পদের অভাবের কারনে যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে উজির নিয়োগ দেওয়া হতো। সপ্তদশ শতাব্দির পর পদ-পদবীর বিক্রয় এত ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে, সব চেয়ে বেশী অর্থ প্রদানকারীকেই পদগুলো দেওয়া হতো।[১২] এর ফলে প্রশাসন যন্ত্র অদক্ষ ও প্রায় অক্ষম হয়ে পড়লো। পদ গ্রহণের পর, উজিরগণ ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির জন্যে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা শুরু করে এবং অন্যান্য বড় বড় পদ-পদবী বিক্রয় করে তাদের দেওয়া অর্থ তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে।[১৩] এমনকি উলেমা ও বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিও মেধা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে দেওয়া হতো, ফলে তাদের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গেল। তার আত্ম-জীবনীতে ইবনে খালদুন তার জীবদ্দশায় বুর্জি মামলুক (৭৮৪-৯২২/১৩৮২-১৫১৭) আমলে ঘুষের ব্যাপক বিস্তার, বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়মের কারনে তিনি দু:খ প্রকাশ করে গেছেন।[১৪]

অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি সাম্রাজ্যের সামরিক, বেসামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্মীয় জীবনের সকল দিকই ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। রাজস্ব অন্বেষন ও দুর্নীতি কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অনেক ক্ষমতাশালী করে

---

[১২] Inalcik, 1994, p. 74.

[১৩] প্রাগুক্ত।

[১৪] Ibn Khaldun, Kitab al-Ta'rif ... 1951, pp. 257-8; আরো দেখুন, Khadduri, 1984, p. 189।

www.pathagar.com

তুলেছিল, যারা কৃষকদেরকে শোষন করতো, ও সরাসরি সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতো। দুর্নীতির থাবা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন রক্ষা না পাওয়ার কারনে জনগণ তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হলো। কেউ কেউ শহরে চলে গেল, অন্যরা হয়ে গেল ডাকাত।[১৫] ইসলামের বিগত শতাব্দিসমুহের প্রধান বৈশিষ্ট্য জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, আইনের শাসন, ন্যায়পরায়ন বিচার ব্যবস্থা আর অবিশষ্ট ছিল না। নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ রকম পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য।

আঠার শতকের ইউরোপীয় জনগণের নিকট অটোমান সাম্রাজ্যের অদক্ষতা ও দুর্নীতি স্পষ্ট ছিল: "সরকারী পদবীধারী প্রত্যেককেই বিক্রি হওয়ার জন্য অপেক্ষমান মনে হতো"।[১৬] পাশ্চাত্যের দেশগুলো উচ্চপদধারীদের আনুগত্য ক্রয় করা ও বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্যে এরুপ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতো এবং এর ফলে সাম্রাজ্য আরো দুর্বল হয়ে পড়তো।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে এ সকল বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও উপদেশ প্রদান করার জন্যে পন্ডিতের অভাব হয় নি। সাম্রাজ্যের উন্নতির স্বর্ণযুগ থেকেই পন্ডিতগণের লেখায় ইতোপুর্বে বর্ণিত "মিররর্স ফর প্রিন্সেস"-এর উপর রচিত রচনাবলী তুরস্কে প্রকাশিত হচ্ছিল। শাসকমহলের আচরণের পরিবর্তনের মধ্যেই তারা অনাগত কঠিন সময়ের পুর্বাভাস পেয়েছিল। এ সকল পন্ডিতগণের মধ্যে ছিলেন লুতফী পাশা (মৃত্যু ৯৭০/১৫৬৩), মুস্তাফা আলী আকসারি (মৃত্যু ১০২৫/১৬১৬), কছু বেই (মৃত্যু ১০৫৮/১৬৪৮-এর পর), হাজী খলিফাহ (মৃত্যু ১০৬৭/১৬৫৭), হুসেইন হাজারফেন (মৃত্যু ১০৮৯/১৬৭৯), ও সারি মেহমুদ পাশা (মৃত্যু ১১৭৯/১৭৬৭)।[১৭] তাদের সকলেই রাজন্যবর্গ ও সভাসদগণের লোভ সংবরন করার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন, কারণ এগুলো শেষ পর্যন্ত অশুভ পরিণতি নিয়ে আসে। এরা সকলেই ন্যায়বিচার, সম্পত্তির অধিকারকে মর্যাদা প্রদান ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, যুক্তি সঙ্গত করারোপ, সেনা-বাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে সংকুচিত করে ব্যয় হ্রাস করণের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তবে, চেনা পথে চলার অভ্যাস ও ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির প্রক্রিয়া তত দিনে অটোমান সাম্রাজ্যে এত বেশী গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন ঘটানো তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল।

---

[১৫] Inalcik, 1970, p. 342.

[১৬] Hodgson, 1977, Vol. 3, p. 158.

[১৭] Akhisari-এর মতামতের জন্যে দেখুন, Meyer, (1989), p. 313, এবং অন্যদের মতামতের জন্য দেখুন, Lewis, 1962।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়

লুইস যথার্থই বলেছিলেন যে, "মধ্য যুগে মুসলিম বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক দিয়েই ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে ছিল –অধিকতর সমৃদ্ধ, বৃহত্তর, অধিক সংগঠিত, অধিক পরিমানে বিক্রয় যোগ্য পণ্য ও ক্রয়ের জন্য বেশী পরিমান অর্থ, এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নততর নেটওয়ার্ক"।[৯৮] তবে, দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দি নাগাদ এ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। কারণ অনুধাবন করা কঠিন নয়। সামরিক অভিযানে অতিরিক্ত আসক্তি ও রাজনৈতিক অভিজাতদের বিলাসী জীবন যাপন, তৎসহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক ও দুর্নীতিবাজ আমলাদের কারনে শিক্ষা, অবকাঠামো নির্মাণ ও সার্বিক কল্যানের মত জাতি গঠনমূলক কাজের জন্য সামান্যই সম্পদ অবশিষ্ট থাকতো। ফল হচ্ছে এই যে, প্রচুর সম্ভাবনা সত্বেও মুসলিম বিশ্ব পুর্বের কৃষি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবকে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পরবর্তিতে জাপানে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের অনুরুপ শিল্প বিপ্লবে রুপান্তরিত করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভানাটি রাজনৈতিক অবৈধতার কবলে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে সরকার (G) মুসলিম সমাজে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। জনগণের যেরুপ চাপের মুখে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কার্যকর হতে বাধ্য হয়, সেরুপ কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এর ফলে মারাত্মক পরিণতি হয়েছিল, যার প্রভাবে মুসলিম বিশ্ব এখনও দুর্গতিতে আছে, এবং সম্ভবত: ভবিষ্যতে আরো কিছু সময় ধরে এরুপ ভোগান্তি চলতে থাকবে।

১৮৬৮ সালে তুরস্কের জনগণের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল শতকরা দু' ভাগ।[৯৯] ১৮৫০ সালে তুরস্কে বা অটোমানদের অধীনস্থ এলাকায় কোন রেলপথ ছিল না।[১০০] ১৮৬০ সালের অনেক পরে রেলপথ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৮৭০ সালে রেলপথের পরিমান ছিল ১৮০ কি:মি:, ১৯১৩ সালে ছিল ৫,৪৩৮ কি: মি: (সারণী-৩)। তবে, এটি একই সময়ে যুক্তরাজ্যের ২১,৫০০ কি:মি: ও ৩২,৬২৩ কি:মি:, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৮৫,১৭০ কি: মি: ও ৪০১,৯৭৭ কি: মি:-এর তুলনায় অনেক কম।

---

[৯৮] Lewis, 1995, p. 177.
[৯৯] Holt, Lambton and Lewis, 1970, Vol. 2, p. 369- এ Inalcik কর্তৃক Tanzimat I-এ, (ইস্তাম্বুল, ১৯৪০) পৃ: ৮৪১, জিয়া পাশার একটি রচনায় বর্ণিত একটি উদৃত্তি থেকে উদ্বৃত।
[১০০] দেখুন, সারনী ১১১. ২১, Rostow, 1978, p. 152; আরো দেখুন, Quataert, 1994, p. 804.

www.pathagar.com

সারণী- ৩
কতিপয় দেশে রেল লাইনের দৈর্ঘ
(কিলোমিটার)

	১৮৭০	১৯১৩
ফ্রান্স	১৫, ৫৫৪	৪০, ৭৭০
জার্মানী	১৮, ৮৭৬	৬৩, ৩৭৮
গ্রীস	-	-
ভারত	৭, ৬৭৮	৫৫, ৮২২
ইটালী	৬, ৪২৯	১৮, ৮৭৩
রাশিয়া	১০, ৭১৩	৭০, ১৫৬
তুরস্ক	১৮০	৫, ৪৩৮
যুক্তরাজ্য	২১, ৫০০	৩২, ৬২৩
যুক্তরাষ্ট্র	৮৫, ১৭০	৪, ০১, ৯৭৭

তথ্যসূত্র: ম্যাডিসন, ১৯৯৫, পৃ: ৬৪, সারণী ৩- ৪

উচ্চ করের হার ও পর্যাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অভাব সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মুসিবতে ফেলে দিয়েছিল ও উৎপাদনশীলতাকে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছিল। নিম্ন আয়ের কারনে কৃষক, কারিগরগণ তাদের ভূমির উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধনের জন্য পর্যাপ্ত সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় নি।[১০১] সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মোতাবেক কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি প্রসারিত হতে পারে নি ও একটি টেকসই শিল্প ও বাণিজ্যিক উপরিকাঠামো নির্মাণ করতে পারে নি, যা শুধু মাত্র সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিই নিশ্চিত করে না, প্রসারমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাম্রাজ্যের হিস্যাও নিশ্চিত করে।[১০২]

সামষ্টিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয় উপাত্তের অনুপস্থিতিতে যতটুকু উপাত্ত পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এগুলো স্পষ্টত: ই দেশটির দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশ করে। উদাহরনত: ১৮৮৮ সালে তুরস্কে গম উৎপাদনের পরিমান ছিল মাত্র ৫০ মিলিয়ন বুশেল (সারণী- ৪), যখন যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে এর পরিমান ছিল যথাক্রমে ৭৬ ও ২৭৫ মিলিয়ন বুশেল, এবং, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে ছিল যথাক্রমে ৪১৫ ও ৪৭৮ মিলিয়ন বুশেল।[১০৩]

---

[১০১] Faroghi, 1995, p. 207.

[১০২] Inalcik, 1994, pp. 51-2.

[১০৩] ভারত থেকে গম আমাদানীর কারনে যুক্তরাজ্যে গমের কম ফলন হয়ে থাকতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ দমন করার পর ১৮৮৮ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড ভারতে শিল্পায়ন বন্ধ করতে

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র শিল্পগুলোও নিম্নমানের ও মান্ধাতার আমলের উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করতো। গোটা অটোমান তুরস্কে ১৯১৩ সালে ২৬৯টি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো, যেখানে প্রায় ১৭,০০০ শ্রমিক কাজ করতো।[১০৪] এই ১৯৩৯ সালেও মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ।[১০৫] অটোমান সাম্রাজ্য যখন এরূপ ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ছিল, তখন পশ্চিমা দেশগুলো উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল, সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে, এবং পাশাপাশি কৃষি ও শিল্পে প্রযুক্তি ও যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করছিল।[১০৬]

সারণী- ৪

কতিপয় দেশে গমের উৎপাদন (বছরে মিলিয়ন বুশেল)

	১৮৩১-৪০	১৮৫১-৬০	১৮৭১-৮০	১৮৮১-৮৭	১৮৮৮
ফ্রান্স	১৯০	২২৩	২৭৫	২৯০	২৭৫
জার্মানী	৫০	৭০	৯৪	৯৮	১০৩
গ্রীস	২	২	৩	৪	৬
ভারত, অন্যান্য	১০৮	১৮৭	২৮২	৩৭৫	৪৭৮
ইটালী	৬০	৭৫	১১৫	১০৫	১৪১
রাশিয়া	১১০	১৩০	২২৪	২৫০	২৫৮
তুরস্ক, অন্যান্য	২০	৩০	৪০	৪৭	৫০
যুক্তরাজ্য	১২০	১২১	৮৫	৭৮	৭৬
যুক্তরাষ্ট্র	৭৮	১৩৭	৩৩৮	৪৪০	৪১৫

তথ্যসূত্র: রোস্টো, ১৯৭৮, সারনী ১১১.১৯, পৃ: ১৪৭, এবং সারণী ১১১.২৪, পৃ: ১৬৪-৫।

সক্ষম হয়েছিল এবং শিল্পায়ন জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতকে একটি কাঁচামাল রপ্তানীকারক উপনিবেশে পরিণত করেছিল। ১৮৯০ সালে ভারতের সূতি-কাপড় আমদানীর পরিমান দাঁড়িয়েছিল ২০৫০ মিলিয়ন গজ, যা ১৮১৪ সালে ছিল ১ মিলিয়ন গজ (Desai, 1971; আরো দেখুন, Bairoch, 1982)।

[১০৪] Rostow, 1978, p. 475.

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭৬।

[১০৬] Inalcik, 1994, p. 888.

www.pathagar.com

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার, ও পাশ্চাত্যে দ্রুততর ও আরো সস্তা স্থল ও জল পরিবহন ব্যবস্থার কারনে পরিবহন খরচ কমে গেলে আগুনে ঘৃতাহুতি ঘটলো, এবং তা অটোমানদের কৃষি ও শিল্পের প্রতিকুলে কাজ করে। আমদানীকৃত ও উৎপাদিত পণ্যের মুল্য হ্রাস পেলে অটোমান সাম্রাজ্যের উতপাদকগণ কেবল মাত্র রপ্তানী বাজারে নয়, তাদের স্থানীয় বাজারেও অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যায়। ধীরে ধীরে অটোমানগণ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত কাঁচা মাল রপ্তানীকারক ও শিল্প পণ্যের আমদানীকারক দেশে পরিণত হলো। ব্যবসার শর্তগুলোও সার্বিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে এবং শিল্পোন্নত জাতিগুলোর অনুকুলে চলে গেল।[১০৭] ১৮৭০ সালে তুরস্কের রপ্তানীর পরিমান ছিল মাত্র ৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অথচ একই সময়ে ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীর পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫৪১ মিলিয়ন, ৪২৪ মিলিয়ন, ৯৭১ মিলিয়ন ও ৪০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণী-৫)। ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত ৪৩ বছর ধরে তুরস্কের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ১.৫ শতাংশ, যা সারণীতে প্রদর্শিত তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সর্বনিম্ন। রপ্তানীতে প্রবৃদ্ধির নিম্ন হারের কারনে তুরস্ক অব্যাহতভাবে বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবেলা করতে থাকলো,[১০৮] যা ঋণ করে পুরণ করতে হয়েছিল।[১০৯]

সারণী- ৫

পণ্য রপ্তানী

(মুল্য মিলিয়ন ডলারে বিদ্যমান বিনিময় হারে প্রদর্শিত)

	১৮৭০	১৯১৩	g
ফ্রান্স	৫৪১	১৩২৮	২.১
জার্মানী	৪২৪	২৪৫৪	৪.২
গ্রীস	৭	২৩	২.৮
ভারত	২৫৫	৭৮৬	২.৭
ইটালী	২০৮	৪৮৫	২.০
রাশিয়া	২১৬	৭৮৩	৩.০
তুরস্ক	৪৯	৯৪	১.৫
যুক্তরাজ্য	৯৭১	২৫৫৫	২.৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪০৩	২৩৮০	৪.২

g= শতাংশ হিসেবে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার, ১৮৭০-১৯১৩।

তথ্যসূত্র: ম্যাডিসন, ১৯৯৫, সারণী ১.১, পৃ: ২৩৪-৫।

[১০৭] Pamuk, 1987, p. 48; Quataert, 1994, p. 830.

[১০৮] দেখুন, Pamuk, 1987, p. 149; আরো দেখুন, Quataert, 1994, p. 829.

[১০৯] দেখুন, McGowan in Inalcik, 1994, pp. 724-9; আরো দেখুন, Quataert, 1994, p. 762 and Faroghi, 1994, p. 467।

www.pathagar.com

রপ্তানীর অংক স্থির মুল্যে দেখাতে পারলে আরো ভাল হতো, ম্যাডিসনের সারণীতে স্থির মুল্যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তবে, যেহেতু, সেই সারণীতে তুরস্ক নেই, সেহেতু, স্থির মুল্যে রপ্তানীর পরিমান এখানে দেখানো হয় নি।

সুতরাং, অটোমান সাম্যাজ্য আঠার ও উনিশ শতকে তুলনামুলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে পিছিয়ে গেল। ১৯৯০ সালের ডলারের বিনিময় হারের হিসাবে ১৯১৩ সালে তুরস্কের মোট মাথাপিছু দেশীয় উৎপাদন ছিল ৯৭৯ মার্কিন ডলার, যা হচ্ছে তুরস্ক সম্পর্কে এ বিষয়ে প্রাপ্ত প্রাচীনতম তথ্য; একই সময়ে তা ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ছিল যথাক্রমে ৩৪৫২, ৫০৩২ ও ৫৩০৭ মার্কিন ডলার (সারণী-৬)। উপাত্তসমুহ দেখাচ্ছে যে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশ এবং বিংশ শতাব্দিতে একটি পরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সময়ে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সরকার যে ভূমিকা পালন করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

দুর্নীতি ও উচ্চ করের হার কেবল মাত্র অর্থনীতি ও উন্নয়নে অর্থ যোগান দিতে সরকারের (G) সামর্থ্যকেই খর্ব করে না, এটি সরকার (G) ও জনগণের (N) মধ্যে সংহতিও নষ্ট করে দেয়। কৃষক, ক্ষুদে কারিগর ও ব্যবসায়ীদের থেকে শহরের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের নিকট সম্পদের প্রবাহের কারনে সৃষ্ট সম্পদ ও মর্যাদার বৈষম্য অবশিষ্ট জনগণের মনোবল ও চারিত্রিক দৃঢ়তা কমিয়ে দিয়েছিল। অনিবার্যভাবেই, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অবিচারের জবাব হিসেবে জনগণের (N) মধ্যে কর আদায়কারী ও অন্যান্যদেরকে প্রতারিত করার এক প্রকার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিল। এর ফলে তাদের মধ্যে অনেক নৈতিক অধ:পতন হয়ে থাকতে পারে যেমনটি আল-মাওয়ার্দি বলেছিলেন, "অবিচার ব্যতীত অন্য কোন কিছুই এত দ্রুত জগতের অবক্ষয় ও জনগণের বিবেকের অধ:পতন নিয়ে আসতে পারে না"।[১১০] সামাজিক সংহতিও কমে গেল, বিদ্যমান অভ্যন্তরীন মতভেদ ও অনৈক্য আরো গভীর হলো, যা সুলতানের কর্তৃত্ব শিথিল হওয়ার পথ সুগম করলো। এর ফলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো। তাঞ্জিমাত আমলের (১৮৩৯-৭৬) সংস্কারও এটি ঠেকাতে পারলো না, কারণ, অবক্ষয়ের প্রধান কারণ রাজনৈতিক অবৈধতা তখন পুর্ণ উদ্যমে চলছিল।

---

[১১০] Al-Mawardi, Adab, 1955, p. 125.

www.pathagar.com

সারণী- ৬

কতিপয় দেশের মাথাপিছু মোট বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
(১৯৯০ সালে ডলারের আন্তর্জাতিক মূল্যমান অনুযায়ী)

	১৮৭০	১৯১৩	g
ফ্রান্স	১৮৫৮	৩৪৫২	১. ৪৫
জার্মানী	১৯১৩	৩৮৩৩	১. ৬৩
গ্রীস	-	১৬২১	-
ভারত	৫৫৮	৬৬৩	০. ৪০
ইটালী	১৪৬৭	২৫০৭	১. ২৫
রাশিয়া	১০২৩	১৪৮৮	০. ৮৮
তুরস্ক	-	৯৭৯	-
যুক্তরাজ্য	৩২৬৩	৫০৩২	১. ০১
যুক্তরাষ্ট্র	২৪৫৭	৫৩০৭	১. ৮১

g=বার্ষিক প্রবৃদ্ধির শতকরা হার, ১৮৭০-১৯১৩।

তথ্যসূত্র: ম্যাডিসন, ১৯৯৫, পৃ: ২৩, ও পৃ: ১৯৪-২০৬।

উদ্যোগ ও অগ্রগতি হ্রাস পাওয়ার কারনে মহানবী (স:) কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট বিরাট, শক্তিশালী ও সৃজনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেনী ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়লো।[১১১] জাতীয় অর্থনীতির অবক্ষয়ের ফলে স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি কমে গেল এবং সৃজনশীল কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি ফিকহ্-শাস্ত্র, পূর্বে যা কিনা একটি বর্ধিষ্ণু সমাজের আইনগত প্রয়োজন মেটাতো, তাও স্থবির হয়ে পড়লো ও নতুন নতুন সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হতে থাকলো, যদিও এরুপ কঠোরতা এটিকে সুলতান ও সামন্তীয় ভূ-স্বামীগণ কর্তৃক তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা থেকে অনেকাংশে দুরে রাখতে পারতো। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে যাত্রা পুর্বে শুরু হয়েছিল, তা পরিত্যাক্ত হলো। শরীয়াহ'র (S) রুপকল্প মোতাবেক আইন ও বিচারিভত্তিক শাসন বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে উন্নয়ন (g) বাধাগ্রস্থ হলো, শরীয়াহ'র নিয়ন্ত্রনও শিথিল হয়ে পড়লো, এবং সার্বিকভাবে জনগণ (N) কোন প্রকার আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো।

[১১১] দেখুন, Ashraf, in Cook, 1970, pp. 308-312; আরো দেখুন, Issawi, in Cook, 1970, p. 409।

www.pathagar.com

বিজয়ী দ্বিতীয় মেহমুদ (১৪৫১-৮১) ও মহান সুলেমানের (১৫২০-৬৬) সময় অটোমান সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল যে শক্তির কারনে, তা মুসলিম বিশ্ব হারিয়ে ফেলেছিল। এ সকল শাসকগণের বিজয় ও জাঁক-জমক ছিল ভবিষ্যতের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জলাঞ্জলির বিনিময়ে। জয়লাভ ও রাজ্য সম্প্রসারনের অতি উৎসাহের ফলে এক বিরাট বাহিনী মধ্য ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, সাইপ্রাস, লোহিত সাগর ও ক্রিমিয়ায়, এবং একটি বয়বহুল নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে ব্যস্ত থাকতো। পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো যখন মুসলিম বিশ্বে ভাঙ্গন দেখা দিল ও সাফাভিদগণ অটোমানদের শত্রুদের সাথে যোগ দিল। এরূপ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক শক্তিসমূহকে অবহেলা করা হবে। এর ফলে নেতিবাচক শক্তিসমূহ বেগবান হতে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না সপ্তদশ শতকে চতুর্থ মেহমুদের (১৬৪৮-৮৭) আমলে ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধ ব্যর্থ হলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত গ্রামীণ অর্থনীতির সামরিক আধিপত্য ও পাশ্চাত্যকে মোকাবেলার জন্যে আবশ্যকীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সমর্থন দানের সামর্থ্য ছিল না। সামরিক বাহিনীর প্রযুক্তিগত ও পেশাদারিত্বের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সম্পদ অটোমানদের হাতে ছিল না, অথচ এ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৭৭০ সালে দানিয়ুবের তীরে রাশিয়ানদের হাতে পরাজয়ের মাধ্যমে শুরু হওয়ার পর অনেকগুলো সামরিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এরূপ অবহেলার জন্য চরম মুল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল।

এর ফলে সাম্রাজ্য ক্রমাগতভাবে আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো, এর সীমান্ত উন্নত সামরিক ও নৌ-শক্তির হাতে হেয় হয়ে পড়লো এবং এর ক্ষুদ্র শিল্প পাশ্চাত্যের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখো-মুখি হলো। এছাড়া, পূর্বে অধিকৃত সকল রাজ্য এর হাতছাড়া হয়ে গেল। বিজয়ের জন্য যে সকল মানবিক ও বস্তুগত সহায়-সম্পদ ব্যয় করা হয়েছিল, ও জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও কল্যান জলাঞ্জলি দিয়ে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছিল, এসব কিছুই বৃথা গেল। এ সকল রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারনে শুধুমাত্র রাজস্ব আয় ও ঋণ না করে সরকারের ব্যয় নির্বাহ করার সামর্থ্যই শুধু কমে যায় নি, এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়লো, যার ফলে কৃষি ও উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলো।[১১২] সংস্কার ও পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্বেও অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি এবং তুরস্ক

[১১২] Inalcik, 1994, p. 7.

www.pathagar.com

ঝাক-জমকপূর্ণ অবস্থা থেকে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষে' পরিণত হলো। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের লগ্নে এসে তুরস্ক সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। চূড়ান্ত বিপর্যয় আসলো ১৯১৪ সালের নভেম্বরে যখন তুরস্ক কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এর পরিনতিতে যে পরাজয় আসে তার ফলে সাম্রাজ্য কেটে টুকরো টুকরো করে যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার হিসেবে বিজয়ীরা ভাগা-ভাগি করে নেয়। এভাবে ইবনে খালদুনের মডেল পুরো-পুরি প্রমানিত হলো।

G (সরকার) ও N (জনগণ) - এর সংহতিতে ফাটল

ধার্মিক ও যোগ্য উলেমাদেরকে সাধারণত: এতিহ্যগতভাবে ইসলামের মুরুব্বী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লষনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অতএব, উলেমা ও সরকারের (G) মধ্যে একটি আস্থার পরিবেশ সরকারের (G) জনপ্রিয়তা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা ও ফিকহ্‌শাস্ত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য মর্মে আবির্ভূত হয়েছে। তবে, উলেমা ও সরকারের মধ্যকার বোঝা-পড়া বহু শতাব্দি ধরে ব্যাপক চড়াই উত্রাইয়ের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: দীর্ঘ দিন যাবত এ সম্পর্ক অবনতির দিকেই যাচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও, কখনও কখনও দু'য়ের মধ্যে সৌহার্দ ছিল, যেমন, খলিফা হারুন আল-রশীদের সময়, যখন আবু ইউসুফের (মৃত্যু ১৮২/৭৯৮) মত যোগ্য ও ধার্মিক উলেমাগণকে খলিফা সম্মান করতেন এবং তাদের পরামর্শ তিনি চাইতেন ও বাস্তবায়ন করতেন।[১১৩]

তবে, কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে এরুপ কোন মতামত দেওয়া হলে হারুন আল-রশীদও স্বেচ্ছারমুলক আচরণ করতেন। আবু হানিফা'র এক শিষ্য ও হানাফী ফিকহ'র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এমন ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আল-সেবানি (মৃত্যু ১৮৯/৮০৪) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে এটি প্রমানিত হয়। আল-রাক্কায় (সিরিয়া) তিনি বিচারক থাকাকালীণ সময়ে একবার হারুন আল-রশীদ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাসান নামক এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত তার নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত অঙ্গিকার থেকে তিনি সরে আসতে পারেন কিনা। আল-সেবানি যখন জবাব দিলেন যে, শরীয়া'র বিধান মতে তিনি তা করতে পারেন না, তখন আল-রশীদ এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি তার মাথায় একটি কালির দোয়াত ছুঁড়ে মারেন। ফলে তার কাপড় চোপড় রক্ত আর কালিতে ভিজে যায় ও তিনি আহত হন। সেখানে উপস্থিত আবু আল-বাখতারী নামক অন্য একজন আইনশাস্ত্রবিদ আল-রশীদের ইচ্ছার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং তাকে তার ইচ্ছামত কাজ করতে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর থেকে আইনগত মতামত

[১১৩] দেখুন, Zaman, 1997.

www.pathagar.com

প্রদান করার বিষয়ে আল-সেবানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে, পরবর্তিতে আল-রশীদ তাকে পদোন্নতিও দিয়েছিলেন ও মৃত্যুর পর তার প্রচুর প্রশংসাও করেছিলেন।[১১৪]

ইসলামী মাপকাঠিতে বিচার করলে যদিও হারুন আল-রশীদকে আদর্শ শাসক বলা যাবেনা, তবুও তিনি অনেকের চেয়ে ভাল ছিলেন। তারা হয়ত: তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী এরুপ মতামত প্রদানের কারনে তারা আল-সেবানিকে হত্যা করতো, যদিও মতামতটি ছিল শরীয়া'র সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে, সরকার (G) ও উলেমাদের মধ্যে একটা আস্থার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এর মাধ্যমে সরকার (G) ও জনগণের (N) মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। সরকারী কাজে উলেমাদের সম্পৃক্ততার ফলে তারা জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হতো। ফলে, ফিকহশাস্ত্র পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতো, এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিকসহ সকল শাখায় ফিকহশাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছিল। এর ফলে, আইন শৃংখলা রক্ষা করে ও ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি (J & g) অর্জনের মাধ্যমে শরীয়াহ'র (S) বিধানসমুহ বাস্তবায়নের জন্য আরো ভাল একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং, সকল জাতি গঠন মুলক কাজে এক বড় ধরনের প্রণোদনা এসেছিল এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বও (G) শক্তিশালী হয়েছিল।

হারুন আল-রশীদের পুত্র আল-মামুন (১৯৮-২১৮/৮১৩-৩৩) ও তার দুই উত্তরসুরী আল-মুতাসিম (২১৮-২৭/৮৩৩-৪১) ও আল ওয়াথিকের (২২৭-৩২/৮৪২-৭) আমলে উলেমা ও সরকারের (G) মধ্যকার মধুর সম্পর্ক যখন হোঁচট খেল, তখন সরকার (G) ও জনগণের (N) সংহতিও দুর্বল হয়ে পড়লো, এবং, এর ফলে সরকারও (G) দুর্বল হয়ে পড়লো। সন্দেহ নেই যে, আল-মামুন ও তার দুই উত্তরসুরীগণ বিজ্ঞান ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক উৎসাহিত করার জন্য অনেক কিছুই করেছিলেন। তবে, মুতাজিলাইদের কতিপয় মতবাদ শরীয়া (S) বিরোধী মর্মে উলেমাদের ঘোষনা সত্বেও মুতাজিলাইদের মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বল প্রয়োগের ফলে উলেমা ও জনগণকে(N) সরকার (G) থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

যদি আল-মামুন ও তার উত্তরসূরীগণ জনগণের নিকট জবাবদিহি করতেন, তাহলে তারা এরুপ বিচ্ছিন্ন নিরাময়ের পথ খুঁজতেন। তার পরিবর্তে তারা

---

[১১৪] Al-Saymari-এর *আকবর আবি হানিফা ওয়া আসাবিহি* থেকে সম্পাদক আবু আল-ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ কর্তৃক তার *আল-শ্যাবানি'র* ভূমিকায়, ১৯৭৭, পৃ: ৫৪-৬, এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ড: আনাস জারকা ঘটনাটি আমার নজরে এনেছিলেন।

নিজেদেরকে রক্ষার জন্য মধ্য এশিয়া থেকে বিদেশী নিরাপত্তা রক্ষী, কর্মকর্তা ও সৈন্য ভাড়া করে এনে গণ-অসন্তোষের পাল্টা জবাব দিতে চাইলো, এবং এভাবে এমন এক প্রথা চালু হলো যা শেষ পর্যন্ত অস্থিতিশীলতার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ালো। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিপরীত পথে চলে ক্রমান্বয়ে শাসকবৃন্দ জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ষোড়শ শতকের পর অটোমান যুগে এরূপ বিচ্ছিন্নতা আরো বেড়ে যায়, যার ফলে সরকার (G) ও জনগণের (N) সংহতি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং শাসকবৃন্দকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার সুযোগ হারিয়ে ফেলে।[১১৫]

আল-মুতাওয়াক্কি (২৩২-৪৭/৮৪৭-৬১) এ রূপ বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং উলেমা ও বেসামরিক জনগণের সমর্থন নিয়ে এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মুতাজিলাইদের মতবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এর শক্তি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তিতে আর কোন শাসক এটা পুন: বহাল করার চেষ্টা করে নি। তবে, আল-মুতাওয়াক্কিল নিজেই তার বিদেশী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে এর ফলে কিছু অরাজকতা শুরু হয়েছিল যখন বিদেশী নিরাপত্তা কর্মীরাই খলিফা পদে লোক বসাতো বা পদ থেকে নামাতে; যে চার জন খলিফা তার উত্তরসুরী হয়েছিলেন, তাদের তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছিল।[১১৬] শেষতক আব্বাসীয়দের পতন হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এভাবে অব্যাহতভাবে দুর্বল হতেই থাকলো।

ফিকহশাস্ত্রের স্থবিরতা

যে প্রশ্নটি বারবার উঠে আসছে তা হচ্ছে, ফিকহশাস্ত্র আগে যথেষ্ট গতিশীলতা প্রদর্শণ করলেও পরবর্তি শতাব্দীগুলোতে এমন স্থবির হয়ে পড়লো কেন? একটি সন্তোষজনক জবাবের জন্যে এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ক্রীড়নকের উপর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটি আলোচিত হয়েছে, অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ শুরু হওয়া ও শাসকগণ কর্তৃক শরীয়া'র (S) অনেকগুলো বিধান লংঘনের পর থেকে উলেমা ও শাসকগণের মধ্যে ভেতরে ভেতরে যে বিরোধ চলে আসছিল, আল-মামুন ও তার উত্তরসুরীদের নির্যাতনের কারনে তা আরো বেড়ে গেল। এর ফলে দু'য়ের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমুলক আলোচনার সম্ভাবনা কমে গেল। বিবেকবান শাসকগণ ক্ষমতায় আসলে তারা যখন উলেমাগণের রাগ কমানোর চেষ্টা করেছে

[১১৫] Faroghi, 1994, p. 616.
[১১৬] দেখুন, Lewis, 1960, p. 18.

www.pathagar.com

তখন বিভিন্ন সময় এ অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। তবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধানসমুহের প্রয়োগ না করার ফলে তা সব সময় একটি বিবাদের কারণ হয়েছিল এবং কর ব্যবস্থায় বৈষম্য, শাসকবর্গের দুর্নীতি ও বিলাসিতা, রাজ দরবারে তোষামদির সংস্কৃতির বিকাশ ও শাসকদের নিজস্ব কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামকে ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

এ সকল কুকর্মের কারনে বিরক্ত হয়ে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি ধার্মিক ও সবর্জন শ্রদ্ধেয় উলেমা ও সূফীগণের মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং তারা ক্ষমতার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলা শুরু করে। রাষ্ট্রীয় চাকুরী অবমাননাকর বিষয়ে পরিণত হলো এবং যারাই রাষ্ট্র থেকে কোন বেতন বা সুবিধা গ্রহণ করতো তারাই শাসকের অন্যায় কাজের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হলো। মুসলিম সমাজে এর একটি সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। যে সকল উলেমা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করতো ও রাজ দরবারে আসা-যাওয়া করতো, তারা নৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললো এবং ক্ষমতা-লিপ্সু ও পার্থিব স্বার্থের অন্বেষনকারী হিসেবে চিহ্নিত হলো। এদেরকে আখ্যায়িত করা হতো 'উলেমা আল-সু' (পাপের পন্ডিত) বা 'উলেমা আল-দুনিয়া' (পার্থিব স্বার্থের পন্ডিত) এবং যারা রাজ দরবার এড়িয়ে চলতো তাদেরকে বলা হতো 'উলেমা আল-খায়ের' (পুণ্যের পন্ডিত) বা 'উলেমা আল-আখিরা' (আখেরাতের পন্ডিত)।[১১৭] ধার্মিক ও খোলা-মেলা কথা বলতে অভ্যস্থ উলেমাগন কর্তৃক রাজ দরবার এড়িয়ে চলার পেছনে আরো একটি বিশ্বাসযোগ্য কারণ আল-আত্তাবির নিকট থেকে পাওয় যায়। তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে; "শাসক তার সভাসদগণকে বিনা কারনে বিরাট পরিমান অর্থ দান করতে পারেন, আবার, শাসক বিনা কারনে তাদেরকে মৃত্যুদন্ডও প্রদান করতে পারেন, এবং আপনারা হয়ত: এ দু'টি অবস্থানের কোনটিই পছন্দ করবেন না"।[১১৮] 'উলেমা আল-সু' হিসেবে গণ্য হওয়া ও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার দু'টি আশংকার কারনে ধার্মিক উলেমাগণ রাজ দরবার থেকে দুরে ছিলেন এবং, এভাবে শাসকগণ (G) পুর্বে হারুন আল-রশীদের মত শাসককে উপদেশ প্রদানে সক্ষম আবু ইউসুফের মত মেধাসম্পন্ন উলেমাদের আন্তরিক উপদেশ থেকে বঞ্চিত হতেন। দুর্ভাগ্যবশত: এরূপ বিভাজন মুসলিম বিশ্বে এখনও কিছুটা অব্যাহত রয়েছে। এমন কি এখনও যে সকল উলেমা সংস্কারের

---

[১১৭] দেখুন, al-Ghazali, Ihya, Vol. 1, pp. 58-82; আরো দেখুন, al-Turtushi, Siraj al-Muluk, 1994, Vol. 2, "Warning Against the Company of the Sultan"।
[১১৮] Al-Turtushi কর্তৃক উদ্বৃত, 1994, p. 481 ।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যও সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে, বিশেষত: সুন্নী সমাজে তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

এর ফলে মুসলিম সমাজে একটি বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। এক দিকে, শরীয়া'র আলোকে ন্যায়বিচার ও সার্বিক কল্যান সাধনের একটি প্রত্যাশা বিদ্যমান ছিল, এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। অপর পক্ষে, যারা রাষ্ট্রের সহিত গাঁটছড়া বেঁধেছিল তারা স্বার্থান্বেষী ও ইহজাগতিক রুপে বিবেচিত হলো। ওমর - যিনি শুধু ধার্মিক ও যোগ্যতা সম্পন্নই ছিলেন না, আত্ম-সংযমীও ছিলেন -এর মত মানের একজন খলিফা, খুজে পাওয়া কত কঠিন তা সম্ভবত: বোঝা যাচ্ছিল না। সুতরাং, দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন শাসকদের অধীনে জীবন যাপন করতে শিক্ষা গ্রহণ ও তাদের নিকট থেকে যতটা সম্ভব ভালোকাজ আদায় করে নেওয়া যায়, তা ব্যতীত উলেমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরুপ আচরণের মাধ্যমে হয়ত: একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করা সম্ভব হবে না, তবে ক্রমান্বয়ে ইসলাম বাস্তবায়নে ও মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্যে এগুলো সহায়ক হতে পারে। "সব কিংবা কোনটিই নয়" জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি সম্ভবত: বাস্তবানুগ ছিল না। এভাবে বিবেচনা করলে মনে হচ্ছে কুরআন যা বলেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীই সঠিক: "পুণ্য ও শান্তির কাজে একে অন্যের সাথে সহযোগিতা কর, কিন্তু, পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে নয়" (আল-কুরআন, ৫:২)।

ধার্মিক ও যোগ্য উলেমাগণ কর্তৃক ক্ষমতাসীনদেরকে এড়িয়ে চলার ফলে বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতি হয়েছে। প্রথমত: এর ফলে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক সংস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যদি ন্যায়পরায়ন ও বিখ্যাত উলেমা ও সূফীগণ নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন না রেখে রাজনৈতিক সংস্কার ও জনগণের অধিকারের জন্য লড়াই করতেন, তাহলে ধীরে ধীরে শতাব্দির পরিসরে তারা হয়ত: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। এর ফলে হয়ত শাসকদের ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রন আরোপিত হতো, এবং বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার ও উর্ধ্বতন পদে অযোগ্য লোকজনের নিয়োগের প্রবনতা হ্রাস পেত। সাধারন মানুষেরা অধিকারের জন্য সংগ্রাম করলে তাদেরকে দমন করা স্বৈর-শাসকের পক্ষে সহজ হয়। তবে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলেমাগণ যদি জনগণের যথেষ্ট সমর্থন নিয়ে জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে, তাহলে শাসকবৃন্দ সহজেই তাদেরকে দমন বা হত্যা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। আল-মামুন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে উলেমাদের সংগ্রামের ফলে আত্ম-ত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সফলতা এসেছিল। আব্বাসীয়

বংশের শেষের দিকের ও অন্যান্য শাসক বংশের অনেক শাসক সম্ভবত: আল-মামুনের মত এত শক্তিশালী ছিল না, এবং আল-মামুন ও তার উত্তরসুরীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালানো হয়েছিল তা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংস্কার চালু করতে তারা রাজী বা বাধ্য হতেন।

দ্বিতীয়ত, মুতাজিলিজমের সহিত বিরোধ উলেমাদেরকে দর্শন সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। দুর্ভাগ্যবশত: তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছে সেকালে দর্শনের দীক্ষাকে পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রের মত অনেকগুলো ভৌত বিজ্ঞানের মত একই বিষয় মনে করা হতো। সে অনুযায়ী এ সবগুলো অজ্ঞাতসারে দর্শন শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, সুতরাং, সবগুলোই সন্দেহের আওতাধীন থেকে গেছে। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম মুলত: ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌত বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লষণের কলা-কৌশল যা আবু ইউসুফ, আল-গাজ্জালি ও ইবনে রুশদ-দের মত আগের যুগের আইনশাস্ত্রবিদগণের পক্ষে শেখা সম্ভব হয়েছিল ও যেগুলো ব্যতীত তারা তাদের ভুমিকা পালন করতে পারতেন না, সেগুলো পরবর্তি প্রজন্মের উলেমাগণের পক্ষে শেখা সম্ভব হয় নি। সুতরাং, তারা আগের আইনশাস্ত্রবিদগণের মত স্বাধীন মতামত প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন নি। এ ভাবেই তারা সৃজনশীল হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, ক্ষমতার বলয় থেকে দুরে থাকার ফলে উলেমাগণ মুলত: মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েন। এর ফলে তারা প্রায় প্রতিটি শাসক বংশের আমলে সংক্ষিপ্ত সংস্কারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এবং তাদের সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলো মোকাবেলা করা ও মুসলমানদের জীবনে শরীয়াহ-কে একটি প্রগতিশীল বাস্তবতায় পরিণত করার কাজে তাদের সুযোগ সীমিত করে তোলেন। এভাবে যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন নতুন অবদান রাখায় তাদের জন্য সামান্যই সুযোগ থাকলো। ধর্মীয় বা পার্থিব নির্বিশেষে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে প্রয়োজনের তাগিদে। ফিকহশাস্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। এটি প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল। এ কারনে উলেমাগণ ইসলামী জীবন ধারার প্রান্তিক বিষয়গুলো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

অতীতে যা লেখা হয়েছিল তা আদর্শ বচন হয়ে গেল এবং পুর্বের সকল মতামত প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়ার উপর অন্যায্য জোর দেওয়া হলো। উলেমাগন তাদের গুরুরা যেমন করে বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা করেছেন সেভাবেই সবকিছু ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। এমন কি তাদের সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তিরাও

www.pathagar.com

মন্তব্যের উপর মন্তব্য লিখে সময় কাটালেন, এবং এভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত প্রাচীন পাঠ্যবইয়ের রাজত্ব টিকিয়ে রাখলেন। পুরনো রচনা মুখস্ত করা ব্যতীত ছাত্রদের আর কোন উপায় থাকলো না। বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা ও বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান প্রদানের ক্ষমতার চেয়ে মর্যাদা নির্ভরশীল ছিল কতগুলো বই মুখস্ত করতে পারলো তার উপর।

ফিকহশাস্ত্রের স্থবিরতার ফলে এটি এমন একটি ব্যবস্থায় বিকশিত হতে ব্যর্থ হলো যা হতে পারলে এটি হতে পারতো এমন একটি বিষয় যার বিভিন্ন অংশের মুল লক্ষ্য হতো মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরীয়া'র সার্বিক লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়ন করা।[১১৯] এর ফলে আগের যুগের ইসলামের প্রগতিশীলতা হারিয়ে গেল। একটি ন্যায়ানুগ আর্থ-সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, আইনগত ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার আদর্শকে ধীরে ধীরে পশ্চাতে সরিয়ে দেওয়া হলো। ফিকহশাস্ত্রের যা অবশিষ্ট থাকলো তা আনুষ্ঠানিক ও আগের শতাব্দিগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রগতিশীল সভ্যতার প্রয়োজন বিবেচনায় অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কংকালটি টিকেছিল, তবে প্রাণ ছিল দুর্বল।

অধিকাংশ মুসলিম এলাকায় পাশ্চাত্যের শক্তিসমুহের দখলদারিত্বের পর সেখানে তাদের দ্বারা ধর্ম-নিরপেক্ষ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পুর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান, কলা ও ভাষা শিক্ষার পুন:রুজ্জীবন ঘটে নি। দুর্ভাগ্যবশত: এর ফলে দু'টি ধারার শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠে, একটি পুরাতন ধর্মীয় রচনার শিক্ষা ও অন্যটি আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক। দু'টি ধারার একত্রিকরন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু নানা কারনে মুসলমানগন তা করতে পারে নি, ধর্মীয় বিদ্যালয়ে পার্থিব বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা মেনে নিতে উলেমাগণ মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকাটা এর জন্য কম দায়ী নয়। তাছাড়া, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার পাঠদান করা ও আধুনিক ইহজাগতিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার মাত্রা যুক্ত করার জন্য আসমানি বানীর সাথে যুক্তির সমন্বয় করে পাঠ্যবই প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। এটা ছিল একটি কঠিন কাজ যা স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। ব্যর্থতা মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। প্রথমত: সামাজিক সংহতিকে আরো দুর্বল করা হয়েছে পন্ডিতগণকে

[১১৯] Cf. Fazlur Rahman, 1965, pp. 184-5; Abu Sulayman, 1993, p. 93.

www.pathagar.com

দু'টি ভাগে বিভক্ত করার মাধ্যমে, যারা পরস্পরের সাথে কোন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিল না। দ্বিতীয়ত: বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে উচ্চ পদে চাকুরী পায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটগণ সাধারনত: কম বেতন ও কম মর্যাদার চাকুরী পায়, ফলে ধর্মীয় শিক্ষা বস্তুত: আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। পিতা-মাতাগণ, বিশেষত: সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজাত পিতা-মাতাগণ, ধর্মীয় ভাবাপন্ন হলেও সাধারনত: তাদের সন্তানদেরকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠান না। ধর্মীয় শাস্ত্রে ভাল দক্ষতাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ সরকারের উচ্চ পদে আসীন থাকার কারনে ক্ষমতার বলয়ে শরীয়া'র পুণ: বহাল এমনকি আরো কঠিন হয়ে পড়লো।

মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় ও ইহজাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংমিশ্রন। ইসলামী কাঠামোর মধ্যে ইহজাগতিক শিক্ষা বলতে কিছু নেই। যে সকল শাস্ত্র মানুষের কল্যান সাধনে কাজে আসে সে সকল বিষয়ই ধর্মীয়। সুভাগ্যবশত: আরব বিশ্বে জামালুদ্দীন আল-আফগানী (মৃত্যু ১৩১৫/১৮৯৭) এ মুহাম্মদ আবদু (মৃত্যু ১৩২৩/১৯০৫) এবং ইন্দো-পাকিস্তান উপ-মহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (মৃত্যু ১৩১৬/১৮৯৮) ও মুহাম্মদ ইকবাল (মৃত্যু ১৩৫৭/১৯৩৮)-দের সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় সংমিশ্রন ঘটছিল। তবে, মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমগুলো প্রয়োজনীয় দ্রুততার সাথে পরিবর্তন হচ্ছিল না। চেনা পথে চলার অভ্যাস ও আত্ম-শক্তিশালীকরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা বন্দী হয়ে পড়েছিল এবং তাদেরকে বিচ্যুত করা সহজ ছিল না। তবে, সংমিশ্রন প্রক্রিয়ার পরোক্ষ উপকার হচ্ছে যে, মাদ্রাসার গ্রাজুয়েটগণ নিজেরা ইংরেজী ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ ধর্ম শাস্ত্র শিখছে। তাছাড়া, পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ থেকে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহন করে মুসলমান ছাত্ররা শুধু মাত্র ভাল বেতন ও উচ্চতর মর্যাদাই পাচ্ছে না, বিভিন্ন বিষয়সমুহ আরো বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করতে পারছে। এরুপ সংমিশ্রন ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশের জন্যেও সহায়ক হচ্ছে এবং এটাকে ক্ষমতার বলয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসছে।

সূফীবাদের ভূমিকা

রাজদরবারের দুর্নীতি ও দুনিয়া-কেন্দ্রিকতার অপর একটা পরিণতি হচ্ছে অনেক ধার্মিক ও বিবেকবান উলেমাদের সূফীবাদ বা সংসার-বৈরাগ্যের মধ্যে আশ্রয়

www.pathagar.com

গ্রহন। ইসলামী দীক্ষার সহিত স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক[১২৩] অনেকগুলো ধারনার কারনে সূফীবাদের প্রতি উলেমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সূফীরা ধীরে ধীরে বেশী বেশী লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে থাকলো এবং অনেকগুলো মুসলিম দেশের ধর্মীয় আবহে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকলো। এটা ছিল তাদের ধর্মীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা, তাদের সহজ-সরল জীবন-যাপন, ন্যায়পরায়ন রোজগার, সহজ লভ্যতা ও তাদের অনেকের (সকলের নয়) পরোপকারের মানসিকতার ফলাফল। পৃথিবীর অনেক স্থানে ইসলামের বিস্তারের জন্য তারাও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মীয় মনো-চিকিতসকের দায়ীত্ব পালন করেছিলেন; সমস্যায় পড়লে মানুষ তাদের কাছে যায় ও আধ্যাত্মিক শান্তি ও মনের সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয়।

সূফীবাদকে এর আপত্তিকর দিকগুলো থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১) ও শায়খ আহমদ সিরিন্দি (মৃত্যু ১০৩৪/১৬২৪)-দের মত অনেক পন্ডিতগণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটা নিজকে এখনও যথেষ্ট সংস্কার করে নি এবং এর ফলে দু'ভাবে ইসলামের ক্ষতি হয়েছে। প্রথমত: মহানবীর (স:) প্রচারিত শরীয়াহ (S) ছিল ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করা ও এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ন্যায়ানুগ আর্থ-সামাজিক শৃংখলার প্রতীক। এর জন্য মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনেতিক জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমুহ সাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলো থেকে পালিয়ে থাকা নয়। কিন্তু সূফীগণ ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামের বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ন্যায়পরায়নতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে নি। বরং, তারা বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়তির নিকট আত্ম-সমর্পণ করাটাকেই উৎসাহিত করতেন। দ্বিতীয়ত: মহানবী (স:) কর্তৃক প্রচারিত শরীয়াহ (S) ছিল বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমুহের মধ্যে একটি ভারসাম্য অর্জনের প্রতীক। সূফীবাদ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চরম ত্যাগ-তিতীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এরূপ ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছিল। সূফিবাদ দারিদ্র ও বৈরাগ্য উৎসাহিত করতো এবং বৈরাগ্যের পথে ব্যক্তি-সত্ত্বাকে বিসর্জন দেওয়াকে উৎসাহিত করতো। এটা প্রার্থনায় সার্বক্ষণিক মনোনিবেশের পক্ষে ও

---

[১২৩] এদের কতিপয় হচ্ছে, তপস্যা ও পার্থিব মোহ পরিত্যাগ করা, শরিয়াহ ও ওহী'র চেয়ে সূফী তরিকা ও সূফী জ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, পীর পুজা অথচ ইসলাম পীর পুজা স্বীকৃতি দেয় না, স্রষ্টার সহিত ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরাসরি যোগাযোগের স্থলে সূফীদের মধ্যস্থতার প্রথা, এবং মৃত সূফীগণের পার্থিব বিষয়ে ভূমিকা পালন করার ও তাদের অনুসারীদের বিনীত আবেদনে সাড়া প্রদানের ক্ষমতা।

www.pathagar.com

পার্থিব বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল। ইতিহাসের গতি-ধারা পাল্টে দিতে সক্ষম ছিলেন এমন অধিকাংশ ন্যায়পরায়ন, যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় উলেমাগণকে বাস্তব জীবন থেকে ও একটা ন্যায়ানুগ আর্থ-সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে সূফীবাদ নিজের অজ্ঞাতসারেই অবৈধ ক্ষমতা কাঠামোকে স্থায়ীত্ব প্রদানের কাজে সামিল হয়ে যায়।

তথাপিও, সূফীরা এখনও মুসলমানদের নৈতিক পুণরুত্থানে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি তারা তাদের আধ্যাত্মিক পরিশোধনের মুল কাজে ফেরত যায়, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার পুন: রুদ্ধারের জন্যে শান্তিপুর্ণ ও অহিংস আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, এবং পরবর্তিতে ঢুকে পড়া কতিপয় অনৈসলামিক ধারনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে। তাদের কয়েকজনের যে সম্মোহনী শক্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তা, এবং তাদের সাধা-সিধে জীবন ও ন্যায়পরায়নতা মুসলিম বিশ্বের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্যে ভীষনভাবে কাজে আসতে পারে। তবে, যদি তারা তাদের নিজেদের পথ আঁকড়ে থাকে ও আর্থ-সামাজিক সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শণ করতে থাকে, তাহলে তারা চলমান সংস্কার আন্দোলনকে শ্লথ করবে এবং এ প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদেরকে আগের চেয়েও বেশী কোনঠাসা করে ফেলবে।

নারীর সামাজিক অবস্থানের অবনতি

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা, রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার বিস্তার ও যুক্তিবাদের অবনতির সাথে সাথে মুসলিম সমাজে নারীদের মর্যাদাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী পুর্বে যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতো তার অবনতি শুরু হয়েছিল। কুর'আন নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে (২: ২২৮)। কুর'আন-এর বিধানমতে পুরুষকে নারীর সাথে ভদ্র ও ন্যায্য আচরণ করতে হয় (৪: ১৯) এবং নম্রভাবে নারীর প্রতি তাদের কর্তব্যগুলো পালন করতে হয় (২: ৩৭), যাতে মনের শান্তি ও পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায় (৩০: ২১)।

মহানবী (স:) নারীকে মানুষের বোন হিসেবে বর্ণনা করে কুর'আনের এ সকল বাণীগুলোর মর্মকে আরো গুরুত্বপুর্ণ করে তুলেছেন।[১১১] বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি মানুষকে নারীর সহিত আচরণের সময় আল্লাহ'র কথা মনে রাখার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ মানুষ নারীকে "আল্লাহ' প্রদত্ত আমানত" রূপে

---

[১১১] Al-Suyuti রচিত তার al-Jami al- Saghir –এর A'ishah থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও আল-তিরমিজি'র কর্তৃত্বে উদ্বৃত, ১ম খন্ড, পৃ: ১০২।

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছিল।[১২২] অন্য এক উপলক্ষে তিনি নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে পুরুষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[১২৩] এগুলোসহ আরো অন্যান্য হাদিসকে নারীর সম-মর্যাদার (নিম্ন-মর্যাদার নয়) ও সমাজের উন্নতির জন্যে তাদের একটি পরিপূরক ভূমিকার প্রমান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা উমর এটা বলার তাগিদ অনুভব করেছিলেন যে: "প্রাক-ইসলামী যুগে (জাহেলিয়াত) আমরা নারীকে কোন কিছুই মনে করতাম না। তবে, ইসলামের আগমনের পর, আল্লাহ তা'লা নিজে যখন তাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে"।[১২৪]

মহানবীর (স:) নিজের সময়েও বহু ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষামুলক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা একটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতো। তাদেরকে সম্পত্তির উপর যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে তার সমান কোন কিছু আধুনিক যুগের আগে পাশ্চাত্যেও ঘটে নি।[১২৫] এমন কি তারা যুদ্ধের কর্মকান্ডেও সাহায্য করতো।[১২৬] বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাদের অংশ গ্রহণের কারনেই সে সময়ে প্রত্যেকেই মহানবীর স্ত্রী, কন্যা, চাচীসহ আরো বিখ্যাত নারীদের সম্পর্ক অবহিত ছিলেন। এমনটা হতো না যদি তারা ঘরের ভেতর বন্দী থাকতো ও মানুষের সংস্পর্শে না আসতো। মহানবীর আমলের পুর্বেই কিছু কিছু মহিলা তাদের মুখ-মন্ডল ঢেকে রাখতো, আবার অন্যরা তা করতো না। বল প্রয়োগ না করার নীতির সহিত সামঞ্জস্য রেখে তিনি তাদের মুখ-মন্ডল থেকে পর্দা সরিয়ে নিতে বাধ্য করতে চান নি। তবে, উমরা ও হজ্জের সময় তিনি তাদের মুখ-মন্ডল থেকে পর্দা সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। তাঁর কতিপয় সাহাবী নারীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত

---

[১২২] মুসলিম রচিত *সহি, কিতাব আল মানাসিক*, বাব হাজ্জাত আল-নাবীবি, ২য় খন্ড, পৃ: ৮৮৯: ১৪৭-এ যাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবু দাউদ, কিতাব আল-মানাসিক, বাব সিফাত হজ্জ আল-নাবিবি, কর্তৃক উদ্বৃত; আরো দেখুন, ইবনে মাজাহ ও আহমদ-এর *মসনদ*।

[১২৩] হাদিসের প্রকৃত কথাগুলো হচ্ছে: "এতিম ও নারীদের অধিকার হরন করা আমি নিষেধ করছি" (আল-হাকিম কর্তৃক আবু হুরায়রা থেকে তার *মুস্তাদ্রাক*, ১ম খন্ড, পৃ: ৬৩ থেকে বর্ণিত)। মুসলিম মান মতে এটি সহি হাদিস।

[১২৪] আল-বুকারী কর্তৃক তার *সহি, কিতাব আল লিবাস, বাব: মা কানা আল-নাবিবি ইয়াতাজাওয়া মিন আল-লিবাস ওয়া আল-বাস্ত-এর উমর* থেকে বর্ণিত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২৮১: ৭৩৫।

[১২৫] Lewis, 1995, p. 72.

[১২৬] দেখুন, আবু শুক্কাহ, ১৯৯০, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৩২-২৩৩; আরো দেখুন, Ruth Roded, 1994, p. 35.

www.pathagar.com

রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ও জোর গলায় এমনটি করতে তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন।[১২৭] সুতরাং, অতীত ও বর্তমানের অনেক সম্মানিত মুসলিম পন্ডিতগণের মত হচ্ছে যে, শরীয়াহ'র দীক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রেখে নারীরা সুশীল পোষাক পরবেন, তবে তাদের মুখ-মন্ডল ঢেকে রাখা বা ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার কোন প্রয়োজন নেই।[১২৮]

ইতিহাস, তফসীর, হাদিস ও ফিকহ্ শাস্ত্র বিষয়ক বইপত্রে নারীরা বেশ ভালভাবেই স্থান পেয়েছেন। সাহাবীদের জীবনীমূলক রচনায় বারোশ'রও বেশী মহিলা সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মোট সংখ্যার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।[১২৯] উমাইয়া যুগে ও আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীরা প্রায় মহানবীর আমলের মতই স্বাধীনতা ভোগ করতো। হারুন আল-রশিদের মাতা, স্ত্রী ও কন্যাসহ অনেক নারী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। নবম শতক থেকে চল্লিশটি বইয়ের তালিকার হাজার হাজার নারীর জীবনী পাঠ করে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক রুথ রোদেদ এমন কোন প্রমান পান নি যা প্রমান করতে পারে যে মুসলিম নারীরা ছিল "অবহেলিত, অন্ত: পুরে বন্দী ও নিয়ন্ত্রিত"। সুতরাং, তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, "চিরায়ত ইসলামী সমাজে নারীর ভূমিকা প্রায়ই খুব নেতিবাচক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যা ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে সমর্থনযোগ্য নয়"।[১৩০]

এমন কি অটোমান যুগ পর্যন্তও নারীরা সম্পত্তির মালিক ছিল, যা তার স্বামী তার জীবদ্দশায় স্পর্শ করতে পারতো না। শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যানমুলক কর্মকান্ডে সহায়তা করার জন্যে নারীরা 'আওকাফ' (বদান্যতামুলক দান) প্রতিষ্ঠা করতো। এটা সম্পত্তিতে তাদের মালিকানা প্রমান করে।[১৩১] অটোমান আওতাধীন আলেপ্পো-তে (সিরিয়ার একটি শহর বর্তমানে 'হালাব') ওয়াকফ্ দান সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে রোদেদ "বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করলেন যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪১ শতাংশ নারীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং নারী ও পুরুষের দানের মধ্যে পার্থক্য ছিল সামান্যই"।[১৩২] নারীরা কৃষক, ব্যবসায়ী,

---

[১২৭] হাদিসটি হচ্ছে এরকম: "নারীদেরকে মসজিদ থেকে বঞ্চিত করো না" (ইবনে উমর থেকে মুসলিম কর্তৃক তার সহি, ১ম খন্ড, পৃ: ৩২৭: ১৩৬-এ বর্ণিত, *কিতাব আল-সালাত, বাব: খুরুজ আল-নিসা ইলা আল-মসজিদ*)।

[১২৮] আবু শুক্কাহ, ২য় খন্ড, ১৯৯০, পৃ: ১৫ ও ৮৩-১৩৭।

[১২৯] Roded, 1994, p. 19

[১৩০] প্রাগুক্ত, পৃ: viii-ix.

[১৩১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩।

[১৩২] প্রাগুক্ত, পৃ: vii.

www.pathagar.com

কারিগর ও ভূ-স্বামী হিসেবেও কাজ করতো।[১৩৩] শরীয়ার আলোকে নারীদের অধিকার, বিশেষত: উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রক্ষায় আদালতগুলোও সক্রিয় ছিল।[১৩৪] আদালতে নারীদের ব্যক্তিগত হাজিরার সাথে কলংকের কোন সম্পর্ক ছিল মর্মে মনে হয় না, এবং, খুব কম নারীই একজন পুরুষ মধ্যস্থতাকারী ব্যতীত তার বিষয়গুলো দেখাশুনা করতেন। মধ্যযুগের ইসলামী বিশ্বের শ্রমের উপর লিখতে গিয়ে স্কাটজমিলার লিখেছিলেন যে. "স্থবিরতা, কায়িক পরিশ্রমে অনীহা, এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও শ্রম শক্তিতে নারীর সীমিত অংশ গ্রহণ আর সমর্থন করা যাচ্ছিল না"।[১৩৫]

উক্ত আলোচনা থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তার সহিত অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য রয়েছে। নারীরা অশিক্ষিত, অন্ত: পুরস্থ, এবং সাধারণভাবে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমুহ থেকে বঞ্চিত। তাদের সমাজে পালন করার মত ভূমিকা কমই রয়েছে। মক্কার হারেম ও মদীনায় মহানবীর মসজিদ ব্যতীত আর কোন মসজিদে রমযান ছাড়া অন্য সময়ে নারীর দেখা পাওয়া কঠিন, এবং তাও শুধুমাত্র কতিপয় দেশে। সুতরাং, এরুপ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কারণ জানতে কৌতুহলী হওয়া স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত কোন সামাজিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় না। এর অনুসন্ধান করা যথার্থ হবে যে, আব্বাসীয় শাসনামালের শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে বুয়েহিদ (৩৩৪-৪৪৭/৯৪৫-১০৫৫) ও সেলযুকিদ (৪৪৭-৫৯০/১০৫৫-১১৯৪) বংশের শাসন পর্যন্ত কয়েক শতাব্দি ব্যাপী চলমান বিরাজমান রাজনৈতিক আন্দোলন ও দুর্বল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কারনে সৃষ্ট জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা এরুপ পরিবর্তনের গুরুত্বপুর্ণ কারণগুলোর মধ্যে কোন একটা ছিল কিনা। বর্বর মঙ্গলীয় (৬৫৬-৭৫৬/১২৫৮-১৩৫৫) ও তিমুরিদ (৭৩৭-৮০৭/১৩৩৬-১৪০৫) দখলদারিত্বের সময় যৌন হয়রানী থেকে বাঁচানোর তাগিদে মুসলিম নারীদেরকে অন্ত: পুরে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকতে পারে।[১৩৬] গন্ডগোল, বিশৃংখলা ও অরাজকতার সময় সতর্কতামুলক পদক্ষেপ হিসেবে ক্ষতি রোধ করার জন্যে নিয়ন্ত্রন আরোপ করা ফিকহশাস্ত্র অনুমোদন করে – যে নিয়ন্ত্রন স্বাভাবিক অবস্থায় শরীয়াহ অনুমোদন করে না।[১৩৭] যেহেতু গন্ডগোল শতাব্দি ব্যাপী চলমান ছিল, সেহেতু, যে নিয়ন্ত্রন সাময়িকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল তা চেনা পথে চলার

---

[১৩৩] Faroghi, 1994, pp. 599, 605.
[১৩৪] Schatzmiller, 1994, p. 362.
[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯৯।
[১৩৬] তৈমুরের বর্বরতার বিবরনের জন্য দেখুন, Hodgson, 1977, Vol. 2, p. 433 ।
[১৩৭] Cf. Abu Shuqqah, 1990, Vol. 3, pp. 183 and 199.

www.pathagar.com

অভ্যাসের কারনে স্থায়ী হয়ে যায় এবং মুসলিম সমাজের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে রুপ নেয়। বিদ্যমান স্থানীয় প্রথা ও ঐতিহ্য এটাকে টিকিয়ে রেখেছিল। জনগণ নিজেদের পথে চলতে থাকলো, এবং এমন অনেক প্রথা যেগুলো বাতিল বা সংস্কার করার জন্যে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিল সেগুলো অক্ষতই শুধু ছিল না, বরং ইসলামের সাথে মিশে গেল, কারণ সাধারণ মানুষকে ইসলামী মুল্যবোধে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থাই ছিল না।

কতিপয় মুসলিম দেশে নারীদের অন্ত:পুরবাসন এতই কঠোর হয়ে পড়েছে যে, নারী-পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করে এবং পারিবারিক পরিবেশের বাইরে তাদের মধ্যে কদাচিত মেলা-মেশা হয়। এর ফলে সমাজে নারী-পুরুষ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতামুলক ভূমিকা পালনেই শুধু বাধাগ্রস্থ হয় নি, নারীরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। গ্রামে যদিও তারা অন্তত: মাঠে কাজ-কর্ম করতে পারে, শহরে নারীরা গৃহস্থালির কাজ-কর্ম দেখা-শুনা ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। নারীর অজ্ঞতা, অন্ত:পুরবাস এবং সকল প্রয়োজনের জন্যে স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা তাকে তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারসমুহ অর্জন করা থেকে বিরত রেখেছে। বর্তমানে বহু উলেমা নারীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং এ বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।[১৩] যে সমাজের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা (N) অবহেলিত থাকে ও আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মেধা অনুসারে তার ভূমিকা পালন করতে অপারগ হয়, সে সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবক্ষয়

এটি স্বাভাবিক যে, সংস্কার ও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর এত বেশী জোর দিয়েছে যে বিশ্ববীক্ষা (World view), তা শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করবে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মহানবীর নিকট অবতীর্ণ হওয়া কুর'আনের প্রথম বাণীই ছিল “পড়, তোমার প্রভুর নামে . . . যিনি মানুষকে কলমের ব্যবহারের মাধ্যমে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না” (আল-কুর'আন, ৯৬: ১-৫)। এমন কি মহানবী (স:) প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামুলক করে ও পূর্ণিমার চাঁদ যেমন অন্য সকল তারার চেয়ে উজ্জলতর তেমনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে একজন মরমীবাদির উপরে স্থান

---

[১৩] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রয়াত আবু শুক্কাহ'র বইটি, ১৯৯০, যিনি মিসরের মুসলিম ভ্রাতৃত্বের একজন বিখ্যাত নেতা।

www.pathagar.com

দিয়ে ইসলামী বিশ্ববীক্ষায় শিক্ষাকে উচ্চ স্থান প্রদান করেছিলেন।[১৩৯] কেবল মাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের মুল্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে (N) যথোপযুক্ত ধারনা প্রদান করা যায়, তাদের দক্ষতার উন্নতি ঘটানো যায় যাতে তারা নৈতিকভাবে বৈধ পথে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে, এবং লক্ষ্য অর্জনে পরিপূর্ণ অবদান রাখায় তাদেরকে সক্ষম করে তোলা যায়। কুর'আন ও হাদিসে শিক্ষার উপর প্রদত্ত গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফিকহ শাস্ত্রও এ বিষয়টিতে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ শতাব্দির অন্যতম সেরা আইনশাস্ত্রবিদ আবু জারাহ বলেন যে, "এক জন মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত যাতে তার নিকট থেকে সমাজ সেবা পায়, ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়"।[১৪০]

মহানবী (স:) শিক্ষার প্রসারের জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধ-বন্দীগণ কর্তৃক মুসলমানদেরকে পাঠদানের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তির সুযোগ প্রদানসহ কোন সুযোগই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন নি। মহানবীর উদাহরণ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত হয়েছিল। সুতরাং, মুসলিম সমাজে শিক্ষার জন্য "একটি সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমর্থন ছিল,"[১৪১] এবং প্রথম কয়েক শতাব্দিতে প্রায় সকল শাসক বংশই শিক্ষা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্যে ও এ উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতকে সমর্থন প্রদানের জন্যে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

শুরুতে পন্ডিতগণের বাড়ী ও মসজিদসমুহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতো। এটা ছিল মহানবীর নিজের রেখে যাওয়া ধারাবাহিকতা যখন তিনি মক্কার দ্বার আল-আরকাম-এ একটি স্কুল ও মদীনায় মহানবীর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কুতাব (বহুবচনে কাতাতিব) নামে আখ্যায়িত এ সকল স্কুল খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল, এবং এমন কি এখনও মুসলিম সমাজের একটি অংশ হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। স্বাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষার প্রসারের জন্য এটা ছিল, এখনও আছে, সবচেয়ে সস্তা ও

---

[১৩৯] হাদিস দু'টি হচ্ছে: "জ্ঞানাণ্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য", এবং "একজন শিক্ষিত ব্যক্তির সাথে একজন মরমীর পার্থক্য হচ্ছে পূর্ণ চন্দ্রের সাথে অপর সকল তারকার যে পার্থক্য"। (উভয় ইবনে মাঝা কর্তৃক উদ্বৃত, প্রথমটি আনাস ইবনে মালিক থেকে এবং দ্বিতীয়টি আবু আল দারদা, ১ম খন্ড, পৃ: ৮১, নম্বর ২২৩ ও ২২৪। গ্রন্থ: আল-মুকাদ্দিমাহ, বাব: ১৭-ফাদল আল-উলামা ওয়া আল-হাত্ত্ব আলা-তালাব আল-ইলম)। বিদ্যার্জন ও শিক্ষা দান সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য হাদিসের জন্য দেখুন, পৃ: ৮০-৯৮। আরো দেখুন, আল-কুরতবি (মৃত্যু ৪৬৩/১০৭০), *যামি বায়ান আল-ইলম ওয়া ফাদলুহু,* ১ম খন্ড, পৃ: ৩-৬৩, এবং আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ৫০৫/১১১১), *ইহিয়া,* ১ম খন্ড, পৃ: ৪-৮২।

[১৪০] Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, 1957, p. 350.

[১৪১] Berkey, 1992, p.3.

www.pathagar.com

কার্যকরী পন্থা। সে যুগে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পাওয়া যেত মূলত: শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে। জীবিকা অর্জনের জন্যে কোন কিছুতে দক্ষতা অর্জনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয় মহানবীর উক্তি থেকে, "আল্লাহ সেই মুসলমানকে পছন্দ করেন যার একটি পেশা রয়েছে"।[১৮২] দ্বিতীয় খলিফা ওমর জোর দিয়ে বলেছিলেন: "তোমাদের কারোই এ কথা বলে রুজি-রোজগার করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়: 'হে আল্লাহ, আমাকে জীবিকা প্রদান কর', কারণ সোনা ও রুপা আকাশ থেকে আসে না। মানুষের পরস্পরের প্রতি সেবার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকেন"।[১৮৩]

সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় অনেকগুলো মসজিদকে ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান একাডেমীতে রুপান্তর করা হয়েছিল যাদেরকে বলা হতো দার আল-উলুম (বিজ্ঞান একাডেমী), দার আল-হিকমা (জ্ঞানের একাডেমী) ও বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানের ঘর)।[১৮৪] এ সকল একাডেমিতে কৃষি, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন, যুক্তি বিদ্যা, গণিত, চিকিতসা বিদ্যা, দর্শন, পদার্থ বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যাসহ সকল বিজ্ঞান বিষয়ে বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এ গুলোর প্রতিটির সাথে সংযুক্ত ছিল একটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার ও পাঠ কক্ষ, একটি অনুবাদ শাখা ও একটি পান্ডুলিপি নকলখানা। কাগজ, কলম, কালি বিনা খরচে সরবরাহ করা হতো। নিয়মিত ছাত্রদের জন্যে বৃত্তি ও হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা হতো এবং পন্ডিতগণকে উদারভাবে আর্থিক ও বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা হতো। বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হতো। জ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদানের একটা বড় অংশ ছিল এ সকল একাডেমী ও একাডেমীগুলোর দাপ্তরিক সহায়তার ফল। সুতরাং, প্রথম শতাব্দিগুলোতে মুসলিম বিশ্বে উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য ছিল।[১৮৫] জ্ঞান চর্চায় বাইজান্টাইন, সাসানিয়, ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার পুর্বের অবদান থেকে

---

[১৮২] ইবনে উমর থেকে আল-বেয়াহাকি কর্তৃক তার *শু'আব আল-ঈমান,* ২য় খন্ড, পৃ: ৮৮, নম্বর ১২৩৭-এ উদ্বৃত।

[১৮৩] 'Ali al-Tantawi and Naji al-Tantawi', 1959, p. 268. উমর আরো বলেছিলেন মর্মে জানা যায় যে, "আল্লাহর দয়া প্রার্থনা কর এবং মানুষের বোঝা হয়ো না" (Al-Qurtubi, Jami al-Bayan al-Ilm wa Fadluhu, Vol. 2, p. 15)।

[১৮৪] Bayt al-Hikmah আল-মামুন (মৃত্যু ২১৮/৮৩৩) কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং Dar al-Hikmah প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিসরে ফাতিমীয় সুলতান আল-হাকিম (মৃত্যু ৪১১/১০২১) কর্তৃক। বিভিন্ন শহরে এরুপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[১৮৫] দেখুন, Tibawi, 1954; Makdisi, 1981, Berkey, 1992; Zurayk, 1992।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ শুধুমাত্র উপকৃতই হয়নি, বরং প্রায় ছ' শতাব্দি ধরে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল ও নিজেরাই যুগান্তকারী অবদান রেখেছিল।[১৮৬]

অন্যান্য স্থানের মত মুসলিম বিশ্বেও শিক্ষা উন্নয়ন পাশা-পাশি এগিয়ে চলছিল। শিক্ষা মানুষের গুণগত উতকর্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করেছিল, ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে শিক্ষাখাতে ব্যয় করার জন্যে সরকার ও বেসরকারী দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট বর্ধিত হারে অর্থ-সম্পদ জমা হলো। অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্ব সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে গেল, কারণ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এটির অবস্থান ছিল সবার সামনে। ইবনে খালদুনের চক্রাকার কার্যকারণ সম্পর্কের তত্ত্বের এটিও একটা প্রমান।

জ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের প্রাধ্যান্য ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দির মাঝা-মাঝি পর্যন্ত চার শতক যাবত অব্যাহত ছিল। যদিও এর পরে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, মুসলমানদের প্রচুর অবদান আরো দু' শতক যাবত অব্যাহত ছিল। এরুপ অবক্ষয়ের সব চেয়ে বড় কারণ সম্ভবত: ছিল রাষ্ট্রীয় আর্থিক আনুকুল্যের অবসান, যা আগে উদারভাবেই পাওয়া যেত। রাজ-প্রাসাদের বিলাসী জীবন, দুর্নীতি ও সামরিক অভিযানে অত্যোধিক ব্যয়ে সরকারী সম্পদ নি:শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। অটোমানরা সাধারনত: শিক্ষা ও অন্যান্য জাতি গঠণমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চাইতো না।[১৮৭] অতএব, অষ্টম/চতুর্দশ শতকের শুরুতে অটোমানরা ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে ইসলামের সৃজনশীলতার যে শিখা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, তা পরবর্তি শতকগুলোতে প্রায় নিভেই গিয়েছিল। এর পর মুসলিম বিশ্ব শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লো। পূর্বের উন্নয়নের জোয়ার শিল্প বিপ্লবে রুপান্তরিত না হওয়ার এটা একটা প্রাথমিক কারণ হয়ে থাকতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ভূমিকা কমে যাওয়ার পর শিক্ষার বড় দায়িত্ব বর্তেছে বেসরকারী খাতের উপর। এটি মূলত: পালিত হয়ে থাকে 'আওকাফ' (দাতব্য প্রতিষ্ঠান)-এর মাধ্যমে, যা মাদ্রাসা ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা সহায়তা করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক যেমন মসজিদ নির্মাণ ও সংরক্ষণ, ছাত্র ও পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করন, সেতু নির্মাণ, কূপ খনন, রাস্তা ও হাসপাতাল নির্মাণসহ অনেকগুলো জনসেবামুলক কাজও এরুপ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তেছিল।[১৮৮]

---

[১৮৬] বিস্তারিতের জন্য দেখুন, Sarton, 1927, ও Fu'ad Sezgin, 1983 ff।
[১৮৭] Faroghi, 1994, p. 542.
[১৮৮] দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন, Makdisi, 1981, pp. 35-74; Hodgson, 1977, Vol. 2, p. 124.

www.pathagar.com

অটোমান যুগে 'আওকাফ' যথেষ্ট উৎসাহ -উদ্দীপনা পেয়েছিল। এগুলো যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ও নিবিঢ় সরকারী তদারকির আওতায় পরিচালিত হতো।[১৪৯] ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য দাতব্য কাজের জন্য আয়ের উৎস হিসেব ব্যবহার করার জন্যে 'আওকাফ' কর্তৃক দোকান ও বাজার নির্মাণ করা হতো।[১৫০]

তবে, আওকাফ পরবর্তিতে অজ্ঞাতসারে মুলত: ধর্মীয় কর্মকান্ডের সহিত জড়িত হয়ে পড়লো এ যুক্তিতে যে, কেবল মাত্র এ সকল কাজই একজন মানুষকে পরকালে পুরস্কার এনে দিতে পারে। সুতরাং, পরকালে পুরস্কার অর্জনের দিক থেকে বিবেচনা করলে বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় মনে করা হতো।[১৫১] এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল এ কারনে যে, মহানবী (স:) –এর মতে বস্তুগত হোক আর আধ্যাত্মিক হোক অন্যের উপকার হয় এমন যে কোন কাজ করলে তা দাতব্য কাজ হবে এবং পরকালে পুরস্কার নিয়ে আসবে[১৫২]। আগের শতাব্দিগুলোতে এমনকি বৃত্তিমুলক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় অবদান রাখা হলেও তাকে পরকালে পুরস্কার প্রাপ্তির একটা উপায়রুপে বিবেচনা করা হতো। তবে, পুর্বে যেমন বলা হয়েছে, মুতাজিলা-দের বাড়াবাড়ি ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) কর্তৃক জনগণের (N) উপর মতামত চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে শক্তির ব্যবহার এক দূর্দান্ত আঘাত হেনেছিল ভৌত বিজ্ঞনের উপর, যা তখন অন্যান্য স্থানের মত মুসলিম বিশ্বেও দর্শনের সাথে এক করে দেখা হতো। সুতরাং, আওকাফ বিজ্ঞান শিক্ষাকে সমর্থন করে নি। এভাবে মুসলিম বিশ্বে বেসরকারী খাতের শিক্ষা ব্যবস্থা মুলত: ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে সীমিত থাকলো। রাষ্ট্রীয় ও পার্থিব বিষয়সমুহ থেকে ধর্মপ্রাণ উলেমাদের বিচ্ছিন্নতার পর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশ্লেষনী ক্ষমতা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভুত হচ্ছিল না। সুতরাং, মাদ্রাসা শিক্ষার মান কমে শুধুমাত্র মুখস্ত করন ও বিদ্যমান বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক বিহীন পুরাতন পাঠ্যক্রম অনুসরনের মধ্যে থেকে গেল। অধিকাংশ মাদ্রাসায় এরুপ দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বিরাজ করছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে বেসরকারী খাতের গতি বাড়ে নি। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকলো, এবং, জনগণকে ইসলামী মুল্যবোধ সম্পর্কে

---

[১৪৯] Inalcik, 1970, p. 307.

[১৫০] প্রাগুক্ত, ১৯৯৪, পৃ: ৭৯।

[১৫১] Hofmann, 1996, p. 85.

[১৫২] মহানবী (স:) বলেছিলেন: "পাখি, পশু ও মানুষের খাবারের জন্যে একজন মুসলিম যখন একটি গাছ লাগায় কিংবা মাঠ চাষ করে, তখন সে একটি পুণ্যের কাজ করে" (Al-Bukhari, Kitab al-Harth wa al-Zira'aha, Bab Fadl al-Zar wa al-Harth)।

www.pathagar.com

অবহিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্যে আরো বেশী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বেসরকারী খাতের আর্থিক সংকট, সরকারী সহায়তার অভাব ও ট্রাস্টিগন কর্তৃক ব্যক্তি-স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে আওকাফের আয় আত্ম-সাত,[১৫৩] ইত্যাদি কারনে এ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব হয় নি। জনগণের মধ্যে স্বাক্ষরতা ও সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্যেই বেসরকারি খাত যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে অপারগ ছিল, মুসলিম বিশ্বে অতি প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাদের জন্যে আরো অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং, বাল্যকালে নৈতিক ও বিজ্ঞান শিক্ষা উভয়টি থেকেই বঞ্চনা ঘটলো। নৈতিক যে চেতনা মহানবী জাগিয়ে তুলেছিলেন, ও মুসলিম প্রাধান্য ধরে রাখার লক্ষ্যে যে প্রযুক্তিগত শক্তির প্রয়োজন ছিল, তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং, মুসলিম বিশ্ব নৈতিক ও প্রযুক্তিগত উভয় দিক থেকে অবক্ষয়ের শিকার হলো।

ইতোমধ্যে, পাশ্চাত্যে কার্যকরী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য জনগণের সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। উন্নয়নের ফলে শিক্ষার জন্য দাবীও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১৮৪০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে ১২ গুণ বৃদ্ধি পেলেও কলেজে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে ৪১৭ গুণ।[১৫৪] সরকারী সমর্থন ও বেসরকারী উদ্যোগের কারনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, যা উন্নয়নে আরো গতি সঞ্চার করেছে, এবং পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র, শিক্ষা ও উন্নয়ন একে অন্যকে শক্তিশালী করেছে। পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যখন সংঘর্ষ শুরু হলো, তখন শিক্ষার অভাব, মান্ধাতার আমলের সামরিক বাহিনী ও উৎপাদনের প্রযুক্তি নিয়ে মুসলিম বিশ্বের জয়ের কোন সম্ভাবনা থাকলো না।

তৃতীয় ভাগ: মুসলিম ইতিহাসের কতিপয় শিক্ষা

সমাজ বা সভ্যতার উত্থান-পতনে জনগণ (N), শরীয়াহ (S), সরকার (G), সম্পদ বা অর্থনীতি (W), ন্যায়বিচার (j) ও উন্নয়ন (g)-এর পারস্পরিক সম্পূরক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা মুসলিম ইতিহাস স্পষ্টভাবেই প্রমান করে। মুসলিম ইতিহাস দেখায় যে, যুক্তি ও আবেগ সম্পন্ন ভীষণ উজ্জীবিত মানুষ যেমন প্রয়োজন, তেমনি অনুকূল আইন-শৃংখলা ও এরূপ একটা পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে কঠিন, দক্ষ ও সৃজনশীল কাজই শুধু করা

---

[১৫৩] দেখুন, McGowan, 1994, p. 712.

[১৫৪] দেখুন, "The Knowledge Factory: A Survey of Universities", The Economist, 4 October, 1997, p. 4 ।

www.pathagar.com

যাবে না, সেখানে ন্যায়বিচার (j), পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক শান্তিও (N) বজায় থাকবে। এর জন্যে প্রয়োজন এক গুচ্ছ মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান (S) যা সমাজে বসবাসরত সকল সদস্যগণের (N) অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দিবে, এবং এগুলো নিরপেক্ষভাবে সকলের কল্যানের লক্ষ্যে প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সরকার (G)। শুরুতে সম্পদ ও বস্তুগত সম্পত্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে, কিন্তু, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি () দীর্ঘকাল ধরে রাখা সম্ভব নয়। জনগণের () অবস্থার দৃশ্যমান ও বাস্তব উন্নতি হতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। কালের পরিসরে যখন জনসংখ্যা () বৃদ্ধি পায় ও জনগণ ও সরকারে () বহুমুখী সমস্যা কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ে তখন সম্পদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ইবনে খালদুনের মডেলের চলকসমুহের যে কোন একটি দুর্বলতা সত্বেও অর্থনৈতিক চলকসমুহের অপরিবর্তনের স্বল্প-মেয়াদে কোন সমাজ অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু, দীর্ঘ মেয়াদে এ অগ্রগতি ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। কালের পরিসরে কোন একটি দুর্বলতা অন্য দুর্বলতাগুলোর জন্ম দিবে।

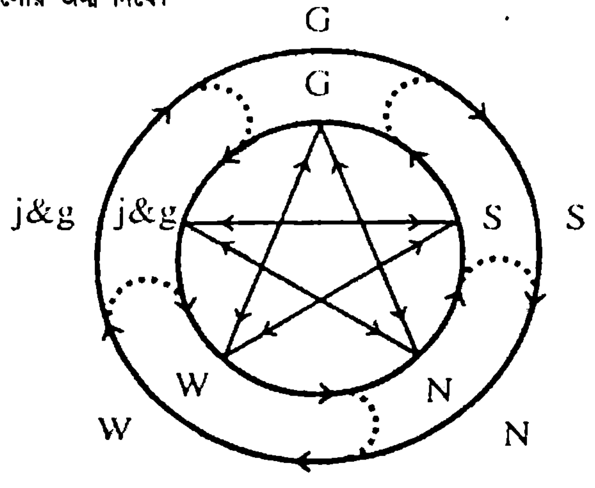

মুসলমানগণ এ সকল চলকসমুহকে প্রত্যাশিত পরিমানে না হলেও যথেষ্ট পরিমানে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং তাদের সমাজের দ্রুত উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছিল। তবে, পরবর্তিতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে শুরু করলো। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ

শরীয়াহ (S) বাস্তবায়ন ও ন্যায়বিচার (j) নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলো এবং জনগণের (N) পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতে পারলো না। পরিণতিতে, উন্নয়ন (g) ও সম্পদ সৃষ্টি (W বাধাগ্রস্থ হলো এবং সরকারের (G) সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও হোঁচট খেল।

প্রথম শিক্ষা

প্রশ্ন হচ্ছে: শাসকগণ (G) কেন তাদের দায়িত্ব অবহেলা করেছিল? মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পাঠে এর জবাব পাওয়া যাবে, জনগণের কল্যানের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালনে শাসকদের (G) আগ্রহী করে তোলার জন্যে জনগণের নিকট তাদের দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম শূরাসহ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে। যদি একটি সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী এ দু'টো প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে দেওয়া হতো, তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কার্যকর সরকার (G) পরিচালনার লক্ষ্যে জন্মগ্রহণকারী এ দু'টো শিশু প্রতিষ্ঠান হয়ত: কালের পরিসরে চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে ধীরে ধীরে একটা আধুনিক সাংবিধানিক ও আইনগত কাঠামোতে বিকাশ লাভ করতো, যা পাশ্চাত্যে হয়েছিল। একটি বিশাল ভৌগলিক এলাকা জুড়ে বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত প্রসারমান একটি বিশ্বাসের পক্ষে সে সময়ে এরুপ বিকাশ লাভ করার জন্য অনুকুল পরিবেশ সম্ভবত: ছিল না। এর ফলে মহানবীর ওফাতের ৩০ বছর পর ৪১/৬৬১ সালে খলিফা হওয়ার ২০ বছর পর মুয়াবিয়াহ তার পুত্রের নিকট বংশানুক্রমিক ধারায় খলিফার পদ হস্থান্তরের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্থান্তর করলে ক্ষমতার হাত বদলের আইনানুগ পদ্ধতির অংকুরে বিনাশ ঘটে। বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু শ্লথ পরিবহন ও যোগাযোগের সে যুগে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার ব্যর্থতার কারনে বিরোধিতা দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

সুতরাং, খিলাফত ও শুরা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করতে পারলো না, শরীয়ার (S) বিধানমতে সমাজের ঐক্যমতের মাধ্যমে যোগ্যতা ও চরিত্রের মাপকাঠিতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্থান্তরের পরিবর্তে বংশানুক্রমিকভাবে অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার বদল ঘটলো। এর ফলে ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ, খন্ড-বিখন্ড হওয় ও অনৈক্য দেখা দেয়, সরকারের (G) জবাবদিহির অভাব ও দায়িত্বপালনে অনীহা দেখা দেয়, এবং যা মুসলিম ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিচ্যুতি-রেখা রুপে প্রতিভাত হয়েছিল। এ কারনে ক্রেমার ঠিকই বলেছিলেন, "পতনের কারণ খুঁজতে হয় মুলত: সংগঠিত জনগোষ্ঠির মধ্যে"।[১৫৫]

[১৫৫] Kramer et al., "Othmanli", 1995, p. 190-231.

www.pathagar.com

তবে, খিলাফত প্রথার অবসানের পর পরই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (G) স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেনি। যে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধের ধারা মহানবী নিজে অভিষিক্ত করেছিলেন সেখানে তা সম্ভব ছিল না। শরীয়াহ'র (G) বিধান তখনও জনগণকে (N) অনুপ্রাণিত করতো, এবং কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতো সরকারের (G) উপর, যার পক্ষে শরীয়াহ'র আলখাল্লাহ ধারন করা এড়ানো সম্ভব ছিল না যদিও শরীয়াহ'র দীক্ষা পুরোপুরি বাস্তবায়নে সরকারের কোন আগ্রহ ছিল না। অধিকন্তু, প্রায় সকল শাসক বংশের মধ্যেই কিছুটা বিবেকবোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং যোগ্য শাসকগণ আংশিকভাবে হলেও ভাল কাজ করার প্রয়াস পেয়েছিল। তবে, এরূপ প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল শাসকদের নিজস্ব উদ্যোগে, খিলাফত ও শুরা'র বিধানের আলোকে গঠিত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার কারনে নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা

এর মাধ্যমে আসে মুসলিম ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা, যা হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহির অনুপস্থিতির কারনে অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে ন্যায়বিচার (j) ও উন্নয়ন (g) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রথম ক্ষতিকারক প্রভাবগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে বাক্-স্বাধীনতার অভাব যার কারনে জনগণের (N) পক্ষ্যে শাসকবৃন্দ ও তাদের নীতির খোলামেলা সমালোচনা করা সম্ভব হয় না। এভাবে শাসক (G) ও জনগণের (N) মধ্যেকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক দুরীভূত হয়ে যায়, যার ফলে সরকারের পক্ষে জনগণের সমস্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় না। এর ফলে শরীয়াহ'র লংঘন ঘটিয়ে আইনের চোখে সাম্যের নীতির বিসর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো, এবং একটি সুবিধা-ভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হলো যাদেরকে শরীয়াহ'র শৃংখলার অধীন আনয়ন করা সম্ভব হলো না। সংস্কারের সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে পেছনে সরে গেল। দুর্নীতি, অদক্ষতা, বৈষম্য বৃদ্ধি পেল এবং বিশেষত: অটোমান যুগে জনগণের সম্পদ প্রায়ই রাজপ্রাসাদের ভোগ-বিলাসে ও রাজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যয়বহুল সামরিক অভিযানে ব্যয় করা হতো। শিক্ষা, গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে কম অগ্রাধিকার প্রদান করা হতো, যার মাধ্যমে বিশেষত: বেসামরিক ও সামরিক প্রযুক্তিতে মুসলমানদের পশ্চাতপদতার বীজ বপন করা হয়েছিল।

তবুও বাজেট ভারসাম্যহীনতা বাড়তেই থাকলো। এটা সামলানোর জন্যে জনগণের (N) সাধ্যাতীত শোষনমুলক করারোপ, মুদ্রার অবমুল্যায়ন, সরকারী পদ-পদবী বিক্রয় (যার ফলে উচ্চ পদে অযোগ্য লোকেরা নিয়োগ পেল) ও অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের ঘটনা ঘটলো। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, যা ছিল ইসলামের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, এক বিরাট হোঁচট খেল। কৃষিতে স্থবিরতা

www.pathagar.com

আসলো, কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীরা দুর্বল হয়ে গেল। জনগণ (N) ও সরকারের (G) মধ্যকার সংহতি দুর্বল হয়ে গেল। নাগরিকদের (N) মান কমে গেল, তাদের জীবনীশক্তি ও উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ হলো, এবং অর্থনীতি (W) জনগণ (N) ও সরকারের (G) ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারলো না। সার্বিক উন্নয়নে মুসলিম বিশ্ব পিছিয়ে পড়লো, এবং দ্রুত গতিতে উদীয়মান পশ্চিমা সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেললো।

তৃতীয় শিক্ষা

মুসলিম ইতিহাসের তৃতীয় শিক্ষা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (G) তার দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের (N) উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। এরকম প্রয়াস সরকার (G) ও জনগণের (N) মধ্যে সংহতি ছিন্ন করতে পারে, সামাজিক গন্ডগোল বাড়িয়ে দিতে পারে ও উন্নয়নের পরিবেশ দুষিত করতে পারে। মুতাজিলাই-দের দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের (N) উপর বলপুর্বক চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আল-মামুনের প্রচেষ্টার ফলে ধর্মপ্রাণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলেমাগণকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, যারা আগে থেকেই রাজনৈতিক অবৈধতা, রাজপ্রাসাদের বিলাসী জীবন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারনে শাসকবৃন্দের (G) উপর ক্ষুব্ধ ছিল। যেহেতু, এ সকল ধর্মপ্রাণ উলেমাগণের উপর জনগণের আস্থা ছিল, সেহেতু, উলেমাদের সাথে শাসকদের সংহতির অভাবের কারনে শাসকদের সাথে জনগণের (N) সম্পর্কেও অবনতি দেখা দেয়। টানাপোড়েন ও দ্বন্ধ আরো বেড়ে গেল, যা শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয়দের পতন ঘটিয়েছিল।

আল-মামুনের অভিজ্ঞতা সোভিয়েত রাশিয়া, পুর্ব ইউরোপ, চীন, তুরস্ক, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এটি প্রমান করে যে, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গী বলপুর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে অসন্তোষ ও অস্থিরতা ফুঁসতে থাকে, যা সরকার (G) ও জনগণের (N) মধ্যে সংহতি নষ্ট করে দেয়, এবং দ্বন্ধ ও টানাপোড়েন বাড়িয়ে দেয়।

নীপিড়ন কখনও সফল হয় নি, হবেও না। গীর্জার দমন নীতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের আন্দোলনের ধর্ম-বিরোধী ভুমিকার সফলতার জন্যে দায়ী ছিল। গীর্জা যদি কিছুটা যুক্তি সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করতো, তাহলে পাশ্চাত্যে ধর্মকে এতটা পরাজয় হজম করতে হতো না। মুতাজিলাইগণ যদি বলপ্রয়োগ না করতো, তাহলে মুসলিম বিশ্বে যুক্তিবাদ এতটা পরাজিত হতো না। যুক্তিবাদি ও রক্ষণশীলদের মতামতের উম্মুক্ত আলোচনার ফলে হয়ত: তুলনামুলকভাবে আরো

www.pathagar.com

ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল। অগ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে দমন নীতি প্রয়োগ করার ফলে যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম বিশ্বে টানাপোড়েন শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয় পড়ানোর উপর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। যেহেতু, সরকারের (G) তরফ থেকেও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয় নি, সেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার ফলে মুসলিম বিশ্ব যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় নি। এরুপ টানা-পোড়েন ও সন্দেহের ফলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণও ফিকহ ও অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রসমুহ বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশলসমুহ রপ্তকরন থেকে বঞ্চিত হলো।

চতুর্থ শিক্ষা

আল-মামুনের অভিজ্ঞতা থেকে মুসলিম ইতিহাসের চতুর্থ শিক্ষা পাওয়া যায়, যা হচ্ছে, জনগণ (N) একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সরকার (G) মাঠ পর্যায়ের সমর্থন হারিয়ে ফেলে এবং বাইরের প্রহরীর উপর নির্ভর করে দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এটি শেষতক বুমেরাং হয়। এর ফলে শাসকবৃন্দ (G) আত্ম-সন্তুষ্টিতে ভোগে, বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায়, টানা-পোড়েন বাড়িয়ে দেয়, উন্নয়ন (g) হ্রাস করে ও দেশের উপর বাইরের প্রাধান্য বিস্তার ঘটায়। বরং, যদি সরকার (G) জনগণের (N) সহিত আলাপ-আলোচনার কৌশল গ্রহণ করতো, ক্ষমতা ভাগা-ভাগি করতো, বিরোধ মীমাংসা করতো, ও জনগণের সমস্যার সমাধান করতো, তাহলে বাইরের প্রহরীদের উপর নির্ভর না করেও সরকার তার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে পারতো, এবং দেশকেও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো।

পঞ্চম শিক্ষা

মুসলিম ইতিহাসের পঞ্চম শিক্ষা হচ্ছে যে, মুসলমানদের অবক্ষয়ের কারণ ইসলাম নয়। ইসলাম নিজেই অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা, দুর্নীতি ও দমন নীতির শিকার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। নিজস্ব কায়েমী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে শরীয়ার সহিত অসঙ্গতিপূর্ন মতামত আদায় করার কাজে ইসলামকে ব্যবহার করার জন্যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের (G) খায়েশের কারনে ইজতিহাদ-এর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও ফিকহশাস্ত্র স্থবির হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকলো না। এর ফলে ধর্মপ্রাণ ও যোগ্য উলেমা ও সূফীগণ দুর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘন থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্যে রাজপ্রাসাদ এড়িয়ে চললেন, কিন্তু, প্রকারান্তরে নিজেদেরকে

www.pathagar.com

জীবনের বাস্তবতা থেকেও গুটিয়ে নিলেন। সুতরাং, জনগণ (N) ও সরকারের (G) সংস্কারে অবদান রাখা ও একটি ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফিকহ্শাস্ত্রের বিকাশের কাজে ভূমিকা পালনে তাদের ক্ষমতা কমে গেল।

কোমল অবতরন

তবে, চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্কের বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে কয়েক শতাব্দি সময় লেগেছিল। ঠিক মানব দেহের মতই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জনগোষ্ঠির দায়িত্ব পালন করলো, এবং তার মাধ্যমে পতন কিছুটা ধীরে ঘটলো। এরূপ প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা ছিল ইসলামের, যা তার প্রগতিশীলতা হারিয়ে ফেললেও জনগণকে (N) ও বিভিন্ন শাসক বংশের সরকারের কতিপয় অংশকে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধ করতে থাকলো, এবং তার মাধ্যমে অংশত: হলেও ন্যায়বিচার পুণ: প্রতিষ্ঠা করলো ও জনগণের দরিদ্রতর অংশের দূর্দশা লাঘব ও পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি যথেষ্ট পরিমানে নিশ্চিত করলো। ইসলাম না থাকলে মুসলমানদের পতন দ্রুততর গতিতে ঘটতো পারতো।

জনগণ, বিশেষ করে স্বচ্ছলদের মধ্য থেকে বিবেকবানগণ ও উলেমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ধার্মিকগণ, শাসকদের (G) দোষ-ত্রুটি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যে সকল সেবা সরকার কর্তৃক প্রদান করার কথা ছিল, সে গুলো ব্যক্তিগত বিশেষত: আওকাফের মত প্রতিষ্ঠানের বদান্যতামুলক উদ্যোগে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বাজার প্রতিষ্ঠা ও আরো অনেক জনকল্যানমুলক কাজ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। আওকাফ ছাড়াও, জাকাত ও ছাদগা গরীব ও দুস্থদের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হতো। ইসলামী মুল্যবোধে দান, ভ্রাতৃত্ত্ববোধ ও নিপীড়তের জন্য সহমর্মিতার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদানের কারনে মুলত: এরুপ ঘটেছিল। বিশৃংখলা, অরাজকতা ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার সময় এরুপ বদান্যতা না দেখানো হলে গরীব ও গণউচ্ছেদের শিকার ব্যক্তিগণের অবস্থা সম্ভবত: ভীষণ খারাপ হতো।

উলেমাগণ মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোকে ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা অব্যাহত রাখলেন। তবে, মসজিদ, মাদ্রাসা ও শুক্রবারের খুতবা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী অধিক সংখ্যক জনগণকে (N) শিক্ষা প্রদান ও সংস্কার করার মত বৃহদাকার কাজের জন্যে যথেষ্ট ছিল না। ইসলামী বিশ্ববীক্ষা (Islamic world view) ও মুল্যবোধে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে এরুপ ধর্মান্তরিত লোকজনের জন্য প্রয়োজন ছিল আরো বিধিবদ্ধ ও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা ব্যতীত তাদের নৈতিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। যেহেতু এরুপ ব্যবস্থা ছিল না, সেহেতু, জনগণ নিজস্ব পথ ধরেই চলতে

www.pathagar.com

থাকলো, এবং ইসলাম বাতিল বা সংস্কার করতে এসেছিল এমন অনেক জীবন-ধারা শুধু কেবল অব্যাহতই থাকলো না, এমনকি ইসলামের সহিত সম্পৃক্ত হয়ে গেল। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উলেমাগণ যোগাড় করতে সম্ভবত: সফল হয় নি, বিশেষত: যখন অর্থনীতির অবস্থাও খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতা

প্রতীয়মান যে, মুসলমানরা তাদের নিজের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের মুল কাজ হচ্ছে অবক্ষয়ের মূখ্য কারণগুলো দুর করা। তবে, চক্রাকার কার্য-কারণ সম্পর্কের তৎপরতার কারনে অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতাই বর্তমানে একমাত্র সমস্যা নয়। অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতার কারনে মুসলিম সমাজে যে সকল দ্বন্দ্ব, টানা-পোড়েন ও ত্রুটিসমুহ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো এখনও অব্যাহত আছে। নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্ব পেছনে পড়ে আছে। অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটানো হলেও শুধুমাত্র সে কারনে সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান ঘটবে না। তবে, তার ফলে জবাবদিহি নিশ্চত করন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন ও জনগণের সম্পদ আরো কার্যকরভাবে শিক্ষা, নৈতিক ও বস্তুগত উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যানের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ব্যয় ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হতে পারে, তার ফলে জাতি গঠনমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব হতে পারে। সরকারগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হ্রাস করতে বাধ্য হতে পারে। তবে, তা হচ্ছে না।

সামরিক একনায়কতন্ত্র ও কতিপয় অবৈধ সরকার মুসলিম বিশ্ব থেকে অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর করার বদলে ইসলামকেই বিতাড়িত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ন্যায়বিচার, নৈতিক সংস্কার, রাজনৈতিক জবাবদিহি ও দুর্নীতি দুর করার উপর গুরুত্বারোপ করার কারনে ইসলাম এ সকল একনায়কদের পছন্দ নয়। রাষ্ট্রীয় দমন নীতি প্রয়োগ করে তারা ইসলামকে বিতাড়িত কিংবা অবদমিত রাখতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এ রকম প্রয়াস চালানো হয়েছে তুরস্কে। কামালবাদ (কামাল আতাতুর্কের মতবাদ) তুরস্ককে একটি অনৈসলামিক পরিচিতিতে সাজাতে চেয়েছিল। ১৯২৪ সালে জনমত উপেক্ষা করে তুরস্কে খিলাফত প্রথা বাতিল করা হয়।[১৫৬] এর ফলে একটা আধ্যাত্মিক শুন্যতা দেখা দেয়, যার ফলে মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের জরুরী উপাদানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।

---

[১৫৬] দেখুন, Ozay Mehmet, 1990।

www.pathagar.com

তবে, কামালবাদ মুসলমানদের পতনের মুল কারণ অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। গণতন্ত্রের মধ্যেও সামরিক বাহিনীই আসল ক্ষমতার মালিক ছিল। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে চার বার ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮১ ও ১৯৯৭ সালে সামরিক বাহিনী যথাযথভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। জবাবদিহিতার অভাব ও জনগণের সম্পদের অপচয় চলতেই থাকলো। একইভাবে মুসলমানদের পতনের মূখ্য কারণগুলোর মধ্যে একটি অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যয় চলছেই। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তুরস্কের সেনাবাহিনী (যুক্তরাষ্ট্রসহ) ন্যাটো জোটের দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম।[১৫৭] কুর্দিশ যুদ্ধের কারনে, যা এখন পনের বছরে পদার্পন করেছে, তুরস্ককে প্রতি বছর মোট দেশীয় উৎপাদনের তিন শতাংশ ব্যয় করতে হচ্ছে, যা তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের মোট পরিমানের চেয়েও বেশী।[১৫৮] ফলে দেশটি অত্যন্ত বেশী পরিমান বাজেট ঘাটতি মোকাবেলা করছে, দুর্নীতিপরায়ন সুলতানদের আমলের চেয়েও যা বেশী। অতীতে মুদ্রা ছাপানো সম্ভব ছিল না। সীমিত পরিমানে মুদ্রার দাম কমানো সম্ভব ছিল। সুতরাং, সরকার বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্যে কেবল মাত্র ঋণ গ্রহণ করতে পারতো। উনবিংশ শতাব্দির তৃতীয় ভাগে এরুপ ঋণের পরিমান অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে, বর্তমানে মুদ্রা ছাপানো সম্ভব হয়েছে, সুতরাং, সরকারের পক্ষে মুদ্রা ছাপানো ও ঋণ গ্রহণ উভয়ই সম্ভব হচ্ছে। যেহেতু, এভাবে অর্জিত সম্পদ সাধারনত: দুর্নীতি, অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় ও অব্যবস্থাপনার কারনে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হতো, সেহেতু, মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল খুব বেশী। তৎসহ ঋণ ও ঋণের সুদের বোঝা ছিল অনেক বড়। বাজেটের সবচেয়ে বড় খাত ছিল সুদ পরিশোধ, যা কর রাজস্বের অর্ধেকের বেশী খেয়ে ফেলে।[১৫৯] বিগত চার দশকে বিনিময়ের হার অবমুল্যায়িত হয়ে ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে প্রতি ডলারে ৩ ও ৯ লিরা থেকে ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে ৩,৮০,৯৯৭ লিরায় নেমে এসেছে।[১৬০]

---

[১৫৭] The Ecocnomist, 19 July, 1997, p. 19.

[১৫৮] Amir Taheri, "Turkey Experiences Own Kuliurkamf", Arab News, 7 August 1997. IMF - এর Government Finance Statistics Yearbook, 1996 থেকে এ বিবৃতি যাছাই করা সম্ভব হয় নি, কারন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় উল্লেখ করা হলেও "Public Order and Safety" খাতের বিপরীতে খালি রাখা হয়েছে (Line 3 of Table B on p. 391)। সুতরাং, প্রতিরক্ষা, জন- শৃংখলা ও জন- নিরাপত্তা খাতে মোট ব্যয় জানা সম্ভব নয়।

[১৫৯] John Barham, "Turkey: Still Reluctant to Grasp Inflation Nettle", Financial Times, 9 October, 1997.

[১৬০] IMF, Internatinal Financial Statistics, CD-ROM, and June 1999, p. 759.

www.pathagar.com

সুতরাং, জেনারেলদের সরকার থেকে দুর্নীতিবাজ সুলতানদের সরকারের পার্থক্যটা কোথায়? নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি সম্পাদকীয় যথার্থই মন্তব্য করেছে যে: "সামরিক বাহিনী সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো জনতার গভীরে স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্রমাগতভাবে তারা সাধারন তুর্কীদের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুর্নীতি কারনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিপরিতক্রমে, এরবাকানের কল্যান পার্টি তুরস্কের অনেক বড় বড় শহরে তুলনামূলকভাবে ন্যায়পরায়ন ও কার্যকরী মিউনিসিপ্যাল সরকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এর গনভিত্তি বৃদ্ধি করেছে"।[১৬৩] এভাবে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর প্রয়াস তুরস্ককে আরো বেশী রাজনৈতিক দুর্নীতি, মুদ্রা-স্ফীতি ও সামাজিক সংগাত ছাড়া আর কিছুই দেয় নি।

তবে, তুরস্ক কোন ব্যতিক্রম নয়। এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে কারণ ছয় শ' বছরেরও বেশী সময় ধরে তুরস্ক মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, এবং একটি মুসলিম দেশে মুসলিম সরকার কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে ইসলামকে হটিয়ে দেওয়ার প্রথম ঘটনা তুরস্কেই ঘটেছিল। তবে, উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে: "কামালবাদ যদিও বা চেয়েছিল ইসলাম শেষ হয়ে যাক, কামালবাদ তা করে নি এবং ভবিষ্যতেও তা করার সম্ভাবনা নেই, কারণ তখন মানবাধিকারের বিনাশের পরিবর্তে বিকাশ ঘটবে"।[১৬৪]

উন্নতির যে শিখরে তুরস্ক পৌছেছিল সেখান থেকে পতন হওয়া সত্বেও তুরস্ক এখনও মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর একটি, যার আরো উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এর রয়েছে মৌলিক গণতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় অবকাঠামো, যা দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে সেনা-নায়কদের হস্তক্ষেপের কারনে যারা শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ইসলাম-বিরোধীও বটে। ইরাক ও সিরিয়ার মত অন্যান্য দেশগুলো আরো বেশী বৈষম্য ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার শিকার, কারণ সেখানে তুরস্কের মত মৌলিক গণতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামো নেই, এবং সেখানে মত প্রকাশের আদৌ কোন স্বাধীনতা নেই ও সেখানে স্বৈর-শাসকগণ আরো বেশী নিষ্ঠুর ও নীতিহীন।

---

[১৬৩] New York Times-এর "Civilian Rule for Turkey" শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে International Herald Tribune, 26 March 1996, p. 6-এ হুবুহু ছাপানো।
[১৬৪] Ozay Mehmet, 1990, p. 125.

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সাম্প্রতিক পুনর্জাগরণ : একটি সমীক্ষা

সূচনা

দ্রুত গতিতে উন্নয়নশীল পাশ্চাত্য সভ্যতা পতনশীল মুসলিম বিশ্ব থেকে জ্ঞানের প্রদীপের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং তা আরো অধিক দ্যুতিময়তার সহিত জ্বালিয়ে রাখে। সামাজিক বিজ্ঞানসহ সকল শ্রেনীর বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৮৯০ সালে আলফ্রেড মার্শালের 'প্রিন্সিপলস অব ইকনোমিকস' প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথাগত অর্থনীতি একটি আলাদা শাস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল[১], এবং তখন থেকেই দ্রুত গতিতে তার লক্ষ্যণীয় উন্নতি হতে থাকে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিগুলোও দীর্ঘ সময় ধরে সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়ে আসছিল, যার ফলে সম্পদের বিরাট প্রসার ঘটেছিল।

তবে, অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, প্রচুর অর্থপূর্ণ ও প্রশংসনীয় প্রয়াস সত্বেও সকলের অভাব মেটানো এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো সম্ভব হয় নি। তাছাড়া সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বড় ধরনের সামাজিক মুল্যের বিনিময়ে। অপরাধ, তালাক, কিশোর অপরাধ, মানসিক অসুস্থতা, মাদকাসক্তি, সামাজিক অস্থিরতা ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার সকল লক্ষ্যনসমুহ বেড়ে যেতে থাকলো। এমনকি পরিবারগুলো ভেঙ্গে যেতে লাগলো এবং সামাজিক সংহতি দুর্বল হতে থাকলো। এখন যেহেতু সর্বত্র কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারনা থেকে সবাই সরে আসছে সেহেতু, ক্রমবর্ধমান হারে আশংকা বাড়ছে যে দরিদ্র ও সুবিধা- বঞ্চিত মানুষদের অবস্থা আরো খারাপ হবে এবং তার ফলে সামাজিক বন্ধনের আরো অবনতি ঘটবে। পাশ্চাত্যের প্রতি সুবিচার করলে বলতে হয় যে, কেবল মাত্র তারাই এ সকল যন্ত্রণা ভোগ করছে না। অন্যান্য সকল সমাজই এ ধরনের সমস্যায় বিভিন্ন মাত্রায় জর্জরিত। এর ফলে এরুপ একটা ধারনার সৃষ্টি হয় যে, কোথাও কোন একটা মৌলিক ভুল রয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের মডেলে অবশ্যই সব কিছু সঠিক নয় যদিও তা এখন বৈশ্বিক রুপ লাভ করেছে। সুতরাং মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যকে ভাল ভাবে যাছাই করবে, এবং আরো দরদী অর্থনৈতিক পদ্ধতির জন্য যা যা দরকার সেগুলো গ্রহণ করবে এবং অন্যগুলো বাতিল করে দেবে।

শত শত বছরের নীরবতা

সে যাহাই হোক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্বের বা মুসলিম বিশ্বের কল্যাণের উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব কোন প্রকার বাছ- বিচার না করেই পাশ্চাত্যের সব কিছুই গ্রহণ করা শুরু করলো। এটা প্রত্যাশিত ছিল। ইবনে খালদুন যথার্থই বলেছিলেন যে, বিজিত বিজয়ীর অধিকাংশ

---

[১] শুমপেটার, ১৯৫৪, পৃ: ২১। ব্লাউগের (১৯৮৫, মতে অর্থনীতি (১৮৮০'র দশকে একটি পাঠ্য শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল (পৃ।(৩ :

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুকরন করে থাকে[২]। মুসলিম বিশ্ব এর কোন ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম বিশ্ব এমনকি অর্থশাস্ত্রসহ সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ আমদানী করলো, তাদের ধর্ম- নিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক বিশ্ব- বীক্ষা পরিশোধন না করেই। ইবনে খালদুন ও তার মুসলিম পুর্বসুরী ও উত্তরসুরীগণ কর্তৃক গুরুত্ব দেওয়া সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনের কাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত নৈতিক মুল্যবোধসমূহের মধ্যকার অর্ন্তনিহিত সম্পর্ক যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় নি।

পাশ্চাত্যের মত একই বিষয়বস্তু নিয়ে এবং ইসলামিক শিক্ষার আলোকে কোন মুল্যায়ন ছাড়াই এবং এ বিষয়ে মুসলিম পন্ডিতগণের অবদানের কোনরুপ উল্লেখ ব্যতীতই মুসলিম দেশের স্কুল ও কলেজসমূহে অর্থশাস্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ানো হচ্ছে। উদাহরণত: ছাত্ররা অর্থশাস্ত্রের জনক হিসেবে এডাম স্মিথের (১৭২৩- ৯০) নাম শুনে থাকে, আরো শুনে থাকে রিকার্ডো (১৭৭২- ১৮২৩), মালথাস (১৭৬৬- ১৮৩০), মার্শাল (১৮৪২- ১৯২৪) এবং কেইনসের (১৮৮১- ১৯৪৬) নাম, কিন্তু, কদাচিত তারা মুসলিম পন্ডিতগণের অবদান শুনে থাকে, কারন প্রত্যাশিতভাবেই পাশ্চাত্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যবইতে কদাচিত এ সকল পন্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মুসলমানদের অবদান যথাযথভাবে প্রকাশ না করার জন্য মুসলমানগন যেমন দায়ী[৩], তেমনি মানবজাতির জ্ঞানের অগ্রগতিতে অন্য সভ্যতার অবদানকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য পাশ্চাত্যও দায়ী।

অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস লিখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণের মধ্যে এরুপ অনুমান করার প্রবনতা দেখা যায় যে, গ্রীক ও স্কলাস্টিকসদের মাঝের সময়টা বন্ধা ছিল। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান- আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জোসেফ সুমপেটার তার হিস্ট্রি অব ইকনোমিক এনালাইসিস নামক পুস্তকে গ্রেকো- রোমান অবদান পর্যালোচনা করার পর মুসলিম যুগ সম্পুর্ণ উপেক্ষা করেন পাঁচশত বছরের বিরাট শুন্যতা লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে সেন্ট থমাস একুইনোর (১২২৫- ৭৪) যুগে চলে এসেছেন[৪]। তবে বাস্তবতা হচ্ছে যে,

---

[২] ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ১৪৭।

[৩] অর্থশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সনাক্ত করার জন্যে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। দেখুন, উদাহরণত: জোসেফ স্পেশলার, ১৯৬৪; ডি- সমগী, ১৯৬৫; মিরাখর, ডিসেম্বর ১৯৮৭; আহমদ ও আওয়ান- এ সিদ্দিকী, ১৯৯২; এবং ইসলাহি, ১৯৯৬। তবে, যতক্ষণ না এরুপ আরো কিছু লেখা পশ্চিমা সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছে, ততক্ষণ এগুলোর প্রভাব খুব বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, মুসলিম অর্থনৈতিক ইতিহাস ও বিশেষত: মুসলিম অর্থনীতির অবক্ষয়ের কারনের উপর খুব কমই লেখা হয়েছে।

[৪] শুমপেটার, ১৯৫৪, পৃ: ৭৩- ৭৪; আরো দেখুন, মিরাখর, ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ: ২৪৬- ৯।

www.pathagar.com

স্কলাস্টিসিজম (যা কিনা দেখাতে চেয়েছিল যে, বিশ্বাসের একটা যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে এবং বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোন অর্ন্তগত বিরোধ নেই) মুসলিম বিশ্বের যুক্তিবাদি আন্দোলনের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিল। ইবনে সিনা(মৃত্যু ৪২৮/১০৩৭), ইবনে রুশদ(মৃত্যু ৫৯৫/১১৯৮), মেইমনাইডস (মৃত্যু ৬০০/১২০৪)[৫] প্রমুখের নাম ত্রয়োদশ শতকের সকল দার্শনিক- পন্ডিতগণের লেখার পাতায় পাতায় পাওয়া যায়[৬]। এমনকি জ্ঞানের জগতে গ্রীকদের অবদান এককভাবে পাশ্চাত্যে যায় নি, সেগুলোর উপর মুসলমানদের সুচিন্তিত মতামত ও অবদানও সাথে গিয়েছিল।

যেহেতু সুমপেটারের বইটি অর্থনীতির উপর একটি ক্লাসিক, সেহেতু তা অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তা জগতের ইতিহাসে একটা অজ্ঞতার কেন্দ্র বিন্দু (blind spot) সৃষ্টি করলো[৭]। এ অজ্ঞতার কেন্দ্র বিন্দু আজ অবধি থেকে গেল, যেমনটা প্রতিভাত হয়েছে ডগলাস নর্থের ১৯৯৩ সালের নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে, যখন তিনি "পাশ্চাত্যের রোমান যুগের অবসান থেকে শুরু করে পাঁচশত বছর পরের পাশ্চাত্যে জ্ঞান- বিজ্ঞানের পুর্ণজাগরন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের শুন্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন"[৮]। বোঝা কঠিন কেন এ সকল পন্ডিতগণ উপলব্ধি করতে পারেন না যা এক হাজার বছরেরও আগে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আবু বকর আল রাজি (মৃত্যু ৩১৩/৯২৫) বুঝেছিলেন যে, জ্ঞান চর্চার ইতিহাস একটা চলমান প্রক্রিয়া যা পুর্ববর্তি প্রজন্মের পন্ডিতগণের স্থাপিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে।[৯] মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের এ প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা গেলে সুমপেটার ও নর্থ এ রুপ বিরাট শুন্যতা বা পাঁচশত বছরের ছেদ অনুভব করতেন না, বরং স্কলাস্টিকস্ ও পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ যে ভিত্তির উপর তাদের জ্ঞানের প্রাচীর নির্মান করেছিলেন তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন। এটা মুসলমানদের জন্য গর্বের বিষয় যে, যদিও তারা নিজেরা যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন তবুও তারা গ্রীক, পারস্য, ভারতীয় ও চীনা পন্ডিতগণের ঋণ স্বীকার করেছেন, যাদের স্থাপিত ভিত্তির উপর জ্ঞানের অট্টালিকার বিনির্মান হয়েছিল। এমনকি এরুপ অস্বীকৃতির চেয়েও খারাপ ঘটনা ঘটেছে যখন অনেক 'মুসলিম শ্রেষ্ঠ রচনা' পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ অনুবাদ করেছিলেন এবং নিজেদের মৌলিক রচনা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছিলেন[১০]। অন্তত: কিছুটা হলেও এটি বর্তমানে অনুধাবন করা হচ্ছে, এবং মন্টগোমারি ওয়াট যথেষ্ট খোলাখুলিভাবেই তার গ্রন্থ The Influence of

[৫] একজন ইহুদী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক, যিনি মুসলিম স্পেনে ও পরে মিসরে বেশ সফল হয়েছিলেন।
[৬] পাইপার, ১৯৭৮, পৃ: ৩৫৬।
[৭] মিরাখর, ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ: ২৪৮।
[৮] নর্থ, ১৯৯৪, পৃ: ৩৬৫।
[৯] রোজেনথাল কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৪৭, পৃ: ৬৮
[১০] দেখুন, সেজগিন, ১৯৮৩; নর্মান, ১৯৬০ ও ১৯৭৫।

www.pathagar.com

Islam on Medieval Europe-এ বলেছেন যে, "পাশ্চাত্যের খৃষ্টিয় জগতে ইসলামের প্রভাব সচরাচর যতটুকু অনুধাবন করা হয় তার চেয়ে বেশী", এবং "আমরা পশ্চিম ইউরোপের লোকজন যখন এক বিশ্বের যুগে প্রবেশ করছি, তখন আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে........ আরব জাতি ও ইসলামিক বিশ্বের নিকট আমাদের ঋণের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা"।[১১]

নিদ্রা- ভঙ্গ

দ্বিতীয় বিশ্ব- যুদ্ধের পর পশ্চিমাদের রাজনৈতিক অর্গল থেকে মুসলিম দেশগুলো ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকলে ইসলামের পুর্ণজাগরণ শুরু হয়। এর ফলে প্রতীয়মান যে, শত শত বছর ও পরবর্তিকালে পাশ্চাত্যের অর্গল ও ইসলামকে বাতিল করার সকল প্রয়াস ইসলামের প্রতি মুসলমানদের অর্ন্তগত অনুরাগ নস্যাত করতে সক্ষম হয় নি। দেহ ক্ষত- বিক্ষত ও দুর্বল হলেও জীবনী- শক্তি সজীব থেকেছে[১২]। বৈদেশিক শাসনের দীর্ঘ সময় কালে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ঐ সকল আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের চুল- চেরা মুল্যায়ন করা প্রয়োজন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সে গুলো ইসলামি বিশ্বাস ও মুল্যবোধের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এবং সেগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই ত্বরান্বিত করতে সক্ষম নয়, প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতেও সক্ষম।

ইসলামি অর্থশাস্ত্রের বিকাশের আহ্বান এরুপ পুর্ণজাগরনের অংশ মাত্র। আবারও ইসলামি অর্থনীতি সামনে হাজির হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বহু বিখ্যাত পন্ডিতগণের মুল্যবান ব্যক্তিগত[১৩] অবদান এ শাস্ত্রের পৃথক পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবশ্যকীয় গতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ১৯৭৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম আর্ন্তজাতিক ইসলামি অর্থনীতি সম্মেলন আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে প্রভাবকের ভুমিকা পালন করেছিল এবং এ বিষয়ে প্রচুর রচনা ও লেখা- লেখির সূচনা করেছিল।

এ সম্মেলনসহ আরো কয়েকটি সম্মেলন ও সেমিনারে খুরশিদ আহমাদ ও মোহাম্মদ ওমর জুবায়ের অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিলেন, যা এ শাস্ত্রের উন্নতিতে গতি সঞ্চার করেছিল।

---

[১১] ওয়াট, ১৯৭২, পৃ: ৮৪।

[১২] দেখুন, এম ফাহিম খানের মধ্যে আল- জারহি, ১৯৮৮, পৃ: ১৬২

[১৩] এ রকম কতিপয় প্রাচীন লেখক হচ্ছেন: পাক- ভারত উপ- মহাদেশের হিফয আল- রহমান সেওরবি (১৯৩৯), আনোয়ার ইকবাল কুরেশী (১৯৪৫), সৈয়দ মানাজির হাসান গিলানী (১৯৪৭), শেখ মাহমুদ আহমদ (১৯৪৭), এম ইউসুফ উদ্দিন (১৯৫০), সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (১৯৫৯); এবং আরব বিশ্বে শেখ মুহম্মদ আল- গাজ্জালী (১৯৪৭), হাসান আল বান্না (১৯৫২), মুস্তাফা আল- সিবা (১৯৬০), ইসা আবদুহ (১৯৬০), বাকির আল- সদর (১৯৬১), ও মাহমুদ আবু সৌদ (১৯৫৭)। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতুরস্ক , ও নাইজেরিয়ায় অনেক মুল্যবান অবদান রয়েছে।

www.pathagar.com

এরুপ মহান প্রয়াস ও ইসলামি অর্থশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান রাখার কারনে ১৯৮৮ ও ১৯৯৫ সালে উভয়ের ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার অর্জন যথার্থ স্বীকৃতি।[১৪] এ সম্মেলনে উপস্থাপিত বর্তমানে বিখ্যাত ও বহুল উদ্ধৃত এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মুসলিম অর্থনীতি চিন্তার সমীক্ষা[১৫] সম্মেলনে আলোচনার মুল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যত বিকাশের প্রভাবক ছিল। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল[১৬]। এ গুলোর মধ্যে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্র ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তাদের বিরাট অবদানের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৩ সালে ইসলামি অর্থশাস্ত্রে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

আদর্শ ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন, এর কর্মপদ্ধতিগুলো কী, সমাজতন্ত্র ও পুঁজীবাদের সাথে এর পার্থক্য কী, এবং কেন এটা ইসলামের মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনে আরো সফল হতে পারে - এগুলো ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল[১৭]। এরই মধ্যে আদর্শ ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রুপরেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ আলোচনাই তাত্ত্বিক ধরনের – ইসলামের দীক্ষার আলোকে সকল অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর (ব্যক্তি ও সংসার, প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠানসুহ, বাজার ও সরকার) আচরন কিরুপ হবে। মাঝে মাঝে আলোচিত হয়েছিল কতিপয় ঐতিহাসিক তথ্যাদি যা দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে, অন্তত: আংশিকভাবে হলেও বিভিন্ন

---

[১৪] ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে অন্য যাঁরা IDB পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন: এম ওমর চাপরা (১৯৮৯), এম আনাস জারকা (১৯৯০), ইউসুফ আল- কারাদাবি (১৯৯১), সাবাহউদ্দিন জাইম (১৯৯২), ইসলামী অর্থশাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩), রফিক আল- মিস্রি (১৯৯৭), মুহাম্মদ হাবিব আল- খোজা (১৯৯৯৮)।

[১৫] সিদ্দিকী, ১৯৮১।

[১৬] এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীদের এসোসিয়েসন, (১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত); ইসলামিক ফাউন্ডেসন, লেষ্টার, যুক্তরাজ্য (১৯৭৩); ইসলামী অর্থশাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা (১৯৭৭); The International Institute of Islamic Thought, হার্ন্ডন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৮১); The Islamic Research & Training Institute of IDB (1983); The International Institute of Islamic Economics, ইসলামাবাদ (১৯৮৩); কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ইকোনোমিক্স, (১৯৮৩); এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতি সমিতি (১৯৮৪)। (বিস্তারিতের জন্য দেখুন: ইন্তালসিনতাস -৩৩ :পৃ ,১৯৮৬ , ।(৭

[১৭] নজির এত বেশী সংখ্যক যে এখানে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বেছে নেয়ার জন্যে আগ্রহী পাঠকগণ পুস্তক- বিবরণী দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

সময়ে ব্যবস্থাটি মুসলিম বিশ্বে আগে থেকেই বিরাজমান ছিল, এবং তা ইতিবাচক ফল দিয়েছিল। এটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ছিল। সমাজের বিশ্ব-বীক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অর্থশাস্ত্র এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে ইসলামের বিশ্ব-বীক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ব্যতীত ইসলামি অর্থনীতি সম্ভবত: সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াতো। আনাস জারকার মতে, প্রকৃত পক্ষে, ইসলামি অর্থশাস্ত্র এক দিকে "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অন্য দিকে তার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ"।[১৮]

প্রথম ভাগ: মুদ্রা, ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতি

যে বিষয়ে সবচে বেশী তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাজ হয়েছে তা হচ্ছে মুদ্রা, ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতি। এগুলো যে সকল প্রশ্নের জন্ম দেয় তার অনেকগুলো ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।[১৯] এগুলোর কতিপয় হচ্ছে 'রিবা'র তাৎপর্য সংক্রান্ত, কেন তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিভাবে তা অর্থনীতি থেকে দুর করা যায়, তা দুর করার জন্য এ যাবত গৃহীত ব্যবস্থাসমুহ কতটা সফলতা অর্জন করেছে, এবং তা দুর করার পর ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যদিও এ সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানের লক্ষ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তবু সকল প্রশ্নের পরিপূর্ণ সন্তোষজনক জবাব প্রদান করা এখনও সম্ভব হয় নি। কাজটি কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ, এবং সকল প্রশ্নের জবাব প্রদান করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

'রিবা'র জটিল প্রশ্ন

এ সকল প্রশ্নের মধ্যে সম্ভবত: 'রিবা'র সংজ্ঞাই অধিকাংশ মনযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে, কুর-আন বা সুন্নায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কোন দ্ব্যর্থতার কারনে তা ঘটেনি। সেটা স্পষ্ট এবং ইতিহাসে মুসলমানদের ভেতর বিদ্যমান ঐক্যমত্যের মধ্যে এটা প্রতিফলিত হয়েছে যে 'রিবা' নি:সন্দেহে নিষিদ্ধ। তবে, যে প্রশ্নটি বারবার ওঠে তা হচ্ছে: 'রিবা' বলতে কি বোঝায়? পুরো মুসলিম ইতিহাস ব্যপী ইসলামের সকল পন্ডিতগণের মধ্যে ঐক্যমত্য ছিল যে, রিবা বলতে সকল প্রকার সুদকে বোঝায়।[২০] তবে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে বৈদেশিক দখলদারিত্ব অবসানের পর এবং বিশেষত: পশ্চিমা সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থা বিশ্বের মুদ্রা বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করার কারনে মাঝে মাঝে এমন কিছু পন্ডিত রয়েছেন যারা মনে করেন পরিবর্তিত অবস্থার কারনে বিষয়টি সম্পর্কে পুণরায় চিন্তা-ভাবনা করার

---

[১৮] জারকা, IRTI, ১৯৮৬, পৃ: ৫২।

[১৯] সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতির সার-সংক্ষেপের জন্য দেখুন: ইসলামিক ব্যাংকিং-এর জন্যে জেড আহমদ (১৯৯৪); মুদ্রানীতির জন্য খান ও মিরাখর (১৯৯৪), ও চাপরা (১৯৯৬)।

[২০] সুদের উপর (রিবা) পাকিস্তানের ফেডারেল শরীয়াহ আদালতের রায় দেখুন, ১৯৯২, পৃ: ৬২ ও ৬৪। আরো দেখুন: নাবিল সালেহরিবা ।৪৮ ও ১২ :পৃ ,১৯৮৬ ,'র বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার জন্যে দেখুন, চাপরা।৬৬-৫৫ :পৃ ,দ্বিতীয় অধ্যায় ,১৯৮৫ ,

www.pathagar.com

প্রয়োজন রয়েছে। যুক্তির সারমর্ম হচ্ছে বর্তমান যুগের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যে সুদ লেন- দেন হয় তা জাহেলিয়ার যুগের মত নয়, এবং সে কারনে রিবার ব্যাখ্যা প্রদানে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনার প্রয়োজন।[২১] আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মোহাম্মদ আসাদের মত কতিপয় বিখ্যাত ও অতি শ্রদ্ধেয় কুরআন অনুবাদকগণ রিবাকে সুদ প্রথা না বলে অতি মাত্রার সুদ ব্যবসা হিসেবে অনুবাদ করেছেন। অন্যান্য পন্ডিতগণ এরূপ অনুবাদের যথার্থতার স্বপক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তবে, সুদ প্রথা ও মাত্রাতিরিক্ত হারের সুদ ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়াস ভীষণ ধারনাগত জটিলতার সৃষ্টি করেছে। একটি দেশে বাজার নিয়ন্ত্রিত সুদের হার নির্ভর করে ঋণের চাহিদা ও সরবরাহের উপর, জড়িত ঝুকির প্রকৃতি ও পরিমানের উপর এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর। সুতরাং, যদি সুদ গ্রহনযোগ্য হয় তবে তার বাজার নিয়ন্ত্রিত উচ্চ বা নিম্ন হারও অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সুদের ব্যবসার নিন্দা করা চলবে না।

সুদ- প্রথাকে জায়েজ করার জন্যে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ এখন পর্যন্ত শরিয়ার পন্ডিত ও অধিকাংশ আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদগণের মতামতে চিড় ধরাতে সক্ষম হয়নি, যারা রিবার বিষয়ে ঐতিহাসিক মতৈক্যকে তুলে ধরছেন। রিবার উপর আলোচনার জন্যে আইনবিদগণের অংশগ্রহণে অনেকগুলো আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৯৫১ সালে প্যারিসে ও ১৯৬৫ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত মুতাম্মার আল ফিকহ আল ইসলামি, এবং ১৯৮৫ সালে ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে কায়রো ও মক্কায় অনুষ্ঠিত ও আই সি এবং রাবিতা ফিকহ কমিটির সভাসমূহ। এ সকল সভার সর্বসম্মত রায় হচ্ছে রিবা বলতে সুদ বোঝায়।[২২] এ সকল রায়গুলো অগণিত ধর্মীয় পন্ডিতগণের অকুন্ঠ সমর্থন পেয়েছে, যার ফলে সেগুলো প্রায় ইজমার (ঐক্যমত্য) বৈধতা পেয়ে গেছে। পাকিস্তানের অর্থনীতি থেকে সুদ প্রথা বাতিল করার জন্যে পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ইসলামিক আইডিয়লজি ১৯৮০ সালে প্রদত্ত প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে এ মতামত প্রকাশ করেছে:

---

[২১] সম্ভবত: স্যার সৈয়দ আহমদ খানই (১৮১৭- ৯৮) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সুদ রিবা নয় (বালিয়ন, ১৯৬৪, পৃ: ৪৫- এ উল্লিখিত তাঁর তাহফিম আল- কুর- আন, প্রথম ভাগ, পৃ: ৩০৬, ১৮৮০- ১৮৯৫, দেখুন)। এম মারুফ আল- দাওয়ালিবি ১৯৫১ সালে প্যারিসে মুতাম্মার আল- ফিকহ আল- ইসলামি- তে একইপ্রকম যুক্তি দেখিয়েছিলেন (দেখুন, আল- সানহুরি, ১৯৫৩- ৪, ৩য় খন্ড, পৃ: ২২৭- ৪৯)। এ লেখাটির কিছুটা সংশোধিত ভাষ্যের জন্যে দেখুন: আলক অন্যদের মধ্যে যারা একই পদাং ।১৯৮৮ ,দাওয়ালিবি - অনুসরন করেছেন তারা হচ্ছেন: ফুলারবি, ১৯৫৯ ;১৯৬৭ ,শাহ ;১৯৬৪ ,ফজলুর রহমান ; এবং ;১৯৯২ ,এম আলী খান ;১৯৭৯ ,কাতোজিয়ান সায়ীদ, ১৯৯৫।

[২২] দেখুন, আল- সানহুরী, ১৯৫৩- ৪, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৪১- ২ এবং আল- কারাদাবি, ১৯৯৪, পৃ: ১২৯- ৪২। ১৯০০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত রিবার উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহের জন্যে আরো দেখুন ।৬০ -৩৫ :পৃ ,১৯৯৪ ও ১৯৯০ ,গাজ্জালী -আবদেল হামিদ আল ,

www.pathagar.com

"ভোগের জন্যে হোক বা উৎপাদন খাতে ব্যবহারের জন্যে হোক, ব্যক্তিগত হোক বা বাণিজ্যিক হোক, গ্রহীতা সরকার বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হোক, এবং সুদের হার কম বা বেশী যাই হোক সকল প্রকার ঋণের সুদের রিবা শব্দটির অন্তর্ভুক্ত"।[২৩]

তথাপিও ভিন্নমত প্রকাশিত হয়েই যাচ্ছে। এর পেছনে সম্ভবত: এরূপ একটা ধারনা লুকিয়ে আছে যে, সুদ বিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়ত: চলবে না, এবং মুসলিম দেশসমুহ থেকে সুদ প্রথা তুলে দেওয়ার প্রয়াস দেশগুলোর আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে দিতে পারে ও নিজেদের উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। এ রকম মতামত প্রকাশ হতেই থাকবে, এবং তা বেশ গতিও পেতে পারে যতক্ষন না মুসলমানেরা একটা টেকসই বিকল্প বের না করছে বা বিদ্যমান পাশ্চাত্যের আর্থিক ব্যবস্থা তীব্র কোন সংকটের মধ্যে পতিত হয়। এরূপ সংকট হলে পাশ্চাত্যেও সম-মুলধনের প্রতি সমর্থন ও মেয়াদী প্রকল্পের জন্য ঋণের উপর, বিশেষত: স্বল্প মেয়াদী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে।[২৪] তবে এরূপ ভিন্ন মত পোষণ করা ভাল লক্ষণ যা শুধু কেবল সুদ প্রথা বাতিলের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারনাই দেয় না, সুদ বিহীন ব্যবস্থার উদ্যোগকে আরো বাস্তব ভিত্তিক করে ও দেখে-শুনে অগ্রসর হতে চায় এরুপ একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এর বাইরে ভিন্নমতের তেমন কোন গুরুত্ব নেই যতক্ষণ না সুদের স্বপক্ষে কোন ঐক্যমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত না হয়। যেহেতু আর্ন্তজাতিক অর্থ ব্যবস্থা একটার পর একট সংকট মোকাবেলা করছে, ইসলামের পুর্ণজাগরন গতি পাচ্ছে, এবং মুসলিম বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, সেহেতু এরুপ কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বিকল্প

সুদ প্রথার বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য স্বভাবত:ই বর্তমান সুদ-ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকল্প সম্পর্কে প্রচুর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সম-মুলধনের উপর বেশী ও ঋণের উপর কম নির্ভরশীল প্রস্তাবিত পদ্ধতি মুদরাবা (নিষ্ক্রিয় অংশীদার), মুশরাকা (সক্রিয়

---

[২৩] কাউন্সিলের প্রতিবেদন দেখুন, ১৯৮০, পৃ: ১। পাকিস্তানের ফেডারেল শরীয়াহ আদালত রায়ে আরো বলেছে যে, 'ইংরেজী পরিভাষার মত রিবা বলতে কুসীদ ও সুদ ব্যবসা উভয়কেই বোঝায়", ১৯৯২, পৃ জন্যে বিস্তারিত আলোচনার র উপররিবা। ৬২ :সুদের উপর ফেডারেল শরীয়া আদালতের রায় দেখুন, ১৯৯২, পৃ: ৩১-১০৯ এবং চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ৫৫-৬৬ ও ২৩৫-৪৬।

[২৪] পাশ্চাত্যে সম-মুলধন ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার সপক্ষে ইতিমধ্যে প্রকাশিত মতামতের জন্যে দেখুন: হেনরি সাইমনস, ১৯৪৮; হাইম্যান মিনস্কি, ১৯৮৬; জোয়ান রবিনসন, ১৯৭৭; ও সি পি কিন্ডলবার্গার, ১৯৭৮। এ গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যে দেখুন: চাপরা, ১১৮ :পৃ ,১৯৭৫-১৯

www.pathagar.com

অংশীদার)[২৫]- 'র মত প্রাথমিক পদ্ধতি এবং মুরাবাহা (দাম ও সার্ভিস চার্জ), ইজারা, ইজারাহ্ ওয়া ইকতিনা (হায়ার পার্চেজ), সালাম (অগ্রিম সরবরাহ চুক্তি) ও ইস্তিসনা (চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন)[২৬] 'র মত দ্বিতীয় পদ্ধতির সমন্বিত রুপ। প্রথমোক্তটি সম- মুলধন ভিত্তিক এবং তুলনামুলকভাবে বেশী ঝুকিঁপূর্ণ কারন লাভ- লোকসানের অংশীদারিত্বের বিষয় জড়িত রয়েছে – তাদের ফিরতি পুর্বে নির্ধারন করা হয় না, এবং তা ব্যবসার শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক হতে পারে। দ্বিতীয়টিতে ঋণের বিষয় জড়িত এবং তুলনামুলকভাবে কম ঝুকিঁপূর্ণ কারন লাভ- লোকসানের অংশীদার হওয়ার প্রয়োজন হয় না – ফিরতির হার ইতিবাচক ও পুর্বেই তা নির্ধারন করা হয়ে থাকে।[২৭]

ইতিবাচক ফিরতির পুর্বনির্ধারিত হারের কারনে দ্বিতীয় পদ্ধতিকে সুদ- ভিত্তিক দলিলের মত দেখায়। তবে, তিনটি কারনে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত: দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে বিক্রয় বা ইজারা, সরাসরি ঋণ বা ধার বা লেনদেন নয়। দ্বিতীয়ত: যেহেতু, শরিয়া কোন ব্যক্তিকে সে যার মালিক বা অধিকারী নয় এমন কোন কিছু বিক্রয় করা বা ইজারা দেওয়ার অনুমতি দেয় না, যখনই অর্থ সরবরাহকারী পণ্যের মালিকানা ও দখল পেয়ে থাকে তখনই সে ঝুকিঁ গ্রহণ করে থাকে। তৃতীয়ত: এ ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের হার নয়, পণ্যের মুল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, এবং একবার মুল্য নির্ধারন করা হয়ে গেলে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারনে মুল্য পরিশোধে বিলম্ব হলে তা পরিবর্তন করা যাবে না।[২৮] যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা হলে শুধ্ মাত্র ঝুকিঁ গ্রহীতা ও ঝুকিঁ পরিহারকারীকেই বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করবে না, একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির সরকারি- বেসরকারি উভয় খাতের মুলধনের প্রয়োজন কার্যকরভাবে তদারক করবে।

---

[২৫] যৌথ মুলধনী কোম্পানীর শেয়ারগুলো মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ উভয়ের রকমফের।

[26] কর্জ- হাসান (বহুবচনে কর্জে হাসানাহ্) পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি। তবে, কর্জ হাসানাহ্র বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নেই। এটা হলো উদার ঋণ যা কোন সুদ বা লাভ- ক্ষতির লভ্যাংশে অংশ গ্রহণের কোন শর্ত ছাড়াই দেয়া হয়ে থাকে।এটার মুল উদ্দেশ্য হতে পারে দরিদ্র, বন্ধু- বান্ধব ও পারিবারিক সদস্যদেরকে জরুরী প্রয়োজন মেটানো বা কোন ছোট- খাট ব্যবসা শুরু করার জন্যে সাহায্য করা।

[২৭] এ বিষয়ে লেখা- লেখি এখন এত বেশী হয়েছে যে, এখানে বা পুস্তক- বিবরণীতে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্যে দেখুন: চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ৬৭- ৭৯, ১৬৩- ৭৪, ও ২৪৭- ৬০; এবং The Institute of Islamic Banking and Insurance, Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance, 1995.

[২৮] এ অধ্যায়ের শেষের দিকে 'যে সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি' শীর্ষক সাধারণ শিরোনামের অধীনস্থ 'আর্থিক দায়সমুহের বিলম্বিত নিস্পত্তি' - এর উপর লেখাটি দেখুন।

www.pathagar.com

তবে, মুসলমানেরাও বিশ্ব পুজিঁ- বাজারে বসবাস করে যেখানে সকল উদার জাতীয় পুজিঁ- বাজার ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের কারনে ব্যাপক গতিতে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে পুজিঁ স্থানান্তর ঘটছে। এরুপ বিশ্বায়িত বাজারের নিয়ামকসমুহ কোন মুসলিম দেশের পুজিঁর বাজারকে আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেয় না। পুজিঁর দেশান্তর যাত্রা ঠেকানো ও দেশে পুজিঁ আকর্ষণ করার জন্যে তারা কেবল কার্যকরি আর্থিক নীতি অনুসরন করতে ও সুস্থ আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে, এবং সুস্থ আর্থিক পদ্ধতির বিকাশে কাজ করতে বাধ্য হবে না, দেশের উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি খাত সুমহের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারসমুহ মেটানোর লক্ষ্যে ইসলামিক কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন প্রকার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক বিধি-বিধানও করবে। বারাকলাফ সম্ভবত: ঠিকই বলেন যে, "যদি ইসলামিক ব্যাংক ব্যাপক পরিমানের উৎপাদ সৃষ্টি না করতে পারে ও বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত না হতে পারে তবে তা দুর্বল হয়ে যাবার ঝুকিঁর মধ্যে থাকবে"।[২৯]

তবে, প্রচলিত ব্যবস্থায় পাওয়া যায় এমন সকল উৎপাদের হুবুহু বিকল্প বের করা অবশ্যই বাঞ্চিত নয়। এটা সম্ভব নাও হতে পারে। ঋণ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেও ইসলামি ব্যবস্থা অর্থনীতির বাস্তব ক্ষেত্রের সহিত সম্পৃক্ত পুজিঁ সরবরাহ ও অর্থায়নের আবশ্যকতার সাথে জড়িত থাকতে বাধ্য। ঝুকিঁপূর্ণ কিন্তু লাভজনক লেনদেন কিংবা প্রকল্প বা পণ্য বা সেবার সহিত সম্পর্কিত নয় এমন সরাসরি ঋণ কোন উপকারে আসতে পারে না। তাছাড়া, ইসলামি ব্যাংকিং- এর যৌক্তিকতা শুধু মাত্র পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মধ্যে বা আর্থিক লেনদেন সংঘটনের বাহনরুপে ব্যবহৃত উৎপাদের মধ্যে নয়, বরং পদ্ধতির লক্ষ্যসমুহ অর্জনের মধ্যে নিহিত। আর্থিক উৎপাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমান হওয়া বাঞ্চনীয় যেন সেগুলো মুলধনের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, কিন্তু এমন বেশী নয় যার ফলে ঋণ সরবরাহ অত্যোধিক বেড়ে যায় বা পদ্ধতিটাকে এমন জটিল করে তোলে যে এমনকি বিশেষজ্ঞগণের পক্ষেও মুল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে, যেমনটা হয়ে থাকে অনেক ঝামেলাপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে। পদ্ধতিটা যত বেশী জটিল হবে, ব্যাংকগুলোর পক্ষে শরীয়ার বিধান ও যুক্তিগুলো এড়িয়ে চলা তত সহজ হবে। সুতরাং, বিশাল রকমের ফলাফল অর্জন করার ব্যর্থতা নয়, বরং একই সাথে সুস্থ, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লাভজনক ও যথেষ্ট পরিমানে বর্ধনশীল হওয়ার জন্যে কতিপয় মৌলিক বিধান প্রণয়ন করতে না পারলে ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে।

এ সংক্রান্তে যা বই- পুস্তক পাওয়া যায় সেগুলো পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, অনেকগুলো আর্থ- সামাজিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ব্যতীত প্রচলিত পদ্ধতি থেকে যথার্থ

---

[২৯] Barraclough, 1995, পৃ: ১৪।

www.pathagar.com

ইসলামি পদ্ধতিতে পরিবর্তন অসম্ভব।[৩০] পাকিস্তানের কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিওলজি যথার্থই গুরুত্ব দিয়েছে যে, "সুদ প্রথার বিলুপ্তি ইসলামের সার্বিক মুল্যবোধের একটা অংশ মাত্র এবং কেবল মাত্র এ ব্যবস্থাই ইসলামের রুপকল্পের আলোকে গোটা অর্থনীতির চেহারা পাল্টে দেবে এমন আশা করা যায় না"।[৩১] যেহেতু এ সব সংস্কারের জন্য সময় প্রয়োজন সেহেতু প্রায় সব লেখক ও বিখ্যাত উলেমাগণ সুদ প্রথা ক্রমান্বয়ে বিলোপের পক্ষপাতি। সুতরাং, নাকভীর বক্তব্যে যথার্থ ঐক্যমত্য প্রকাশিত হয় যখন তিনি বলেন যে, "বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন না করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে" সুদ প্রথা বাতিল করা হয়ত: সম্ভব হবে না।[৩২] তবে, যদি ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে তা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

যৌক্তিক ভিত্তি

একটা টেকসই বিকল্প প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত অসুবিধা হচ্ছে যে, এ প্রক্রিয়া স্বভাবত: প্রশ্নের উদ্রেক করে যে, একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের ঝামেলা কেন পোহাতে হবে? সুদপ্রথা বাতিলের পেছনে যুক্তিকে এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ঝামেলার সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ হতে হবে। কতিপয় পন্ডিত যুক্তি দেখান, যারা কিনা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে, ইসলামেরই মুল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মহানবীর আমলে সুদ প্রথা বাতিল না করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এটা প্রমান করার জন্যে তারা অনুমান করে নেন যে, সে সময় ভোগের লক্ষ্যেই গরীবরা ঋণ গ্রহণ করতো এবং সুদারোপ করার মাধ্যমে তাদেরকে শোষণ করা হতো। এরুপ অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা যুক্তি দেখান, যেহেতু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঋণ কেবল মাত্র গরীবরাই নেন না, বরং ব্যবসায়ী ও সরকারও ঋণ নেন, যারা উৎপাদনশীল কাজে তা ব্যবহার করেন এবং যারা সুদের দায় বহন করতে সক্ষম, সুতরাং সুদ- বিরুধী বিধান এখন প্রযোজ্য নয়।[৩৩]

তবে, ইতিহাসের রায় এরুপ অনুমানকে সমর্থন করে না। মহানবীর আমলের শেষের দিকে, যখন সুদ- নিষিদ্ধকরনের বিধানাবলী কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল, গরীবদের মৌলিক অভাব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারনে কষ্টে নিপতিত ব্যক্তিদের

---

[৩০] দেখুন, সদর, ১৯৮১, পৃ: ৩৩৪; চাপরা, ১৯৮৫, অধ্যায় ৪, ৬, ৯; ইকবাল ও মিরাখর, ১৯৮৭, , পৃ: ২৩।

[৩১] কাউন্সিলের প্রতিবেদন, ১৯৮০, পৃ: ৩।

[৩২] দেখুন, নাকভি, ১৯৮২, পৃ: ৮ ও ৮৪, আরো দেখুন, নাকভি, ১৯৯৪. পৃ: ১৩৯-৪০।

[৩৩] আল- দাওয়ালিবি, ১৯৮৮; আরো দেখুন, ফুলারভি, ১৯৫৯; শাহ, ১৯৬৭।

www.pathagar.com

সমস্যা মেটানোর জন্যে মুসলিম সমাজ যথেষ্ট পরিমানে সংগঠিত ছিল। তবে, যদি এরূপ অনুমানও করা হয়ে থাকে যে, কষ্টের মধ্যে নিপতিত ব্যক্তিদের জন্য মুসলিম সমাজের আর্থ- সামাজিক অঙ্গিকার সত্ত্বেও গরীবরা ভোগের জন্যে ঋণ গ্রহণ করতো, সেক্ষেত্রে তা ছিল সীমিত আকারে ও স্বল্প অংকের জন্যে, এবং মুলত: কর্জে হাসানাহ বা সুদ- মুক্ত ঋণ।

এর বিপরীতক্রমে, উটের পিঠে পরিবহনের মাধ্যমে সে যুগে যে আমদানী- রপ্তানীর ব্যবসা চলতো, তার জন্যে প্রচুর পরিমান অর্থের দরকার হতো। শ্লথ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্ধুর রাস্তা- ঘাট, প্রতিকুল আবহাওয়ার কারনে ব্যবসায়ীরা শীতকালে একটা ও গরম কালে একটা বছরে দুটোর বেশী উটের দল পাঠাতে পারতো না (আল- কুর'আন, ১০৬: ২)। সুতরাং, রপ্তানী লক্ষ্যে অর্থনীতির গোটা রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত ক্রয় করার জন্যে, এবং তাদের সমাজের জন্যে দরকারী সবকিছু আমদানীর জন্যে তাদেরকে প্রচুর পরিমানে অর্থ ঋণ করতে হতো।[৩৪] সে মোতাবেক এ শতাব্দির অন্যতম বিখ্যাত মুসলিম পন্ডিত মরহুম আবু জারাহ যথার্থই বলেছেন যে, "প্রাক্- ইসলামি অন্ধকার যুগে রিবা বা সুদ প্রথা ভোগ- কেন্দ্রিক ঋণের উপর ছিল, উন্নয়ন কেন্দ্রিক ছিল না – এরূপ মতবাদের স্বপক্ষে আদৌ কোন প্রমান নেই। প্রকৃত পক্ষে, গবেষকগণ যেরুপ ঋণের বিষয়ে ইতিহাসে তথ্য- প্রমান পেয়েছেন তা হচ্ছে উৎপাদনের জন্যে ঋণ। আরবদের অবস্থা, মক্কা'র অবস্থান ও কুরায়িশদের ব্যবসা- বাণিজ্য সব কিছুই প্রমান করে যে ঋণগুলো ছিল উৎপাদনের জন্যে, ভোগের জন্যে নয়"।[৩৫] এরূপ সিদ্ধান্ত উদোভিচ সমর্থন করেছেন, যিনি নিকট- প্রাচ্যের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর প্রচুর কাজ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "মধ্য- যুগের ঋণ ছিল শুধুই ভোগ কেন্দ্রিক, উৎপাদন কেন্দ্রিক নয়- এরূপ কোন বক্তব্য মধ্য- যুগের নিকট- প্রাচ্যের জন্যে প্রযোজ্য নয়"।[৩৬]

যদি ঋণ মুলত: ব্যবসার জন্যেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে ব্যবসা ও সুদ প্রথার মধ্যে কুরআনে বর্ণিত পার্থক্য অনুধাবন করা সহজ হবে: "আল্লাহ ব্যবসা বৈধ করেছেন কিন্তু রিবা নিষিদ্ধ করেছেন" (আল- কুর'আন, ২: ২৭৫)। যাই হোক এখনও জানার চেষ্টা হতে পারে যে কেন এরূপ নিষেধাজ্ঞা। মুসলিম ইতিহাসের এক নামজাদা উলেমা ফখর আল দীন আল রাজি (মৃত্যু ৬০৬/১২০৯) নিজেই প্রশ্ন পেশ করেছেন যে, সুদারোপ কেন অন্যায় হবে যখন ঋণ- গ্রহীতা তার ব্যবসায় তা খাটাচ্ছেন এবং লাভ করছেন। তাঁর সুচিন্তিত জবাব হচ্ছে, "লাভ অনিশ্চিত হলেও সুদ পরিশোধের

[৩৪] চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ৬৩- ৪।
[৩৫] আবু জারাহ, ১৯৭০, পৃ: ৫৩।
[৩৬] উদোভিচ, ১৯৭০, পৃ: ৮৬।

www.pathagar.com

বিষয়টি পুর্ব- নির্ধারিত ও নিশ্চিত। লাভ হতেও, পারে নাও হতে পারে। সুতরাং, সন্দেহ নেই যে অনিশ্চিত কোন ফিরতির উপর ভরসা করে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পরিশোধ ক্ষতির কারন হতেই পারে"।[৩৭] অর্থায়নকারী ও উদোক্তার মধ্যকার সুদ- ভিত্তিক সম্পর্ক ইসলাম বাতিল করেছে এবং লাভ- লোকসান ভাগা- ভাগির ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। লগ্নিকারী যথাযথ অংশ পেল এবং মালবাহী উটের দল লুট- পাটের শিকার হওয়ার মত প্রতিকুল পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাও নিষ্পেষিত হয়ে যায় নি।

অন্যান্য লেখকগণও এ বলে সমর্থনমুলক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অর্থ নিজে উৎপাদনশীল নয়। এর সাথে উদ্যোক্তার উদ্যোগ, ও শ্রম, কাঁচামাল, মুলধন পণ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদির সমন্বয় করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং, লগ্নিকারীর ঝুকিঁ বা লাভ উদ্যোক্তার লাভের বিষয়টি বাদ দিয়ে হিসেব করা যাবে না।[৩৮] যেহেতু, চূড়ান্ত অর্জন অর্থ ও উদ্যোগের সমন্বিত ফলাফল, সেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাদের উভয় পক্ষকে সে ফলাফল সমভাবে ভাগা- ভাগি করতে হবে ।

এটা ন্যায় বিচারের একটা দিক। তবে, সকল বড় বড় ধর্মই (ইসলাম ছাড়াও জুডাইজম, খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম) যে সুদ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে তার একমাত্র কারন এটি নয়।[৩৯] সুদ প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরো শক্ত হতো যদি দেখানো যেত যে, দক্ষতা ও সম- মুলধনসহ অভাব মেটানোর মানবিক লক্ষ্যসমুহ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার ও পরিপুর্ণ কর্মসংস্থান, আয় ও সম্পদের সম- বন্টন, ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম- মুলধন ভিত্তিক অর্থ- লগ্নির ব্যবস্থার মধ্যে আরো কার্যকরভাবে অর্জন করা যেতে পারে। এ কারনে সুদ প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অনেক লেখকই তাদের আলোচনায় এ বিষয়টিতে মনযোগ দিয়েছেন।[৪০] সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনার সময়ে পরে এ বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

---

[৩৭] রাজি, ৭ম খন্ড, পৃ: ৮৭।

[৩৮] প্রফেসর ওজায়ের (১৯৮০) যথার্থই বলেছেন: 'উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসেবে পুঁজির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, এটি উৎপাদনের আরেকটি উপাদান, উদ্যোগ- এর অংশ (পৃ: ৩৮)। খান ও মিরাখর (১৯৯৪ ,বলেন ("অর্থ পুঁজি নয়, এমনকি পুঁজির প্রতিনিধিও নয়। এটি 'সম্ভাব্য পুঁজি', যাকে পুঁজিতে রুপান্তর করার জন্যে উদ্যোক্তার শ্রমের প্রয়োজন হয়; অর্থকে পুঁজিতে পরিণত করায় ও তার উৎপাদনশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকারীর কিছুই করনীয় নেই (পৃ: ৫)। আরো দেখুন: শেখ মাহমুদ আহমদ ।২৭-১৩ :পৃ ,১৯৮৫ ,

[৩৯] সুদের উপর ইহুদী ও খৃস্টিয় মতামতের জন্যে দেখুন: Jhons et al., n.d., and Noonan (1957); এবং হিন্দু মতামতের জন্যে দেখুন: বোকারে, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৮।

[৪০] এ বিষয়ে লেখা- লেখি প্রচুর রয়েছে। তবে, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারনার জন্যে দেখুন: সিদ্দিকী, (১৯৮৩); চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১০৭- ৪৫; ১৯৯২, পৃ: ৩২৭- ৩৪; অক্টোবর ১৯৯২, পৃ: ৩৮- ৪১।

www.pathagar.com

স্বপ্ন ও বাস্তবতা

এটা আমাদেরকে নিয়ে আসে সেই প্রশ্নে যে, মুসলিম দেশসমুহের আর্থিক ব্যবস্থাকে ইসলামিকরনে আমরা কতটা সফলতা অর্জন করতে পেরেছি।এরূপ প্রয়াসগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি – ব্যাংকগুলোকে ইসলামিকরনের প্রয়াসগুলো এবং গোটা আর্থিক ব্যবস্থাসমুহকে ইসলামিকরনের প্রয়াসগুলো। আমি প্রথমে চেষ্টা করবো এ দু'টো ভাগের মধ্যে ব্যাংকসমুহকে ইসলামিকরনের প্রয়াসগুলোর মুল্যায়ন করতে, এবং তারপর গোটা আর্থিক ব্যবস্থাসমুহকে ইসলামিকরনের প্রয়াসগুলো মুল্যায়ন করতে চেষ্টা করবো।

যদিও এ সকল সফলতা ও ব্যর্থতার মুল্যায়ন করার অনেকগুলো খন্ডিত প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল, সার্বিক মুল্যায়নের কোন প্রয়াস এখনও হয়নি। [৪১] অনেকগুলো লক্ষ্য সামনে নিয়ে একটা সার্বিক মুল্যায়ন করা যেতে পারে। এদের কতিপয় হতে পারে নিম্নে-বর্ণিত বিষয়গুলো জানার জন্যে:

ক. ইসলামি ব্যাংকের প্রতি মানুষের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষের প্রত্যাশা, তৎসহ গ্রাহকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশেষত: তাদের সম্পদের পরিমান ও আয়ের উৎস, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শরীয়া ও ইসলামি লগ্নি পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, এবং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি;

খ. ইসলামি পুর্জি বাজারের আকার, ব্যাংকের সংখ্যা, ডিপোজিট, স্থিতি ও লাভের হিসেবে সেগুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি;

গ. স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগের হিসেবে ইসলামি ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা, তাদের অর্থায়নের উদ্দেশ্য, তাদের সঞ্চয়কারী ও ঋণগ্রহণকারীদের সংখ্যা ও আকার, তাদের বিনিয়োগযোগ্য অর্থে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পদ্ধতির হিস্যা, মাধ্যমিক পদ্ধতি অনুমোদনের জন্যে শরিয়ার বিধি-বিধান তারা কতটা মেনে চলেন, এবং বিধি-বিধান প্রতিপালন না করার কারনগুলো; এবং

ঘ. এ সকল ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসমুহ কতটা অর্জিত হয়েছে, অর্থাৎ ইসলামের সাম্যের নীতি কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

---

[৪১] এ যাবৎ যে সকল জরীপ ও গবেষণা চালানো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: উইলসন, ১৯৮৭; হক, ১৯৮৬; মুদাবি, ১৯৮৬; নীয়েনৌজ, ১৯৮৬; অসাফ আহমদ, ১৯৮৭; সালামা, ১৯৮৭; ইকবাল ও মিরাখর, ১৯৮৭; আবদুল কাদের স্টিভেন, ১৯৯৩; এবং আল-হাজ্জার, প্রেসলি, ও রাইট, ১৯৯৩। হার্ভার্ড ইসলামী বিনিয়োগ প্রজেক্টও জরীপ কাজ শেষ করেছে। তবে, এ জরীপটি মুলত: লক্ষ্যসমুহের অংশ বিশেষের জন্যে সাজানো হয়েছিল এবং ১৯৯৯ সনের জুনে এ অধ্যায়টি চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত তা প্রকাশ করা হয়নি।

www.pathagar.com

এ সব লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে অবশ্যই একাধিক মুল্যায়ন জরীপ আবশ্যক হবে।

ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

আধুনিক যুগে পরীক্ষামুলকভাবে ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল নীল নদের মিট-গামর এলাকায় ১৯৬৩-৬৭ সালে গ্রামীন সঞ্চয় ব্যাংক আকারে। সার্বিকভাবে সফল বিবেচিত এ পরীক্ষা "রাজনৈতিক কারনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল"।[৪২] এরুপ অগ্রণী ভুমিকা পালনের জন্যে বড় কৃতিত্বের দাবীদার লোকটা হচ্ছেন মরহুম আহমদ আল-নজ্জর। আরো একটা পরীক্ষা হয়েছিল এস এ আহমদ কর্তৃক করাচীতে, যিনি ১৯৬৫ সালের জুন মাসে একটা সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে ব্যাংকটি ব্যাবস্থাপনা ও তদারকির অভাবের কারনে সফল হয়নি, যা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার প্রতি মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান মনস্তাত্তিক বাধা দুর করার জন্যে এ দুটো পরীক্ষা কাজ করেছিল, এবং এগুলো মধ্য-সত্তরের দশকের পর অনেকগুলো ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথ খুলে দিয়েছিল। প্রথম পুরো-দস্তুর ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে ১৯৭৫ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠিত দুবাই ইসলামি ব্যাংক। শীঘ্রই অন্যরা এটাকে অনুসরন করলো। ১৯৯৬ সালের শেষ অবধি সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে কমপক্ষে ৩৪টি মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ১৬৬'র বেশী সংখ্যক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৩] শাখা কার্যক্রম বিস্তার, ব্যালেনস্ শীট ও লাভের বিষয় বিবেচনায় এদের সবগুলোই এ যাবৎ সফল হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তাদের মুলধন ছিল ৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রিজার্ভ ছিল ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাদের সম্পত্তি ও ডিপোজিটের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৩৭.১ বিলিয়ন ও ১০১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে বছর তারা ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট মুনাফা অর্জন করেছিল।[৪৪] মুলধন

---

[৪২] Wohlers-Scharf, 1983, পৃ: ৮০।

[৪৩] যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখনও International Association of Islamic Banks (IAIB)-এর সদস্য হয়নি, সেগুলোসহ ৩৮ টি দেশে মোট সংখ্যা ১৯২।

[৪৪] উপরের সকল তারিখসমুহ নেয়া হয়েছে International Association of Islamic Banks-এর *Directory of Islamic Banks and Financial Institutions*, 1996, পৃ: ১০ থেকে। ১৬৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি ইউরোপ ও আমেরিকায়, ৪৩টি মধ্যপ্রাচ্যে (উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থাধীন ১৯টি সহ), ৩৫টি আফ্রিকায়, ৮০টি এশিয়ায়(যার ৩০টি দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় ও ৫০টি দক্ষিণ এশিয়ায়)। এরুপ ১৬৬ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩টি সরকারী মালিকানাধীন, অবশিষ্ট ১৩৩টি বেসরকারী মালিকানাধীন।

www.pathagar.com

ও রিজার্ভের অনুপাতে লাভ ছিল যথাক্রমে ২৩.১ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ। তাদের মুলধন ও রিজার্ভ ছিল তাদের স্থিতির (ঝুঁকি সমন্বয় ব্যতীত) ৯.৫ শতাংশ। এ সকল অনুপাত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমুহের অনুরুপ অনুপাতগুলোর চেয়ে বেশী, এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমুহের ভাল অবস্থার সাক্ষ্য বহন করছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হতে পারে কারন, যেমনটা রডনি উইলসন যথার্থই বলেছিলেন: "সম্ভাবনাপুর্ণ বাজারের কেবল মাত্র অংশ বিশেষই ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আরো প্রবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে"।[৪৫]

ইসলামি ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা বাড়ছেই এবং মনে হচ্ছে আমানতকারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ –এর দিকে ইসলামি ব্যাংকিং ছিল একটা স্বপ্ন যা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষালয়ে, তাও আবার অনেকের নিকট ছিল তা অজানা, বর্তমানে নগর এলাকায় বাস করেন এমন কোন মুসলমান নেই যিনি ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে অবহিত নন। সামাজিক সভা-সমিতিতে এটা এখন একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়। এটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড-এর মত পাশ্চাত্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আই এম এফ ও বিশ্ব ব্যাংকের মত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস-এর মত মর্যাদাশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, এবং পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে সার্বিকভাবেই অনুকুল প্রচার পেয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে প্রায় অপরিচিত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন রকম প্রকারভেদ বর্তমানে সকলের মুখে মুখে। তথাপিও, এ আন্দোলন এখনও শিশু অবস্থায় রয়েছে, এবং নিম্নে-বর্ণিত অনেকগুলো প্রাথমিক সমস্যায় ভুগছে। সুতরাং, পরিপক্ক হওয়ার জন্যে এটাকে বহুদুর যেতে হবে।

প্রাথমিক সমস্যাসমুহ

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত এর সেবাগুলোর মান স্থিরকৃত হয়নি। এর প্রাথমিক কারন সম্ভত: এ যে, ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত কতিপয় আইনগত (ফিকিহ) বিষয় এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক কারন শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে ফিকহ স্থবির হয়ে রয়েছে। ইসলামি ব্যাংক স্থাপিত হওয়ার পর মাত্র সম্প্রতি

এ সকল অংকের মধ্যে । Al B'র নিকট তথ্য প্রেরণ শুরু করেনি এমন অনেক ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকসমুহ কর্তৃক ইসলামী বিধান মোতাবেক গৃহীত আমানতের পরিমান অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

[৪৫] রডনি উইলসন, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ: ৯।

www.pathagar.com

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কিত ইসলামি বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়গুলো সামনে এসেছে ও আলোচিত হচ্ছে। তবে, বিষয়গুলো জটিল যার কোন অতীত নজির নেই, ফিকহ'র ভাষা ও শরীয়াহ'র লক্ষ্যসমূহ এবং বর্তমান যুগের বাস্তবতার আলোকে সেগুলোর সমাধানের আলোকে নূতন করে ভাবনা-চিন্তা করার আবশ্যকতা রয়েছে। কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে ইসলামে গীর্জার মত কোন প্রতিষ্ঠান যেহেতু নেই, সেহেতু, আলোচনার মাধ্যমে অতীতের শতাব্দিকালের মত ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা একটা সময় সাপেক্ষ বিষয়। তবে, এ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এরুপ আলোচনার লক্ষ্যে একটা ফোরাম হিসেবে কাজ করার জন্যে ও আই সি এবং রাবিতার ফিকহ কমিটি আর্থিক লেন-দেনসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করে থাকে। এ সকল বিষয়সমূহ আলোচনার জন্যে বিভিন্ন দেশের উলেমাদের সমন্বয়ে ইসলামি ব্যাংকসমুহের আর্ন্তজাতিক সংগঠন (IAIB) একটা সমন্বিত শরীয়া কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সকল আলোচনার মাধ্যমে অনেক বিষয়ে মতামত সুসংগঠিত হয়েছে, এবং পরিণতিতে, যেমনটা ভোগেল ও হেইজ স্বীকৃতি দিয়েছেন, “ইসলামিক ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানটায় ইসলামিক আইনশাস্ত্র বর্তমানে সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ করছে”।[৪৬] তথাপিও, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবশ্যকীয় ঐক্যমত্য আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে।[৪৭]

সেবাগুলোর মান স্থিরকৃত হয়নি বিধায় প্রতিটি ব্যাংকেরই নিজস্ব শরীয়াহ বোর্ড রাখতে হচ্ছে। ব্যাংকের সেবাসমুহের অনুমোদনের জন্যে এ বোর্ডগুলোর প্রত্যেকটার নিজস্ব একটা মান রয়েছে। তাছাড়া, অনেকগুলো প্রথাগত ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংকের অনুরুপ সেবা প্রদান শুরু করেছে, যাদের অধিকাংশরই কোন প্রকার শরীয়া বোর্ডের অনুমোদন নেই বা যারা শরীয়াহ'র বিধি-বিধান সামান্যই আমলে নিয়ে থাকে। এ কারনে কিছু বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার কতিপয় কার্য পদ্ধতির বিশেষত: মুরাবাহা'র অপব্যবহার শুরু হয়েছে, যার ফলে শেখ মুস্তফা আল-জারকা'র মত কতিপয় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পন্ডিতগণ মুরাবাহা সম্পর্কে তাদের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪৮]

বিভিন্ন শরীয়া বোর্ডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা উৎসাহিত করার জন্যে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী, এবং এরুপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংকের সকল সেবাসমুহ

---

[৪৬] Vogel and Hayes, 1998, পৃ: ২১।

[৪৭] এ সব কতিপয় বিষয়ের জন্য এ অধ্যায়ের শেষের দিকে “যে সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি” শীর্ষক অংশ দেখুন।

[৪৮] দেখুন: আল-মিস্রি, ১৯৯৫, পৃ: ৩০।

www.pathagar.com

ভালভাবে মুল্যায়ন করে সেগুলোর মান স্থির করা ও সেগুলোর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিতকরনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। এ উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশসমুহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের দেশের ভেতর বড় ভুমিকা পালন করতে পারতো, এবং নিয়মিত সভায় মিলিত হন বিধায় মুসলিম দেশসমুহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর গভর্ণর ও মুদ্রা ব্যবস্থার অধিকর্তাগণ মুসলিম বিশ্বে এ সকল সেবাগুলোর একটা মান যতটা সম্ভব স্থির করে দিতে পারতো। কোন কঠোর সাংগঠনিক ধরা-বাঁধার মধ্যে সেবাগুলোকে নিয়ে আসা বাঞ্ছিত নয়, কারন শরীয়া নিজেই যথেষ্ট স্বাধীনতা অনুমোদন করে। ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকলে উদ্ভাবনী শক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নতুন নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংগঠনের ক্ষমতা হ্রাস করে। তথাপিও, পুজিঁর বাজারের যথাযথ কার্যক্রম ও বিকাশ ও শরীয়ার দীক্ষা মেনে চলার জন্যে ন্যুনতম মান স্থির করা প্রয়োজন। যথাযথভাবে স্থিরকৃত মান ও নিয়ন্ত্রনমুলক কাঠামোর অভাব একটা বড় সমস্যা। তবে, এ সমস্যা দুর করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিকহ'র বিষয়গুলো সুরাহা না হয়, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো একটি ইতিবাচক নেতৃত্বের ভুমিকা পালন না করে।

আরো একটা সমস্যা হচ্ছে যে, সব ইসলামি ব্যাংকগুলো বর্তমান যুগের সকল বড় বড় ব্যাংকগুলোর তুলনায় অত্যন্ত ছোট, যাদের প্রত্যেকটির সম্পদ সকল ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিত সম্পদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী।[৫১] আকার ছোট থাকার কারনে তা তাদের কার্যক্রমে একটা অন্তর্গত দুর্বলতার সৃষ্টি করে, কারন, ভেতরের বা বাইরের কোন সমস্যার কারনে ছোট ব্যাংকগুলোর লাল বাতি জ্বলার সম্ভবনা বড় ব্যাংকগুলোর চেয়ে বেশী থাকে। আকার ছোট থাকলে আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যয় হ্রাস করে ফসল ঘরে তোলার অক্ষমতা ছাড়াও ছোট আকারের ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগে বহুমুখীতা আনয়ন করতে পারে না এবং প্রশিক্ষণ, বাজার গবেষণা, সেবা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যে পর্যাপ্ত সম্পদ যোগাড় করতে সক্ষম হয় না।

---

[৫১] প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে UBS, যার সম্পদ হচ্ছে ৬৯৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম হচ্ছে The Citigroup ও Mitshubishi, যাদের সম্পদের পরিমান হচ্ছে যথাক্রমে, ৬৯৭.৫ বিলিয়ন ও ৬৫৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে বৃহদাকারের প্রশংসা করাটা উদ্দেশ্য নয়, কারন $৫০ বিলিয়ন থেকে $১০০ বিলিয়নের পর অর্থনীতি ছোট হওয়ার প্রবণতা দেখিয়ে থাকে। (The Economist, 31 October, 1998, পৃ: ২২)

www.pathagar.com

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে যে, একটা পুরো-দস্তুর ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা তৈরী করার জন্যে আবশ্যকীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমুহের নেটওয়ার্ক এখনও গড়ে উঠেনি।[৫০] ব্যবসার অবস্থা ও ঋণ-গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ, অর্থায়নের প্রস্তাব মুল্যায়ন করা, সম্বিন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির হিসাব অডিট করা, ঋণগ্রহীতাগণকে সঠিক হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রস্তাবসমুহের সম্ভাব্যতা যাছাই করার জন্যে ব্যাংকগুলোর প্রয়োজন কতিপয় সহায়ক প্রতিষ্ঠান।[৫১] এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠার একটা কারন হচ্ছে যে, বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা ও এ যাবৎ গড়ে ওঠা সেবার আকার এত বেশী নয় যে সেগুলো এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমুহকে টিকিয়ে রাখতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ও একটা ইসলামি আন্ত:ব্যাংক বাজার গড়ে না ওঠা পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকসমুহের পক্ষে তাদের তারল্য ও ঝুঁকির সফল ব্যবহারসহ অন্য সকল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকসমুহে হিসাব রক্ষণ ও অডিটিং-এর জন্যে একটা সম্মত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। ফলে, একজন শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও তাদের ব্যালেন্স শীটের তুলনামুলক বিচার করা কঠিন হবে। ১৯৯১ সালে বাহরাইনে ইসলামি ব্যাংকগুলোর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত The Financial Accounting Organization for Islamic Banks & Financial Institutions কতিপয় সম্মত মান গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবে, সকল ব্যাংকগুলোর পক্ষে এটা গ্রহণ করা ও এ পদ্ধতির বিধান মোতাবেক তথ্যাদি প্রকাশ করার বাধ্য-বাধকতা বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ ব্যপার।

পঞ্চম সমস্যা হচ্ছে যে, আমানতকারীগণকে এখনও প্রচলিত ব্যাংকের আমানতকারীগণের মতই বিবেচনা করা হচ্ছে,[৫২] যদিও তত্ত্বগতভাবে তারা ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার। বোর্ড অব ডিরেক্টরস বা পরিচালনা পরিষদের সভায় তারা উপস্থিত থাকতে পারেন না। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন না, যদিও তারা ঝুঁকির অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে থাকেন এবং লোকসান বহন করার আশংকার মধ্যে থাকেন। ব্যাংকের যথাযথ কার্যক্রম,

---

[৫০] এরুপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যে দেখুন, চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১৭৪-৮১ ও ২০০-২।

[৫১] এরুপ প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন: চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১৭৪-৮১ ও ২০০-২।

[৫২] দেখুন, আল-মিস্রি, ১৯৮৫, পৃ: ৩২৪।

www.pathagar.com

স্বচ্ছতা, লাভের যথাযথ অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তারা অক্ষম। তাদের আমানতের উপর ব্যাংক ব্যবস্থাপনা তাদেরকে যা দিতে চায় তাদেরকে তাই গ্রহণ করতে হয়। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রতিনিধি থাকলে মোট মুলধনে আমানতের অংশের হারে তাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকতো, এবং শেয়ার হোল্ডারদের মতই তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হতো। বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের সভায় তাদের প্রতিনিধি নিজেরা ভোটা-ভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে, কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত হতে পারে।

কতিপয় সমালোচনা

যদিও ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচুর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে ও সমর্থন পেয়েছে, সেগুলো তেমনি প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। এগুলো প্রত্যাশা পুরনে তাদের ব্যর্থতা অথবা তাদেরকে ইসলামি পরিচিতি প্রদানের সাথে সম্পর্কিত।

এ সকল সমালোচনার একটা হচ্ছে প্রচলিত ব্যাংকের আবহ থেকে বের হয়ে আসতে না পারা।[৫৩] তাদের ঋণ-কার্যক্রম মুলত: স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসা ও বড় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের লীজ কার্যক্রমের মাধ্যমিক পদ্ধতির মধ্যে সীমিত, যারা প্রচলিত ও ইসলামি ব্যাংক উভয় থেকেই ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ব্যবসায়ী, কৃষক, শিল্পপতি, কারিগরকে অর্থ প্রদান করতে বা উদ্যোগী মুলধন সরবরাহ করতে তারা কোন গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে চায় না।[৫৪] যদিও তারা মুসলিম দেশসমুহ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে, তাদের অর্থায়নের এক বড় অংশ চলে যায় পাশ্চাত্যের বড় বড় কর্পোরেশনগুলোতে। এভাবে মুসলিম বিশ্বকে তাদের নিজেদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৫৫] তাছাড়া, তারা যে ফিরতি আদায় করে তা London Interbank Offer Rate (LIBOR)-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং, এরুপ একটা ধারনা রয়েছে সাম্যের নীতির আলোকে যাকে বলা যায় যে, তাদের (ইসলামি ব্যাংকগুলোর) সার্বিক কার্যক্রম প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের চেয়ে ভাল তো নয়ই, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো খারাপ।[৫৬]

---

[৫৩] মনে হচ্ছে, এটাই সবার অভিমত এবং এটাকে রডনি উইলসন (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬) এভাবে প্রকাশ করেছেন: 'এটাকে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রচলিত বিধানাবলীর সাথে এমন ভাবে মিলানো ও পরিবর্ধন করা হয়েছে যাতে সেগুলোকে ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ মনে হয়।'

[৫৪] ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর ১৯৯৬ সালের IDB পুরস্কার গ্রহণের সময় সালেহ কামেল কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ দেখুন, আরব নিউজ, ২২ অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃ: ১৫।

[৫৫] হামুদ, ১৯৯৪, পৃ: ৭৫-৬; টি, খান, ১৯৯৫; খান ও মিরাখর, ১৯৯৪, পৃ: ২০।

[৫৬] Nienhaus, in Mallat, 1988, p. 157; Kuran, 1995, পৃ: ১৬০-৩।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যে সমালোচনাটি করা হয়ে থাকে, এবং যা কিনা সবচে বেশী ক্ষতিকারক, তা হচ্ছে যে, অর্থায়নের জন্যে যে মাধ্যমিক পদ্ধতির উপর ব্যাংকগুলো নির্ভর করে থাকে তা তারা করে থাকে এরুপ পদ্ধতির বিষয়ে শরীয়ার সকল বিধানগুলো বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালন না করেই। এরুপ সামলোচনা সঠিক হতে পারে নাও পারে। তবে, ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের গোপণীয়তা এরুপ সমালোচনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।[৫৭] কি ঘটছে তা বাইরের কারও পক্ষে বোঝা কঠিন। অধিকাংশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে তাদের অর্থায়নের পদ্ধতি, শর্তাদি (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদ), স্বরুপ (ব্যবসা, বিনিয়োগ বা উদ্যোগী মুলধন) সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদির প্রকাশ ঘটে না।[৫৮]

তৃতীয় সমালোচনা হচ্ছে যে, তাদের ইসলামি পরিচয় সর্ম্পকে সনদ ইস্যু করে তাদেরই নিজস্ব শরীয়া বোর্ড। অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শরীয়া পন্ডিত এরুপ বোর্ডের সদস্যদের সততা সম্পর্কে কেউ কোন সন্দেহ করে না। তারা এ সকল ব্যাংকের বেতনভুক কর্মচারী বা উপদেষ্টা, স্বার্থের সংঘাতের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, এ ধরনের বোর্ডগুলো রয়েছে ব্যাংকের সেবা অনুমোদন ও অনুমোদনের শর্তগুলো প্রণয়ণ করার জন্যে। ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে কিনা তা নিশ্চিত করা তাদের কাজ নয়, এবং তা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়।[৫৯]

সুতরাং, সচরাচর ক্ষেত্রে যেমন বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ ব্যাংকগুলোকে সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে, তেমনি একটি স্ব-শাসিত শরীয়া বোর্ড কর্তৃক ব্যাংকগুলোর ইসলামি সত্ত্বা সম্পর্কিত সনদ পত্র ইস্যু করা হলে সেটা ভাল হতো। নীরিক্ষা কার্যে যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত না বেসরকারী খাতে স্বাধীন ও যথাযোগ্য চাটার্ড শরীয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরুপ শরীয়া বোর্ড-এর দায়িত্ব পালন করতে পারে। ব্যাংকের যথাযথ কার্যক্রম ও বিধি-বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শরীয়ার বিধানাবলীর প্রতিপালনও নিশ্চিত করতে পারে। যেহেতু, পণ্য-সেবার একটা যুক্তি-সঙ্গত মান ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীরিক্ষকগণ এরুপ দায়িত্ব পালন করতে

---

[৫৭] মোয়াজ্জেম আলী, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ: ৬।

[৫৮] দেখুন, Nienhaus, in Mallat, 1988, পৃ: ১৫৭; আরো দেখুন: M. Zeineldin, 1990।

[৫৯] দেখুন, আল-মিস্রি, ১৯৮৫, পৃ: ৪-১২।

www.pathagar.com

সক্ষম নন, সেহেতু, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে একটা শরীয়া বোর্ড রাখা হলে তা এরূপ মান নির্ধারন ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে বাধ্য করতে পারতো।

সরকার যদি ইসলামি ব্যাংকের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী না হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি স্বাধীন না হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে শরীয়া বোর্ড স্থাপন করা হলে সরকার কর্তৃক ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রমে অযথা হস্তক্ষেপের ভয় থেকে যায়।[৬০] এরূপ ভীতির কারনে অন্য একটা বিকল্প হতে পারে একটা স্ব-শাসিত শরীয়া বোর্ড যা ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের মত কোন আর্ন্তজাতিক সংগঠণের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক এমন একটা শরীয়া বোর্ড স্থাপন করতে পারে যেটা পৃথিবীর শত শত ব্যাংক নীরিক্ষা ও তাদের ইসলামি সত্ত্বার সনদ পত্র ইস্যুর দায়িত্ব পালন করতে পারে। বছর বছর ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ও প্রথাগত ব্যাংকসমুহের ইসলামি ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম গ্রহনের কারনে এ দায়িত্ব পালন ধীরে ধীরে ঝামেলাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সমালোচনার মুল্যায়ন

ইসলামি ব্যাংকসমুহের একটা সম্যক জরীপ না করা পর্যন্ত এসব সমালোচনাগুলোর বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এরূপ কোন জরীপ করাই হয়নি এবং ব্যাংকগুলোর তরফ থেকে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান না করা হলে তা সম্ভব বা অর্থপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে, যারা ইসলামি ব্যাংকের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত তারা অনুভব করেন যে, যদিও অনেকগুলো দুর্বলতার কারনে ব্যাংকগুলোকেই দায়ী করা যায় তবুও সব দায় তাদের উপর বর্তায় না। প্রত্যাশা সম্ভত: খুব বেশী, এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রযুক্তি-জ্ঞান, অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও আন্তরিক রাষ্ট্রীয় সমর্থন বিহীন মুলত: একটা সুদ-ভিত্তিক পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় সে বিষয়ে সচেতনতা সামান্যই রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। তাদের ত্রুটিসমুহের একটা বড় কারন হতে পারে পদ্ধতিগত, এবং তারা এককভাবে সে সকল সমস্যা করতে সক্ষম নয়। তাছাড়া, তাদের প্রতিদ্বন্ধী ব্যাংকগুলো হচ্ছে বৃহদাকারের ব্যাংক যেগুলোর সাথে তাদেরকে প্রতিযগিতা করতে হয়, এবং যথাযথ প্রতিযগিতার পরিবেশ তৈরী করার মত সম্পদও তাদের নেই। সুতরাং, এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম-তৎপরতা মুল্যায়নের জন্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমুহ বিবেচনায় নেয়া উচিৎ হবে।

---

[৬০] তার মূল্যবান মন্তব্যের মাধ্যমে এ বিপদটি আমার নজরে এনেছিলেন রডনি উইলসন।

www.pathagar.com

প্রথমত: প্রায়ই উপলব্দি করা হয় না যে, শরীয়াহ যথেষ্ট বাস্তববাদি এবং বিক্রয় লেনদেন আকারে মাধ্যমিক পদ্ধতিকে শরীয়াহ অনুমোদন করে। তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিক্রয় ও ঋণের প্রসার ঘটানো এবং তৎদ্বারা সামাজিক চাহিদা পুরণ করা যার জন্যে প্রাথমিক পদ্ধতি ঠিক মানানসই নয়। তবে, লেনদেনের সকল পক্ষের, বিশেষত: ঋণগ্রহীতার, স্বার্থ সুরক্ষার জন্যে শরীয়াহ কতিপয় শর্ত নির্ধারন করে দিয়েছে। সুতরাং, শর্তাদি যথাযথভাবে পুরন করা হলে মাধ্যমিক পদ্ধতির ব্যবহার অবাঞ্চিত নয়। ইসলামিক অর্থ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত পুর্বেকার রচনাসমুহে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ'র উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা সম্ভবত: ভুল ছিল। শরীয়াহ যা নিষিদ্ধ করেছিল তা ছিল নিরেট ধারের উপর একটা পুর্ব-নির্ধারিত নির্দিষ্ট ফিরতির হার। যখন অর্থায়ন পণ্য ও সেবার বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে, যেমনটা হয়ে থাকে মাধ্যমিক পদ্ধতিতে, তখন ফিরতি মুল্যের অংশ হয়ে যায়, যা কিনা লাভের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং যা (শরীয়াহ কর্তৃক) অনুমোদিত।[৬১]

মাধ্যমিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ অবলোপন যেমন সম্ভব ও বাঞ্চিত না হলেও একটা ঐক্যমত্য রয়েছে যে, এ সকল ব্যাংকসমুহের ইসলামি পরিচিতির উপর আস্থা সৃষ্টির জন্যে এ সকল পদ্ধতির অনুমোদনের জন্যে শরীয়াহ নির্ধারিত শর্তাদির আন্তরিক অনুসরন প্রয়োজন। একইভাবে, প্রাথমিক পদ্ধতির ব্যবহারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্যে তাগিদ রয়েছে, যাতে কোন উদ্যোগে সম্পর্ণ অর্থায়নে সম-মুলধনের হার অনেক বেশী হয়[৬২] এবং ঋণের উপর নির্ভরশীলতা, বিশেষত: স্বল্প মেয়াদী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। মনে হচ্ছে ব্যাংকগুলো এটা করার চেষ্টা করছে। সাধারণভাবে মনে হচ্ছে যে, সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলো কর্তৃক শরীয়াহর বিধানাবলী অনুসরনের মাত্রা বাড়ছে। অধিকন্তু, তাদের সার্বিক অর্থায়নে মুরাবাহ'র অংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে নেমেছে ৪০.৩ শতাংশে, এবং মুদারাবাহ, মুশারাকাহ ও ইজারাহ'য় অর্থায়ন বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.২, ১২.৭, ও ১১.৫ শতাংশে। অন্যান্য অনির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থায়ন ছিল ২৮.৩ শতাংশ।[৬৩] অল্প কয়েক বছর পুর্বে যখন তাদের অর্থায়নে মুরাবাহ'র পরিমান ছিল ৯০ শতাংশের বেশী, সে

[৬১] এ বিষয়ের উপর আল-মিস্রি'র পুরো একটি রচনা দেখুন, ১৯৮৬ ও ১৯৯০। তাছাড়া, কাফ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "সুদ-প্রথা নিষিদ্ধকরনের অর্থ এ নয় যে, কালের ব্যাপ্ত পরিসরে অর্থের মুল্যের স্বীকৃতিকে মেনে না নেয়া" (কাফ, ১৯৯৪)।

[৬২] তরিকুল্লাহ খান, ১৯৯৫, পৃ: ৩৯।

[৬৩] IAIB, 1996, পৃ: ১৮।

www.pathagar.com

অবস্থার তুলনায় এটি একটি বড় অগ্রগতি। সুতরাং, কঠিন পরিবেশে ব্যাংকসমুহ যা করছে তার জন্যে তারা কৃতিত্বের দাবীদার।

ঝুকিঁপুর্ণ প্রাথমিক পদ্ধতির দিকে ব্যাংকগুলোর দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। ক্রমবিকাশের বর্তমান অবস্থায় ব্যাংকগুলো এ সকল পদ্ধতি ব্যবহারের সহিত সম্পর্কিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্যে যথেষ্ট পরিমানে প্রস্তুত নয়। ঝুঁকি-অংশীদারিত্বের প্রকল্পসমুহ পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নীরিক্ষা করার মত দক্ষতা এদের নেই।[৬৪] অভ্যন্তরীন বা আর্ন্তজাতিক অর্থনীতির উপর তীব্র কোন আঘাতের কারনে ব্যর্থতার ঝুঁকির আশংকায় ছোট আকারের ব্যাংক হিসেবে এদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক রাখে। ফলে, তারা চেষ্টা করে থাকে এটা নিশ্চিত করার জন্যে যে তাদের জনবল ও আর্থিক সংগতির চেয়ে তাদের ঝুকিঁসমুহ যেন বেশী না হয়ে যায়।

তাছাড়া, অংশীদারিত্বমুলক অর্থায়নের অভাবই প্রাথমিক পদ্ধতির স্বল্প ব্যবহারের এক মাত্র কারন নয়। আমানতকারীগনও ঝুঁকি এড়াতে চায় বলে মনে হয় এবং দীর্ঘ দিন ধরে প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ার কারনে তাদের আমানতের উপর লোকসান মেনে নিতে মানসিকভাবে রাজী নয়।[৬৫] এরুপ অর্থায়নের জন্যে ব্যাংকের মক্কেলদের পক্ষ থেকে জোরালো দাবী না থাকাটাও আরেকটি বড় কারন।[৬৬] সুদের উপর ঋণ নিয়ে উচ্চ হারে লাভ করা সম্ভব হলে কোন উদ্যোক্তা তার লাভ ভাগ করতে নাও চাইতে পারেন। তাছাড়া, যে সকল ব্যবসায়ীরা কর ফাঁকি দেয়ার জন্যে দু' সেট হিসাবের বই সংরক্ষণ করে থাকে তারা কর বিভাগের নিকট ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে তাদরে প্রকৃত লাভ কারো নিকট প্রকাশ করতে রাজী নাও হতে পারে। সুতরাং, কর ব্যবস্থাও একটা বাধা। সুদকে সমন্বয়যোগ্য ব্যয় বিবেচনা করে ও লাভকে সেরুপে বিবেচনা না করার মাধ্যমে এটা (কর ব্যবস্থা) ঋণের মাধ্যমে পুজিঁ সংগ্রহকে উৎসাহিত করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: ইতিপুর্বে যেমন বলা হয়েছিল, প্রাথমিক পদ্ধতি কাজে লাগানোর জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখনও গড়ে তোলা হয় নি। এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ব্যতীত ব্যাংকগুলো নিজেরা প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়, বিশেষত: এ কারনে যে, তাদের অধিকাংশই আকারে তুলনামুলকভাবে

---

[৬৪] ইকবাল ও মিরাখর, ১৯৮৭, পৃ: ৩।
[৬৫] দেখুন: El-Gari, 1997, pp. 50-1; Tag El-Din, 1991.
[৬৬] Nienhaus, in Mallat, 1988, পৃ: ১৫৯;

www.pathagar.com

ছোট। যদি তারা চেষ্টা করতো তাহলে তাদের মূলধন ও অন্যান্য ব্যয় ভীষণ বেড়ে যেত। যদি পুষিয়ে দেওয়ার মত লাভ না বাড়ে, তাহলে আর্থিক সম্পদ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে বড় বড় প্রথাগত ব্যাংকসমুহের সাথে এ সকল ব্যাংকের প্রতিযোগিতা করার মত ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে এবং যেখানে পুজিঁর কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা নেই এবং টেলি যোগাযোগের বিপ্লবের যুগে বর্ধিত লাভের খোজেঁ দেশান্তরে পুজিঁর দ্রুত স্থানান্তর যখন সম্ভব হচ্ছে তখন এরা অসুবিধার মধ্যে পড়বেই।

তৃতীয়ত: সম-মুলধন ভিত্তিক ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবে নেই, মাধ্যমিক পদ্ধতিতে ফিরতির পুর্ব-নির্ধারিত হার হিসেবে বিবেচনা করার জন্যে কোন প্রতিনিধিত্বমুলক হারও বিদ্যমান নেই। সুতরাং, ব্যাংকগুলোর সামনে এ কাজের জন্যে LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) ব্যবহার করা ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর নেই। এর ফলে মাধ্যমিক পদ্ধতিকে সুদ-ভিত্তিক কার্যক্রমের মতই মনে হবে। তবে, এমনকি একটা প্রতিনিধিত্বমুলক হার যদিও বা থাকতো বাজারের নিয়ামক শক্তিগুলো ব্যাংকগুলোকে LIBOR থেকে খুব বেশী দুরে যেতে দিবে না। এটা এ কারনে যে, তারা যদি ঋণ কার্যক্রমে LIBOR থেকে উঁচু হার ধার্য করে তাহলে তাদের কিছু মক্কেল প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থার দিকে চলে যাবে। যদি তারা LIBOR থেকে কম হার ধার্য করে তাহলে তারা তাদের আমানতকারী ও শেয়ার হোল্ডারগণকে কম লভ্যাংশ দিতে পারবে, ফলে তাদের কিছু অংশকেও প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থার নিকট হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথাগত অর্থ ব্যবস্থা বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণকে ইসলামি ব্যাংক কর্তৃক LIBOR কে একটা যথাযথ মান হিসেবে গ্রহণ করাকে ইসলামিকরনের অন্তত: প্রাথমিক পর্যায়ে মেনে নিতে হবে।[৬৭]

চতুর্থত: মুসলিম দেশসমুহে নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধানকারী ও আইনগত ব্যবস্থা, বিশেষত: সম্পত্তির ঘোষণার বিধান, বিরোধ নিস্পত্তি ও বকেয়া ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে এখন পর্যন্ত ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থার বিকাশ সাধনের মত করে গড়ে উঠেনি। সাম্প্রতিককালে দুবাই ইসলামি ব্যাংকে কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত তঞ্চকতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইসলামিকরনের অংশ হিসেবে ইসলামি ব্যাংকসমুহের উপর কঠোর নজরদারী ও নীরিক্ষার জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে, মনে হচ্ছে এরুপ প্রয়োজনের কথা অনুভুত হচ্ছে,

---

[৬৭] দেখুন, El-Gari, 1997, pp. ৪৯-৫০।

www.pathagar.com

কারন একটা যথাযথ নিয়ন্ত্রক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরী করার লক্ষ্যে মুসলিম দেশসমুহের মুদ্রা কর্তৃপক্ষগণ অনেকগুলো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সভা করেছে।

পরিশেষে, ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। এ রকম একটা বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। কারন, এর জন্যে আবশ্যকীয় পুর্বশর্ত পুরণ করা হয়নি।[৬৮] বস্তুত: প্রত্যেক মুসলিম দেশে ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা এত ছোট আকারের যে, তা এরুপ একটা বাজার ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে সক্ষম নয়। এর ফলে ইসলামি ব্যাংকগুলো ইসলামে অনুমোদিত কায়দায় তাদের অতিরিক্ত তহবিল বা তারল্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং, তারা প্রচলিত মুদ্রা বাজারের সাহায্য গ্রহন করতে বাধ্য হয়, এবং সমালোচিত হয়। অধিকাংশ ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থলে কোন প্রবেশাধিকার নেই। যার ফলে তারা বাধ্য হয় প্রথাগত ব্যাংকসমুহের চেয়ে বেশী তারল্য সংরক্ষণ করতে। ফলে তাদের লাভ অর্জন করার ক্ষমতার উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে।[৬৯]

মুসলিম দেশসমুহের মুদ্রা কর্তৃপক্ষগুলো কখনও নীরব বিরোধিতা, কখনও সক্রিয় সমর্থনমুলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করেছে। যারা বিরোধিতা করছে তারা, কতিপয় গভর্ণরের সাথে আমার আলোচনায় যা মনে হয়েছে যে এ পদ্ধতিটা ব্যর্থ তারা হোক এটাই চায়, কারন তাহলে তারা এটা থেকে মুক্তি পাবে। অন্যরা বৈরী না হলেও এক প্রকার নিস্প্রভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আছে, এবং, পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটানোর কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মচারী, আমানতকারী, ফান্ড ব্যবহারকারী বা আম-জনতাকে নুতন ব্যবস্থাটির কার্যপদ্ধতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে জানানোর জন্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।[৭০] এটা একটা বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করছে যা ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভর করে সমাধান করতে সক্ষম নয়। মালয়েশিয়া ও বাহরাইনের মত কেউ কেউ তাদের সাধ্যমত এ পদ্ধতিটাকে সাহায্য করছে, এবং একটা যথার্থ আইনগত কাঠামো সৃষ্টি, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, একটা আদর্শ আর্থিক বিবরনী তৈরী, সতর্ক ব্যবস্থাপনার জন্যে গাইড লাইন তৈরী, যথেষ্ট নিরোধ ও ভারসাম্যমুলক বিধান প্রয়োগ, ইসলামি অর্থ বাজার প্রতিষ্ঠা ও ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে।

---

[৬৮] দেখুন, এ আর ইউস্রি আহমদ, ১৯৯৫, পৃ: ৩৩।

[৬৯] IDB'র প্রেসিডেন্ট আহমদ মুহাম্মদ আলীর ভাষণ দেখুন, ১৯৯৫, পৃ: ৪।

[৭০] দেখুন, মোয়াজ্জেম আলী, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ: ৫।

www.pathagar.com

বৈরী ভুমিকা পালনকারীগণ ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষগুলোকে তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ভুমিকা পালন না করার কারনে দোষারোপ করা যাবে না। তাদের নিজেদেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারো কারো এরুপ কাজ করার জন্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নেই, এবং, যদিও তারা তা করতে চায়, তবুও স্বল্প মেয়াদে তারা তা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। তাদের প্রশিক্ষিত জনবল কিংবা সামর্থও নেই। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার যথার্থ কার্যক্রমের জন্যে অধিকাংশ আবশ্যকীয় বিষয়গুলো কেবল মাত্র কালের ব্যাপ্ত পরিসরে একটা ক্রমবিকাশের ধারায় সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় অর্জন করা সম্ভব। দরকার হচ্ছে ধৈর্য ও লাগাতার প্রয়াস। তবে, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষগুলো একটি সক্রিয় নেতৃত্বের ভুমিকা পালনের মাধ্যমে ক্রমবিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা পালনের জন্যে তাদের কেউ কেউ সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।

তথাপিও ইসলামি ব্যাংক বিকাশ লাভ করেছে, এবং "কোনভাবেই এখন কোন তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়"।[৭১] মুসলিম ও অমুসলিম দেশের মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারনে ইসলামি ব্যাংকের অধিকতর বিকাশ নিশ্চিত মর্মেই প্রতীয়মান। সুতরাং, "ইসলামি ব্যাংকিং-এর ভবিষ্যত যে উজ্জ্বল"[৭২] সে সম্পর্কে সামান্যই সন্দেহ রয়েছে মর্মে মনে হয়। এটি অনেক সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু এগুলোর "উত্তরন অসম্ভব"[৭৩] নয়। আশা করা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ইসলামি ব্যাংকের যথাযথ তত্ত্বাবধান ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যর্থতার ক্রমবর্ধমান সমালোচনা ধীরে ধীরে তাদেরকে আরো বেশী বেশী অবদান রাখার এমন সুযোগ করে দিবে যার ফলে তারা জনগনের প্রত্যাশা পুরনে সক্ষম হবে।

এরুপ প্রত্যাশা আংশিক পুরন হয়েছে বলে মনে হয়, কারন তাদের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে এবং তাদের বয়স, আকার ও অভিজ্ঞতা বাড়ছে। পদ্ধতিসমুহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে তারা শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানসমুহ আরো যত্নের সহিত প্রতিপালন করছে মর্মে প্রতীয়মান। তাদের বিনিয়োগসমুহ কৃষি ও শিল্প খাতে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থায়নের দিকে ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে।[৭৪] তবে,

---

[৭১] Nienhaus, in Mallat, 1988, পৃ: ১৩০;

[৭২] নূর, ১৯৯৭, পৃ: ২৫২।

[৭৩] Vogel and Hayes, 1998, পৃ: ১৩।

[৭৪] মুদাবী, ১৯৮৬; রডনি উইলসন-এ ওসমান আহমদ, ১৯৯০; এবং এম এন সিদ্দিকী, Zeineldin-এর বই (১৯৯০) আলোচনা করতে গিয়ে (১৯৯৪)।

www.pathagar.com

সম্ভবত: বাস্তবানুগ হওয়াই ভালো এবং আমাদের প্রত্যাশা খুব বেশী বাড়ানো সংগত নয়। নিকট ভবিষ্যতে ব্যাংকসমুহ সঠিক হিসাব সংরক্ষণকারী ও নিয়মিত নীরিক্ষা সম্পান্নকারী কর্পোরেশন ও বৃহদাকার অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে লেন-দেনে মুদারাবাহ ও মুসারাকাহ'র মত প্রাথমিক পদ্ধতি যেমন গ্রহন করতে পারে, তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানসমুহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাদের কিছুটা সময়ও লাগতে পারে।

এর ফলে প্রশ্ন ওঠে যে, মাধ্যমিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করেও ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থা প্রথাগত ব্যবস্থার থেকে আলাদা কিছু হবে কী না। সম্ভাব্য জবাব বোধ হয় হাঁ হবে, কারন মাধ্যমিক পদ্ধতি অনিবার্যভাবেই অর্থায়নকে প্রকৃত পণ্য, সেবা ও প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে। পণ্য ও সেবার সম্পৃক্ততা ব্যতীত সরাসরি ঋণ প্রদান সম্ভব নাও হতে পারে। এভাবে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ঋণের অতি সম্প্রসারন হ্রাস করা যেতে পারে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে মুদ্রার সম্প্রসারন সম্ভব হতে পারে এবং, ফলশ্রুতিতে তা মুদ্রাস্ফীতির চাপ ন্যূনতম রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া, যেহেতু, মাধ্যমিক পদ্ধতি অনুমোদনের জন্যে শরীয়াহ কতিপয় শর্ত দিয়ে দিয়েছে,[৮] সেহেতু অর্থায়নকারীকেও কতিপয় ঝুকিঁ বহন করতে হবে এবং ঋণগ্রহীতার স্বার্থও কিছুটা হলেও রক্ষা করা যেতে পারে। মুদ্রা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ সকল শর্তাদির যথাযথ প্রয়োগের ফলে এ জাতীয় পদ্ধতিগুলোকে নিরেট অর্থ-লগ্নিকারী কৌশলে পর্যবসিত করতে দেবে না। ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাথমিক পদ্ধতি ব্যবহারের দিকে যতখানি ঝুঁকবে সেটা বিবেচনায় ফলাফল ততখানি বাঞ্ছিত মর্মেই প্রতিভাত হতে পারে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে সম-মুলধনের একটা প্রতিনিধিত্বমুলক পুর্ব-নির্ধারিত ফিরতির হার বাস্তবে ক্রিয়াশীল থাকা উচিত। এর ফলে লন্ডনের আন্ত:-ব্যাংক বিনিময় হারের (LIBOR) প্রয়োজন পুরো-পুরি না ফুরালেও অন্তত: কমে যেতে পারে।

গোটা অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরন

সুদভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলো প্রথাগত ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নীতির বিপরীতে তিনটি মুসলিম দেশ দেশব্যাপী ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ বেছে নিয়েছে। কারনটি সম্ভবত: পাকিস্তানের কাউন্সিল ফর ইসলামিক আইডিওলজির বিচেনায় থাকা যুক্তির কাছাকাছি হবে, যার জন্যে তারা আলাদা ইসলামি ব্যাংক

[৮] দেখুন, চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১৬৬-৭৩।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা বা প্রথাগত ব্যাংকে সুদমুক্ত কাউন্টার চালু করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। তাদের মতে এরূপ পদক্ষেপ দেশে সুদমুক্ত ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াসকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, এবং তার ফলে প্রচলিত পদ্ধতি স্থায়িত্ব পেয়ে যেতে পারে।[৭৬] গোটা অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামিকরনের বিষয়ে ইরান ও সুদানের যুক্তিও সম্ভবত: একই রকম হয়ে থাকবে।

মুল্যায়নের মাপকাঠি

প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ দেশ-ব্যাপী পরীক্ষা-নীরিক্ষা কতটা সফল হয়েছে? তাদের সাফল্য মুল্যায়নের জন্যে অনেকগুলো মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে আমানত, সম্পদ, মুলধন, লাভ ইত্যাদির মত কতিপয় বিভিন্ন ব্যাংকিং চলকের উর্ধ্বগতি এবং এ পদ্ধতির সুস্থতা ও কর্মক্ষমতার নির্দেশক কতিপয় অনুপাত, যা কিনা প্রথাগত ব্যাংকের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। যদিও এ রকম মুল্যায়ন অবশ্যই করা উচিত, তবে তা অবশ্যই অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরন পরিমাপে কোন সহায়তা করে না।এ সকল চলকসমুহের উর্ধ্বগতিতে সহায়ক ভুমিকা পালনের মধ্যে ইসলামিকরনের যুক্তি নিহিত নয়।[৭৭] প্রবৃদ্ধিতে এরূপ অবদান নানা কারনে হয়ে থাকতে পারে, যেমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো, অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য ও দ্রুত বিকাশ, পুজির অন্ত:প্রবাহ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি ও ব্যাংকগুলোর উন্নততর ব্যবস্থাপনা। প্রচলিত ব্যবস্থায়ও এ রকম উন্নতি ঘটতে পারে এবং একই ফলাফল অর্জিত হতে পারে। যেহেতু মুসলিম বিশ্বে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার চাহিদা অপুর্ণ রয়েছে, সেহেতু, এ সকল দেশে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের আমানত ও সম্পদের বর্ধিত প্রবৃদ্ধি অর্জন হতে বাধ্য। সুতরাং, ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার কর্মতৎপরতার মুল্যায়ন করার প্রয়োজন হতে পারে। যে সকল কারনে এ ব্যবস্থার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে সে প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্যে এ ব্যবস্থা কতখানি অবদান রেখেছে তার পরিমাপের মাধ্যমে, অন্য কথায়- যা হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্যসমুহের বাস্তবায়ন।

তবে, ইসলামের লক্ষ্যসমুহ (Maqasid Al Shariah) অর্জনে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সহায়ক নাও হতে পারে যদি প্রাথমিকভাবে অর্থনীতি থেকে সুদ ব্যবস্থার অবলোপনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অন্য তিনটি ক্ষেত্রেও যুগপৎ অগ্রগতি হওয়া বাঞ্চনীয়। প্রথমত: ইসলামিকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ

---

[৭৬] কাউন্সিলের রিপোর্টে Chairman, Council of Islamic Ideology, তাঞ্জিলুর রহমানের মুখবন্ধ দেখুন, পৃ: xiv।

[৭৭] দেখুন, আল-নাজ্জার, ১৯৮৯, ১ম খন্ড, পৃ: ১৯।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণভাবে সুস্থ ও শক্তিশালী হবে এরূপ একটা নিশ্চয়তা আবশ্যক। এটা সম্ভব হবে না যদি না: নিয়োগসমুহ মেধার ভিত্তিতে না করা হয়; যথেষ্ট পরিমান স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করা হয়; যথেষ্ট পরিমান অভ্যন্তরীন যাছাই-বাছাই ও নিয়ন্ত্রন বজায় না থাকে; প্রতারনা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অর্থের তছরুপের মত ঘটনা না ঘটে বা নিদেনপক্ষে ন্যুনতম পর্যায়ে নামানো না হয়; এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ পরিদর্শন ও বাইরের নিরপেক্ষ অডিটের ব্যবস্থা কার্যকর না থাকে। দ্বিতীয়ত: সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে এবং অভ্যন্তরীন ও বাইরের দ্বন্দ্বসমুহ, যা কিনা এরূপ ভারসাম্যহীনতাকে উস্কে দেয় ও ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করে থাকে, সেগুলোকে এড়িয়ে চলার দরকার হবে। তৃতীয়ত: শরীয়াহ'র চাহিদা অনুযায়ী একটা সুচিন্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী চালু করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, প্রয়োজনীয় আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্বাস্থ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত ইসলামিকরন অপেক্ষা করা উচিৎ। এরূপ যুক্তি ইসলামিকরন প্রক্রিয়া আদৌ শুরু না করার জন্যে একটা ছুতার মতই মনে হবে।

পাকিস্তানের উপাখ্যান

পাকিস্তানে ইসলামিকরনের শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের হাতে ১৯৭৯ সালের জুলাই থেকে। উদ্যোগটা শুরু করার জন্যে তিনি অবশ্যই সাধুবাদ পেতে পারেন। যেহেতু এটা শুরু করা হয়েছিল গণদাবীর প্রেক্ষাপটে, সেহেতু এর জন্যে জনগণের সার্বিক সমর্থন ছিল। তবে, যদিও কাউন্সিল ফর ইসলামিক আইডিওলজি স্পষ্ট করেই সাবধান করে দিয়েছিল যে, "সুদ প্রথার বিলোপ সার্বিক ইসলামি মুল্যবোধের কেবল মাত্র একটা অংশ মাত্র এবং কেবল মাত্র এরূপ একটা পদক্ষেপের মাধ্যমে গোটা অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামি দর্শনের আলোকে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না", [৭৮] কাউন্সিলের সুপারিশসমুহ বাস্তবায়ন কিংবা আর্থিক ব্যবস্থায় বৃহদাকার সমন্বয় সাধনের জন্যে কোন আন্তরিক প্রয়াস চালানো হয়নি।

অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতই সেখানকার ব্যাংক ব্যবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল।এরূপ দুর্নীতি অবশ্যই পাকিস্তানী জনগণের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। বরং এটা ছিল জনগণের প্রতি দায়বদ্ধহীন বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন, এবং ৭০-এর দশকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনকালে ব্যাংকগুলো

[৭৮] কাউন্সিলের প্রতিবেদন, ১৯৮০, পৃ: ৩।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয়করন, যা ধনী ও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থই রক্ষা করছে। রাজনৈতিক চাপের ফলে ব্যাংকগুলো ক্রমেই দুর্নীতিগ্রস্থ ও অদক্ষ হয়ে পড়লো, এবং সুস্থতা ও দক্ষতার আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য মাপকাঠির পরীক্ষায় টিকে থাকতে অপারগ হলো। মেধার পরিবর্তে স্বজন-প্রীতি ও আনুকল্যের ভিত্তিতে নিয়োগ অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে গেল। প্রায়ই যথেষ্ট পরিমানে জামানত ব্যতীত প্রকল্পের গুনাগুন বিবেচনা না করে ঋণ-গ্রহীতার রাজনৈতিক সংশ্লেষের উপর ভিত্তি করে ঋণ মঞ্জুর করা হতো, এবং আরো জঘন্য ঘটনা হচ্ছে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হতো। খেলাপী ঋণের নানা রকম হিসাব রয়েছে। এরুপ একটা হিসাব অনুসারে খেলাপী ঋণের পরিমান ২৫০ বিলিয়ন রুপী, যা সকল ব্যাংকের মুলধন ও রিজার্ভের প্রায় ৪০০ শতাংশ। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আন্তর্জাতিক মুল্যায়ন সংস্থা মুডিজ-এর (Moodys) মুল্যায়নে পাকিস্তানের চারটি বড় ব্যাংকের (ন্যাশনাল, মুসলিম কমার্শিয়াল, হাবীব ও ইউনাইটেড) রেটিং হচ্ছে E+। গণতন্ত্র চালু হওয়ার ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তিত না হলে খেলাপী ঋণগুলো হয়ত: নীরবেই মওকুফ করে দেওয়া সম্ভব হতো। স্বাধীন সংবাদ পত্র ও মুখর বিরোধী দল অতীতের অনুরুপ আচরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেহেতু, এরুপ একটা অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্থ অর্থ ব্যবস্থায় ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেহেতু, সুদ-প্রথা বিলোপের প্রয়াস ও অর্থ ব্যবস্থার সুস্বাস্থ্য ও সততা পুন: প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও একই সাথে চালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। তবে, জেনারেল জিয়া তা করেন নি। তিনি অর্থনীতির সুস্থতা নিশ্চিত না করেই সুদ-প্রথা বিলোপ করতে চাইলেন। তিনি সফল হতে পারেন নি। ইসলামি ব্যবস্থা চালু করার জন্যে একটা সরকারী আদেশ প্রদান করেই কোন দুর্নীতিগ্রস্থ আর্থিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কম বা বেশী মুল্যে পুজিঁ সরবরাহ (mark-up and mark-down financing) ব্যতীত ইসলামিকরন প্রক্রিয়া তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।[৭৯] বহু

[৭৯] ডিসেম্বর, ১৯৮৬-তে সর্বমোট অর্থায়নের ৮৩ শতাংশ ছিল এ ধরনের অর্থায়ন। মুদারাবাহ, মুশারাকাহ ও সম-মুলধনে অর্থায়নের পরিমান ছিল মাত্র ১৪.১ শতাংশ, হায়ার-পার্সেজ, বাড়ী-ভাড়ার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গৃহ-নির্মান ঋণ ও অন্যান্য ঋণের পরিমান ছিল যথাক্রমে, ০.৭, ১.০, ও ১.২ শতাংশ (দেখুন, ইকবাল ও মিরাখর, ১৯৮৭, পৃ: ২০)। এগুলো শুধু মাত্র জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলোর তথ্য, যা ব্যাংকিং সেক্টরের মোট পরিসম্পদ ও দায়ের ৯০ শতাংশের মালিক। তখন থেকে কতিপয় জাতীয়করনকৃত ব্যাংক বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ইসলামীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রকাশনা বন্ধ করে

www.pathagar.com

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে যেখানে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে, সেগুলোর তুলনায় পাকিস্তান তার দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে সৎ ও দক্ষভাবে কার্যকর করার জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনার জন্যে খুব সামান্যই কাজ করেছে।

আক্রাম খান যথার্থই বলেছেন যে, "দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থায়নই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে লাভ-লোকশানের অংশীদারিত্ব বেশ ভালোভাবেই প্রয়োগ করা যায়"। তবে, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ "এখনও সুদের ভিত্তিতে পাওয়া যায়"।[৮০] এর জন্যে তিনি রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, ব্যাংকের আমলাদের নিকট থেকে অভ্যন্তরীন প্রতিরোধ, এবং অপর্যাপ্ত আইনগত সমর্থনকে দায়ী করেন। তাছাড়া, কর্পোরেশন ও বড় বড় অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে সম-মূলধনের হার বৃদ্ধি জন্যে কোন চেষ্টাই করা হয় নি, কিংবা কর ব্যবস্থা সংশোধনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি যা সম-মূলধনের বিপরীতে ঋণকে উৎসাহিত করে থাকে, যেখানে ঋণের সুদকে খরচ হিসেবে সমন্বয় করাকে অনুমোদন করে কিন্তু লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে অনুরূপ সুবিধা প্রদান করে না। সরকারী লেন-দেনের ক্ষেত্রে যেখানে অনুৎপাদনশীল ব্যয়জনিত বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্যে ইসলামি অনুশাসন আরো বেশী হারে প্রযুক্ত হওয়া সমীচীন ছিল, খামখেয়ালীভাবে সেখানেও নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ করা হলো না। ইসলামি ব্যবস্থা অমিতব্যয়ী সরকারের জন্যে মানানসই নয়। পরিণতিতে, দেশে প্রচুর অসন্তুষ্টি দেখা দিল। ফেডারেল শরীয়াহ আদালত যখন ঘোষণা করলো যে, নির্ধারিত লাভের শর্তে ঋণ প্রদান (mark-up financing) শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এটার অবসান হওয়া উচিৎ, নেওয়াজ শরীফের সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলো যেখানে সরকারের ইশারায় মামলাটি প্রায় আট বছর হিমাগারে থাকলো এবং এ সুযোগে নির্ধারিত লাভের শর্তে ঋণ (mark-up financing) দানের পদ্ধতি অবাধে চলতে থাকার সুযোগ পেল। সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপীল বেঞ্চ অবশ্য এখন শুনানী শুরু করেছে এবং জনগণ অধীর আগ্রহে রায়ের অপেক্ষায় আছে।

পরিণতিতে, পাকিস্তানকে ইসলামিকরনের কোন প্রকৃষ্ট উদাহরন হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। দেশটি ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ থেকে ধীরে ধীরে দুরে সরে যাচ্ছে, যদিও এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে প্রচুর

দিয়েছে। সুতরাং, অর্থায়নের প্রাথমিক পদ্ধতি ব্যবহার বিষয়ে অগ্রগতি মুল্যায়ন করা সম্ভব নয় (জিয়া উদ্দিন আহমদ, ১৯৯৪, পৃ: ২৯, ফুটনোট ৪৩)।

[৮০] এম আকরাম খান, ১৯৯৬, পৃ: ২২২।

www.pathagar.com

চাপা-বাজি চলছে। ১৯৭৯ সালে ইসলামিকরন প্রক্রিয়া চালুর সময়ের ও ১৫ বছর পরে ১৯৯৪ সালের আমানত ও ঋণের পরিমান (সারণী-১) তুলনা করলে এটা পরিস্কার হবে। যেখানে

১০০,০০০ রুপীরও কম আমানত ১৯৭৯ সালে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট আমানতের ৭৪.৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী ছিল, ১০০,০০০ রুপীরও কম পরিমান ঋণ ১৯৭৯ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমুহের মোট প্রদত্ত ঋণের মাত্র ১৮.৯ শতাংশের সমান ছিল। তাছাড়া, ১০ মিলিয়ন রুপীর বেশী আমানতের পরিমান মোট আমানতের মাত্র ৪.৭ শতাংশ ছিল, অথচ ১০ মিলিয়ন রুপীর বেশী প্রদত্ত ঋণ মোট প্রদত্ত ঋণের ৩৬.২ শতাংশ ছিল। আশা করা যাচ্ছিল যে, ইসলামিকরনের ১৫ বছর পর অবস্থা কিছুটা হলেও ভাল হবে। তবে, ১৯৯৪ সালের তথ্য মতে দুর্ভাগ্যবশত: অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। নিম্ন-স্তরে ১০০,০০০ রুপীরও কম পরিমান অর্থ আমানতের জন্যে দায়ী আমানতকারীর সংখ্যা ১৯৭৯ সালের ১৪.৩ মিলিয়ন থেকে প্রায় দ্বিগুন হয়ে ১৯৯৪ সালে ২৭.৭ মিলিয়ন হয়েছে, এবং মোট আমানতে তাদের অবদান সাড়ে-পাঁচগুন বেড়ে ৪৬.০০ মিলিয়ন রুপী থেকে ২৫৪.৬ মিলিয়ন রুপী হয়েছে, ১০০,০০০ রুপীর চেয়েও কম পরিমান ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমে ১৯৭৯ সালের প্রায় ৯১৫ হাজার থেকে কমে ১৯৯৪ সালে নেমে এসেছে ৭২৩ হাজারে। বিপরিতক্রমে, উচ্চ স্তরে, ১০ মিলিয়নের বেশী অংকের আমানতসমুহ ১৯৯৪ সালের মোট আমানতের ১৪.৭ শতাংশের জন্যে দায়ী ছিল, অথচ ১০ মিলিয়নের বেশী অংকের ঋণসমুহ ১৯৯৪ সালের মোট প্রদত্ত ঋণের ৫৫.৬ শতাংশের জন্যে দায়ী ছিল। বৈষম্য আরো বেশী জাজ্বল্যমানভাবে চোখে পড়ে যদি লক্ষ্য করা হয় যে, ১৯৯৪ সালে ২৮.৪ মিলিয়ন আমানতকারীর আমানতকৃত সম্পদ মাত্র ৪৭০৩ জন সুবিধাভোগী ঋণ-গ্রহীতার নিকট চলে গেছে।[৮১] এ সকল ঋণের কতিপয় কৌশলে মওকুফও করা হয়ে থাকতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের মুলধনের সাথে তার ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতার সম্পর্ককে সংযুক্ত করে ব্যাংকিং কার্যক্রমে আরো বেশী সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে জারীকৃত প্রবিধানমালা এখন পর্যন্ত কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।[৮২]

---

[৮১] ১৯৭৯ সালের সংখ্যাগুলো স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের *Banking Statistics of Pakistan,* 1988-89 (করাচী, ১৯৯১), পৃ: ৫০ ও ১১২; ১৯৯৪ সালের সংখ্যাগুলো স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের *Statistical Bulletin,* জুলাই, ১৯৯৫, পৃ: ৩২-৩ ও ৪৬-৭ থেকে সংগৃহীত।

[৮২] Z. Ahmed, 1994, পৃ: ২৯।

www.pathagar.com

সারণী - ১

পরিমান অনুসারে পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমুহের আমানত ও ঋণ বন্টন

(পরিমান মিলিয়ন রুপীতে)

	১৯৭৯				১৯৯৪			
	হিসাবের সংখ্যা	মোটের শতকরা	পরিমান	মোটের শতকরা	হিসাবের সংখ্যা	মোটের শতকরা	পরিমান	মোটের শতকরা
আমানতের প্রকারভেদ ১০০, ০০০–এর কম ১০০, ০০০ থেকে ১০০০, ০০০ ১০০০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০ ১০, ০০০, ০০০ – এর উর্ধ্বে	১৪, ৩২২ , ৫৩৬ ৩১, ৪৪৩ ২, ১২২ ১০৫	৯৯. ৭৭ ০. ২২ ০. ০১ ০. ০০	৪৫, ৯৭ ৬ ৭, ৮৯১ ৪, ৮১৩ ২, ৯১২	৭৪. ৬ ৪ ১২. ৮ ২ ৭. ৮১ ৪. ৭৩	২৭, ৭০ ৯, ০২৯ ৬৬০, ৫১ ৬ ৪১, ৮৬ ৩ ২, ১৬৯	৯৭. ৫২ ২. ৩২ ০. ১৫ ০. ০১	২৫৪৬৩৮ ১৬১, ০৮ ৮ ৯০, ০৫৯ ৮৭, ৩০৬	৪২. ৯৩ ২৭. ১৬ ১৫. ১৯ ১৪. ৭২
মোট	১৪, ৩৫ ৬, ২০৬	১০০	৬১৬০০	১০০	২৮৪১৩৫৭৭	১০০	৫৯৩০৯১	১০০
ঋণের প্রকারভেদ ১০০, ০০০ এর কম ১০০, ০০০ থেকে ১০০০, ০০০ ১০০০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০ ১০, ০০০, ০০০ 'এর উর্ধ্বে	৯১৫, ৩ ২০ ২২, ১৬ ৪ ৪, ৩৬ ৮ ৫২৩	৯৭. ১৩ ২. ৩৫ ০. ৪৬ ০. ০৬	৮, ২৫৩ ৬, ৪২২ ১৩, ২২৭ ১৫, ৮৩৯	১৮. ৮৭ ১৪. ৬৮ ৩০. ২৪ ৩৬. ২১	৭২২৯০৯ ১৮৯, ৭৩৩ ২৭, ০৬০ ৪, ৭০৩	৭৬. ৫৪ ২০. ০৯ ২. ৮৭ ০. ৫০	১৪, ৪১৮ ৫৩, ১৭৫ ৭৮, ৮৭১ ১৮৩, ৭২৭	৪. ৩৭ ১৬. ১০ ২৩. ৮৯ ৫৫. ৬৪
মোট	৯৪২৩৭৫	১০০	৪৩, ৭৪১	১০০	৯৪৪, ৪০৫	১০০	৩৩০১৯১	১০০

তথ্যসূত্র: ১৯৭৯ সালের তথ্য পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত পাকিস্তানের ব্যাংকিং পরিসংখ্যান

www.pathagar.com

(করাচী, ১৯৯১), ১৯৮৮-৮৯, পৃষ্ঠা ৫০ ও ১১২-এ; এবং ১৯৯৪ সালের তথ্য পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের পরিসংখ্যান বুলেটিন, জুলাই, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩ ও ৪৬-৪৭-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়তে বাধ্য - জাকাত, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রগতিশীল করারোপ ও ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ ব্যবহার করে সে বৈষম্য যতই কমানোর চেষ্টা করা হোক না কেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়নও পাকিস্তানে অবহেলার শিকার ও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের আওতাও তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের, কর ব্যবস্থা নীপিড়নমূলক, ধনী ভু-স্বামী ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সহজেই কর ফাঁকি দিতে পারে। পাকিস্তান সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিংবা ব্যাংকের আমলারা ইসলামিকরনের জন্যে কোন আন্তরিক অঙ্গিকার এখনও দেখাতে পারে নি। সুতরাং, মিরাখোর যথার্থই বলেছেন যে, "পাকিস্তানে ইসলামি ব্যাংকিং একটি জটিল সন্ধিক্ষনে রয়েছে এবং এর অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের আরো বেশী বেশী প্রয়াস"।[৮৩] বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ, সুপ্রীম কোর্টে যার আপীল আবেদনের কারনে ফেডারেল শরীয়া আদালতের রায় হিমাগারে গিয়েছিল, অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরনের জন্যে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী রাজা জাফরুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছেন। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে কমিশন রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু তা এখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

উপরোক্ত ব্যর্থতা ছাড়াও আরো অনেক সংস্কারের ক্ষেত্রেও সরকারের অঙ্গিকারের অভাব দেখা গেছে, যদিও ইসলামের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে সেগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। এগুলোর একটি হচ্ছে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। ইসলামের জন্যে আন্তরিকভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ একটি সরকার মুদ্রাস্ফীতিপ্রবন ও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে বাজেট ঘাটতি হ্রাসকরনের জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে মর্মে আশা করা হয়। এরূপ একটি সরকার চেষ্টা করবে যেন তার বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় হয় শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক

---

[৮৩] Mirakhor, in Mallat, p. 100.

www.pathagar.com

উন্নয়ন, এবং পল্লী উন্নয়ন খাতে যাতে করে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। এটা করা হয়নি।

ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামিকরনের পুর্বের ১৮ বছরে (১৯৬১-৭৯) পাকিস্তানের গড় বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৬.৫ শতাংশ (সারণী-২)। তথাকথিত ইসলামিকরনের পরবর্তি ১৮ বছরে (১৯৭৯-৯৭) ঘাটতির গড় হ্রাস পাবে এমন আশা করা হতো। কিন্তু অল্প হলেও তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল জিডিপি'র ৬.৮ শতাংশে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের চাপ না থাকলে ঘাটতি সম্ভবত: আরো বাড়তো। একটি সত্যিকার ইসলামি রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আই এম এফ) চাপে নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের লক্ষ্যসমুহের প্রতি সরকারের নিজস্ব অঙ্গিকারের কারনেই প্রয়োজনীয় সংস্কার হওয় উচিৎ।

যেহেতু মুদ্রা ছেপে এবং অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে এ সকল ঘাটতিসমুহ মোকাবেলা করা হতো, সেহেতু অর্থ সরবরাহ (অর্থ ও অর্থের অনুরূপ দলিল) এবং ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমানও দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। ইসলামিকরনের আগের ১৮ বছরে মুদ্রা প্রসারের পরিমান ছিল বার্ষিক ১৪.৮ শতাংশ, কিন্তু, ইসলামিকরনের পর তা বেড়ে বার্ষিক ১৫.৮ শতাংশে পৌছেঁছিল। যেহেতু, এ দু'সময়ে প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে মাত্র ৪ শতাংশ ও ৫.৭ শতাংশ, এ দু'সময়ে বাজার মুল্যের বৃদ্ধি ঘটেছিল যথাক্রমে বার্ষিক ৭.৯ ও ৮.৮ শতাংশ। যদিও এটা যে কোন উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভাল, এটা বিশ্বাস করার কোন কারন নেই যে, আরো বেশী কিছু অর্জন করা অসম্ভব হতো না যদি ইসলামি মুল্যবোধের আলোকে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরে সাধ্যের বাইরে জীবন যাপন করার অভাস ত্যাগ করা যেত।

www.pathagar.com

সারণী- ২

পাকিস্তান: কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশক

				বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার	
	১৯৬১	১৯৭৯	১৯৯৭	১৯৬১ - ৭৯	১৯৭৯ - ৯৭
জিডিপি (বিলিয়ন রুপী)	২৩. ৭	১৯৪. ৯	২৫০৩. ২	১২. ৪	১৫. ২
জিডিপি (বিলিয়ন রুপী, ১৯৯০-এর মুল্যমানে) বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতকরা হারে) মুদ্রা সরবরাহ(বিলিয়ন রুপী) (মুদ্রা+মুদ্রা জাতীয়) বাজার মুল্যের সূচক	২১৪. ০ ০ -৩. ১ ৭. ০ ১১. ৬	৪৩২. ১ -৯. ২ ৮৪. ১ ৪৫. ৬	১, ১৬৬. ৩ -৫. ৩ ১, ১৭০. ৫ ২০৮. ৯	৪. ০ ৬. ৫ ১৪. ৮ ৭. ৯	৫. ৭ ৬. ৮ ১৫. ৮ ৮. ৮
বৈদেশিক ঋণ					
বিলিয়ন ডলার	-	৯. ৯*	২৯. ৭	-	৬. ৭*
জিডিপি'র শতাংশ	-	৪২. ৪*	৪৭. ৫	-	-
ঋণের কিস্তি পরিশোধ**	-	১৮. ৩*	৩৬. ১	-	-
রপ্তানী					
বিলিয়ন রুপী	১. ৯	২০. ৪	৩৫৯. ০	১৪. ১	১৭. ৩
পরিমান (১৯৯০=১০০)	-	৪৯. ৫	১২২. ৮	-	৫. ১
আমদানী					
বিলিয়ন রুপী	৩. ০	৪০. ২	৪৭৬. ৩	১৫. ৫	১৪. ৭
পরিমান (১৯৯০=১০০)	-	৮০. ৩	১৩০. ৪	-	২. ৭
বিনিময় হার (ডলারের বিপরীতে রুপী)					
বছরের শেষে	৪. ৭৮	৯. ৯০	৪৪. ১	-৪. ১	-৮. ৬
বছরের গড়	৪. ৭৮	৯. ৯০	৪১. ১	-৪. ১	-৮. ২

* এ অংকগুলো ১৯৮০ সালের এবং প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮০-৯৭ সময় কালের।

* পণ্য ও সেবা রপ্তানীর শতকরা হার।

www.pathagar.com

সূত্র: আই এম এফ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পরিসংখ্যান, CD-ROM৷ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্যসমুহ বিশ্ব ব্যাংক, গ্লোবাল ডেভেলাপমেন্ট ফিনান্স, ১৯৯৯ থেকে সংগৃহীত।

১৯৮০ সালে পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল মাত্র ৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল জিডিপি'র ৪২.৪ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা জিডিপি'র ৪৭.৫ শতাংশ। এ সময় প্রতিবছর ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরিমান পণ্য ও সেবা রপ্তানী আয়ের ১৮.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৬.১ শতাংশে উঠেছিল। সরকারের অভ্যন্তরীন ঋণও ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে সরকারের ঋণ পরিশোধের দায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের বাজেটের (সারণী-৩) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৬.৩ বিলিয়ন রুপীর ৪৫.৫ শতাংশ এবং প্রাক্কলিত কর-এ কেন্দ্রীয় সরকারের হিস্যা ২০৩.২ বিলিয়ন রুপীর ১৩৫.৬ শতাংশ এ খাতে চলে যায়। মোট ব্যয়ের ২৩.৯ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে চলে যায়, অবশিষ্ট ৩০.৬ শতাংশ অন্যান্য সকল খাতের জন্যে বরাদ্দ করা হয়। মোট ব্যয়ের মাত্র ১৮.২ শতাংশ উন্নয়ন খাতের জন্য বরাদ্দ।বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা আইন-শৃংখলা রক্ষা খাতসহ অন্য সকল খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১২.৪ শতাংশ।কিন্তু, দুর্নীতি এতই ব্যাপক যে, উন্নয়ন খাতের জন্যে বরাদ্দ এরুপ ক্ষুদ্র অংশেরও বড় একটি পরিমান কমিশন ও ঘুষ খাতে চলে যায়। ফলাফল হচ্ছে, জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ নিরক্ষর, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬ শতাংশ ও ৭৪ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র স্কুল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এরুপ বাজেট ও শিক্ষার মান এবং জিডিপি'র ১৫ শতাংশের সম-পরিমান অতি নিম্ন সঞ্চয়ের হার নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কি প্রাচ্যের বাঘ হওয়া ও ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব?

আর একটি বড় ব্যর্থতা হচ্ছে অতি জরুরী ভুমি সংস্কার কার্যক্রমে অবহেলা। মাত্র ৫ শতাংশ ব্যক্তি পাকিস্তানের প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষি জমির মালিক।[৮৪] এ সকল ভূস্বামী পরিবারগুলোর হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং তারা অধিকাংশ কৃষিজীবীদের দন্ডমুন্ডের কর্তা হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে। পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ বস্তুত: সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ইচ্ছা ও হুকুমের অধীন, যারা তাদের কথা মতই কাজ করে। এর ফলে পল্লী এলাকার জনগণের

[৮৪] S. Tahir Hijazi, n.d. কর্তৃক উদ্বৃত, পৃ: ৬৯।

www.pathagar.com

শোষনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, যা তাদের উৎসাহকে দমিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, এবং দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য স্থায়িত্ব লাভ করছে। পল্লী এলাকায় ক্ষমতা কেন্দ্রে ভাঙ্গন না ধরালে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো কিংবা দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমুহের ভিত্তি শক্ত করা সম্ভব হবে না। এটা একটা কঠিন কাজ, কিন্তু যেহেতু অন্য কোন আর্থ-সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে এরুপ কোন সুদুর প্রসারী ফল বয়ে আনার সম্ভাবনা নেই যা ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব, সেহেতু একটি দৃঢ় প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এ কারনে সকল ইসলামিকরন কর্মসূচীর মুল ভিত্তি হওয়া উচিৎ ভুমি সংস্কার। ইসলামের আলোকে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবীদার যে কোন সরকার যদি ভুমি সংস্কারকে তার সকল কর্মসূচীর কেন্দ্রে স্থান না দেয়, তাহলে সেই সরকারকে তার দাবীর বিষয়ে আন্তরিক মর্মে বিবেচনা করা যাবে না।

একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছে প্রকৃত ইসলামিকরন বলতে বুঝায় সে সকল নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন যেগুলোর পক্ষে একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপুর্ণ উন্নয়নে, সার্বিক কল্যাণ সাধনে, ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা সম্ভব। যদি সরকারগুলো সুদ-প্রথা বিলোপে আন্তরিক হতো, তাহলে তারা কর ব্যবস্থাকে আরো সুদক্ষভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে বাজেট ঘাটতি দুর করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতো। সেক্ষেত্রে সরকারের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কর থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হতো। কিন্তু, ইসলামের জন্যে চাপাবাজি করা সত্বেও সরকারগুলো সোজা পথ অনুসরন করে যত পেরেছে ঋণ গ্রহণ করেছে। ফলে, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে সরকারের কোমর ভেঙ্গে যাবার অবস্থা হয়েছে। যেহেতু, প্রতিরক্ষা খাত বাজেটের বিরাট অংশ খেয়ে ফেলছে, সেহেতু, অবকাঠামো নির্মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্যে সামান্যই অবশিষ্ট থাকছে। যদি ইসলামের লক্ষ্য হয়ে থাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাহলে পাকিস্তানের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে, প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, সরকারগুলো ইসলামিকরনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্যসমুহ সম্পর্কে প্রকৃতই ওয়াকিবহাল ছিল কি না।

www.pathagar.com

সারণী- ৩

পাকিস্তান: ১৯৯৮-৯৯ সনের বাজেট

	বিলিয়ন রুপী	মোটের উপর শতকরা হার
মোট ব্যয় প্রস্তাব	৬০৬. ৩	১০০. ০০
ঋণের কিস্তি পরিশোধ	২৭৫. ৬	৪৫. ৫
প্রতিরক্ষা	১৪৫. ০০	২৩. ৯
উন্নয়ন	১১০. ৬০	১৮. ২
অন্যান্য	৭৫. ১	১২. ৪
অর্থায়ন	৬০৬. ৩	১০০. ০০
কর রাজস্ব	২০৩. ২	৩৩. ৫
প্রত্যক্ষ কর	(১১৪. ৮)	(১৮. ৯)
অপ্রত্যক্ষ কর	(২২৩. ৪)	(৩৬. ৮)
(-) প্রদেশ সমুহের হিস্যা	(১৩৫. ০০)	(-২২. ২)
কর বহির্ভুত রাজস্ব (প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের উপর সারচার্জসহ)	১৬৩. ৯	২৭. ০০
অন্যান্য অভ্যন্তরীন উৎসসমুহ	৪১. ৬	৬. ৯
উক্ত তিনটির যোগফল	৪০৮. ৭	৬৭. ৪
ঘাটতি পুরনের উৎস বৈদেশিক ঋণ ব্যাংক থেকে ঋণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ	১৯৭. ৬ (১৪২. ০) (৪৩. ০) (১২. ৬)	৩২. ৬ (২৩. ৪) (৭. ১) (২. ১)

তথ্যসূত্র: স্টেট ব্যাংক নিউজ, ১৬ জুন, ১৯৯৮, পৃ: ৫।

ইরান ও সুদানের উপাখ্যান

ইরান ও সুদানের আর্থিক ব্যবস্থাকে ইসলামিকরনের প্রয়াস মুল্যায়ন করা ঝামেলাপুর্ণ হতে পারে, কারন দু'টি দেশই অস্বাভাবিক রকম কঠিন সময় পার করছে। ফলে, আগের পৃষ্ঠাগুলোতে পাকিস্তানের প্রসঙ্গে যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল তা এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া, সুদানের ক্ষেত্রে এরুপ বিশ্লেষণের জন্যে তথ্যাদিও পাওয়া যাবে না।

প্রায় দু'বছর ধরে স্বত: স্ফূর্ত ও ব্যাপক বিদ্রোহের পর ১৯৭৯ সালে ইরানে স্বৈরাচারী শাহ'র শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লব সফলতা অর্জন করেছিল। এরুপ বিদ্রোহের ফলে অর্থনীতিতে বড় বিপর্যয়ের সাথে যুক্ত হয়েছিল শাহ'র প্রশাসনের সাথে যুক্ত অভিজ্ঞ টেকনোক্র্যাটদের পাইকারী হারে বিনা বিচারে হত্যাকান্ড, ১৯৭৯ সালের নভেম্বরের পণ-বন্দী সংকট, এবং প্রতিবেশী

দেশসমূহে বিপ্লব রপ্তানীর প্রয়াস। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিপ্লবের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি বৈরীতায় মোড় নিয়েছিল।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে ইরান পাকিস্তান ও সুদানের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। ইরানের রয়েছে ৯৩ বিলিয়ন ব্যারেলের তৈল মওজুদ, ৬০.৭ মিলিয়ন জনসংখ্যা,[৮৫] ভাল অবকাঠামোগত সুবিধা, শতকরা ১০০ ভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্প বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধের সহনীয় দায়।[৮৬] তবে, দু'টো ঘটনা অর্থনীতির উপর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আঘাত হেনেছে। একটা হচ্ছে ইরাকের সাথে প্রায় আট বছর ব্যাপী যুদ্ধ, যা শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাক কর্তৃক ইরানকে আক্রমনের মধ্য দিয়ে। অন্যটি হচ্ছে, ১৯৮২ সালে তৈল-মূল্য বৃদ্ধির অবসান, যা চলমান যুদ্ধের কারনে অন্যান্য তেল রপ্তানীকারক দেশগুলোর চেয়ে ইরানকে বেশী আর্থিক সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। দেশটিকে আরো কতিপয় ঝামেলা মোকাবেলা করতে হয়েছিল, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ, এর বৈদেশিক সম্পদ জব্দ করন, মুদ্রা সরবরাহের দ্রুত বৃদ্ধি এবং অতি উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতি,[৮৭] ইরানী রিয়েলের অতি অবমূল্যায়ন[৮৮] এবং প্রচুর পরিমানে পুজিঁ পাচার যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে অনেক কমিয়ে দিয়েছিল এবং অর্থ ব্যবস্থায় প্রায় ধ্বস নামিয়ে দিয়েছিল।[৮৯] এ সকল সমস্যার কারনে অর্থ ব্যবস্থাসহ অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভোগান্তি নেমে

---

[৮৫] ইহার তুলনায় পাকিস্তান ও সুদানের জনসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে, ১৩৮.২ মিলিয়ন ও ২৭.৩ মিলিয়ন; ইরাক (২১.২ মিলিয়ন) ও GCC দেশগুলোর (২৬.৭ মিলিয়ন) সম্মিলিত জনসংখ্যা ইরানের মোট জনসংখ্যার মাত্র প্রায় পাঁচ-চতুর্থাংশের সমান। (সংখ্যাগুলো IMF, International Financial Statistics, জুন, ১৯৯৯, থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

[৮৬] ১৯৯৩ সালে ইরানের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমান সর্বোচ্চ ২৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছার পর ১৯৯৭ সালে তা ১১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ১২৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জি এন পি'র ৯.৬ শতাংশ, নেমে এসেছিল। ঋণের কিস্তি পরিশোধ বাবৎ ১৯৯৭ সালে ইরানের মোট পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানী আয়ের ৩২.২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। (তথ্য সূত্র: World Bank, Global Development Finance, 1999, Vol 2, p. 288)।

[৮৭] ১৯৭৭-৯৬ সময় কালে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক গড় হার ছিল ২১.২ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ হার বেড়েছে, এবং ১৯৯৫ সালে সর্বোচ্চ ৪৯.৬ শতাংশে উঠেছে। অবশ্য, এটা কমে ১৯৯৬ সালে ২৮.৯ শতাংশে ও ১৯৯৭ সালে ১৭.২ শতাংশে নেমে এসেছে, কিন্তু, ১৯৯৮ সালে আবার তা কিছুটা বেড়ে ১৯.৪ শতাংশে উঠেছে। (তথ্যসূত্র: IMF, International Financial Statistics)

[৮৮] ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইরানী রিয়েল-এর বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল ছিল, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হারের কোন প্রতিফলন হতে দেয়া হয়নি। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে হঠাৎ করে ১৯৯২ সালের ডলার প্রতি ৬৭.০৪ রিয়েল থেকে অবমূল্যায়ন করে ডলার প্রতি ১৭৫৮.৫৬ রিয়েলে নির্ধারন করা হয়। তারপর মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার সত্বেও এ হারকে প্রায় স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখা হয়েছিল। দ্রব্য মূল্যের সূচক ১৯৯২ সালের ১৪৭.২ থেকে ১৯৯৭ সালে ৫৩০.২-এ পৌঁছে।(তথ্যসূত্র: IMF, International Financial Statistics)।

[৮৯] ইকবাল ও মিরাখর, ১৯৮৭।

www.pathagar.com

সারণী- ৪

ইরান: কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশক

						বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার	
	১৯৭৭	১৯৭৯	১৯৮৮	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৭৯-৮৮	১৯৮৮-৯৬
১. ১৯৯০-এরর মুল্যমানে জিডিপি (বিলিয়ন রিয়েল)	৫১, ৯৯৫	৩৭, ২২৭	৩১, ৭২৪	৪৯, ১৫৫	৫০, ৭৬৭	-১. ৮	৫. ৫
২. জিডিপি'র শতকরা হারে সরকারের বাজেট ঘাটতি(-) বা উদ্বৃত্ত বাজেট	-৪. ৪	-৩. ৯	-৯. ২	০. ০১	-০. ০১	-	-
৩. মুদ্রা বা মুদ্রাজাতীয় ডকুমেন্ট (বিলিয়ন রিয়েল)	১, ৯০৫	৩, ১৮৬	১৪, ১০৬	৯৫, ২৯১	১১৭, ৮৫৮	১৮. ০	২৭. ০
৪. দ্রব্য মুল্যের সূচক	১২. ৬	১৫. ৫	৭৫. ৯	৪৫২. ৬	৫৩০. ২	১৯. ৩	২৫. ০
৫. চলতি হিসাবের ব্যালেন্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২. ৮	১২. ০	-১. ৯	৫. ২	-	-	-
৬. মুদ্রা কর্তৃপক্ষের বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১২. ৮	১৫. ৭	৮. ৮	১১. ১	৮. ৯	-	-
৭. মোট বৈদেশিক ঋণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	-	-	৫. ৮	১৬. ৭	১১. ৮	-	১৭. ৬
৮. বিনিময় হার (বছর শেষে ডলারের বিপরীতে রিয়েল)	৭০. ৫	৭০. ৫	৬৮. ৬	১, ৭৪৯. ১	১, ৭৫৪. ৩	০. ৩০	-৩৩. ৩

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র: আই এম এফ, আন্তর্জাতিক অর্থ পরিসংখ্যান, বর্ষপুস্তক ১৯৯৭, এবং জুন, ১৯৯৯-এর মাসিক সংখ্যা; এবং বিশ্ব ব্যাংক, গ্লোবাল ডেভেলাপমেন্ট ফাইনান্স, ১৯৯৯।সারণীতে বিশেষ কোন বছর বেছে নেওয়ার যুক্তির জন্যে মুল রচনা দেখুন। আরো কিছু তথ্যের জন্যে ফুটনোট ৮৬-৮ দেখুন।

এসেছিল (সারণী-৪)। বিপ্লবের দু'বছর আগে ১৯৭৭ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠা প্রকৃত জিডিপি সোজাসুজি নীচের দিকে চলতে শুরু করে এবং ১৯৮৮ সালে নিম্নতম ধাপে পৌঁছা পর্যন্ত ১১ বছরে তা ৩৯ শতাংশ নীচে নেমে গিয়েছিল।

ইরানে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামিকরন শুরু করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের মার্চে, যখন দেশটি যুদ্ধ ও দীর্ঘ মেয়াদী মন্দার মধ্যে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল সমস্যা ইসলামিকরনকে কঠিন করে তুলেছিল। এটা ছিল নানা রকম জটিল সমস্যায় জর্জরিত কোন রোগীর উপর একটি বড় শল্য চিকিৎসা সম্পন্ন করার মত। "বর্ধিত মুল্য" (mark-up) শব্দটির পরিবর্তে "কমিশন" এবং "নিশ্চিত ন্যুনতম ফিরতি" শব্দগুলো ব্যবহার করা হলো।[৯০] পাকিস্তানের মতই সরকারী সেক্টরের লেনদেনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য ছিল না। সুতরাং, আয়াতুল্লা কোনী'র মতে ইরানের বর্তমান অর্থ ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে সুদ-মুক্ত নয়।[৯১] তাছাড়া, বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমুহ জাতীয়করন করা হয়। কোন দেশেই ব্যাংক জাতীয় করন সুফল বয়ে আনে নি, এবং ইরানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তবে, বর্তমানে ইরানের সমস্যাগুলো সহজ হয়ে আসছে মর্মে মনে হচ্ছে এবং অর্থনীতি শক্তি অর্জন করছে, যা একটা ভাল ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত দিচ্ছে। ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কাল বাদ দিলে ১৯৮৮-৯৬ সময় কালে প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় ৩.৫ শতাংশ, যুদ্ধের বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল অস্বাভাবিক রকম বেশী, বার্ষিক ১১.৬ শতাংশ।[৯২] ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬.৭ ও ৩.৩

---

[৯০] সিরাজি কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৮৮, পৃ: ২৫।

[৯১] পুরিয়ান কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৯৪, পৃ: ৫।

[৯২] ১৯৯০ সালের মুল্যমানে GDP ১৯৮৮ সালের ৩১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৬ সালে ৪৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। (তথ্যসূত্র: IMF, International Financial Statistics)।

www.pathagar.com

শতাংশ। ১৯৮৮ সালে জিডিপি'র হার সর্বোচ্চ ৯.২ শতাংশে উঠলে সরকারের বাজেট ঘাটতির প্রায় অবসান ঘটেছিল (সারণী-৪)। দীর্ঘ সময়ের পর ১৯৯৬ সালে প্রথম বারের মত বাজেটে সামান্য উদ্বৃত্ত দেখা যায়। ১৯৯৭ সালে মুদ্রা স্ফীতির হার ছিল ১৭.২ শতাংশ, যা বেশী হলেও ১৯৯৫ সালের সর্বোচ্চ হার ৪৯.৬ শতাংশের চেয়ে তা অনেক কম ছিল। বৈদেশিক সম্পদও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং বিনিময় হারও স্থিতিশীল হতে পারে যদি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আনা যায়। সামষ্টিক অর্থনীতির সমস্যাগুলো সমাধানের কাছাকাছি আসলে ইরানে অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরনের লক্ষ্যে আরো আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের আশা করাই যেতে পারে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের মর্জিমাফিক পদক্ষেপ গ্রহণের কারনে সুদানে ব্যাংক ব্যবস্থার ইসলামিকরনের ফলাফলে বেশ চড়াই-উৎরাই লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৮৪ সালে হঠাৎ করেই জেনারেল নুমেইরী ব্যাংকগুলোকে মাত্র দু'মাসের নোটিশ প্রদান করে কোন বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই এটি চালু করেন।[৮৩] ফলে, কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৮৫ সালে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ পদ্ধতির অবসান ঘটেছিল।[৮৪]

আবারও কোন প্রশিক্ষণ বা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই ১৯৯০ সালে এ পদ্ধতি পুণরায় চালু করা হলো। দেশটি তখন এক ধ্বংসাত্মক গৃহ-যুদ্ধের মধ্যে নিপতিত ছিল, আরো ছিল খরা এ দুর্ভিক্ষে জর্জরিত, ইথিওপিয়া ও শাদ থেকে আগত বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, যার সবগুলো অর্থনীতির উপর এক মারাত্মক আঘাত হেনেছিল। গৃহ-যুদ্ধের ফলে দেশটিকে প্রতিদিন প্রায় ১-২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গুনতে হচ্ছে,[৮৫] যার ফলে দেশটির কোষাগার প্রায় নি:শেষ হওয়ার পথে। ১৯৮০-৯০ সময় কালে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার ছিল প্রায় ৩৯.১ শতাংশ, কিন্তু এরপর ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে উঠেছিল বার্ষিক প্রায় ১৩২.৮ শতাংশে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৯৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪৬.৭ শতাংশে নেমে এসেছে এবং হ্রাস অব্যাহত আছে।[৮৬]

---

[৮৩] রডনি উইলসন-এ উসমান আহমদ, ১৯৯০, পৃ: ৭৭। আরো দেখুন, এম ইউ খলিফা, Islamic Ecocnomic Studies ,December ,1993 IIBI Mudawi in এবং ;Encyclopaedia, 1995.

[৮৪] জেড আহমদ, ১৯৯৪, পৃ: ২২।

[৮৫] The Europa World Yearbook, 1993, Vol. 2, পৃ: ২৬৬৩।

[৮৬] IMF, International Financial Statistics, 1997 Yearbook and June 1999, দ্রব্যমূল্যের সারণী। প্রকৃত GDP সংক্রান্ত তথ্য শুধুমাত্র ১৯৯১ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

দেশটির বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রহীনভাবে বেশী এবং তা সুদানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। ১৯৯৭ সালের শেষে এর মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমান ছিল ১৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল তার মোট পণ্য ও সেবা খাতের রপ্তানী আয়ের ১,৪৬০ শতাংশ, জিএনপি'র ১৮২ শতাংশ।[১৭] সুতরাং, যদিও মনে হচ্ছে যে, ইরান কিংবা পাকিস্তানের চেয়ে আরো কঠোর মনযোগের সহিত সুদানে ইসলামিকরন করা হয়েছিল,[১৮] তবুও সুদানের অর্থনীতির উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়।

তবে, মনে হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি হতে পারে এবং ইসলামিকরনের জন্যে আরো ভালো পরিবেশ তৈরী হতে পারে। অনেকগুলো কারনে এরূপ আশা করা যেতে পারে। এগুলোর একটি হচ্ছে ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর বশির কর্তৃক দক্ষিনাঞ্চলের ছ'টি উপ-দলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর, যারা বিগত ১৪ বছর ধরে সরকারের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আসছিল। চুক্তির কারনে দক্ষিনাঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারনের জন্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। দেরীতে হলেও প্রেসিডেন্ট বুঝতে পেরেছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণের ঐক্য যেমন বজায় রাখা দরকার, তেমনি গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দীর্ঘসময় ধরে আন্দোলনরত দক্ষিণাঞ্চলের পৃথক হয়ে যাওয়া ভাল, কারন, ১৯৮৩ সাল থেকে গৃহ-যুদ্ধের ফলে এক মিলিয়নেরও বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে, প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, এবং এত বেশী অর্থ ব্যয় হয়েছে যা উন্নয়নের জন্যে উৎপাদনশীল খাতে ও সার্বিক কল্যানের জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় কারন হচ্ছে, দেশটির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। কেহই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে দেশের ভেতরে ও বাইরে দ্বন্দ্বের চেয়ে শান্তি অনেক বেশী সহায়ক। তৃতীয় কারন হচ্ছে, জুলাই ১৯৯৯ থেকে তেল রপ্তানীর সম্ভাবনা। এর ফলে দেশটির আর্থিক সংকট হ্রাস পাবে, এবং বিদ্যমান সংকটজনক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই শুধু হবে না, বরং উন্নয়নের দিকেও এগিয়ে যাবে।

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

এর পর আমরা মুখোমুখি হচ্ছি যে প্রশ্নের তা হচ্ছে, সুদ-মুক্ত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বে ছাপানো কাগজী মুদ্রা গ্রহনযোগ্য কিনা, এবং সুদ ব্যবস্থার মত একটি নিয়ন্ত্রকারী বিধানের অনুপস্থিতিতে এরূপ মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ সামাল দেওয়া সম্ভব কী না।

---

[১৭] World Bank, Global Development Finance, 1990, Vol. 2, পৃ: ৫১২।

[১৮] দেখুন, এম ইউ খলিফা, ১৯৯৩।

www.pathagar.com

ধাতব মুদ্রার ব্যবহারই যখন ছিল নিয়ম সেই সপ্তম শতকে খলিফা ওমর (মৃত্যু ২৩/৬৯৪) এবং পরবর্তিকালে আহমদ ইবনে হানবাল (মৃত্যু ২৪১/৮৫৫), ইবনে হাজম (মৃত্যু ৪৫৬/১০৬৪) এবং ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮)-এর মত অনেক বিখ্যাত আইনজ্ঞগণের নিকট সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত কাগজী মুদ্রা নীতিগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।[৯৯] এর ফলে আধুনিককালের পন্ডিতগণের পক্ষে সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত কাগজী মুদ্রা মেনে নেওয়া সহজ হয়েছিল। তবুও বিভিন্ন দেশে কতিপয় ফিকহ্ বিশেষজ্ঞ এর বিরোধিতা করেছেন। ১৯৮২ সালে রাবিতা আল-আলাম আল-ইসলামির ফিকহ্ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত এবং ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৮০'র দশকে একটা মোটামুটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১০০]

এর ফলে দুটো প্রশ্ন সামনে আসে। কাগজী মুদ্রা ইস্যু করার কর্তৃত্ব কার, এবং সুদ প্রথার অনুপস্থিতিতে কাগজী মুদ্রার মুল্যমান, বিভিন্ন মুদ্রাজাতীয় দলিলে বাটার হার ও উম্মুক্ত বাজারের কার্যক্রম কীভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হবে। প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে আইনজ্ঞগণ প্রায় এক কন্ঠে বলেছেন যে, শাসকবর্গই মুদ্রা ইস্যু করবে এবং মুদ্রার মুল্য স্থিতিশীল রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে মুদ্রা সুচারু রূপে মুল্যের পরিমাপক, বিনিময়ের মাধ্যম ও ক্রয় ক্ষমতার ধারক হিসেবে কাজ করতে পারে।[১০১] দেশের ভেতরে ও বাইরে

---

[৯৯] খলিফা উমরের মতামতের জন্যে দেখুন, আল-বালাধুরী (মৃত্যু ২৭৯/৮৯২), ১৯৫৯, পৃ: ৪৫৬, ও কালাজি, ১৯৮১, পৃ: ৬৪৩; আহমদ ইবনে হানবালের জন্যে দেখুন: আল-রশীদ, ১৯৮০, ১ম খন্ড, আল-মিস্রি কর্তৃক উদ্ধৃত, ১৯৯০, পৃ: ১০; ইবনে হাজমের জন্যে দেখুন: ইবনে হাজম, ৮ম খন্ড, পৃ: ৪৭৭; ইবনে তায়মিয়াহ্‌র জন্যে দেখুন: ফতুয়া, ১৯৬৩, ১৯তম খন্ড, পৃ: ২৫১। আরো দেখুন: চাপরা।৭-৫ :পৃ ,১৯৯৬,

[১০০] ১৪০২ হিজরীর ৮-১৬ রবি আল-থানি (২-১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২) মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবিতা ফিকহ্ কমিটির সভাগুলোতে অনুমোদিত পূর্ণ কার্যবিবরণীর জন্যে দেখুন: ▯আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলায়মান ইবনে মানি, ▯ ১৯৮৪, পৃ: ১৪২-৫। হিজরী ১৪০৭৮ এর -- ১৩ সফর ১৬-১১) অক্টোবর, ১৯৮৬) জর্ডানে অনুষ্ঠিত :ফিকহ্ কমিটির সভাসমুহের কার্যবিবরণীর জন্যে দেখুন OIC মুনাজ্জামাহ আল-মুতামার আল-ইসলামী (OIC) মাজমা আল-ফিকহ্ আল-ইসলামি, কারারাট ওয়া তাওসিয়াত, ১৪০৬-৯ (১৯৮৫-৮), পৃ: ৩৮।

[১০১] Ahmad ibn Hanbal ও Nawawi -এর মতে সরকারী মুদ্রণাগার থেকেই মুদ্রা ছাপা হওয়া বাঞ্ছণীয়। খলিফা ওমর ইবনে আবদ আল-আজিজ (মৃত্যু ১০১/৭২০) জনৈক ব্যক্তিকে বিনানুমতিতে মুদ্রা ছাপানোর কারনে কারাদন্ড প্রদান করেছিলেন। (দেখুন, Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, Ministry of Awqaf, Vol. 20. পৃ: ২৪৯-৫০)। আরো দেখুন, আল-।৫-৯৪ :পৃ ,১৯৯০ ,মিস্রি

www.pathagar.com

মুদ্রার মানের স্থিতিশীলতার উপর আইনজ্ঞদের গুরুত্বারোপ সকল প্রকার মুল্য পরিমাপে সততা ও ন্যায্যতার বিষয়ে কুর-আনের দ্ব্যর্থহীনত অবস্থানের কারনে যথার্থ (৬: ১৫২, ৭: ৮৫, ১১: ৮৪-৫, ১৭: ৩৫ এবং ২৬: ১৮১)। সম্ভবত: মুদ্রাই হচ্ছে মুল্যের সবচেয়ে বড় পরিমাপক, এবং এর প্রকৃত মানের অবিরাম ও বড় ধরনের পতন আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার ও সার্বিক কল্যানে বিরুপ প্রভাব ফেলে।[১০২] এখন সকলেই মানেন যে, বাজার মুল্যের স্থিতিশীলতাও সার্বিক অভাব পুরণ, আয় ও সম্পদের সম-বন্টন, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়ে থাকে।[১০৩]

কাগজী মুদ্রা ইস্যুকরন ও তার মুল্যের স্থিতিশীলতার প্রশ্নের নিস্পত্তি হওয়ার পর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে কীভাবে তার চাহিদা ও সরবরাহের এমন ব্যবস্থাপনা করা হবে যাতে মুল্য স্থিতিশীলতা ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমুহ অর্জিত হবে। একটি নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থায় মুদ্রা সরবরাহ যেহেতু চাহিদা নির্ভর হয়ে থাকে, সেহেতু, আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুদ্রার চাহিদা নিয়ন্ত্রন করাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

মুদ্রার চাহিদার দু'টো উপাদান রয়েছে: প্রথমত: প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে ভোগ ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ; এবং দ্বিতীয়তত: দৃশ্যমান ও লাগামহীন ভোগ, অনুৎপাদনশীল ও ঝুকিঁপূর্ণ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ। আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমুহ অর্জন তুলনামুলকভাবে বেশী উৎসাহিত হবে যদি দ্বিতীয় কারনে উদ্ভুত মুদ্রার চাহিদা কমানো সম্ভব হয়। এ অধ্যায়ে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনীতির উপর আলোচনায় যেমন বলা হবে, অনেক লেখকই দেখিয়েছেন যে, সুদের হার নিয়ন্ত্রনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রা চাহিদার বিভিন্ন উপাদানসমুহ নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টার কারনে অনুৎপাদনশীল ও ঝুকিঁপূর্ণখাতে বিনিয়োগ না কমিয়ে বরং প্রয়োজন মেটানোর ও উৎপাদনশীল খাতের ব্যয়কেই সংকুচিত করে থাকে, এবং এর দ্বারা লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস বানচাল হয়ে যায়। সুতরাং, তারা মুদ্রা চাহিদা নিয়ন্তণ করতে গিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চলকের উপর ভরসা করে থাকে। এগুলো হচ্ছে:

---

[১০২] দেখুন, আল-জারহি, ১৯৮৩, পৃ: ৮৭, তিনি মনে করেন যে, মুদ্রার মুল্যমান রক্ষা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্যে বাধ্যতামুলক। আরো দেখুন, চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ৩৭-৪৪।
[১০৩] দেখুন, "The Rise and Fall of Inflation: Lessons of Post-War Experience", IMF, *World Economic Outlook*, October, 1996, পৃ: ১০০-৩১ ও বিশেষ করে, পৃ: ১১৬। আরো দেখুন, চাপরা।১৩ -২০৯ ও ৯ -৭ :পৃ ,১৯৯২ ,

www.pathagar.com

ক. নৈতিক মুল্যবোধ:
খ. বাজার মুল্য প্রক্রিয়াসহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ;
গ. সুদের হারের পরিবর্তে মুনাফার হার।

তিনটির প্রত্যেকটিকে একটি অপরটির পরিপূরক হতে হবে। নৈতিক মুল্যবোধের কারনে লাগামহীন ভোগের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র এ কারনটি যথেষ্ট নয়। বাজার মুল্য প্রক্রিয়াসহ অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সীমিত সম্পদের উৎপাদনশীল ও সুষম বন্টনের জন্যে অপরিহার্য। যেহেতু সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থার একটা প্রবণতা হচ্ছে সাধ্যের বাইরে জীবন যাপন, ঝুকিপুর্ণ বিনিয়োগ ও অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। সেহেতু লাভ-লোকসান ভাগাভাগিভিত্তিক অর্থ-লগ্নির ব্যবস্থা অর্থায়নকারীকেও কিছুটা ঝুকিঁর মধ্যে ফেলে অপ্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফিরতিকে (Profit & Loss)ব্যবসার চূড়ান্ত ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হলে অর্থায়নকারীও বিনিয়োগে আরো সতর্ক হয়। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় যে, যে কোন উদ্দেশ্যে বা ঋণগ্রহীতার বন্ধক দেওয়ার মত সম্পদ থাকলেই বা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার সামর্থ থাকলেই ঋণ পাওয়া যাবে না। সরকারী খাতেও যদি অর্থের চাহিদা ও সরবরাহ কাজের অর্জিত মানের সহিত সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং অলাভজনক সরকারী প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারী ব্যয় কার্যকরভাবে কমানো সম্ভব হতে পারে।

অর্থের চাহিদায় স্থিতিশীলতা আসলে এবং তাকে সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করা গেলে তার পরে প্রশ্ন আসে কীভাবে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে। ইসলামি অর্থনীতির উপর বিভিন্ন লেখায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে যদি সরকার উচ্চ ক্ষমতার মুদ্রা সৃষ্টির উপর প্রত্যাশিত নিয়ন্ত্রন আরোপ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাহলে সুদ-প্রথা বিলুপ্তি ও স্থিরকৃত ব্যাংক রেট না থাকা সত্বেও সরকার ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। তবে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, তারল্যের হার, ঋণ-সীমা, লভ্যাংশ বন্টনের হারসহ অনেক প্রচলিত বিধান এরপরও বহাল থাকবে।[১০৪] কোন কোন লেখক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উপর শতকরা ১০০ ভাগ রিজার্ভ

---

[১০৪] দেখুন, MN Siddiqui, Banking Without Interest, 1983, পৃ: ৯৭-১২৩; জিয়াউদ্দিন আহমদ, এম ইকবাল ও এম ফাহিম খান, ১৯৮৩-এ চাপরা, আরিফ, এম ইকবাল, আল-জারহি ও নাদরি, পৃ: ২৭-১০১; এম আরিফ-এ কাফ, ওয়ারের ও এম আরিফ, ১৯৮২, পৃ: ১২৫-৪৪, ২১১-৩৬ ও ২৮৭-৩১০; চাপরা, ১৯৮৫, পৃ: ১৯৪; মহসিন খান ও এম মিরাখর, ১৯৯৪; চাপরা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

আরোপের পক্ষে মত দিয়েছেন।[১০৫] তবে, অন্যরা এটাকে খুব দরকারী মনে করেন না।তাঁরা মনে করেন যে, অর্থ-লগ্নিকারী কর্তৃক ঝুঁকির অংশীদারিত্ব গ্রহণের ফলে এমনিতেই ঋণ সম্প্রসারনের উপর একটা সুস্থ প্রভাব পড়বে, এবং উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রার যথাযথ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হতে পারে।[১০৬]

যে সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা হারালো কেন?

মুদ্রা ও ব্যাংকিং-এর উপর অনেক কাজ হলেও এখনও অনেক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর জবাব প্রয়োজন। উদাহরণত: ঊনবিংশ শতকে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা কেন অগ্রসর হতে পারলো না তার কোন বাস্তব কিংবা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পূর্বে এ সকল পদ্ধতি কৃষি, কারিগরি পেশা, উৎপাদন শিল্প, ও দুর-দুরান্তের ব্যবসায় মধ্যযুগের ইসলামি বিশ্বের গোটা অর্থ ভান্ডার কাজে লাগানোতে সফল ছিল মর্মে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মুসলমানগণ ছাড়াও ইহুদি ও খৃষ্টানরাও[১০৭] এগুলো ব্যবহার করতো, কারন সুদভিত্তিক ঋণ ও উন্মুক্ত কুসীদ প্রথার খুব বেশী প্রচলন ছিল না।[১০৮] গয়েটিনের মতে সুদ প্রথার বিরুদ্ধে ইহুদি, খৃস্টীয় ও ইসলামিক আইনের বরখেলাপের বিষয়টির উল্লেখ কেবল মাত্র একবার গিনিজাহ দলিলাদির মধ্যে প্রাপ্ত একটি রায়ের রেকর্ডে পাওয়া গিয়েছিল, যদিও "গিনিজাহ দলিলাদির অনেকাংশ জুড়ে ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে"।[১০৯] স্কাটজিমিলারও এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "রিবা, কুসীদ প্রথার উপর তথাকথিত আইনী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রাচীন যুগে বহু সংখ্যক অর্থের মালিক ও মুল্যবান ধাতুর মালিকগণ কর্তৃক কোন বাধা ছাড়াই বহু আর্থিক মুলধন গড়ে তোলা হয়েছিল"।[১১০]

---

[১০৫] দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, আল-জারহি, ১৯৮০, মহসিন খান, ১৯৮৭, ফাহমি, ১৯৯২

[১০৬] জিয়াউদ্দিন আহমদ, ১৯৮৩, পৃ: ৮, চাপরা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ: ১৯।

[১০৭] উদোভিচ, ১৯৭০, পৃ: ১৮০ ও ২৬১, এবং ১৭০-৮২, ১৮৫। আরো দেখুন, Goitein, 1967, Vol. 1, পৃ: ১৬৯-৭৯ ও ২৫৪-৮।

[১০৮] উদোভিচ, ১৯৮১, পৃ: ২৫৭; আরো দেখুন: পৃ: ২৬৮।

[১০৯] Goitein, 1967, যথাক্রমে পৃ: ২৫৫ ও ২৫০। আরো দেখুন, Goitein, 1966, পৃ: ।৪ -২৭১

[১১০] Schatzmiller, 1994, পৃ: ৪০২। Maxime Rodinson (1974, পৃ: ৩৬অন্য রকম (৭-যোগ্কিন্তু কোন বিশ্বাস ,যুক্তি দেখিয়েছেনয সাক্ষ্য-প্রমান দিতে পারেন নি। এটা সম্ভবত: বোধগম্য হচ্ছে না যে, আইনগত চল-ছাতুরী ব্যবহার করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, পদ্ধতিটি বিদ্যমান ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে এটা দেখানো প্রয়োজন ছিল যে, আইনগত চল-ছাতুরী ব্যবহার এত বেশী ছিল যে, বাস্তবে নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর মর্মে প্রতীয়মান ছিল। এরূপ ঘটেছিল মর্মে বিশ্বাস করার মত কোন সাক্ষ্য-প্রমান নেই। উদোভিচ, গয়টিন ও স্কাটজমিলারের গবেষণা প্রকৃত পক্ষে উল্টোটাই প্রমান করে।

www.pathagar.com

শত শত বছর ধরে এ পদ্ধতি সফলভাবে কাজ করতে পারলে কেন তা পরিত্যক্ত হলো? এ প্রশ্নের বহু অনুমানভিত্তিক জবাব রয়েছে। একটি হচ্ছে যে, পদ্ধতিটি কিছু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যা নতুন যুগে উদ্ভূত নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে পারছিল না, ফলে পতনের নিয়ামকসমূহ গতি পেয়েছিল। এরূপ জবাব থেকে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে যে, সমস্যাগুলো সমাধানযোগ্য ছিল কী না এবং মুসলিম সমাজ তার পূর্বের প্রগতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে এ সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম ছিল কী না। বিগত অধ্যায়ে বর্ণিত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের আলোকে বলা যেতে পারে কি যে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক পতনের কারন ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা, এবং অবশ্যই নতুন নতুন তৈরী হওয়া সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে সমতাভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থার অক্ষমতার কারনে নয়। আগের মত শিক্ষা, অবকাঠামো ও অন্যান্য সামাজিক সেবা সরবরাহ করার মাধ্যমে অনুঘটক ও প্রদায়কের ভূমিকার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির উপর একটা বোঝারূপে আভির্ভূত হয়েছিল। এর ফলে শেষতক অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোর পতন এসেছিল ও তাদের বহু প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির করতলভুক্ত হতে হয়েছিল। সুতরাং, মুসলিম সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত ইসলামি অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা মুসলিম সমাজের পতনের কারন নয়, ফলাফল হতে পারে।

উপরের প্রশ্নগুলোর ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, সুদ প্রথা বৈধতা পাওয়ার কারনে পাশ্চাত্যের উত্থান ও দ্রুত উন্নতির একটা বড় কারন ছিল কি, কিংবা এটা কি ইহজাগতিকতার অনুকূলে আমুল পরিবর্তনের ফলাফল ছিল কি এবং পাশ্চাত্যের উন্নতির পেছনে বাস্তব অর্থে এর কোন ভুমিকা ছিল না? এটা কি সম্ভব যে, সুদ প্রথার বিরুদ্ধে বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা দুর না করা হলেও তাদের উদ্যোগী বেসরকারী খাত ও কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল পশ্চিমা সভ্যতা সঞ্চয়কে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে অর্থায়নের জন্যে ব্যবহারের লক্ষ্যে যথেষ্ট সমতা ভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরী করেছে? এগুলো গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন কারন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির আন্দোলনের ফলে আনীত সকল পরিবর্তন অবশ্যই পাশ্চাত্যের উত্থান ও উন্নয়নে ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে নি। কতিপয় পরিবর্তন হয়ত প্রয়োজন ছিল না এবং এমন কি নেতিবাচক ভুমিকাও পালন করে থাকবে। এর ফলেই সামনে যে প্রশ্নটি আসে তা হচ্ছে যে, সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থাই পাশ্চাত্যের বর্তমান সমস্যাসমূহ, যেমন, সামর্থের বইরে জীবন যাপন, সকলের অভাব মোচনে ব্যর্থতা, আয় ও সম্পদের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, অর্থ বাজার, পণ্য বাজার ও

www.pathagar.com

স্টক মার্কেটে অতি অস্থিরতা ইত্যাদির জন্য দায়ী কী না। এসব প্রশ্নের পরিপুর্ণ জবাব না পাওয়া গেলে সুদ ভিত্তিক বা সম-মুলধন ভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপন:
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপন-এটা কি সম্ভব? শরীয়াহ'র বিশেষজ্ঞগণ মজুরী, বেতন, পেনসন ও চুক্তির বিষয়ে জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপন অনুমোদন করেছেন। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। একমাত্র যে প্রকারের ঋণ শরীয়াহ অনুমোদন করেছে তা হচ্ছে কর্জে হাসানাহ (বিনা শর্তে সুদ-বিহীন ঋণ)। অন্যান্য সকল প্রকার ঋণকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে ঋণ-দাতা লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং, শরীয়া'র বিশেষজ্ঞগণ ঋণের সাথে বাজারমুল্যের সম্পর্ক স্থাপনকে অর্থের বিপরিতে আর্থিক ফিরতি রয়েছে বিধায় তাকে সুদের সমার্থক মনে করেন।[১১১] তাদের মনে হয়ত এমন ধারনা কাজ করেছিল যে, কর্জে হাসানাকে জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত করলে তার ফলে শেষ পর্যন্ত সঙ্গোপনে সুদ-প্রথা স্বীকৃতি পেয়ে যেতে পারে।

ঋণের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যে সকল যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে, সেগুলো ছাড়াও শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণ আরো যুক্তি দেখান যে, যেহেতু উদ্যোক্তাগণকে, যারা কেবল সঞ্চয় করে না ও কেবল উদ্যোগ সম্পর্কিত কার্যাদিই নির্বাহ করে না, তারা বিনিয়োগের ঝুকিও গ্রহণ করে থাকে, তাদের বিনিয়োগের প্রকৃত স্থিতিশীল মুল্য সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় না, সেহেতু অর্থ-লগ্নিকারীগণকেও এরুপ কোন নিশ্চয়তা প্রদান করার কোন কারন নেই, কারন তারা ঝুকিঁর অংশীদার নন। ঋণের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপন করা হলে সঞ্চয়কারীগণ

---

[১১১] OIC-এর মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামি�র সহায়তায় ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ কুয়েতে ও ১০ এপ্রিল ১৯৯৩ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সেমিনারগুলোর সিদ্ধান্তসমুহ দেখুন। আরো দেখুন: ৮ নভেম্বর ১৯৮৯ নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত Islami Fiqh Academy of India-এর সিদ্ধান্ত। অনেক অর্থনীতিবিদও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন। চাপরার লেখার উপর বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর আলোচনা দেখুন, আরিফ, ১৯৮২, পৃ: ১৮৩-৬। আরো দেখুন, এম এন সিদ্দিকী :পৃ ,১৯৮৫ ,হাসানুজ্জামান ;৪৩ :পৃ ,১৯৮৩ , ।৪২-৩৯ :পৃ ,১৯৮৫ ,চাপরা ;৫২-৪৩

www.pathagar.com

ঝুকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে পিছিয়ে আসতে পারে, যেরুপ বিনিয়োগ ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং যা একটি উঠতি অর্থনীতির জন্যেও প্রয়োজনীয়। ঋণের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বৈষম্যমুলক নীতি চালুর চেয়ে তাঁরা সঞ্চয়কারীগণকে তাদের সঞ্চয় বিনিয়োগের প্রকৃত মুল্যে কোন ক্ষতি রোধ করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করাকে শ্রেয় মনে করে থাকে। মুসলিম দেশগুলো মিউচুয়াল ফান্ড, বিনিয়োগ ট্রাস্ট ও অর্থের অন্যান্য লাভজনক ব্যবহারের পথ উৎসাহিত করতে পারে, যা ঝুকিঁ যারা এড়াতে চায় তারা ও যারা ঝুকিঁ গ্রহণ করতে চায় তারা উভয়েই পছন্দ করবে।

তবে, আধুনিক কালের কতিপয় মুসলমান পন্ডিত রয়েছেন যারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।[১১২] তাদের যুক্তি ১৯৭০ ও ১৯৮০'র দশকে মনযোগ আকর্ষণ করেছিল, যখন মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল খুব বেশী, এবং যখন শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয় সারা দুনিয়ায় জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ছিল একট জনপ্রিয় বিষয়। বিশ্বব্যপী মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার পর এখন যদিও এ বিষয়ে আগ্রহ অনেক কমে গেছে, তবুও তুরস্ক, ইরান ও সুদানের মত কতিপয় মুসলিম দেশে তা রয়ে গেছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার বেশী। সুতরাং, ঋণের সাথে বাজার মুল্যের সূচকের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি বারবার উঠে আসছে, এবং তা চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল মুসলিম দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে যায় কিংবা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে সমস্যা সৃষ্টিকারী অস্পষ্ট বিষয়গুলোর বিষয়ে একটা সন্তোষজনক সমাধান না পাওয়া যায়।

আর্থিক দায়সমূহের বিলম্বিত নিষ্পত্তি

এ বিষয়ে অস্পষ্ট বিষয়গুলোর একটা হচ্ছে খেলাপী ঋণ। ঋণ বা অন্য কোন চুক্তিজনিত আর্থিক দায় থেকে উদ্ভুত খেলাপী দেনার বিষয় নিষ্পত্তির জন্যে খেলাপী দেনাদারের জরিমানা করা ও সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ক্ষতিপুরণ প্রদানের জন্যে ইসলামে গ্রহনযোগ্য একটা পদ্ধতি বের করা আবশ্যক। খেলাপী দেনা কেবল মাত্র ব্যক্তি, ব্যবসা, ইসলামি ব্যাংক, সরকারকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না, এটা এমন এক পৌণ:পুনিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম যার ফলে সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ প্রক্রিয়ায় ধ্বস নেমে আসতে পারে।

---

[১১২] দৃষ্টান্ত স্বরুপ দেখুন: Hammand, 1980; Al-Misri, 1981 and 1991; Naqvi, 1981, p. 121; Sultan Abou Ali, in Ariff, 1982, pp. 177-80; Dunya, 1985.

www.pathagar.com

এখানে মহ্‌রানা'র (স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিশোধ করার জন্যে একটা সম্মত অর্থের অংক) বিলম্বিত পরিশোধের বিষয়টিতে মনযোগ দেওয়া যেতে পারে। যদি বিবাহের সময় মহ্‌রানা পরিশোধ করা হয় তাহলে স্ত্রীর পক্ষে অর্থের প্রকৃত মুল্য ধরে রাখার জন্যে বিনিয়োগ করাই শুধু সম্ভব হয় না, বরং কালান্তরে তারও বেশী কিছু মুল্যমানও অর্জিত হতে পারে। যদি কয়েক বছর পরে তালাকের সময়ে বা স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তা পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তবে যে মুদ্রায় মহ্‌রানা পরিশোধিত হয় তা যদি মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হারের কারনে মুল্য হারায় সেক্ষেত্রে তার প্রকৃত মুল্য হবে খুবই কম। কোন অবস্থাতেই মহ্‌রানাকে ঋণের সমার্থক মর্মে বিবেচনা করা যাবে না। এটা একটা অধিকার,[১১৩] যা বিশ্বস্ততার সহিত মেটানো সম্ভব যদি তার বিলম্বিত পরিশোধ ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের আলোকে বিবেচনা করা হয় - যে লক্ষ্য হচ্ছে অবশ্যই নারীদের প্রতি কল্যাণমুলক আচরন, বিশেষ করে তারা যখন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকে।

অবশ্য মহ্‌রানাকে স্বর্ণ বা ইসলামি দিনার আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে, দুর্ভাগ্যবশত: স্বর্ণ এখন আর ক্রয় ক্ষমতার বিশ্বস্থ রক্ষাকবচ নয়। এর মুল্য ১৯৮০'র তুলনায় যেমন প্রায় অর্ধেক কমে গেছে, তেমনি জীবন যাত্রার ব্যয়ও প্রায় ১৬ গুণ বেড়ে গেছে।[১১৪] সুতরাং, এক ঝুড়ি পণ্য ও সেবা ভিত্তিক ইসলামি দিনারই সম্ভবত: একটা ভালো বিকল্প হতে পারে। তবে, মহ্‌রানার মত অপরাপর দায়দেনা নির্ধারনের জন্যে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ইসলামি দিনার ব্যবহারে যেহেতু চলেই আসছে, সেহেতু কয়েক শতাব্দি পুর্বে জারী করা

[১১৩] কুর'আন বলছে, "তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্যে সম্মত পদ্ধতিতে খরপোষের ব্যবস্থা রয়েছে। সকল মোমিনগণের জন্যে এটি একটি কর্তব্য" (আল কুর'আন, ২: ২৪১-২)। স্বামী ও স্ত্রীর বিষয়ে কুর'আন বলছে ,"পরস্পরের কল্যানের বিষয়টি অবহেলা করো না" (আলকু -র'আন, ২: ২৩৭)। মহানবীও (স ,বলেছেন (:"নারীদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি"' ,হুরায়রা -বুখারী কর্তৃক আবু -আল) *'কিতাব আল- নিকাহ, বাব আল- ওয়াসাত বি আল- নিসা'* থেকে উদ্বৃত; এ হাদিসটির ব্যাখ্যা দেখুন, এবং বিশেষ করে 'ইবনে হাজার আল- আসকালানি', ১৩৮০/ ১৯৬০, খন্ড ৯, পৃ: ২৫৩- এ '*ইসতাওসু*' শব্দটির অর্থ দেখুন।

[১১৪] সোনার মুল্যমান ১৯৮০ সালের ১৫৮. ৫ থেকে কমে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ৭৬. ৩- এ নেমে এসেছিল, অথচ একই সময়ে বাজারে পণ্যমুল্য সূচক ১৭. ০ থেকে বেড়ে ২৬৮. ৬- এ উঠেছিল (উভয় ক্ষেত্রে ১৯৯০=১০০; দেখুন, IMF, International Financial Statistics, 1997 Yearbook and October 1998, the Tables on commodity and consumer prices)।

www.pathagar.com

ইসলামি শাস্ত্রীয় আদেশ প্রয়োগ করা যথাযথ হবে না, যখন ক্রমাগতভাবে ক্ষয়িষ্ণু কাগজী মুদ্রা নয়, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল আইন সম্মত বিনিময়ের মাধ্যম।[১৮]

মহরানার মত আরো অন্যান্য আর্থিক দায়দেনা রয়েছে যা ঠিক ঋণের মত নয় এবং যার কয়েক বছর পরে নাম মাত্র অংকে পরিশোধ করার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয়, একটা সম-পরিমান অংকে পরিশোধযোগ্য। এমনকি যারা এ সকল সমস্যাকে সুদ প্রথার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় না, তারাও এর একটা ইসলাম সম্মত সমাধান পেতে চাইবে। যেহেতু আইনশাস্ত্রবিদগণ এ সকল সমস্যার সম্মুখীন বার বারই হচ্ছেন এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, আশা করা যায় যে, তারা একটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছবেন।

ইসলামি ব্যাংকগুলোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যথা সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে সক্ষম এরুপ ব্যক্তি কর্তৃক মুরাবাহা'র আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের পর উদ্ভূত আর্থিক দেনার বিলম্বিত নিষ্পত্তি। অর্থলগ্নিকারী বা ব্যাংক-কে এরুপ খেলাপের কারনে যে ক্ষতি ও লোকসান গুনতে হয় তার জন্যে ক্ষতিপুরণ প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব কি? বিলম্বের কারনে যদি দন্ড দিতে না হয়, তাহলে খেলাপী সংস্কৃতি উৎসাহিত হবে। এর ফলে একটা স্বয়ংক্রিয় পৌণ:পুণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালু হবে এবং যদি অর্থের পরিমান খুব বেশী হয় তাহলে অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়াই ভেঙ্গে পড়তে পারে।

এ বিষয়ের উপর অনেক মতামত ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু কোন ঐক্যমত্য হয়নি।[১৯] চরম অভিমত হচ্ছে যে, বিলম্ব যদি যুক্তি সঙ্গত না হয়ে থাকে তাহলে খেলাপীদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করুন ও প্রতিরোধক হিসেবে তাদেরকে

---

[১৮] আরব বিশ্বে আল-ফতুয়া আল-হিন্দি (বৈরুত: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyya, 1310 AH, Vol. 1, p. 310) নামে পরিচিত *ফতুয়া আলমগিরি* অনুসারে স্ত্রীকে প্রদেয় মহরানার অর্থের বিলম্বিত পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থের অবমুল্যায়নের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হয় না। (আরো দেখুন, ফেডারেল শরীয়াহ আদালতের প্রতিবেদন, ১৯৯২, পৃ: ১০৫; হাসানুজ্জামান, ১৯৮৫, পৃ: ৪৭)। *ফতুয়া আলমগিরি* হচ্ছে ১০৭৫-৮৩/ ১৬৬৪-৭২ সময় কালে ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ভারতের মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (মৃত্যু ১১১৮/ ১৭০৭) কর্তৃক তৈরী সংকলন।

[১৯] এ বিষয়ে প্রকাশিত নানা মতামতের জন্যে দেখুন; MA Zarqa and MA El-Gari, 1991, pp. 25-27, তৎসহ M Zaki Abd al-Barr ও Habib al-Kaf-এর মতামত, পৃ: ৬১-৪; এবং একই জার্ণালের ১৯৯২ সালের সংখ্যা, পৃ: ৬৭-৯-এ Rabi al-Rabi-এর মতামত দেখুন। আরো দেখুন, Al-Misri, 1977, pp. 131-54; al-Zu'ayr, 1997, pp. 50-7; Abu Ghuddah and Khoja, 1997, pp, 55, 91।

www.pathagar.com

কারাদন্ড প্রদান করা, তবে কোন অর্থদন্ড বা সংক্ষুব্ধ পক্ষকে কোন ক্ষতি পুরণ প্রদানের বিরোধিতা করা হয়েছে কারন তা সুদের সমার্থক হতে পারে। যদিও কালো তালিকাভুক্তকরন বা কারাবাস দেনা পরিশোধে অযৌক্তিক বিলম্ব রোধ করতে পারে, এটা ক্ষতি ও লোকসানের শিকার সংক্ষুব্ধ পক্ষকে কোন সুবিধা দিতে অক্ষম। সুতরাং, উদার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অযৌক্তিকভাবে খেলাপী দেনাদারের উপর অর্থ দন্ড আরোপ যেন তা প্রতিরোধকরুপে কাজ করে, এবং দন্ডের অর্থ ক্ষতিপুরণ হিসেবে পাওনাদারকে প্রদান, যদি তা আদালত কর্তৃক আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে, আদালতের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও দু'রকম ভিন্ন মত রয়েছে। একটি মত বিলম্বিত দেনা পরিশোধের কারনে আদালত কর্তৃক পাওনাদারের ক্ষতিপুরণ ও আয়ের লোকসান নির্ধারন করার ক্ষমতাকে অনুমোদন করে। অন্য মত আদালত কর্তৃক সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রকৃত ক্ষতি নির্ধারন অনুমোদন করে, তবে আয়ের লোকসান অনুমোদন করে না। যদি দন্ড আদালত কর্তৃক নির্ধারন না করা হয়ে থাকে, তাহলে দন্ড বাবৎ আয় কেবল মাত্র দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে এবং ক্ষতিপুরণ হিসেবে সংক্ষুব্ধ পক্ষকে প্রদান করা যাবে না। মুসলিম দেশসমুহে বর্তমানে বিদ্যমান বিচারিক কাঠামোতে সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ক্ষতিপুরণ প্রদানের লক্ষ্যে আদালতের সিদ্ধান্ত হাসিল করা বাস্তবসম্মত নয়। কারন আদালতের সিদ্ধান্ত পেতে কয়েক বছর লেগে যায় এবং খরচ বাবৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় করার দরকার পড়ে। সুতরাং, অযৌক্তিক খেলাপীদেরকে দ্রুত দন্ডিত করন ও সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ক্ষতিপুরণ প্রদানের জন্যে কোন একটা প্রক্রিয়া অবশ্যই বের করতে হবে।

সমাপনী মন্তব্য

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার যুগ বেশ ভালো ভাবেই যাত্রা শুরু করেছে এবং কারো পক্ষে এটাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হবে না। বিভিন্ন সমস্যা ও ভেতরের-বাইরের অনেক ধকল সামলানো সত্বেও বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকসমুহ এককভাবে এ যাবৎ ভালোই অগ্রসর হয়েছে। প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, অনেক ধারনা স্পষ্ট হয়েছে, প্রাথমিক পদ্ধতি ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে, মানুষের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতাও বিস্তৃতি লাভ করেছে, সুদ-ভিত্তিক প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থার ধারেও যেতেন না এমন মুসলমানদের নিকট থেকেও আমানত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্যা এখনও রয়েছে, কিন্তু এগুলো সমাধানের অযোগ্য মনে করার কোন কারন নেই। মুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রতি অনুরাগ বজায় থাকলে ভবিষ্যতে এর অগ্রযাত্রা আরো গতি লাভ করবে মর্মে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

দেশ পর্যায়েও গোটা অর্থ ব্যবস্থা ইসলামিকরনের জন্যে তিনটি মুসলিম দেশের সিদ্ধান্ত অবশ্যই একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কয়েক দশক আগেও এটা ধারনাতীত ছিল। তবে, সফলতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংস্কার একত্রে চালু করনে তাদের অক্ষমতা, বা ব্যর্থতার কারনে তাদের অভিজ্ঞতা এ যাবৎ অসম্পুর্ণ রয়ে গেছে।[১১৭] অর্থ ব্যবস্থায় কতিপয় ভাসা-ভাসা পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অর্থ ব্যবস্থার ইসলামিকরন একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় যা হতে হবে সমাজ ও অর্থনীতির সকল বড় বড় দিকগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটা সার্বিক সংস্কার কর্মকান্ডের অংশ।

এমনকি অর্থ ব্যবস্থার ইসলামি করনের সহিত সম্পর্কিত ইসলামি বিধি-বিধানগুলো সুসংহত হতেও অনেক সময় নিতে বাধ্য। এর কারন হচ্ছে ইসলামের পুণর্জাগরণ হচ্ছে একটা সাম্প্রতিক ঘটনা এবং তাদের সীমিত জনবল ও সম্পদের কারনে ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ যে সকল অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে ডুবে আছেন সেগুলো সামাল দিতে পারছেন না। মুসলিম বিশ্বের ফিকহ্ পরিষদগুলোর প্রয়োজন পুর্ণকালীন পেশাদার জনবল, যারা ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজপত্র তৈরী করে দেয়ার লক্ষ্যে শরীয়া ও আধুনিক কালের আর্থিক বিষয়সমুহের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন। বর্তমানে এরুপ সহায়তা পাওয়া যায় না। কারন প্রথমত: মুসলিম বিশ্বে এরুপ মানের পন্ডিত পাওয়া যায় না এবং, দ্বিতয়িত: আর্থিক সহায়তার অভাব। এমনকি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ও আই সি'র ফিকহ্ কমিটি এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগাড় করতে পারছে না। উভয় বিষয়ের উপর দক্ষ পন্ডিতগণ যতদুর সম্ভব স্বেচ্ছায় সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে; তাঁরা অন্যত্র পুর্ণকালীন চাকুরী করছেন এবং এরুপ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছেন না। সুতরাং, পেশাগতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন একটি কর্মীশ্রেণীর ক্যাডার গড়ে না তোলা পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমুহের বিকাশ শ্লথ হতে বাধ্য।

আম-জনতার প্রতি সুবিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, মুসলিম অর্থনীতি থেকে সুদ-প্রথা দুর করার জন্যে জনগণকে দায়ী করা যায় না। সুদ-বিহীন অর্থনীতি মুসলিমদের একটা স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়নের জন্যে উত্তম পন্থা বের

---

[১১৭] এরুপ কতিপয় সংস্কারের জন্যে দেখুন, চাপরা, ১৯৮৫, ৪ ও ৬ অধ্যায়।

www.pathagar.com

করার দায়িত্ব সরকারের। যে বিষয়ে সবাই একমত তা হচ্ছে সুদ নিষিদ্ধ করাই ইসলামের একমাত্র মুল্যবোধ নয়। সুদপ্রথা সফলতার সহিত দুর করা সম্ভব হবে যদি একই সাথে আরো অনেকগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা যায়। এ সকল সংস্কার সাধন যেহেতু সময়-সাপেক্ষ বিষয়, সেহেতু, সুদপ্রথার বিলুপ্তি ঘটতে পারে স্তরে স্তরে একটি ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি অনুসরন করে। এ বিষয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। কারন স্তরে স্তরে বাস্তবায়নের সপক্ষে মহানবীর নিজের উদাহরণ রয়েছে।সুদ-প্রথা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ করা হলেও এর পুর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছিল তাঁর দায়িত্বের শেষ দিকে যখন যথাযথ অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। তবে, "স্তরে স্তরে অগ্রসর" হওয়াকে আদৌ কোন কিছু না করার একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। কারন এর ফলে মুসলিম সমাজে বিরোধ বাড়বে এবং অগ্রগতি ব্যাহত করবে।[১৮] সর্বোত্তম কৌশল হচ্ছে একটা সার্বিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা যার মধ্যে থাকবে সুদ-প্রথার বিলোপ সাধনসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমুহ শক্তিশালীকরন, সরকার ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি দুরীকরন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং আরো অনেকগুলো প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচী চালুকরণ। এরপর ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার প্রদান করে ধীরে কিন্তু বিরামহীনভাবে এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ:
সামষ্টিক অর্থনীতি ও এর ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি

সামষ্টিক অর্থনীতি

সকল মনুষ্য সমাজের বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম হচ্ছে কীভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সীমিত সম্পদ কীভাবে বরাদ্দ ও বন্টন করা যেতে পারে। একটা যথাযথ ভারসাম্য অর্জন করা না গেলে সংশ্লিষ্ট সমাজ বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় পড়তে পারে। উদাহরণত: যদি ভোগের জন্যে অনেক বেশী সম্পদ বরাদ্দ করা হয়, তাহলে পরিপুর্ণ কর্মসংস্থান ও প্রত্যাশিত হারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য যথেষ্ট পরিমান সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘটবে না। তারপরও উচুঁ হারের বিনিয়োগ যদি করতেই হয়, তাহলে তার ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যেতে পারে যার ফলে ঋণের কিস্তি পরিশোধের দায় বাড়বে এবং ভবিষ্যতের ভোগ ও বিনিয়োগের জন্য সম্পদ কমে যাবে, কিংবা মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে যাবে যার ফলে শুধু কেবল মুদ্রাস্ফীতির চাপই বাড়বে না, ভবিষ্যতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ও রপ্তানীর সুযোগও হ্রাস পাবে। এমনকি যদি বিনিয়োগের জন্যে যথেষ্ট সম্পদ বরাদ্দও করা হয়, তবুও পুর্ণ কর্মসংস্থান নাও অর্জিত হতে পারে যদি বিনিয়োগ হয় অনুৎপাদনশীল ও ঝুকিঁপুর্ণভাবে লাভজনক খাতে।

যদি ভোগের জন্য খুব অল্প পরিমান সম্পদ বরাদ্দ করা হয় তাহলে ভোগের চাহিদা কমে যেতে পারে, যার ফলে মন্দা ও বেকারত্ব বাড়তে পারে। এমনকি যদিও ভোগের জন্যে বরাদ্দকৃত সম্পদ মোটের উপর যথেষ্ট পরিমানও হয় তাহলেও সমাজের সকল ব্যক্তির অভাব পুরণ নাও হতে পারে যদি ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ বিলাসিতা ও লোক-দেখানো ভোগের জন্য অতি বেশী পরিমান সম্পদ ব্যবহার করে, এবং পণ্য ও সেবার অভাব মেটানোর লক্ষ্যে অল্প পরিমান সম্পদ বরাদ্দ পাওয়া যায়। সুতরাং, কেবল মাত্র যথাযথ পরিমানের ভোগ্য-সামগ্রী উৎপাদন, এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করা যথেষ্ট নয়, সীমিত সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন যার ফলে এক দিকে যেমন সকলের অভাব মেটানো যায়, এবং অন্য দিকে পরিপুর্ণ কর্মসংস্থান ও সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, সকলের কল্যাণ চাইলে আয়ের সম বন্টন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও অর্জন করতে হবে।

এরূপ বরাদ্দ ও বন্টন অর্জিত হবে কীভাবে? বাজার ব্যবস্থা একাই কি এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে, নাকি এ প্রক্রিয়ার পরিপুরক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

www.pathagar.com

করা প্রয়োজন? ইসলামি সামষ্টিক অর্থনীতির জগতে এ সম্পর্কীয় আলোচনায় যে সাধারণ সুর দেখা যায় তা হচ্ছে যে, যদিও বাজার ব্যবস্থা অপরিহার্য, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এর পরিপুরক হিসেবে সরকারের কার্যকরী ভুমিকাই শুধু প্রয়োজন নয়, সরকারের অত্যোধিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমাজের মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জন করতে হলে বাজার কার্যক্রমে বিভিন্ন ভুমিকায় অবতীর্ণ ব্যক্তিবর্গের নৈতিক সংস্কারও প্রয়োজন। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এ সকল লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে ইহজাগতিক পরিবেশের বাজার ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমুহের অধীন ক্রিয়াশীল বাজার ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকর। নিম্নে এ জাতীয় তর্কের উপর বিভিন্ন রচনায় বর্ণিত যুক্তিসমুহ পর্যালোচনার চেষ্টা করা হলো।[১]

অভাব মেটানো

মোট ভোগের পরিমান প্রচলিত সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপুর্ণ চলক। তবে, অভাব (Cn) ও বিলাস সামগ্রি (Cl) নিয়েই মোট ভোগের পরিমান হিসাব করা হয়ে থাকে। অভাব (প্রয়োজন ও বিলাস বাসনের জন্য দরকারী পণ্য ও সেবাসহ) হচ্ছে এমন পণ্য ও সেবা যা কোন প্রয়োজন মেটায় বা কষ্ট কমায় এবং ভোক্তার কল্যানের ক্ষেত্রে প্রকৃতই কোন পরিবর্তন ঘটায়। বিলাস সামগ্রী বলতে বোঝায় সে সকল পণ্য ও সেবাকে যেগুলোর দাম্ভিক আবেদন রয়েছে কিংবা যেগুলো ভোক্তার কল্যাণের তেমন কোন গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে না। মোট ভোগের মধ্যে ভিন্ন অনুপাতের প্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী (C=Cn+Cl) থাকতে পারে, এবং এ দু'শ্রেণীর প্রতিটির অনুকুলে সম্পদ বরাদ্দের হারের উপর নির্ভর করে অভাব মেটানো সম্ভব হতে পারে, নাও হতে পারে। বিলাসী পণ্য ও সেবা সামগ্রী (Cl) ভোগ ও উৎপাদনের জন্যে কোন সমাজ যতবেশী সম্পদ সরবরাহ করতে পারবে, অভাব মেটানোর জন্যে সে সমাজ তত কম সম্পদ (C_n) পাবে। সুতরাং, এরূপ হতে পারে যে, যদি বর্ধিত ভোগ ধনীদের বিলাস বাসনে (C_l) চলে যায় তাহলে মোট ভোগ বেড়ে যাওয়া সত্বেও কোন সমাজ দরিদ্রদের অভাব মেটানোর (Cn) জন্যে যথেষ্ট স্বচ্ছল নাও

---

[১] দৃষ্টান্ত স্বরুপ সেমিনারের কাগজ পত্র ও আলোচনার সারাংশ নিয়ে লেখা সূচনা দেখুন, আরিফ, ১৯৮২, পৃ: ১-২০। সূচনা মতে, 'ইসলামী অর্থনীতির মুল্যবোধ ব্যবস্থা, যা ইহার ভোগ, উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে, অন্যান্য অর্থনীতি থেকে তাকে আলাদা করেছে" (পৃ: ৩)। আরো দেখুন, আহমদ, ইকবাল ও খান, ১৯৮৩, পৃ: ১-২৫; মুনাওয়ার ইকবাল, ১৯৮৬, পৃ: ১১-৩৩; খান ও মিরাখর, ১৯৮৭, পৃ: ix-xxi; MF Khan, 1988, pp. 1-16; Ahmed and Awan, 1992, pp. 13-16; A Qadir Atiah, 1994.

www.pathagar.com

হতে পারে। সুতরাং, অভাব মেটানো যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে কেবল মাত্র মোট ভোগের পরিমান আলোচনা করলেই যথেষ্ট হবে না।

প্রচলিত সামষ্টিক অর্থনীতি ভোগের সূত্রের মধ্যে মোট ভোগের উপাদানসমুহ (Cn ও Cl) বিবেচনার মধ্যে নেয় না। অধিকন্তু, এটি মুলত: ভোগের উপর বাজার মুল্য ও আয়ের প্রভাব পর্যালোচনা করে থাকে। এর ফলে ব্যাখা-বিশ্লেষনে ক্রটি থেকে যেতে পারে, কারন যদিও বাজার মুল্য ও আয় মোট ভোগের পরিমানের (C) উপর একটা নির্ধারক ভুমিকা রাখে, তবুও অনেক নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ভোগের বিভিন্ন উপাদানের (Cn ও Cl) মধ্যে তার বন্টনকে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং, বিভিন্ন মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান, অভিরুচী, পছন্দ-অপছন্দ, আয় ও সম্পদের বন্টন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিকাশ, এবং সরকারের নীতি-কৌশল ইত্যাদিকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দুরে রাখা সমীচীন নয়।

বহু মুসলমান অর্থনীতিবিদ এ সকল অতিরিক্ত বিষয়গুলোর সব না হলেও অধিকাংশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ভোগের সূত্র তৈরী করার চেষ্টা করেছেন।[২] তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যাদের ব্যয় করার ক্ষমতা রয়েছে তাদের লোক দেখানো ও অপচয়মুলক ভোগ (Cl) হ্রাস করার ক্ষমতা বাজার মুল্যের নেই। দৃষ্টিভঙ্গী, অভিরুচী, পছন্দ-অপছন্দ পরিবর্তন, যথাযথ উদ্বুদ্ধকরণ প্রয়োজন, এবং এমন একটা সামাজিক পরিবেশ তৈরী করা আবশ্যক যেখানে এরুপ ভোগ (Cl) নিন্দিত হয়ে থাকে। প্রয়োজন ভিত্তিক পণ্য ও সেবার (Cn) চাহিদা বাড়ানোর জন্যে দরিদ্রদের নিকট সম্পদ সরবরাহ করা আবশ্যক। যে কোন ধর্মের বিশেষ করে ইসলামের আদর্শের উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটানো। ইসলামের ভোগের নীতি ব্যক্তিগত অভিরুচীকে বিলাস ব্যাসনের (Cl) বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করতে পারে, এবং সামাজিক নিরাপত্তা জাল ও জাকাত, অন্যান্য দাতব্য ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পদের বরাদ্দকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যায়, যার ফলে মোট ভোগের প্রয়োজনীয় উপাদান (Cn) বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদকগণও তাদের বিনিয়োগের বিরাট অংশ প্রয়োজন ভিত্তিক পণ্য (Cn) উৎপাদনে নিয়োজিত করবে। ব্যক্তিগত অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দের

---

[২] এদের মধ্যে রয়েছেন, Jarqa (1980, 1982); Monzer Kahf (1978, 1980); M M Metwally (1981); Fahim Khan (1988); M A Mannan (1986); M A Choudhury (1986); Munawar Iqbal (1986); Bendjilali and al-Zamil (1993); Ausaf Ahmad (1992)।

www.pathagar.com

সংস্কার না হলে এবং সামাজিক সম্পদের বড় একটা অংশ বিলাস সামগ্রী ও অপচয়মূলক পণ্য উৎপাদনে খরচ করা হলে, সরকারের বিশাল পূণ: বন্টনের ভূমিকাও সকলের অভাব মেটানোর প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে না।

সুদ-প্রথার বিলোপের মাধ্যমে নৈতিক সংস্কার আরো বলীয়ান হতে পারে। সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থায় আর্থিক সম্পদের মূলত: ধনীদের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা থাকে, যারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে পারে ও যাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার মত তারল্য থাকে, এবং আর ধাবিত হয় সরকারগুলোর দিকে যাদের খেলাপী হওয়ার আশংকা থাকে না। তবে, ধনীরা কেবল মাত্র উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের জন্যেই ঋণ করে না, তারা লোক দেখানো ভোগ-বিলাস ও অত্যোধিক ঝুকিঁপূর্ণ খাতেও বিনিয়োগ করে থাকে, এবং সরকারগুলো কেবল মাত্র উন্নয়ন ও জনগণের কল্যানের জন্যেই ঋণ গ্রহণ করে না, অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও অলাভজনক সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়, তাছাড়া সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক ভারসাম্যহীনতা বেড়ে যায়, অভাব মেটানো ও উন্নয়নের জন্যে সম্পদ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এটা থেকে বোঝা যাবে, অন্তত: আংশিকভাবে হলেও, কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ তাদের হেফাজতে প্রচুর সম্পদ থাকা সত্বেও সকল নাগরিকের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণে অক্ষম। তবে, যদি অর্থের যোগান দাতা ব্যবসার ঝুকিঁর অংশীদার হতো তাহলে অনুৎপাদনশীল খাতে ও অধিক ঝুকিঁপূর্ণ লাভজনক ব্যবসায় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মানে অর্থ-লগ্নি হ্রাস পেত, ফলে আরো বেশী বেশী সম্পদ অভাব মেটানোর কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হতো।

আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণ কর্মসংস্থান

টেকসই প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ হচ্ছে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কঠোর পরিশ্রম, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা, তৎসহ সহায়ক সামাজিক আচরণ ও সরকারী নীতি। প্রবৃদ্ধির উপর সঞ্চয়ের ইতিবাচক প্রভাব এখন বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত একটি সত্য।[৩] এটা মূলধন গঠণে সাহায্য করে, যা আবার উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে যে, উচ্চ হারে সঞ্চয়ের দেশ নিম্ন হারের সঞ্চয়ের দেশ অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে উন্নতি লাভ করেছে।[৪]

---

[৩] Mankiw, Romer and Weil, 1992- এ পেশকৃত তথ্য থেকে এটাই বোঝা যায়।

[৪] IMF, World Economic Outlook, May, 1995, pp. 67-89, Chapter V, 'Saving in a Growing World Economy," দেখুন।

www.pathagar.com

সঞ্চয়ের মুল গুরুত্ব আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে সঞ্চয়ের উপর ইসলামের মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমুহের সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে। মোট আয়ের মধ্য থেকে ভোগ-বিলাসের হার হ্রাসকারী সকল বিষয়সমুহ সঞ্চয়ের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ সকল বিষয়গুলোর কয়েকটি হচ্ছে: মুল্যবোধ ও পছন্দ-অপছন্দ, ঋণ, কর ও সম্পত্তি হস্তান্তরের সহজ ব্যবস্থা, আয় ও আয়ের পুণ: বন্টনে পরিবর্তন ও জনসংখ্যা। সাধারণ অনুভূতি হচ্ছে যে, বেসরকারী খাতের দৃশ্যমান ভোগ-বিলাস হ্রাসকরণের মাধ্যমে ইসলামি মুল্যবোধ সঞ্চয়ের উপর একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, প্রথাগত অর্থনীতিতে গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঋণের প্রাপ্যতার সাথে সঞ্চয়ের হারের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। জাপান ও জার্মানীর মত উচ্চ হারে সঞ্চয়ের দেশে এমন কর ব্যবস্থা রয়েছে যা ভোক্তা-ঋণ নিরুৎসাহিত করে।[৫] এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, লাভ-লোকসান ভাগা-ভাগির পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে তা সরকারী-বেসরকারী উভয় খাতেই অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের সুযোগ কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। তবে, ইসলামের বিধান মোতাবেক দরিদ্রদের অভাব পুরণের প্রয়োজন বাড়লে তা নীট সঞ্চয়ের উপর এ সকল বিষয়ের কতিপয় ইতিবাচক দিক নস্যাত করে দিতে পারে।

সুতরাং, সঞ্চয়ের উপর এ সকল বিভিন্ন মুখী শক্তির প্রভাব কি হতে পারে? দুর্ভাগ্যবশত: এ প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব প্রদান করা সম্ভব নয়। কারন এটা অভাব-মেটানোর চাহিদার বৃদ্ধি ও দৃশ্যমান ভোগ-বিলাস হ্রাস ও সরকারী খাতের ঘাটতির তুলনামুলক হারের উপর নির্ভরশীল। একদিকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, প্রান্তিক পর্যায়ে ও গড়ে ভোগ বৃদ্ধির একটা প্রবণতা দেখা যাবে।[৬] অভাব-পুরণ বৃদ্ধি পেলে অন্তত: প্রাথমিক পর্যায়ে সঞ্চয় কমে যেতে পারে। অভাবপুরণে সমাজের সক্ষমতার অগ্রগতির সাথে সাথে এরুপ হ্রাস ধীরে ধীরে কমে যাবে, যার ফলে শেষতক সঞ্চয় বেড়ে যাবে। অপর দিকে বিপরীত প্রক্রিয়ার সপক্ষেও যুক্তি দেখানো হয়েছে;[৭] ভালো খেতে পারে এমন একটা স্বাস্থ্যবান ও সুশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণী বৈষম্যহীন সামাজিক পরিবেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করতে পারে। এটা গরীব ও বেকারদের মধ্যে সমাজ-বিরোধী অনুভূতি হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে, তাদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করতে

[৫] দেখুন, Poterba, 1994.
[৬] দেখুন, Metwally, 1983.
[৭] M. Fahim Khan, 1988 and 1992. আরো দেখুন: M. Fahim Khan, 1988, পৃ: ৫৬, M. Fahim Khan 'এর লেখার উপর সুলতান আবু আলীর মন্তব্য; Nadim ul Huq and A Mirakhor, 1987; Bendjilali and al-Zamil, 1993.

www.pathagar.com

পারে, তাদের দক্ষতা বাড়াতে পারে, এবং অপরাধ ও সামাজিক বিরোধের কারনে উদ্ভূত অপচয় কমাতে পারে। এ সকল অগ্রগতির নীট ফলাফল ধনী লোকদের সংখ্যা ও তাদের বিলাসিতা ও অপচয়মুলক ভোগের পরিমান, গরিব লোকের সংখ্যা ও তাদের দারিদ্রের মাত্রা, এবং ইসলামি দীক্ষার বাস্তবায়নের গতিসহ অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের যুক্তির অনুসারীগণ জাপান ও অন্যান্য পুর্ব এশীয় দেশগুলোতে সঞ্চয়ের উপর সাম্যবাদী সমাজের সামাজিক মুল্যবোধের প্রভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৮]

এর ফলে প্রশ্ন ওঠে যে, সঞ্চয়ের উপর ইসলামি মুল্যবোধের ইতিবাচক প্রভাব সুদ-প্রথার অনুপস্থিতিতে নস্যাৎ হয়ে যাবে কি না? নাকভী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মানুষ যেহেতু ইতিবাচক সময় পছন্দ করে, সেহেতু ইতিবাচক সুদের হারের অবর্তমানে সঞ্চয় কমে যেতে পারে।[৯] অন্য অনেক লেখক এ যুক্তির সাথে একমত নন।[১০] জারকা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইতিবাচকতা যুক্তিবাদিতার নীতি নয়, এমনকি তা বাস্তব পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভোক্তাদের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যও নয়। এটা হচ্ছে তিনটা পার্থিব পছন্দের একটা, অন্য দু'টো হচ্ছে শুন্যতা ও নেতিবাচকতা, যার প্রতিটাই যৌক্তিক ও তার নিজস্ব পরিবেশে পর্যবেক্ষণযোগ্য।[১১] মানুষ ভবিষ্যতে ব্যয় করার জন্যে সঞ্চয় করে কারন ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করে আকর্ষণীয় লাভ করতে পারলে তাদের সুবিধা হয়। ইসলাম সঞ্চয়ের উপর লাভ করার সুবিধাকে অস্বীকার করে না। সুদ নিষিদ্ধ করলেও ইসলাম লাভ অনুমোদন করেছে।

উৎসাহের কথা হচ্ছে যে, বিগত একশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টক খাতে লাভের পরিমান বেশ উঁচু দেখা গেছে-স্টকের গড় ফিরতি (Average return) হয়েছে শতকরা ৭ ভাগ, ট্রেজারী বিলের ফিরতির চেয়ে শতকরা ৬ ভাগ বেশী।[১২] জার্মানী ও জাপানেও এ হার উঁচু ছিল, যেখানে ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল সময়ে স্টক থেকে প্রকৃত লাভের হার ছিল যথাক্রমে ৫.৯ ও ৪.০ শতাংশ। বিপরিত দিকে ১৯২০-এর দশকের অতি মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি জার্মানীর বন্ড মালিকগণকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালের জাপানে অতি মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি একই ঘটনা ঘটিয়েছিল।[১৩]

---

[৮] Chapra, 1992, p. 117.
[৯] Naqvi, 1981, pp. 115-17. আরো দেখুন: Pryor, 1985, p. 208.
[১০] Siddiqi, 1981; Zarqa, 1982; Chapra, 1985; N. Huq and A Mirakhor, 1987; Shamim Siddiqui and Fardmanesh, 1992.
[১১] Zarqa, 1982, pp. 98-106.
[১২] দেখুন: Kocherlakota, 1996; Siegel and Thaler, 1997.
[১৩] Siegel and Thaler, 1997, p. 194.

www.pathagar.com

অর্ন্তনিহিত সমস্যা হচ্ছে, স্টকে বিনিয়োগে ঝুকিঁ বেশী, যা প্রত্যেকে বহন করতে রাজী নন। কিছু কিছু লোক কম ঝুকিঁপুর্ণ পথে যেতে চায়। ইসলামি কাঠামোর মধ্যে এ সুবিধা রয়েছে। সুতরাং, গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়কারীগণের পছন্দ মোতাবেক নানা প্রকার ঝুঁকিতে ও মেয়াদে বিনিয়োগের সুযোগ ও অধিকার বিরাজমান থাকা।

উচ্চ সুদের হার যদি সঞ্চয় বৃদ্ধির কারন হতো, তাহলে ১৯৮০'র দশকের পর থেকে লাগাতারভাবে বিরাজমান উচ্চ সুদের হারের কারনে বিশ্ব ব্যাপী সঞ্চয়ের পরিমান বেড়ে যেত।[১৪] বরং উল্টো, বিগত ২৫ বছরে জিডিপি'র অনুপাতে মোট জাতীয় সঞ্চয় বিশ্ব জুড়ে কমে ১৯৭১ সালের ২৬.৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৫ সালে ২২.৬ শতাংশে নেমেছে। একই সময়ে শিল্পোন্নত দেশে এরুপ পতনের হার ছিল ২৩.৬ শতাংশ থেকে ২০.২ শতাংশে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও ঋণ পরিশোধের দায় না বাড়িয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে যে উচ্চ হারের সঞ্চয় প্রয়োজন ছিল, একই সময়ে সেখানে তা নেমেছিল আরো বেশী, ৩৪.২ শতাংশ থেকে ২৬.১ শতাংশে।[১৫] এর কারন হতে পারে অনেকগুলো। একটা কারন হতে পারে সম্ভবত: জামানত ও সুদ-ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় ঋণের সহজলভ্যতার কারনে সরকারী-বেসরকারী উভয় খাতে ভোগের পরিমান বেড়ে গিয়েছিল।

সুদের উচ্চ হার যখন সঞ্চয় বাড়াতে পারলো না, তখন তা হয়ে গেল বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির নিম্ন হারের একটা বড় কারন। এরুপ নিম্ন হার যুক্ত হয়েছে কাঠামোগত অনমনীয়তা ও কতিপয় ঘটনার সাথে যার ফলাফল হলো বেকারত্ব, যা OECD-ভুক্ত দেশগুলোতে ১৯৯৭ সালে ছিল ৭.২ শতাংশে, যা ১৯৭১-৩ সালের ২.৯ শতাংশের আড়াইগুনের খুব কাছাকাছি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বেকারত্বের হার (১৯৯৭ সালে ১১.২ শতাংশ) আরো বেশী।[১৬] যদি "নিরুৎসাহিত শ্রমিক" (যারা চাকুরীর প্রতি হতাশ হয়ে চাকুরী ছেড়েছে) ও বাধ্যতামুলক খন্ডকালীন শ্রমের আওতাধীন শ্রমিকদেরকে হিসাবে ধরা হয় তাহলে বেকারত্বের সার্বিক হার আরো বেশী হতে পারে।[১৭] আরো বেশী উদ্বেগের কারন

---

[14] IMF- এর মতে : '১৯৮০'র দশকের শুরু থেকে লাগাতারভাবে বিদ্যমান সুদের উচ্চ হারই প্রাথমিকভাবে প্রমান করে যে, সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগের চাহিদা বেশী' (IMF, *World Economic Outlook*, May, 1985, p.7)।

[১৫] IMF, *International Financial Statistics*, 1998 Yearbook, pp. 166-7, 'Consumption as per cent of GDP" শীর্ষক সারণী থেকে সংখ্যাগুলো নেয়া হয়েছে।

[১৬] OECD, *Economic Outlook*, December 1991, Table 2, p. 7, and June 1998, Table 21, p. 245.

[১৭] BIS, 64th *Annual Report*, June, 1994, p. 17.

www.pathagar.com

হচ্ছে "নিরুৎসাহিত যুবক" ব্যতীত ২৫ শতাংশ যুব-বেকার।[১৮] এটা তাদের অহংকারে আঘাত করে, ভবিষ্যতের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট করে দেয়, সমাজের প্রতি তাদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে, এবং তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ভবিষ্যতে অবদান রাখার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

যেহেতু বাজেট শৃংখলা এখন যথার্থভাবেই প্রচলিত প্রজ্ঞার অংশে পরিণত হয়েছে এবং ইউরো'র সফলতার জন্যে তা অপরিহার্য, সেহেতু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাইলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে রাজস্ব ঘাটতির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস কোন সম্ভাব্য বিকল্প নয়। অপচয়মূলক সরকারী ও বেসরকারী ব্যয় হ্রাস করা গেলে সম্ভবত: সেটাই হতে পারে সঞ্চয় ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাময় উপায়। তবে, এটা সম্ভব নাও হতে পারে যদি সামাজিক মূল্যবোধ সরকারী-বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে সাধ্যের বাইরে জীবন যাপনকে উৎসাহিত করে, এবং সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নির ব্যবস্থায় ঋণ-প্রাপ্তিতে ঋণের চূড়ান্ত ব্যবহার বিবেচনায় গ্রহণ না করার মাধ্যমে ও তুলনামূলকভাবে সহজে ঋণ-প্রাপ্তির মাধ্যমে তাকে সহায়তা করা হয়।[১৯]

এমনকি যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে, ইসলামি দীক্ষার বাস্তবায়নের পর মুসলিম সমাজে চোখ-ধাঁধানো ও অপচয়মূলক ভোগ-বিলাস কমবে এবং সঞ্চয় বাড়বে, তবুও কোন নিশ্চয়তা নেই যে অর্জিত সঞ্চয় নিজ দেশে বিনিয়োগ করা হবে। বিনিয়োগ বাড়তে পারে যদি জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, খামখেয়ালীভাবে জাতীয়করণ ও বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা, যুক্তিসঙ্গত কর হার, ভেতরে ও বাইরে দেশের মুদ্রার মূল্যমানের তুলনামূলক স্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি ও মেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। বর্তমান কালের মুসলিম দেশসমূহ এ সকল পূর্বশর্তের বিষয়ে কারো আস্থা বৃদ্ধি করে না। তবে একটা পরিবর্তন ঘটছে এবং বিনিয়োগের জন্যে একটা অনুকূল পরিবেশ রয়েছে এরূপ ধারনার ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ইসলামি মূল্যবোধ বিনিয়োগের উপর একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।[২০]

---

[১৮] প্রাগুক্ত।

[১৯] বিশ্বব্যাপী এখন বাজেট ঘাটতি হ্রাস করার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় গোষ্ঠী বর্তমানে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্যে জিডিপি'র ৩ শতাংশ এবং সরকারী দেনা পরিশোধের জন্যে জিডিপি'র ৬০ শতাংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তবে, বেসরকারী খাতের জন্যে এরূপ কোন সীমা নেই। ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহস্থালী ঋণের পরিমান ব্যয়যোগ্য গৃহস্থালী আয়ের (disposable income) শতভাগে পৌঁছেছে, যা ১৯৯৬ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ, ১৯৯০ সালে ৮৩ শতাংশ ও ১৯৮০ সালে ছিল মাত্র ৬৭ শতাংশ। (BIS, Annual Report, June, 1999, p. 19; and US Department of Commerce)।

[২০] দেখুন: Chapra, 1985, pp. 111-25.

www.pathagar.com

জাকাত অলস সঞ্চয়ের উপর দন্ড আরোপ করে, গুদামজাতকরনকে নিরুৎসাহিত করে, এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। সঞ্চয়কারীগণ বাধ্য হবে অন্তত: সে পরিমান আয় করতে, যা মুদ্রাস্ফীতির কারনে ও জাকাত প্রদানের ফলে তাদের সঞ্চয়ের অভিহিত ও প্রকৃত মুল্যের ঘাটতি পুষিয়ে দিবে।[২১]

যুক্তি প্রদর্শণ করা হয় যে, অর্থ-লগ্নিকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে একটা সুষ্ঠু অনুপাতে লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করা হলে সম্পদের আরো বেশী উৎপাদনশীল বন্টন হতে পারে।[২২] সর্বোপরি, উদ্যোক্তাই হচ্ছে বিনিয়গ সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুল শক্তি, এবং অনিশ্চয়তা ও অবিচারের একটা মুল কারন অপসারিত হলে তা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনুকুল প্রভাব ফেলতে বাধ্য। "সঞ্চয়ীকে বিনিয়োগকারী"-তে পরিণত করার মাধ্যমে, যেমনটি বলেছেন ইঙ্গো কার্স্টেন, ব্যবসার ঝুকিঁ আরো সমান ভাগে বিভাজিত হতে পারে, যার ফলে বিনিয়োগের পরিবেশ আরো ভালো করা যেতে পারে। তাছাড়া, উদ্যোক্তার ব্যবসার সাফল্যে সঞ্চয়ী ও ব্যাংক-কে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা আরো বেশী বিশেষজ্ঞ সহায়তা পেয়ে যেতে পারেন, যার ফলে তথ্য, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও লাভ অর্জনের বিষয়ে আরো বেশী বেশী খোঁজ-খবর পেতে পারেন। ফলে যোগ্যতর উদ্যোক্তাগণ আরো বেশী বেশী বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবেন।[২৩] বহু লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, লাভ ভাগা-ভাগির ব্যবস্থায় মোট বিনিয়োগের হার অনেক বেশী হয়ে থাকে,[২৪] এবং একটা লাভ ভাগা-ভাগির চুক্তি কোন পুর্ব-নির্ধারিত হারে ফিরতির (Return) চুক্তির তুলনায় (পারেটো মানে) ভাল।[২৫] যেহেতু, বিনিয়োগ হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্ধারক, সেহেতু ইসলামি অর্থনীতি তুলনামুলকভাবে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে।[২৬]

এখন দৃষ্টি দেয়া যাক উন্নয়নের জন্যে আবশ্যকীয় কঠোর পরিশ্রম ও বিবেক-তাড়িত কর্ম, যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, ইসলাম এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত

---

[২১] বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর জাকাতের প্রভাবের বিষয়ে প্রচুর লেখা রয়েছে। আরবী ও ইংরেজী গ্রন্থ তালিকার জন্যে দেখুন: Suhaibani, 1990, pp. 313-25.

[২২] Zarqa, 1982, pp. 98-106; Chapra, 1985, pp. 107-117; Presley and Sessions, 1994.

[২৩] Ingo Karsten, 1982, p. 131, pp. 129-36.

[২৪] Metwally, 1983; Waqar Khan, 1985, 1992; N Huq and Mirakhor, 1986; Mirakhor and Zaidi, 1987; Mohsin Khan, 1987; Ziauddin Ahmed, 1994.

[২৫] Waqar Khan, 1989.

[২৬] Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, pp. 18-22; Chapra, 1985, pp. 111-17; MF Khan, 1988, p. 13; al-Jarhi, 1988, p. 173; Ausaf Ahmad, 1988, p. 135; Tag El-Din, 1992; Khan and Mirakhor, 1994, p. 17.

www.pathagar.com

ইতিবাচক।[২৭] একজন মুসলমানের প্রাথমিক কর্তব্যসমুহের মধ্যে একটা হচ্ছে বিবেক-বিবেচনা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমান যত্ন ও দক্ষতা প্রয়োগ করে দায়িত্ব পালন করা। মহানবী উপদেশ করেছেন, "সর্বোচ্চ মান অর্জন আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বাধ্যতামুলক করেছেন"[২৮] এবং "আল্লাহ্'র কাছে ভালো লাগে যখন তোমরা কোন কাজ নিখুঁতভাবে কর"।[২৯] উপযুক্ত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে কাজের জন্যে এরুপ সম্মানবোধ ও তৎসহ নিজের ও অন্যের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে সহায়ক হতে পারে।

এ রকম মনে করার কোন কারন নেই যে, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন ও সৃজনশীল ব্যবস্থাপনার জন্যে ইসলামি অর্থনীতিতে প্রণোদনা কম। প্রকৃত পক্ষে, আয় বাড়ানোর জন্যে সকল অন্যায্য ও অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়ার সকল দরজা বন্ধ হলে পরে প্রযুক্তিগত উন্নতি ও আরো বেশী উৎপাদনশীলতার প্রয়োজন আরো বাড়বে, যদি এর জন্যে উপযুক্ত সুবিধাদি ও প্রণোদনাসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি যোগ্যতা থেকে থাকে। সবকিছু সমান থাকলে, একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির খরচ কমানো ও হালাল রুজি বাড়ানোর জন্যে এটাই হয়ত: একমাত্র পথ।

সহায়ক সামাজিক আচরণ ও সরকারী নীতি-কৌশলের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, বর্তমানে কোন মুসলিম দেশেই এগুলো বিদ্যমান নেই। এর জন্যে ইসলাম দায়ী নয়, বরং ইসলাম বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এরুপ হয়েছে। এর কতিপয় কারন ইতোমধ্যে বিগত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বৈষম্যহীন বন্টন ব্যবস্থা

যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অনেকগুলো ইসলামি মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান, ইসলামি সৌভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্য ও বৈষম্যহীন বন্টন ব্যবস্থার মত, ইসলামি আদর্শ বাস্তবে রুপ দিতে সাহায্য করতে সক্ষম।[৩০] এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে জাকাত ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাসমুহ। তবে, কতিপয় লেখক খেয়াল-খুশী মতে

---

[২৭] Chapra, 1985, pp. 122-3.

[২৮] মুসলিম কর্তৃক সাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে তাঁর সহি: কিতাব আল-সাইয়িদ ওয়া আল-ধাবাহ, বাব আল-আমর বি ইহসান, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৫৪৮: ৫৭-এ উল্লিখিত।

[২৯] Al-Bayhaqi কর্তৃক সাইয়ীদাহ্ আ'ইশাহ্ থেকে তাঁর শু'আব আল-ঈমান, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৩৪: ৫৩১২-এ উদ্বৃত।

[৩০] দেখুন, Munawar Iqbal, 1988; MF Khan, 1988; Shamim Siddiqi and Zaman, 1989; Shamim Siddiqi, 1992 , 1994; Chapra, 1992, pp. 251-76; MN Siddiqi, 1996, pp. 5-42.

www.pathagar.com

ধরে নিয়েছেন যে, জাকাত চালু করা হলে অন্য সকল সামাজিক নিরাপত্তা জাল অপরিহার্যভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।[৩১] এরূপ অনুমান অযৌক্তিক ও ভুল। আধুনিক সমাজে কর্মচারীদের বেতন থেকে সমন্বয় ও নিয়োগকারীর অনুদানের মত নিজস্ব অর্থায়নের ব্যবস্থার মাধ্যমে বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, ও অসুস্থতা থেকে রক্ষার জন্যে সামাজিক বীমার বিকল্প হিসেবে জাকাতকে বিবেচনা করা যায় না। বাজেটে সরকার কর্তৃক কল্যাণমুলক খাতে ও দুর্যোগের সময় ত্রাণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে নির্দিষ্টকৃত বরাদ্দের বিকল্পও জাকাত নয়। এমনকি জাকাত কোন ইসলামি রাষ্ট্রকে আয় পুণ: বন্টন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজেটে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করে না।

জাকাত হচ্ছে একটা সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী যার আওতায় ধনীদের কর্তব্য হচ্ছে ঐ সকল গরীবদেরকে সাহায্য করা, যারা উপরে বর্ণিত সকল কর্মসূচী সত্বেও টিকে থাকতে অক্ষম, যার ফলে মুসলিম সমাজ থেকে দুর্দশা ও দারিদ্র্য দুর করা যায়। এর মাধ্যমে সরকারের কল্যাণমুলক দায়িত্বের অবসান হয় না, তবে, অবশ্যই দায়িত্বের এক বিরাট অংশ সমাজের নিকট, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের নিকট স্থানান্তরিত হয়ে যায়, এবং এভাবে সরকারের বাজেটের উপর চাপ কমে। কল্যাণের পুরো দায় সরকারের উপর চেপে দেয়া অবাস্তব। জাকাত বাবৎ আয় যদি অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণের মতে মুসলিম সমাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অন্যান্য উপায় ও পন্থা বের করা। ইসলামের উত্তরাধিকার পদ্ধতির কারনে আয় ও সম্পদের বন্টনের উপর জাকাতের ইতিবাচক প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়।

সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থার স্থলে লাভ-লোকসান ভাগা-ভাগির পদ্ধতি চালু করা হলে অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা, যারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে পারে এবং যাদের ঋণ শোধ করার মত প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে। সুতরাং, ঋণ প্রবাহিত হয় তাদের দিকে, যারা লেস্টার থুরো'র মতে "চালাক-চতুর কিংবা মেধাবী নয়, ভাগ্যবান"।[৩২] এভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা "পুঁজির অসম বন্টনকে আরো বাড়িয়ে দেয়"।[৩৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

[৩১] Kuran, 1986.
[৩২] Thurow, 1980, p. 175.
[৩৩] Bigsten, 1987, p. 156.

www.pathagar.com

অন্যতম বৃহৎ ব্যাংক মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানী স্বীকার করেছে যে, ব্যাংক ব্যবস্থা "বাড়ন্ত ছোট ছোট কোম্পানীগুলোকে বা উদ্যোগী পুজিঁবাদীগণকে অর্থ সরবরাহ করতে" ব্যর্থ হয়েছে, এবং "যদিও অর্থের ভেতর ডুবে রয়েছে, তবুও বৃহত্তম ও অত্যন্ত অর্থশালী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন গ্রাহককে প্রতিযোগিতামূলক দামে পুজিঁ সরবরাহ করতে আগ্রহী নয়"।[৩৪] সুতরাং, আমানত যদিও আসে জনসাধারণের নিকট থেকে, তার সুবিধা পায় ধনীরা। এর ফলে আয় ও সম্পদের বন্টনে বৈষম্য বেড়ে যায়। এ অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে অনেকগুলো দেশে নি:সন্দেহে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিম দেশসমূহেও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। ব্যাংকগুলো যেখানে অন্তত: জামানতের মত প্রকল্পের লাভের ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দিতে আগ্রহী, সেখানে একটা সাম্যবাদী ব্যবস্থায় তারা আরো বেশী সফল হওয়ার প্রবণতা দেখাতে পারে, এবং তার মাধ্যমে ছোট ছোট ব্যবসাগুলোকেও প্রতিযোগিতায় নিয়ে আসতে পারে।[৩৫]

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

ইতিহাসে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চড়াই-উৎরাই হয়েছে অনেকগুলো কারনে, যার কতগুলো প্রাকৃতিক ঘটনার মতই দুর করা কঠিন। সে যাহাই হোক, সুদের হার, বিনিময় হার, পণ্য ও স্টকের মুল্যের অস্থিরতাজনিত কারনে অর্থবাজারের অতি অস্থিরতার ফলে বিগত দু'দশক ধরে মনে হচ্ছে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়ে গেছে। বিশ্বের এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন না কোন সময় এরুপ কোন তীব্র সংকট তৈরী হয়নি।[৩৬] এরুপ সংকটের ফলে অনিশ্চিয়তা বেড়ে যাওয়া, অর্থ ব্যবস্থায় সাবলীল কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ করা, আর্থিক দুর্বলতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়।

অর্থ বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে ভেতরের ও বাইরের অনেকগুলো কারন রয়েছে। এখানে তাদের সবগুলো আমাদের আলোচনার জন্যে প্রয়োজনীয় নয়। তবে, তাদের সবগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সবগুলো একত্রে মিলে

---

[৩৪] Morgan Guarantee Trust Company of New York, World Financial Markets, January 1987, p. 7.

[৩৫] দেখুন, Chapra, 1985, pp. 107-11, 200-2.

[৩৬] ১৯৮৭ সালে স্টক মার্কেট পতনের পর বিশ্বজুড়ে অনেকগুলো সংকট দেখা দিয়েছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে: ১৯৯০-এর দশকে জাপানের স্টক ও প্রোপার্টির অতি ফোলানো-ফাঁপানো মার্কেটের পতন, ১৯৯২-৯৩ সালে European Exchange Rate Mechanism ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা, ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে বন্ড মার্কেটের পতন, ১৯৯৫ সালের মেক্সিকো সংকট, ১৯৯৭ সালের পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংকট, এবং আগষ্ট ১৯৯৮ সালের রাসিয়ার সংকট।

www.pathagar.com

পরিস্থিতি নাজুক করার প্রবণতা দেখা যায়। এগুলোর একটা হচ্ছে, সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নির ব্যবস্থায় ঋণ, বিশেষ করে স্বল্প মেয়াদী ঋণ, তুলনামুলকভাবে সহজলভ্য বিধায় সরকারী-বেসরকারী খাতে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ। সুদভিত্তিক অর্থ-লগ্নি ব্যবস্থায় ঋণদাতা প্রকল্পের গুনাগুনের উপর নির্ভর না করে জামানতের উপর বেশী আস্থা রাখে। লভ্যাংশকে করের আওতায় রেখে এবং পরিশোধিত সুদকে করমুক্ত রাখার মাধ্যম কর ব্যবস্থাও পরোক্ষভাবে সম-মুলধনের চেয়ে ঋণের ব্যবহারকে বেশী উৎসাহিত করে থাকে। তাছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসাধারন উন্নতি ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের উদারীকিকরনের ফলে সামান্যতম গুজবের ভিত্তিতেই দেশ থেকে দেশান্তরে মুলধন স্থানান্তর ঘটে থাকে। এর ফলে সুদের হার অতি মাত্রায় অস্থির হয়ে পড়ে, যা আবার বিনিয়োগের বাজারে প্রচুর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে, এবং ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়কেই দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের পরিবর্তে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের দিকে ধাবিত করেছে। ফলাফল হচ্ছে, খুব সহজলভ্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এ বিষয়টি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। আই এম এফ ১৯৯৮ সালের World Ecocnmic Outlook-এ এরুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, যে সকল দেশে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের পরিমান বেশী সে সকল দেশ "ভেতরের ও বাইরের আঘাতে কুপোকাত হওয়ার বিশেষ আশংকায় আছে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের আর্থিক সংকটে নিপতিত হওয়ার আশংকায় রয়েছে"।[৩৭]

এখানে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, ঋণ, বিশেষত: স্বল্প-মেয়াদী ঋণ, বাড়লে অস্থিতিশীলতা বাড়বে কেন? জবাবে বলা যায় যে, ঋণের সহজলভ্যতা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ও আর্থিক অস্থিরতার মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ঋণের সহজলভ্যতার কারনে সরকারী-বেসরকারী উভয় সেক্টরেই সাধ্যের বাইরে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে। ঋণ যদি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে ঋণের অনুপাতে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বাড়ে না, ফলে আর্থিক দুর্বলতা ও ঋণের সংকট বৃদ্ধি পায়। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের উপর নির্ভরতা যত বেশী হবে, সংকটের তীব্রতা তত বেশী হতে পারে। কারন হচ্ছে যে, স্বল্প-মেয়াদী ঋণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য, কিন্তু, অর্থ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্পে আটক হয়ে গেলে ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হতে পারে, কারন সেখানে বিকাশের সময় দীর্ঘ হয়ে থাকে। যুক্তিসঙ্গত পরিমানের স্বল্প-মেয়াদী ঋণে দোষের কিছু নেই, কিন্তু, পরিমানে বেশী হলে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা, স্টক মার্কেট ও পণ্যবাজারের দিকে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

---

[৩৭] IMF, World Economic Outlook, May, 1995, পৃ: ৮৩।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের পুর্ব এশিয়ার সংকট এটাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাচ্যের ব্যাগ্রগুলো বেশ ভালো রাজস্ব নীতি-কৌশল অনুসরন করে আয়েশেই দিন কাটাচ্ছিল, যা কিনা অনেক উন্নত দেশের ঈর্ষার কারন হয়েছিল। সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে এটা যেহেতু বেশ প্রতিষ্ঠিত যে, বন্ড ছেড়ে অথবা নির্দিষ্ট সুদের হারের স্থিতি'র মাধ্যমে সরকারের বাজেট ঘাটতি মেটানো হলে তা অস্থিতিশীলতাকে উৎসাহিত করে থাকে, এ সকল দেশের রাজস্ব নীতি দেশগুলোকে অস্থিতিশীলতা থেকে রক্ষা করা উচিৎ ছিল।[৩৮] তবে, সেগুলো তা করে নি। বিদেশ থেকে আসা অর্থের সহায়তায় বেসরকারী সেক্টরে ব্যাংক ঋণের দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারনে সম-মূলধন ও স্থাবর সম্পত্তির ঝুকিঁপুর্ণ অথচ লাভজনক বাজারে উত্তাপ বাড়িয়ে দিল, এবং এক প্রকার "অযৌক্তিক প্রাচুর্যের" আবহ তৈরী করেছিল যা সম্পত্তির মুল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক বেশী।

বৈদেশিক মুদ্রার প্রচুর আমদানীর কারনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর পক্ষে বিনিময় হার স্থির রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে ঋণ প্রদানের জন্যে বিদেশী ব্যাংকগুলোকে আশ্বস্থ করা সম্ভব হয়েছিল এবং, দেশের ভেতরে বিরাজমান সুদের উচ্চ হারের কারনে স্থাবর সম্পত্তির বাজারে সৃষ্ট ব্যাপক চাহিদায় অর্থায়নের জন্যে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় আরো বেশী বেশী অর্থ আসতে থাকলো। যেহেতু, এ সকল আগত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগই ছিল স্বল্প-মেয়াদী, সেহেতু, মেয়াদ সংক্রান্ত জটিল গোলমাল দেখা দিল। এর সাথে যুক্ত হলো রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অকার্যকর ব্যাংকিং বিধি-বিধানসমুহ যা অতিরিক্ত লাভের আশায় পছন্দের কোম্পানীগুলোকে অঢেল ঋণ প্রদান সম্ভব করেছিল। এ সকল কোম্পানীগুলোর দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এ কারনে যে, প্রথাগত ব্যাংকগুলো ঝুকিঁর অংশীদার হতে হয় না বিধায় প্রকল্পগুলো ভালোভাবে যাছাই না করে সহজে তাদেরকে ঋণ প্রদান করেছিল। এটা ছিল অর্ন্তনিহিত ঝুকিঁ সঠিকভাবে যাছাই না করে জামানতের উপর নির্ভর করে ঋণ প্রদান করার সেই পুরনো ভুল। যদি ঝুকিঁর অংশীদারিত্ব থাকতো, তাহলে প্রকল্পগুলোকে ভালোভাবে যাছাই করার একটা বাধ্যবাধকতা ব্যাংকগুলোর থাকতো, এবং প্রকল্পটি বেশী ঝুকিঁপুর্ণ মনে হলে তারা এমনকি রাজনৈতিক চাপের কাছেও নতি স্বীকার করতো না।

যখনই একটা আঘাত এলো তখনই শুরু হলো অর্থের বিপরীতমুখী প্রবাহ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বাণিজ্য, সুদের হার, কিংবা রপ্তানী মুল্যের শর্তাদিতে কোন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনসহ অনেকগুলো কারনে আঘাত আসতে পারে, এবং এর ফলে দায় পরিশোধে সরকারের সামর্থের উপর আস্থা কমে যেতে পারে।

---

[৩৮] দেখুন, Christ, 1979; Searth, 1979.

www.pathagar.com

অর্থের বহি: মুখী দ্রুত প্রবাহের ফলে, যা সম-মূলধন অর্থায়ন ব্যবস্থায় কিংবা মাঝারি বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিনিময় হার ও সম্পত্তির মূল্য হঠাৎ খুব পড়ে গেল এবং তার সাথে সাথে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণের মূল্য হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। ঋণ-গ্রহীতাগণ নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। দেশীয় ব্যাংকগুলোতে সংকট চলছিল, বৈদেশিক দায় পরিশোধে দেশীয় ব্যাংকগুলোর অক্ষমতার কারনে যার প্রভাব পড়েছিল বিদেশী ব্যাংকগুলোর উপর।

এ রকম অবস্থায় সরকারগুলোর মাত্র দু'টো বিকল্প ছিল। প্রথমটি হচ্ছে করদাতাদের উঁচু খেসারতের বিনিময়ে দেশীয় ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতন অনুমোদন করা এবং অর্থনীতিকে ধ্বংসের কাছাকাছি যেতে দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক প্রথম বিকল্প বেছে নিল। যেহেতু দেশীয় ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক দায়গুলো ছিল বৈদেশিক মুদ্রায়, সেহেতু বৈদেশিক সহায়তা ব্যতীত উদ্ধার কর্ম অসম্ভব ছিল, যার জন্যে আই এম এফ এগিয়ে আসলো। এভাবে ঋণ আরো বেড়ে গেল, যার কিস্তি পরিশোধ দুরুহ হতে পারে, যদি এ সকল দেশ তাদের রপ্তানী দ্রুত বাড়াতে সক্ষম না হয়। সুতরাং, জেমস টবিন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "প্রাইভেট ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছা মাফিক পরিমানে, মেয়াদে ও মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করতে পারলেও সে সকল ঋণ দেশের রিজার্ভের উপর ভবিষ্যতে-কার্যকর একটি দাবী পেশ করে"।[৩৮] ফলশ্রুতিতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এমন মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে যা তাদের লক্ষ্যের বাস্তবায়নকে বলি দিয়ে দিতে পারে। কঠোর নিয়ন্ত্রন আরোপই ঋণ নিয়ন্ত্রনের জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হবে এমন কথা নেই, বরং একটা সহজাত স্ব-আরোপিত শৃংখলার পদ্ধতি চালু করা যায়। ঝুঁকি ভাগাভাগি করার পদ্ধতি চালু করার চেয়ে আরো বেশী কার্যকর কি হতে পারে, যা ঋণ বিতরনে দেশী-বিদেশী সকল ব্যাংকগুলোকে আরো বেশী সতর্ক রাখবে?

শুধু কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়, এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলোও এরূপ সংকটে পড়তে পারে যদি তারা স্বল্প-মেয়াদী ঋণের উপর কিংবা মূলধনের অন্ত: মুখী প্রবাহের উপর বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটে মূল্যের অতিমাত্রায় উত্থান ঘটেছিল স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রবাহের কারনে, যেমন ঘটেছিল পূর্ব এশিয়ায়। যদি কোন অজানা কারনে এরূপ অন্ত: মুখী প্রবাহ

[৩৮] World Bank, *Policy and Research Bulletin*, April-June, 1998, p. 3.

www.pathagar.com

বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বিপরীত মুখী হয়, তাহলে ভীষণ সংকট তৈরী হতে পারে। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে যখন ডলারের উপর আস্থা কমে গিয়েছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুলধনের বহি:মুখী প্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে বিদেশে ডলারের মুল্য অনেক কমে গিয়েছিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কমে গিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল।

১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের Long-Term Capital Management (LTCM), "Quantum", and "Tiger"-এর মত অতি ঝুঁকিপুর্ণ বিনিয়োগ কোম্পানীগুলোর (hedge funds) পতনের কারনও ছিল অতি মুনাফার প্রত্যাশায় স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বন্টন। অতি ঝুঁকিপুর্ণ বিনিয়োগ কোম্পানীগুলো (hedge funds) তাদের কার্যক্রম গোপন রাখতে সক্ষম। কারন, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান এলান গ্রীনস্প্যান যেমন বলেছেন, এটা "কাঠামোগতভাবে গঠিত হয়েছে অল্প-সংখ্যক অতি উঁচু মানের, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এর মক্কেলের সংখ্যা সীমিত রাখার মাধ্যমে বিধি-বিধান এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে"।[৪০] তিনি অবশ্য বলেন নি কীভাবে একটা তথা-কথিত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাংকগুলোর পক্ষে এ সকল "অতি উঁচু মানের, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিবর্গকে" অতি মুনাফার আশায় অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ লাভজনক ব্যবসায় খাটানোর লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। এ সকল অতি ঝুঁকিপুর্ণ বিনিয়োগ কোম্পানীগুলোকে (hedge funds), যারা "অতি জঘন্য লোভী প্রকৃতির ঝুকি-ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু নয়, যারা তাদের বাজিকে শক্তিশালী করার জন্যে অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ করে থাকে", সাধারণত: হংকং থেকে লন্ডন ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিভিন্ন মার্কেটে কারসাজি করার জন্যে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে।[৪১] এ সকল অতি ঝুঁকিপুর্ণ বিনিয়োগ কোম্পানীগুলো (hedge funds) আলাদাভাবে কাজ করে না। আলাদাভাবে কাজ করলে তারা এত বড় বড় লাভ করতে পারতো না। তারা সাধারনত: ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। এটা সম্ভব হয় এ কারনে যে, তাদের প্রধান নির্বাহীগণ প্রায়ই একই ক্লাবে যায়, একত্রে ভোজন করে, পরস্পরকে বেশ ঘনিষ্টভাবে চেনে ও জানে।[৪২] তাদের নিজস্ব সম্পদের জোরে এবং তারা যে বিরাট অংকের অর্থ ঋণ করতে সক্ষম তার জোরে তারা তাদের জন্যে সুবিধাজনক মনে করলে পৃথিবীর যে কোন দেশের আর্থিক বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। ১৯৯৮

[৪০] ব্যাংকিং ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত প্রতিনিধি পরিষদের কমিটির সামনে ১ অক্টোবর, ১৯৯৮ প্রদত্ত তার সাক্ষ্য দেখুন, Federal Reserve Bulletin, December, 1998, p. 1046.
[৪১] 'The Risk Business", *The Economist,* 17 October, 1998, p. 21.
[৪২] John Plender, 'Western Crony Capitalism", *Financial Times,* 3-4 October, 1998.

www.pathagar.com

সালের মাঝামাঝিতে LTCM-এর ঋণ ও মুলধনের অনুপাত (leverage) ছিল ২৫:১,[৪৩] কিন্তু, ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃক উদ্ধারের সময় তা ৫০:১-এ উঠেছিল।[৪৪] ফেডারেল রিজার্ভকে উদ্ধারে নামতে হয়েছিল এ কারনে যে, অনেকগুলো প্রথম সারির বাণিজ্যিক ব্যাংক, যেগুলো ফেডারেল রিজার্ভের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং যেগুলো বেশ ভালো চলছে মর্মে সুখ্যাতি রয়েছে, LTCM-কে বিরাট অংকের অর্থ ঋণ প্রদান করেছিল। ফেডারেল রিজার্ভ উদ্ধার না করলে মার্কিন অর্থ ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিত, যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপচিয়ে পড়তো ও সংক্রমিত হতো।[৪৫]

স্বল্প-মেয়াদী ঋণের উপর নির্ভরশীলতাও বৈদেশিক মুদ্রার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল। আন্তর্জাতিক সেটলমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত একটি জরীপ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার আন্তর্জাতিক বাজারের দৈনিক লেনদেনের পরিমান এপ্রিল ১৯৯৮-এ বেড়ে দাড়িয়েছিল ১৪৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা এপ্রিল ১৯৮৯-এ ছিল ৫৯০ বিলিয়ন ডলার, এপ্রিল ১৯৯২-এ ছিল ৮২০ বিলিয়ন ডলার, ও এপ্রিল ১৯৯৫-এ ছিল ১১৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৬] ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে বৈদেশিক মুদ্রার দৈনিক লেনদেনের পরিমান ছিল দৈনিক পণ্য-সামগ্রীর ব্যবসার (রপ্তানী ও আমদানী) পরিমানের ৪৯ গুনেরও বেশী।[৪৭] এমনকি যদি সেবা, একতরফা স্থানান্তর ও ঝুঁকিপূর্ন লাভজনক ব্যবসা ব্যতীত অন্যান্য মুলধন প্রবাহের ক্ষেত্রে ছাড়ও দেয়া হয়, তাহলেও পরিমানটি বেশ অযৌক্তিকভাবে বেশী। ১৯৯৮ সালের মোট লেনদেনের ৩৯.৬ শতাংশ ঘটনাস্থলের লেনদেনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যা ১৯৮৯ সালের এপ্রিল থেকে ৯ বছর ধরে বছরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে বেড়েছিল, এবং যা বিশ্ব-বাণিজ্যের গড় প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৮ ভাগের খুব কাছাকাছি। লেনদেনের উদ্বৃত্ত

---

[৪৩] BIS, *Annual Report*, June 1999, p 100.

[৪৪] "The Risk Business", *The Economist*, 17 October, 1998, p. 22.

[৪৫] Greenspan এটা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন: 'LTCM-এর পতনের কারনে যদি বাজারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে প্রতিষ্টানটির সহিত সরাসরি জড়িত নয় এমন অনেকেসহ বাজার ব্যবস্থার সহিত জড়িত অনেকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতো, এবং আমাদের নিজেদেরটাসহ বহু জাতির অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা ছিল' (Federal Reserve Bulletin, October 1998, p. 1046)।

[৪৬] এপ্রিল ১৯৯৮ এর বৈদেশিক মুদ্রার জরীপের ফলাফলের জন্যে BIS press release, 19 October, 1998, Table 1, দেখুন। BIS প্রতি ৩ বছর পরপর এরূপ জরীপ করে থাকে।

[৪৭] ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে বিশ্ব বাণিজ্য (আমদানী+রপ্তানী) এপ্রিল ১৯৮৯-এর ৪৯৯ বিলিয়ন মার্কিণ ডলার থেকে বেড়ে ৯০৮.৭ বিলিয়ন মার্কিণ ডলারে উঠেছিল (IMF, *International Financial Statistics*, CD-ROM and November 1998)। এপ্রিল ১৯৯৮-এ গড় দৈনিক বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমান ছিল ৩০.৩ বিলিয়ন মার্কিণ ডলার।

www.pathagar.com

(৬০. ৪ শতাংশ) মূলত: বৈদেশিক মুদ্রার সরাসরি স্থানান্তর ও বিনিময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যা একই সময়ে বছরে গড়ে ১৫.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুঁজির মুল ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয় মর্মে ব্যাংকারগণ যে সাধারণভাবে যে বিবৃতি প্রদান করে থাকে, তা যদি সত্য হতো তাহলে আরো অর্থ আয় করার ঝুঁকিপূর্ণ লাভজনক ব্যবসায় এত বেশী পরিমান ঋণ সম্প্রসারনের ঘটনা হয়ত ঘটতো না।

বিগত দু'দশকে ফটকা ব্যবসার লেনদেনের নাটকীয় প্রবৃদ্ধির কারনে, যার ফলাফলই হচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার বিরাট সম্প্রসারন ঘটেছে। এত বিরাট পরিমান অংকের লেনদেন ইঙ্গিত করে যে, যদি সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহলে তা গোটা অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, যার পৌণ: পৌনিক ঘাত-প্রতিঘাত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের উপর আছড়ে পড়বে। সেমতে, আন্তর্জাতিক সেটলমেন্ট ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মি: ক্রকিট-কে স্বীকার করতে হয়েছে যে, "এভাবে অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার সম্ভাব্য ব্যর্থতার কারনে আমাদের অর্থনীতিগুলো আরো বেশী বেশী হারে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে"।[৫৮] বিরাট অংকের আরো কতিপয় বিরুপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। অব্যাহতভাবে বিরাজমান সুদের উচ্চ হারের জন্যে এটা অন্যতম কারন, যা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্থ করছে। দীর্ঘ-মেয়াদী মৌলিক বিনিয়োগের পরিবর্তে স্বল্প-মেয়াদী ফটকা ব্যবসায় বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে ভীষনভাবে অস্থির করে তোলে। এসব বিষয়গুলো বাজারের অবাধ কার্যক্রম ব্যাহত করে, বাজারগুলোকে অতিরিক্ত অস্থির করে তোলে, এবং বিনিময় হার, বিশেষ করে পুজিঁ স্থানান্তরের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপের কারন ঘটায়। সুদের হার সামান্য পরিবর্তন করে কিংবা দৈনিক কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের হস্থক্ষেপের মাধ্যমে এরুপ অস্থিরতা দুর করার প্রয়াস সার্বিকভাবে অকার্যকর প্রমানিত হয়েছে। অস্থিতিশীলতা হ্রাস করার উপায় হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর টোবিন কর (জেমস টোবিন প্রস্তাবিত কর) প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, এ প্রস্তাবের সমালোচকগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এরুপ করারোপ অবাস্তব হবে। যদি না প্রত্যেকটি দেশ এটি গ্রহণ করে ও বিশ্বস্ততার সহিত তা বাস্তবায়ন করে, তাহলে ব্যবসা করমুক্ত অঞ্চলে সরে যাবে। তাছাড়া, এমনকি যদি সব দেশ এটা মেনেও চলে তাহলেও অভিজ্ঞ ফটকা ব্যবসায়ীগন এরুপ কর ফাঁকি দেওয়ার পথ খুজেঁ নেবে, কারন সব দেশেই কার্যকর কর-প্রশাসন নেই।[৫৯]

---

[৫৮] Andrew Crockett, ১ জুন, ১৯৯৪, সেন্ট গ্যালেন-এ 24th International Management Symposium-এ প্রদত্ত বক্তৃতায়, *BIS Review*, ২২ জুন, ১৯৯৪, পৃ: ৩
[৫৯] Haq, Kaul and Grunberg (eds), 1996-এ Tobin Tax -*এর পক্ষে- বিপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিসমুহ দেখুন।*

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত নগদ অর্থের ঘাটতি মোকাবেলার জন্যে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা যদি অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ ও সম-মূলধনের ভিত্তিতে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ দু'য়ের মধ্যে সম-মূলধনের ভিত্তিতে অর্থায়নের ব্যবস্থা করাই ভালো, কারন এর ফলে প্রকল্পগুলো আরো গভীর যাছাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সুবাতাস প্রবাহিত করা যেতে পারে। এর আরো অনেক সুবিধা রয়েছে। আই এম এফ সম-মুলধন ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে যে, "ঋণ-প্রবাহ বৃদ্ধি না করে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে উন্নয়ন কাজে অর্থায়নের বেশী নিরাপদ ও স্থিতিশীল উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারন এটা কারখানা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোর মালিকানা সৃষ্টির সহিত সম্পর্কিত এবং এর মাধ্যমে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ক্ষমতা তৈরীর লক্ষ্যে মুলধন সরবরাহ করা হয়, অথচ স্বল্প-মেয়াদী বৈদেশিক ঋণ ভোগ-বিলাসে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, কোন সংকট উপস্থিত হলে, বিনিয়োগকারীগণ দেশীয় সিকিউরিটিসমূহ থেকে নিজেদের পুঁজি তুলে নিতে পারে এবং ব্যাংকগুলো ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু ভৌত মুলধনের (Physical Capital) মালিকগণ সহজে ক্রেতা যোগাড় করতে পারে না"।[৫০] অধিকন্তু, হিকস যেমন বলেছেন, সুসময়-দু:সময় নির্বিশেষে সুদ পরিশোধযোগ্য, কিন্তু, দু:সময়ে লভ্যাংশ কম দেওয়া যেতে পারে, এবং খুব খারাপ অবস্থায় লভ্যাংশ না দিলেও চলে। সুতরাং, শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হলে দায় কম থাকে। সন্দেহ নেই যে, সুসময়ে বেশী লভ্যাংশ আশা করা হয়, কিন্তু, এটাই উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রদানের দায় বহন করার আসল সময়। তার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি সুসময়ে, বেশী লাভ প্রদানের মাধ্যমে, যখন বেশী লাভ প্রদান করা সহজ, দু:সময়ের কঠিন চাপ থেকে নিজকে কিছুটা রক্ষা করছে। এ অর্থে প্রতিষ্ঠানটির ঝুকিপুর্ণ অবস্থা দুর হয়ে যেতে পারে"।[৫১] এ বিষয়টির ব্যবসা পতনের ঝুকিঁ প্রচুর পরিমানে হ্রাস করার ক্ষমতা রয়েছে, এবং তা প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়ানোর বদলে কমিয়ে আনবে।

এ কারনে বহু লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সম-মূলধন ভিত্তিক ইসলামি অর্থনীতিতে চলে গেলে তা অর্থ বাজারে অস্থিরতা বহুলাংশে হ্রাস করতে সাহায্য করবে।[৫২] তারা আরো দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় আমানতের অর্থ ফেরত

---

[৫০] IMF, *World Economic Outlook*, May, 1995, পৃ: ৮২।
[৫১] Hicks, 1982, p. 14.
[৫২] দেখুন, Chapra, 1985, পৃ: ১১৭-২২, Chisti, 1985; Mohsin Khan, 1987; Mirakhor and Zaidi, 1987; S. Siddiqi and Fardmanesh, 1994; Aynul Hasan

www.pathagar.com

প্রদান মোটামুটি নিশ্চিত হলেও সকল ঋণ ও অগ্রিম আদায় হবার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। ফলে, স্থিতি ও দায়ের মধ্যে ফারাক দেখা দেয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর আস্থার অভাব ঘটলে যা শেষতক একটি ব্যাংকিং সংকট তৈরী করে। লাভ-ক্ষতি অংশীদারিত্বের ব্যবস্থায় স্থিতির দিকের লোকসান তাৎক্ষণিকভাবেই দায়ের দিকে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এভাবে ব্যাংক-পতনের ঝুঁকি কমিয়ে আনা হয় এবং ব্যাংকের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। আরো যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, যেহেতু সাধারণভাবে সম্মত ঋণের অস্থিতিশীলতাসহ সুদের হারের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারনে বিনিয়োগের পরিবেশে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, সেহেতু, সম-মূলধনের প্রতি আরো বেশী ঝুঁকে গেলে তা অর্থনীতিতে আরো স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে সহায়ক হতে পারে।

আরো একটা যুক্তি হচ্ছে যে, সুদের হারের অস্থিরতা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা আনয়নের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ হরে দেয়। সুদের হারের অস্থিরতার কারনে এর থেকে সুবিধা আদায় করার জন্যে দেশ থেকে দেশান্তরে পুঁজির স্থানান্তর ঘটে থাকে। এর ফলে আরো খারাপ হয়ে যায় অনিশ্চয়তার পরিবেশ, যার মধ্যেই অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে, এটি পুঁজি গঠণকে নিরুৎসাহিত করে এবং সম্পদের বরাদ্দকে ভুল পথে চালিত করে।[৫৩] সম-মুলধন ভিত্তিক অর্থনীতি অস্থির সুদের হারের কারনে সৃষ্ট দৈনিক অস্থিতিশীলতা দুর করতে পারে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে কোন মুদ্রার সামর্থ ও দুর্বলতা অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির অবস্থান জানায়। বিনিময় হার আরো বেশী স্থিতিশীল হতে পারে, কারন কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা ও প্রবৃদ্ধির হারের পার্থক্যের কারনের মত যে সকল মৌলিক কারন বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে থাকে সেগুলো মাঝারি কিংবা দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকৃতির এবং এগুলো সাধারনত: খামখেয়ালীভাবে পরিবর্তিত হয় না।

ব্যাস্টিক অর্থনীতি

যেহেতু প্রচলিত অর্থনীতির একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্যসমুহ ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে স্পষ্ট কোন সংযোগের অনুপস্থিতি, সেহেতু আশা করা যেতে পারে যে, সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা করে ইসলামি অর্থনীতি এরুপ ত্রুটি দুর করার চেষ্টা করবে। অবশ্য, একাজ এখনও অসম্পুর্ণ রয়েছে। ইসলামি ব্যাষ্টিক অর্থনীতি এখনও শুরুতে রয়ে গেছে। এখন

---

and A Naeem Siddiqi, 1994; Toutounchian, 1995; M Akram Khan, in Ariff, 1987; এবং আরো অনেক।

[৫৩] BIS, *Annual Report*, 1982, p. 3.

www.pathagar.com

পর্যন্ত যা করা হয়েছে তা হচ্ছে, স্বীয় স্বার্থ, সামাজিক স্বর্থ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত অভিরুচী ও পছন্দ-অপছন্দ, বাজার ব্যবস্থা, প্রতিযোগিতা, মুনাফা ও উপযোগ বাড়ানো, এবং যুক্তিবাদিতাসহ অনেকগুলো গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা।[৫৪] যেহেতু এ সকল ধারনাসমুহের তাৎপর্য ভাষাগত দিক থেকে প্রচলিত অর্থনীতির মতই, সেহেতু, মনে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু একটা প্রচেষ্টা হয়েছে এটা দেখানোর জন্যে যে, ইসলামি বিশ্ব-বীক্ষার দার্শনিক ভিত্তি কীভাবে এ সকল ধারনাসমুহের উপর আলাদা অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করেছে।

তাত্ত্বিক ভিত্তি

প্রচলিত অর্থশাস্ত্র স্বীয় স্বার্থ হাসিল ও ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক ও ব্যবহারের বিষয়ে পরিপুর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ধরে নেওয়া হয় যে, বাজারের নিয়ামক শক্তির মাধ্যমেই সামাজিক স্বার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে যদি পরিপুর্ণ প্রতিযোগিতার বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে ব্যক্তি-স্বার্থ অন্বেষণ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র প্রতিষ্ঠান বা আচরণ বিধি ও সরকার কর্তৃক উৎসাহ প্রদান ও প্রতিরোধক আরোপের মাধ্যমে সেগুলোর কার্যকর প্রায়গিক ভুমিকাকে এর সাথে যোগ করে থাকে। ইসলামি অর্থশাস্ত্র এদের উভয়কেই আবশ্যকীয় মনে করলেও মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে এগুলোকে অপর্যাপ্ত মনে করে। অধিকতর উৎপাদনশীলতা অর্জন ও উন্নয়নের জন্যে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলকে ইসলামি অর্থনীতি অনুমোদন করে, কিন্তু, এর মডেলে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করার মাধ্যমে স্বীয়-স্বার্থ হাসিলের প্রয়াসের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করে ও প্রয়াস ঢেলে সাজায়। নৈতিক মুল্যবোধ ব্যক্তি-স্বার্থকে স্বল্প-স্থায়ী পার্থিব পরিসর থেকে চিরস্থায়ী পরলোকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে একটা দীর্ঘ-মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে থাকে। স্বার্থপরতা ও শুধুমাত্র নিজের অবস্থার উন্নতিতে মনযোগ প্রদান করার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করা গেলেও পরিবার ও সমাজের প্রতি নৈতিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে পরকালের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থ আরো ভালোভাবে হাসিল করা যেতে পারে, এমনকি যদি এর জন্যে এ পৃথিবীতে কোন বস্তুগত ব্যক্তি-স্বার্থ জলাঞ্জলিও দিতে হয়।

নৈতিক মুল্যবোধের একটা মুল লক্ষ্য হচ্ছে স্বীয়-স্বার্থের লাগাম টেনে ধরা, এবং স্বীয়-স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে একটা ভারসাম্য তৈরী করা। নৈতিক

---

[৫৪] *দৃষ্টান্তস্বরুপ দেখুন,* Mannan, 1986; MN Sddiqi, 1968 qnd 1981; Kahf, 1978; Chapra, 1992; *এবং বিশেষ করে বিভিন্ন পন্ডিতগণের ২২টি লেখা যা* Tahir, Ghazali and Agil এর Readings in Microeconomics, ১৯৯২- এ প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুল্যবোধের প্রেরণা ব্যতীত বিধি-বিধান ও নিয়ন্ত্রনের উপর নির্ভরতা অনেক বেশী প্রয়োজন হতে পারে এবং মানবিক লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে সরকারকে বেশী বেশী ভূমিকা পালনের দরকার হতে পারে। নৈতিক মুল্যবোধের যেরুপ প্রেরণা-শক্তি রয়েছে আচরণের ইহজাগতিক বিধানাবলীর সেরুপ প্রেরণা-শক্তি নাও থাকতে পারে। তাছাড়া, ইসলামও পরিবার ও নৈতিকভাবে উজ্জীবিত সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। যদি পরিবারগুলো ভেংগে যায় কিংবা সমাজ দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে নৈতিক মুল্যবোধও কার্যকরতা হারিয়ে ফেলতে পারে। যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, পারিবারিক ও সামাজিক সংহতির পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতামুলক বাজার ব্যবস্থা ও নৈতিক মুল্যবোধের দ্বিমুখী নিয়ন্ত্রনের ফলে চুক্তি ও অন্যান্য মানবিক কর্তব্য প্রতিপালন নিশ্চিত করা হয় এবং, এর মাধ্যমে শুধুমাত্র লেনদেনের খরচই কমে না, মানুষের কর্মকান্ডে আরো বেশী নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিগত ও সামাজিক খরচে ও তুলনামুলকভাবে কম সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে।

নৈতিক মুল্যবোধ ভোক্তাদের অভিরুচি ও পছন্দ-অপছন্দেও এমনভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হতে পারে যে, তা ভোক্তাদের ব্যয়কে প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্য ক্রয়ের মধ্যে সীমিত রাখে, এবং তার মাধ্যমে অপচয় ও অমিতব্যয়িতা হ্রাস করে।[৫৫] এরুপ আচরন তৎসহ জাকাত ও অন্যান্য পরার্থপরতার ব্যয় শুধুমাত্র অভাবপূরণে অবদান রাখে না, বরং সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।[৫৬] যেহেতু, উৎপাদন ভোক্তা-চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল থাকে, সেহেতু, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমুহের মর্যাদার প্রতীক ও ভোগ-বিলাসের পণ্য উৎপাদন থেকে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। উৎপাদনকারীদের উপর নৈতিক মুল্যবোধের প্রভাবের কারনে তারা এ জাতীয় পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যে ক্রমাগতভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করতেও নিরুৎসাহিত হবে। মেতওয়ালি যেমন বলেছেন, ইসলামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্যগুলো "অনৈসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্যসমুহ থেকে কেবল আলাদাই হবে না, বরং সেগুলোর অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল ও বাজার ব্যবস্থার কৌশলও ভিন্ন হবে"।[৫৭] যদি অর্থ-লগ্নির ব্যবস্থাও এরুপ আচরণের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ হয়, তাহলে বিলাস-সামগ্রি উৎপাদনের জন্যে ঋণ-প্রবাহ কমে যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দরকারী পণ্য উৎপাদনের জন্যে ঋণের প্রবাহ বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে ভোগ ও উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সুস্থতার আরো একটি মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

---

[৫৫] M Anas Zarqa, 1980; Kahf, 1978, pp. 23-5

[৫৬] Kahf, in Tahir et al, 1992, p. 101.

[৫৭] Metwally, 1992, পৃ: ১৩৬; আরো দেখুন, পৃ: ১৯২।

www.pathagar.com

নৈতিক মুল্যবোধের বাধ্যবাধকতার অধীন ভোক্তা ও উৎপাদকগণ চাইলে তাদের অভিরুচি ও পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে চলতে পারে, এবং তাদের উপযোগ ও আয় বাড়াতে পারে।[৫৮] তবে, কোন এক ভোক্তা বা উদ্যোক্তা তাদের উপযোগ বা আয় বাড়ানোর বা না বাড়ানোর বিকল্প সুযোগ যেমন থাকে, একটি অংশীদারী বা কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সে সুযোগ নাও থাকতে পারে। বিভিন্ন অংশীদার বা শেয়ার-হোল্ডারের বিভিন্নমুখী পছন্দ-অপছন্দ, তৎসহ প্রতিযোগিতা ও দখলের আশংকাজনিত (takeover) চাপের কারনে এ সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফা বাড়ানো ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্য নিয়ে এগুনোর স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়। সুতরাং, ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা করবে না-এরূপ অনুমান করা অবাস্তব। তবে, ইসলাম মুনাফা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করে না, যদি নৈতিক মুল্যবোধের আওতাধীন থেকে তা করা হয়।[৫৯]

এ বিষয়টি ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারনাটিকে সামনে নিয়ে আসে। যদিও ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারনার পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দেয়, ইসলাম একই সাথে এটাকে ব্যক্তি বা গোত্রের নিকট আল্লাহ্'র আমানত (trust) হিসেবে ঘোষণা করেছে, এবং বিধান করা হয়েছে যে, তা যেন আমানতের জন্যে নির্দিষ্টকৃত শর্তাবলী অনুসারে ব্যবহার করা হয় – সকল ব্যক্তি, সম্পত্তির মালিক ও সমাজের কল্যানের প্রয়োজন মেটানোর শর্ত। আমানতের শর্তাবলী নৈতিক মুল্যবোধের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে এক প্রকার ভারসাম্য তৈরীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও ব্যবহারের মধ্যে একটা সামাজিক মাত্রা যুক্ত করে থাকে। সমাজের মানবিক লক্ষ্যসমুহ কার্যকরভাবে অর্জন করতে হলে অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই নৈতিক মুল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেই হবে।

বাজার প্রক্রিয়া ইসলামও গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর বিধান মতে বাজারে ক্রিয়াশীল পক্ষগণ, ভোক্তা সাধারণ ও উৎপাদনের উপাদানের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত

---

[৫৮] M Anas Zarqa - এর মতে, 'একজন মুসলিম আয়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকেও সে সর্বোচ্চ উপযোগ অর্জনের চেষ্টা করে থাকে' (Tahir et al, 1992, পৃ: ১০৭)। Monzer Kahf (১৯৭৮) - এর মতে, 'কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যে সর্বোচ্চ লাভ অর্জন করার উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের নির্ধারিত বিধি- বিধান লংঘন করা সমীচীন নয়' (পৃ: ৩৩)। আরো দেখুন, MN Siddiqi, Zubair Hasan, al-Junaid, in Tahir, 1992, pp. 140, 244, 256.

[৫৯] ইবনে খালদুন বলেন, 'ব্যবসার মধ্যে কম দামে পণ্য ক্রয় করে বেশী দামে বিক্রয় করার মাধ্যমে আয় অর্জন ও পুঁজির বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস থাকে' (ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ: ৩৯৪)। আরো দেখুন, আল-মিস্রি, ১৯৯৭, পৃ: ৮১।

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে বাজারে প্রতিযোগী সকল পক্ষগণকে স্বীয়-স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়ে নৈতিক মুল্যবোধ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে কার্যক্রম চালাতে হয়।[৬০] বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা যে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে তাকে কোনভাবেই খাট না করেই বহু লেখক এ লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভুমিকার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৬১] পারস্পরিক কল্যাণ ও সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৈতিকতার নিয়ন্ত্রনাধীন বাজার ব্যবস্থার ভুমিকাসহ পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে আরো যুক্ত হয় পরিবার ও সমাজের ভুমিকা, যেন সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণের সম্পুর্ণ দায়িত্বভার বাজার ব্যবস্থা বা সরকারের উপর না বর্তায়।

সুতরাং, যুক্তিবাদিতা কেবল মাত্র জ্ঞান ও গণনা সংক্রান্ত চিন্তা-প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার আওতাধীনই শুধু নয়, তা নৈতিকভাবে অনুমোদিত পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যেরও আওতাধীন।[৬২] সম্পদের ব্যবহারে বিবেক-বিবেচনাপুর্ণ ও মিতব্যয়ী হওয়া এবং অন্যের কল্যানের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা যুক্তিপুর্ণ আচরণ, কারন এর মাধ্যমে পরলোকের জন্যে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিল করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, সম্পদের উৎপাদনশীল বন্টন ও সম-বন্টন বাস্তবায়নের জন্যে শুধু বাজার ব্যবস্থার উপর সম্পুর্ণভাবে নির্ভর করে না। নৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোও একটা পরিপুরক ভুমিকা পালন করে থাকে।

এ প্রক্রিয়াকে আরো সাহায্য করতে পারে সম্পদের বিবেক-বিবেচনাপুর্ণ ব্যবহার, কাজ-কর্মে নৈতিকতা, সততা, নৈতিকতার উঁচু মান, এবং শঠতা, প্রতারণা ও শোষনের অবসান।[৬৩] অনেক লেখকই উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল পক্ষ, যেমন: উদ্যোক্তা, অর্থের যোগানদাতা, শ্রমিক এবং সরকারের সামাজিক ও নৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর ইসলামি মুল্যবোধ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রভাবের বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনা হচ্ছে কল্পিত এবং এরুপ একটা অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সংস্কার

---

[৬০] Akram Khan and MA Mannan, in Tahir et al., 1992, pp. 184-93.
[৬১] দৃষ্টান্তস্বরুপ দেখুন, Kahf, in Tahir et al., 1992, pp. 146-56.
[৬২] দেখুন, Agil, 1992; MN Siddiqi, 1972; Zarqa, 1992; M Fahim Khan, 1988, pp. 17-18; Kahf, 1978, pp. 15-18; Chapra, 1992, pp. 214-21.
[৬৩] A H Mahboob, 1991; A Q Atiah, 1994.

www.pathagar.com

সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং একটা আদর্শ ইসলামিক সমাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ'র প্রাথমিক পদ্ধতিগুলো বিদ্যমান রয়েছে, এবং এ সকল পদ্ধতির নির্ঝঞ্ঝাট পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৬৩] এটি খুবই অস্বাভাবিক এ কারনে যে, ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের আদর্শ ইসলামি সমাজও বাস্তবে নেই, এবং এরুপ একটা সমাজ বাস্তবে রুপ লাভ করতে অনেক সময় লাগবে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নেই বিধায় অনেকগুলো ইসলামি মুল্যবোধ বেশ ভালোভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রচুর নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে, চেনা পথে চলার অভ্যাস ও 'স্বয়ংক্রিয় জোরদারকরণ' প্রক্রিয়ার কারনে যা স্থায়ী হয়ে গেছে, যদিও কুর'আন বলেছে, "হে মুসলমানগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা অনুসরন কর না। তোমরা যা বল তা না করা আল্লাহ'র নিকট খুবই অপছন্দের একটা কাজ" (আল-কুর'আন, ৬১: ২-৩)। একটি যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থাসহ অনুকুল সামাজিক, অর্থনৈতিক এ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরীতে মুসলিম সমাজের ব্যর্থতার ঐতিহাসিক কারন সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটা প্রচেষ্টা পুর্বের অধ্যায়ে করা হয়েছে। গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এরুপ একটা পরিবেশ এখন কীভাবে তৈরী করা যেতে পারে, যার উত্তর পাওয়া না গেলে ইসলামি অর্থশাস্ত্র নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হবে না।

কোন কোন লেখক অভিযোগ করেছেন যে, মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ বাজার ব্যবস্থার উপর ইসলামি নৈতিকতা-ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহৃত মডেল প্রচলিত অর্থশাস্ত্র থেকে নেয়া হয়েছে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, এরুপ মডেলসমুহ সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গীজনিত অনুমানের কারনে সব সময় যথেষ্ট উপযোগী নয়।[৬৪] তাছাড়া, বর্তমানে একটি পুর্ণাঙ্গ ইসলামি অর্থনীতি কিংবা তার

---

[৬৩] দেখুন, Chapra, 1985, pp. 81-105 and pp. 147-85.

[৬৪] Anwar বলছেন, 'ইসলামী আর্থনীতিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই পাশ্চাত্যের মডেল অনুসরন করে, এর দু'একটি উপাদান একটু রদ-বদল করে, ও রদ-বদলকৃত সংস্করণকে 'ইসলামী' মডেলরুপে আখ্যায়িত করে। এরুপ মডেলগুলোকে 'ইসলামিক' বলা বাস্তবসম্মত নয়' (১৯৯০, পৃ: ৩৭)।খুরশীদ আহমদ পুর্বেই এরুপ মতামত দিয়ে বলেছিলেন যে, এ যাবৎ অধিকাংশ প্রয়াসই ছিল 'অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন বিষয় বিবেচনায় না রেখে সুদের স্থলে লাভ-লোকসান ভাগাভাগির হার প্রতিস্থাপন করা এবং 'জাকাত'-কে কর হিসেবে চালু করা' (১৯৮৬, পৃ: ৮১)। Tag El-Din 'ইসলামের সহিত যত মানানসই হোক না ইহজাগতিক কলা-কৌশলের (tools) ইসলামিক মডেল ব্যবহার কতটা যথার্থ হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন' (ফাহিম খানের লেখার উপর তার মন্তব্য দেখুন, MF Khan, p. 66)। তাদের মন্তব্যগুলোকে দৃঢ়ভাবে যা সমর্থন করে তা হচ্ছে, ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কীয় রচনাবলী সম্পর্কীয় গ্রন্থপুঞ্জীতে মুলত: প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের বইগুলোর বিষয়ে উল্লেখ থাকে, অথচ কদাচিৎ ইসলামী অর্থশাস্ত্রের অতীত বা বর্তমান কালের কোন পন্ডিতের নাম উল্লেখ থাকে।

www.pathagar.com

কাছাকাছি বিবেচনা করা যেতে পারে এমন একটা কিছুর অনুপস্থিতি, এবং পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাবের কারনে এসব মডেলগুলো বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। অতীতে মুসলিম অর্থনীতিগুলো কীভাবে কাজ করতো তার বিষয়ে গবেষণাপত্রও খুব কম পাওয়া যায়।[৬৬] ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে সম্পন্ন মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক মুসলিম সমাজগুলোর উপর বাস্তব গবেষণাও খুব কম।[৬৭] সুদ প্রথার প্রতি মুসলমানদের অভিমতের উপর অনেকগুলো আংশিক জরীপ ও সুনির্দিষ্ট গবেষণা হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সার্বিক জরীপ কিংবা গবেষণা করা হয় নি (নোট ৪১ দেখুন)।

এ কারণে ইসলামি অর্থশাস্ত্রের উপর চলমান আলোচনার আবশ্যকতা থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন নেই। মুসলিম সমাজে ইসলামি আদর্শগুলো যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি পরিপুর্ণ প্রতিযোগিতাও বাস্তবে নেই এবং কোন সমাজেই মানুষ সবসময় শুধুমাত্র নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে না। কল্পিত ধারনা ইসলামি অর্থনীতির একটা তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করে দিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে কোন এক সময় বাস্তবে রুপ লাভ করলে ইসলামি অর্থনীতির কীরুপ সামর্থ ও দুর্বলতা দৃশ্যমান হতে পারে সে বিষয়ে ধারনা দিতে পারে।[৬৮]

অসমাপ্ত কাজ

সম্পুর্ণভাবে কল্পিত অনুমানের উপর নির্ভরশীলতা ইসলামি অর্থনীতির বিষয়ে একটা অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। বর্তমান ইসলামি বিশ্বে ইসলামের রুপকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না কেন এবং কেন ইতিহাসের কোন এক সময় মুসলমানগণ আদর্শ আচরণ করেছে, কিন্তু অন্য এক সময় অত্যন্ত স্থুলভাবে ইসলামি বিধানাবলী লংঘন করেছে- এসব গুরুতর প্রশ্নের কোন জবাব নেই। আদর্শ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান ফারাক দেখাচ্ছে যে, অর্থশাস্ত্রের মধ্যে নৈতিকতার প্রবেশ ঘটানো দরকার, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এরুপ ফারাকের কারনও আলোচনা করা আবশ্যক। এটা সম্ভব নাও হতে পারে যদি ইবনে খালদুনের মডেল অনুসরন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক চলক অর্ন্তভুক্ত না করা হয়। ফারাকের

---

[৬৬] ঐতিহাসিক গবেষণামুলক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে: Goitein, 1966 and 1967; Udovitch, 1970 and 1981; Cook, 1970; Hasanuzzaman, 1981.

[৬৭] যুক্তরাজ্যে মুসলিম অভিবাসিদের ভোক্তা- আচরণের উপর El-Ashker- এর গবেষণা (১৯৮৭) হচ্ছে ভোক্তা- আচরণের উপর বাস্তব দৃষ্টি প্রদানকারী এরুপ একটি প্রয়াস।

[৬৮] Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, p. 19.

www.pathagar.com

কারন একবার জানা গেলে পরে এটাও জানা সম্ভব হতে পারে কীভাবে সকলকে না হলেও অধিকাংশ লোকজনকে নৈতিক মুল্যবোধের আলোকে কাজ করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে, এবং, এভাবে কখনও কোথাও সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ দৃশ্যত: সাংঘর্ষিক হলেও সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে নৈতিক মুল্যবোধসমুহকে সম্ভাব্য স্থানে আইনগত বিধানেও রুপান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে, এবং সেগুলো প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থাসহ অনুকুল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। এটি করা না গেলে সেই আদর্শ সমাজ গঠণ করা সম্ভব নাও হতে পারে, যার প্রতিষ্ঠা ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য এবং ইসলামি অর্থনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে যার অস্থিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান কালের মুসলিম বিশ্বের নৈতিক অবক্ষয়, এবং ন্যায়বিচার ও সার্বিক কল্যানের অনুপস্থিতি মুলত: ধর্মীয় বিষয়ে হেদায়েতের অভাবজনিত কারনে নয়। ধর্মীয় বিষয়ে উপদেশের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। সম্ভবত: অনুকুল পরিবেশের, বিশেষ করে অনুকুল পরিবেশ তৈরীর উপাদান ও তা সৃষ্টির কৌশলের অভাব রয়েছে।

আর্থিক দায়-দেনার বিলম্বিত পরিশোধ হচ্ছে কথা ও কাজের মধ্যে ফারাকের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুদ-প্রথার আওতায় একজন ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুদ প্রদানের মাধ্যমে জরিমানা প্রদান করে থাকে এবং তা সম্ভবত: কিছুটা উঁচু হারেই। ইসলামি ব্যবস্থায় যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করার বিষয়ে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব সর্বজন স্বীকৃত। এরুপ নৈতিক-দায়িত্ব বিবেকবান মানুষকে যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করতে অনুপ্রানিত করবে। তবে, এরুপ-নৈতিক দায়িত্ব ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্বেও দুষ্ট লোকদের খেলাপী হওয়া বন্ধ করতে পারবে না, যদি সে আদর্শ ইসলামি সমাজে তার অনিবার্যভাবে এক-ঘরা হয়ে যাওয়াটা ঠেকাতে সক্ষম হয়, কিংবা প্রচলিত ব্যবস্থার কোন প্রতিরোধক সাজা ভোগ করা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। যদি একজন ব্যক্তি সহজে পার পেয়ে যায়, তাহলে অন্যরাও একই পথে হাটতেঁ চাইবে। এভাবে খেলাপী হওয়াটা বহুলভাবে প্রচলিত হবে। পরকালের দন্ড তার জন্যেই কার্যকর যিনি সে বিষয়ে সচেতন। যে প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক তা হচ্ছে, বৃত্তটি কীভাবে আরো বড় করা সম্ভব যাতে তার ভেতর সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিকে ধারন করা যায়।

অবশ্য বিদ্যমান শুন্যতা নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। বহু পন্ডিত এর অস্তিত্ব অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৬৬] তবে, নিজের সম্পদ, আয়-রোজগার ও

[৬৬] Munawar Iqbal, 1992, p. 212.

www.pathagar.com

ভোগ-বিলাস বৃদ্ধি করার মাধ্যমে পার্থিব অর্থে মূলত: স্বীয় স্বার্থ হাসিলে আগ্রহী মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক মানুষের ধারনার উপর ভিত্তি করে একটি পৃথক ব্যাষ্টিক অর্থশাস্ত্র গড়ে তোলা একটি কঠিন কাজ। মানুষের আচরণ সম্পর্কে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের সরল কিন্তু অবাস্তব কতিপয় অনুমানের কারনে অর্থনৈতিক মডেলগুলোকে ম্যানেজ করা সহজ করেছে। প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও অনৈতিক আচরণ সমার্থক নয়। এটি শঠতা, প্রতারনা ও শোষণকে উপেক্ষা করে না। প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ব্যক্তির আচরণকে পুর্বনির্ধারিত মর্মে ধরে নেয় এবং এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে বা এ বিষয়টি পরিবর্তন করতে চায় না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আদর্শেআচার-আচরণ অন্তর্ভুক্ত করা হলে তখন ব্যাখা-বিশ্লেষণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে বিদ্যমান ফারাকের কারন আলোচনা না করে এবং প্রচলিত আচার-আচরণে একটা পরিবর্তন সূচিত করণের লক্ষ্যে বাস্তব কৌশল প্রণয়ন না করে আমাদের পক্ষে সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন শাস্ত্রের বহু সৃজনশীল পন্ডিতগণের ক্রম-পুঞ্জিভূত অবদানের মাধ্যমে কালের পরিসরে ধীরে ধীরে এরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইমারত গড়ে উঠবে, প্রত্যেকে হয়ত: স্থাপন করবেন ইমারতের এক বা একাধিক ইট। এটিই হবে ইসলামি বিশ্ব-বীক্ষার আলোকে ব্যাষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বিকাশ, অবশেষে যা ইসলামি অর্থনীতির পৃথক একটি সত্ত্বা রচনা করবে। এ কারনে, ইয়ালচিন্তাস হয়ত: যথার্থই বলেন যে, "ইসলামের বাধ্যবাধকতার আলোকে ব্যাষ্টিক অর্থনীতির তত্ত্ব সৃজন করাই হয়ত ইসলামি অর্থনীতির জন্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে"।[৭০]

তৃতীয় ভাগ: সরকারী অর্থায়ন

অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্র যে সকল সেবা দিয়ে থাকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র কেবল মাত্র সে সকল সেবা দিলেই হবে না, বরং, রাষ্ট্রের ইসলামি চরিত্রের কারনে তাকে মুসলিম সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। অতএব, যদিও এমন পন্ডিতবর্গ রয়েছেন যারা ইসলামি রাষ্ট্রের সীমিত ভূমিকার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শণ করেন,[৭১] তবুও সাধারণ মতামত হচ্ছে যে, এরূপ সীমিত ভূমিকা ইসলামের রূপকল্পের সাথে মানানসই হয় না।[৭২] ব্যক্তি-স্বাধীনতাসহ সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং অতিরিক্ত করারোপ ও

---

[৭০] Yalcintas, 1986, p. 38.

[৭১] Kahf, 1983, pp. 136-44.

[৭২] Siddiqi, 1996, pp. 43-96; Chapra, 1979 and 1992, pp. 286-304; Mahfooz Ahmed, 1982; Faridi, 1983 । আরো দেখুন, Goitein, 1966, pp. 197-213; Lewis, 1995, pp. 133-56.

www.pathagar.com

অতিরিক্ত অর্থায়ন এড়িয়ে চলার আকাংখ্যাই দু'টি মতবাদের মধ্যে বাস্তবানুগ ভারসাম্য খুজেঁ পেতে সাহায্য করে।

স্বাভাবিকভাবেই এটি আমাদেরকে রাজস্ব নীতিসহ করারোপের কৌশল, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, অর্থ যোগান ও সরকারী ঋণের গুরুত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় নিয়ে আসে।[৭৩] তবে, এ পর্যন্ত যে সকল আলোচনা হয়েছে তা এ সকল বিষয়ের উপর আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২/৭৯৮), আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮), আল-জুয়েনি (মৃত্যু ৪৭৮/১০৮৫), ইবনে তায়মিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮), ও ইবনে খালদুনের (মৃত্যু ৮০৮/১৪০৬) মত চিরায়ত পন্ডিতগণের লেখার বাইরে খুব বেশী অগ্রসর হয়েছে মর্মে মনে হচ্ছে না।

করারোপ

যাকাত

ইসলামে সরকারী অর্থায়নের উপর সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হচ্ছে জাকাত, যা সরল অর্থে প্রকৃত পক্ষে কোন কর নয়। এটা হচ্ছে নামাজ, রোজা ও হজ্বের মত। প্রত্যেকের নীট আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করার জন্যে মুসলমানদের একটা ধর্মীয় দায়িত্ব। এ খাতে অর্জিত আয় রাষ্ট্রের ইচ্ছামত খরচ করার কোন এখতিয়ার রাষ্ট্রের নেই। মুসলিম সমাজ থেকে দুর্দশা ও দারিদ্র্য দুর করার লক্ষ্যে অসহায় গরীব-দু:খীদেরকে সাহায্য করার জন্যে পুর্ণ ধর্মীয় সমর্থনের আওতায় এটি আসলে একটা সামাজিক আত্ম-সহায়তামুলক পদক্ষেপ। আধুনিক যুগে কর্মচারীদের বেতন থেকে কেটে নিয়ে ও নিয়োগকর্তার তরফ থেকে অনুদানের মাধ্যমে বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য থেকে সামাজিক নিরাপত্তা প্ররক্ষার জন্যে নিজস্ব অর্থায়নের যে ব্যবস্থা রয়েছে, জাকাত তার কোন বিকল্প নয়। এরূপ সকল ব্যবস্থাকেই চালিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া, জাকাত অবশ্যই সরকারের ত্রান ও কল্যাণ খাতের বাজেট বরাদ্দকে কমিয়ে দেয় না কিংবা আয় পুণ:বন্টন, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থাণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়ণের দায় থেকে ইসলামি রাষ্ট্রকে অব্যাহতি প্রদান করে না। জাকাত খাতের আয় অপর্যাপ্ত হলে সমাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অন্যান্য উপায় খুজেঁ বের করা।[৭৪]

---

[৭৩] Faridi, 1980 and 1983; Metwally, 1983, pp. 59-60; Chapra, 1992; Siddiqi, 1996; Salama, 1983, p. 117; Kahf, 1982 and 1983.

[৭৪] Ibn Zanjawiyyah (d. 251/865), 1986, Vol. 2, p. 799:1388; al-Juwayni (d. 478/1085), Gihiyath al-Umam, 1979, pp. 191-2 and 261; Ibn Hazm (d. 456/1064), Vol. 6, p. 156:725.

www.pathagar.com

জাকাত যেন অর্থপুর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে বহু পন্ডিত পরামর্শ দিয়েছেন যে, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট পরিমান আয় রোজগার করতে পারে না তাদের আয়ের একটা স্থায়ী পরিপুরক হিসেবে জাকাতকে স্থান দেওয়া উচিত। অন্যদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা উচিত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সুদমুক্ত ঋণ বা অনুদানরূপে মৌলিক পুঁজি হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রদানের জন্যে, যেন তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।[৭৫] কতিপয় লেখক আরো প্রস্তাব দিয়েছেন যে, জাকাতকে একটি পরিপূরক তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এভাবে যে, প্রাচুর্যের বছর জাকাত মোটেই বিলি করা হবে না যাতে মন্দার সময় বন্টনের লক্ষ্যে তা ব্যবহার করা যায়।[৭৬] তবে, যদিও কোন এক বছরে জাকাত বাবৎ অর্জিত সমুদয় আয় সে বছরেই খরচ করার প্রয়োজন না হয়, তবুও গরীব দেশসমুহে প্রাচুর্যের বছরগুলোতে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করার সুযোগ খুব কম বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। প্রাচুর্যের বছরগুলোতেও জাকাত বাবৎ অর্জিত আয়ের পরিমান রাজস্ব খাতে ব্যবহারের জন্যে উদ্বৃত্ত তৈরীর কথা দুরে থাক দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটানো ও তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার মত এত বেশী পরিমান হবে না।[৭৭]

বহু লেখক দেখিয়েছেন যে, অলস সম্পদের উপর জাকাত আরোপ করার ফলে জাকাত প্রদানকারীগণ জাকাত বাবৎ প্রদেয় অর্থ পুরোটা না হলেও অন্তত: আংশিকভাবে পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হতে পারে। এর ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মওজুত করার প্রবণতা ও অলস অর্থের মওজুত কমে যাবে, বিনিয়োগ বাড়বে, এবং তা প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এর ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জাকাত আরোপের ফলে জাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্যে অপচয়মুলক ব্যয় উৎসাহিত হয় কি না কিংবা পাওনা গ্রহণ করতে আগ্রহ কমে যায় কি না? আদর্শগতভাবে যে সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে সহজ সরল জীবন যাপন করা, যেখানে আতিশয্য ও লোক-দেখানো ব্যয় নিন্দিত হয়, এবং যেখানে নিজের শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীলতা একটি ধর্মীয় কর্তব্য, সেখানে এরূপ ঘটা উচিৎ নয়। তথাপিও ইসলামি রাষ্ট্রকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ইসলামি মুল্যবোধ মেনে চলা নিশ্চিতকরণ ও ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের লক্ষ্যে জাকাত যেন একটি

---

[৭৫] বিস্তারিতের জন্যে দেখুন, Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakat, 1969, Vol. 2, pp. 564 and 571; আরো দেখুন, Chapra, 1992, pp. 274-5।
[৭৬] Faridi, 1983, p. 17.
[৭৭] Ahmed, Iqbal and Khan, (eds), ১৯৮৩, পৃ: ১৭, তাদের বইয়ের সূচনায়।

www.pathagar.com

কার্যকর পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে ঢেলে সাজানোর জন্যে ইসলামি রাষ্ট্রকে তার ভূমিকা পালন করতে হতে পারে।

অন্যান্য কর

যেহেতু জাকাত ব্যবহৃত হয় মুলত: একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা কাঠামো হিসেবে, সেহেতু, সকল বরাদ্দ, বন্টন ও স্থিতিশীলতা রক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্যে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পদ প্রয়োজন হয়।[৭৮] বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ চিরায়ত আইনশাস্ত্রবিদ রাষ্ট্রকে করারোপ করার জন্যে অবাধ ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক ছিল।[৭৯] এটি বোধগম্য, কারন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন আলোচিত হয়েছে, এ সকল আইনশাস্ত্রবিদগণকে কতিপয় অবৈধ সরকার মোকাবেলা করতে হয়েছিল, যাদের কোন জবাবদিহিতা ছিল না এবং যারা অন্যায়ভাবে করারোপ করে দেদারছে অর্থ খরছ করতো।[৮০] এর ফলে বিরোধ দেখা দিয়েছিল শাসক এবং ধর্মপ্রাণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলেমাদের মধ্যে, যাঁরা হৃদয়ে ধারন করতেন একটি আদর্শ খিলাফতের স্বপ্ন, যেখানে জনগণের সম্পত্তি ছিল একটি আমানত, যা জনগণের কল্যানের জন্যেই ব্যয় করতে হবে। তবে, সমসাময়িক কালের কতিপয় পন্ডিতও করারোপের বিরোধিতা করে আসছেন।[৮১] তাদের মুল যুক্তি হচ্ছে যে, সরকারগুলো হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্থ এবং দুর্নীতি না কমালে তাদেরকে করারোপ করতে দেয়া উচিৎ নয়। এরুপ মতামত বর্তমান বিশ্বে অযৌক্তিক। কারন সরকারী কাজকর্ম ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনলেও সরকারগুলো কর-বহির্ভুত খাত থেকে কীভাবে রাজস্ব আয় করে ব্যয় নির্বাহ করবে সে বিষয়ে পন্ডিতগণ গ্রহণযোগ্য এমন কোন উপায় দেখাতে পারবেন না। দুর্নীতি কমানোর উপর তাঁরা যে জোর দিয়েছেন তা

---

[৭৮] দেখুন, Faridi, 1983; Salama, 1983, pp. 99-129; Sami Sulayman, 1990, pp. 1013-51; Rifat al-Awadi, 1990, p. 1094; Kharabshah, 1990, pp. 1349-50; Chapra, 1992, pp. 295-8.

[৭৯] দেখুন, al-Abbadi, 1974-7, Vol.2 p. 300; and Salah Sultan, 1988, pp. 453 and 457.

[৮০] দেখুন, al-Juwayni, Ghiyath al-Umam, 1979, pp. 201-210; Goitein, 1966, pp. 197-213; Turabi, 1987, p. 7.

[৮১] করারোপের বিরুদ্ধে মতামতের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারনার জন্যে দেখুন, Kahf, 1983, pp. 145-53। Al-Misri বেতন ও মজুরী, ব্যবসা ও শিল্পের আয় বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি করের আওতায় আনয়নকে সমর্থন করেন না (১৯৯৪, পৃ: ৯১)। পাঠক ইচ্ছা করলে Kahf-এর প্রবন্ধের উপর সেমিনারে অংশগ্রহনকারীগণের আলোচনা দেখতে পারেন (Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, pp. 154-61)। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জাতির স্বার্থে ন্যায় সঙ্গত পরিমানে করারোপে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করার ধারনার বিরুদ্ধে সেমিনারে অংশগ্রহনকারীগণ প্রায় ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

যথার্থই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে, করের অনুপস্থিতি দুর্নীতি কমানোর যথার্থ কৌশল নয়, বরং জবাবদিহির ব্যবস্থা, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম, যথাযথভাবে নির্বাচিত একটি সংসদ, এবং যথাযথ যাছাই ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসহ অপরাধীদেরকে শায়েস্তাকরনের জন্যে একটি কার্যকর আইনগত্ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরীকরনই হচ্ছে দুর্নীতি কমানোর যথার্থ কৌশল।

সৌভাগ্যবশত: ইসলামি আইনের বস্তুত: সকল মতের প্রতিনিধিত্বকারী অনেক পন্ডিত ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এরুপ মতামতের অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের লক্ষ্যে কর আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ সংক্রান্তে ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকার নীতিগতভাবে সমর্থন করেছিলেন।[৮২] আল-কারাদাবি নামক একজন বিখ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আধুনিক আইনশাস্ত্রবিদ যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু কালান্তরে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বেশ বেড়ে গেছে, যদি রাষ্ট্রকে কর আদায় করতে না দেওয়া হয়, তাহলে "রাষ্ট্র কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে"।[৮৩] সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, "করারোপের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করার ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, যদি সম্পদ সংগ্রহ করা হয় ন্যায়ানুগভাবে এবং তা 'সহনীয়' সীমার মধ্যে থাকে"।[৮৪]

একটি আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের কর্মকান্ড যেমন এমন মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা যাবে না যা প্রাচীন ইসলামি রাষ্ট্র সম্পাদন করতো, তেমনি এরুপ মনে করাও অবাস্তব যে, করারোপও সীমিত থাকবে সে সকল বিষয়ের মধ্যে চিরায়ত আইনশাস্ত্রবিদগন যেগুলোর উপর করারোপ করেছিলেন বা করারোপের বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। সেই যুগে অর্থনীতি ছিল মুলত: কৃষিভিত্তিক এবং, *খারাজ* ও *উশর*-এর মত কর ছিল মুলত: কৃষিজাত পণ্যের উপর; অন্যান্য খাতের কর থেকে সামান্য পরিমান আয় হতো। বর্তমানে অর্থনীতির প্রকৃতি পরিবর্তিত

---

[৮২] বিভিন্ন আইনশাস্ত্রবিদগণ করের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন: যেমন: dara'ib, waza'if, kharaz, nawa'ib, and kilaf al-sultaniyyah. Al-Qaradawi এ বিষয়টির উপর হানাফি, মালিকি, শাফি-ই ও হানাবলি আইনশাস্ত্রবিদগণের মতামত জানাচ্ছেন, Abbadi জানাচ্ছেন আল-গাজ্জালি, আবু আল-ওয়ালিদ আল-বাজি, আল-মালিকি ও আল-আনসি (জায়দি) প্রমুখের মতামত। (দেখুন, Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakat, 1969, Vol. 2, pp. 1100-2 and al-Abbadi (1974-7), Vol.2, pp. 288-97)। আরো দেখুন, al-Misri, 1994, pp. 65-7।

[৮৩] Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakat, 1969, Vol. 2, p. 1074। আরো দেখুন, Faridi, 1980, p. 122, ও 1983, pp. 29-30। অধ্যাপক ওযায়ের স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, 'যাকাত ছাড়া অন্যান্য করারোপে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে এখন আর তেমন কোন বিতর্ক নেই' (Farid-এর প্রবন্ধের উপর তাঁর মতামত দেখুন, ১৯৮৩, পৃ: ৪৭)।

[৮৪] Chapra, 1979, p. 22; আরো দেখুন, Mannan, 1986, p. 252.

www.pathagar.com

হয়েছে কিংবা হচ্ছে, এবং একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে বর্তমানে আরো বৈষম্যহীন ও বহুমুখী রাজস্বের উৎস রয়েছে। তথাপিও, কতিপয় লেখকের আলোচনা এখনও ঘানাই'ম, ফেই, জিজিয়া, খারাজ, উষর, ও শুল্ক আবগারী'র মত প্রাচীন আমলের রাজস্ব-উৎসের কাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকছে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্তমান যুগের জন্যে প্রাসঙ্গিক নয় এবং সেগুলোকে নি: সন্দেহে বাতিল করে দিতে হতে পারে।[৮৪]

সুতরাং, এমন একটি কর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা দরকার যা পরিবর্তিত বাস্তবতাগুলোকে বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করবে। কর বাবৎ পর্যাপ্ত আয় ব্যতীত একটি উন্নয়নশীল ও দক্ষ অর্থনীতির বিশাল সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত চাহিদা পুরণ করা, এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে কোন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়, এমনকি যদি এ সকল প্রয়োজনের অনেকগুলো বেসরকারী খাতের মাধ্যমে পুরণ করার চেষ্টাও করা হয়। এরূপ একটি কর ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্যে প্রাচীন আইনশাস্ত্রীয় রচনা থেকে সহায়তা গ্রহণ করার চেষ্টা বৃথা। একটি সম্পুর্ণ ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের কর সংক্রান্ত বিষয় তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। ইসলামের লক্ষ্যসমুহকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করা ও কুর'আন, সুন্নাহ'র কোন বিধান লংঘন না করে, এবং অতিরিক্ত কর ধার্য না করে কিংবা বাজেট ঘাটতি না ঘটিয়ে ইসলামের এ সকল লক্ষ্যসমুহ বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক একটি ন্যায়ানুগ ও কার্যকর কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধাজনক হতে পারে। এরূপ আইনগত কাঠামোর মধ্যে চিরায়ত আইনশাস্ত্রবিদগণের সম্মত করের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিভাজন, এবং অনুমোদনযোগ্য অতিরিক্ত কর, ও খারাবশাহ'র নিপীড়নমুলক কর কার্যকরী হতে পারে।[৮৫] যেহেতু, শুল্ক ব্যতীত বস্তুত: সকল চিরায়ত করসমুহ ছিল প্রত্যক্ষ কর, সেহেতু ন্যায়বিচারের উপর ইসলামের গুরুত্বের আলোকে প্রত্যক্ষ করকেই পন্ডিতগণ অনুমোদনযোগ্য বিবেচনা করেছেন।[৮৭] মুসলিম ব্রাদারহুড-এর প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসান আল-বান্না, আল-কারাদাবি ও আল-আব্বাদিসহ বহু পন্ডিতগণ প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাকে ইসলামি বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপুর্ণ মনে করেছেন, কারন তা আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করতে সাহায্য করে থাকে।[৮৮]

---

[৮৪] Sami Sulayman, 1990, p. 1045.

[৮৫] Kharabshah, 1990, Vol. 3, p. 1347.

[৮৭] দেখুন, Salah Sultan, 1988, pp. 450 and 480; al-Misri, 1994, pp. 71-2 and 88-90; and Munir Murad, in Mallat, 1988, p. 124.

[৮৮] দেখুন, Hasan al-Banna, Majmu'ah Rasa'il (1989), p. 267; al-Qaradawi, Fiqh al-Zakat, 1969, Vol. 2, p. 1060; al-Abbadi, 1974-7, Vol. 2, p. 299; আরো দেখুন,

www.pathagar.com

সুতরাং, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, কিছু সাধারন মন্তব্য ব্যতীত আয় ও কর্পোরেট, সম্পত্তি, মুল্য সংযোজন, সম্পদ ও উত্তরাধিকার করের মত আধুনিক কর সম্পর্কে ইসলামের লক্ষ্যসমুহের সাথে সামঞ্জস্যতার ও মুসলিম সমাজে সেগুলোর বাস্তবানুগতার দৃষ্টিকোন থেকে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে।[৮১] সম্ভবত: এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি কারন এগুলোর অধিকাংশই মুসলিম রাষ্ট্রসমুহে গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছিল। অন্য একটি কারন সম্ভবত: এই যে, পাশ্চাত্যের লেখকগণ সমাজের মানবিক লক্ষ্য অর্জনের দৃষ্টিকোন থেকে এ সকল করের বিষয়ে এত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যে, এ সকল করের ফলে অতিরিক্ত করারোপ, অদক্ষতা ও বৈষম্য এবং শরিয়াহ'র নিয়ম-নীতির বরখেলাপ ইত্যাদি ছাড়া আর কোন বিষয়ে কারো পক্ষে কোন আপত্তি উত্থাপন করার জন্যে কোন যুক্তিই অবশিষ্ট ছিলই না।

চিরায়ত আইনশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে যারা করারোপকে সমর্থন করেছিলেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, তারা কেবল মাত্র 'ন্যায়ানুগ' করকেই ইসলামের প্রকৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করতেন।[৮০] কোন কর ব্যবস্থাকে তারা তখনই সঠিক মনে করতেন যদি তা তিনটি শর্ত পুরণ করতো। প্রথমত: ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে একান্তভাবেই প্রয়োজন এরুপ কোন কাজে ব্যয় করার লক্ষ্যে করারোপ করা যেতে পারে; দ্বিতীয়ত: করের বোঝা এত বেশী হওয়া উচিৎ নয় যা লোকজনের সহ্য ক্ষমতার তুলনায় বেশী, ও কর পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেওয়া উচিৎ; এবং তৃতীয়ত: যে উদ্দেশ্যে আদায় করা হয় কর বাবৎ অর্জিত অর্থ সে লক্ষ্যে যথেষ্ট বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ করে ব্যয় করা সমীচীন। কোন কর ব্যবস্থা এ সকল শর্ত পুরণ না করলে সেটাকে নিপীড়নমুলক মনে করা হতো এবং সর্বসম্মতভাবে বাতিল করে দেওয়া হতো।

Muhammad Hashim Awad, 'Al-Haykal al-Daribi al-Muasir fi Daw' al-Mabadi' al-Daribah al-Islamiyyah", Monzer Kahf (ed), Mawarid al-Dawlah al-Maliyyah (1989), p. 86 । অবশ্য মাহমুদ রিয়াদ আতিয়াহ'র মত পন্ডিতগণ প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার বিরোধী। (M. R. Atiyyah, 1966, pp. 205-6, থেকে Salah Sultan, 1988, কর্তৃক উদ্বৃত, p. 488;

[৮১] উত্তরাধিকার করের উপর মতামত প্রদানকারী অল্প সংখ্যক পন্ডিতগণ এরুপ কর সমর্থন করেননি। তবে, ইবনে হাজম'র 'বাধ্যতামুলক উইল' - এর যুক্তি ব্যবহার করে শায়খ আবু জারাহ এটাকে সমর্থন করেছেন (শায়খ আবু জারাহ'র বই ইবনে হাজম থেকে কর্তৃক আল-মিস্রি কর্তৃক উদ্বৃত, ১৯৯৪, পৃ: ৮২)।

[৮০] দেখুন, Abu Yusuf, 1352 AH, pp. 14, 16, 86; al-Fatawa al-Hindiyyah, Vol. 2, p. 243 and 'Kharaj" in Ministry of Awqaf (Kuwait), al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 1990, Vol. 19, p. 78. আরো দেখুন, al-Abbadi, 1974-7, Vol.2 p. 300; and Azmi, 1996 ।

www.pathagar.com

এডাম স্মিথের বহু পূর্বে আইনশাস্ত্রবিদগণ করারোপের নীতি-কৌশল আলোচনা করেছিলেন। সকল বৈধ খলিফাগণ, বিশেষত: উমর, আলী এবং উমর ইবনে আবদুল-আজিজ, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ন্যায়ানুগভাবে উদারতার সহিত কর আদায় করা উচিৎ, কর যেন জনগণের জন্যে বোঝা না হয়, তাদেরকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে যেন বঞ্চিত না করা হয়।[৮১] আবু ইউসুফ যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, একটি ন্যায়ানুগ কর ব্যবস্থা শুধুমাত্র রাজস্ব আয়ই বাড়াবে না, দেশের উন্নয়নও সাধন করবে।[৮২] আল-মাওয়ার্দি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কর ব্যবস্থা করদাতা ও সরকারী ট্রেজারী উভয়ের প্রতিই ন্যায়বিচার করা উচিৎ; বেশী আদায় করা জনগণের অধিকারকে ভীষণভাবে ক্ষুন্ন করে, কম আদায় করা হলে সরকারী ট্রেজারীর প্রতি অবিচার করা হয়ে থাকে।[৮৩]

মুসলিম পন্ডিতগণ জোর দিয়ে বলেছেন যে, করদাতাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সততার সহিত কর পরিশোধ করা।[৮৪] তারা যুক্তি দেখান যে, ইসলামের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলার জন্যে জনগণ কর পরিশোধের মাধ্যমে তাদের কর্তব্য পালন করে থাকে। তাছাড়া, তারা যে সকল কর রাষ্ট্রকে প্রদান করে থাকে তার অধিকাংশই তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রাপ্ত সেবার বিনিময়ে দিয়ে থাকে। যদিও সরকারগুলোর উচিৎ দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে সরাসরিভাবে সেবা গ্রহণকারীদের নিকট থেকে খরচ আদায় করার চেষ্টা করা, কিন্তু, প্রশাসনিক ঝামেলা ও ন্যায্যতা বিবেচনায় সব সময় তা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, সরকারী ব্যয়ের এক বিরাট অংশ কর পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করতে হয়। আনুভূমিক সমতা (horizontal equity: একই রকম আয়ের লোকদের উপর একই রকম করারোপের তত্ত্ব) ও উলম্ব সমতা (vertical equity: যত বেশী আয়, তত বেশী কর) সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুসারে (কর নির্ধারনের) এরূপ কাজে একই রকম আয়ের লোকদের সাথে সমভাবে এবং বিভিন্ন আয়ের লোকদের সাথে বিভিন্নভাবে আচরণ করতে হয়। করারোপের অধিকারের বিরোধিতাকারী কতিপয় ব্যক্তির প্রদত্ত যুক্তির জবাব এর মধ্যে পাওয়া যায়, যারা বলেন যে, করদাতাদেরকে আনুপাতিক সুবিধাদি প্রদান না করা হলে কর আদায় করার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

---

[৮১] Abu Yusuf, (1352 AH), pp. 14, 16, 86.

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

[৮৩] Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, 1960, p. 209.

[৮৪] দেখুন, 'Kharaj" in Ministry of Awqaf (Kuwait), al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 1990, Vol. 19, p. 72; al-Misri, 1994, p. 64.

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে যে, যেহেতু করদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত সেবাসমুহের খরচ হিসেবেই মুলত: করকে দেখা হয়ে থাকে, সেহেতু, মুসলিম সমাজে কর ফাঁকি দেওয়া কেবল অপরাধই শুধু নয়, পরকালে স্রষ্টা কর্তৃক শাস্তিযোগ্য একটি নৈতিক অপরাধও বটে। তাছাড়া, করদাতাদের এরুপ কর ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস ভালো কাজ করার জন্যে সরকারের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস করে দেয় বিধায় তা ইসলামের লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকেও বাধাগ্রস্থ করে থাকে। কোন ইসলামি সমাজে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? এ কারনে আইনশাস্ত্রবিশারদগণ যেমন রাষ্ট্রকে করারোপে ন্যায়ানুগ হওয়ার জন্যে বলেছেন, তেমনি জনগণকেও তাদের কর্তব্য পালন করার তাগিদ দিয়েছেন। অন্যায়ভাবে করারোপ করা হলেও ইবনে তায়মিয়াহ তা ফাঁকি না দেওয়ার জন্যে বলেছেন, কারন কতিপয় করদাতার এরুপ কর ফাঁকি'র ফলে তা অন্যদের উপর আরো বেশী বোঝা তৈরী করতে পারে।[১৫]

এভাবে লেখকগণ করদাতাগণ ও ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য দেখিয়ে দিয়েছেন। কর পরিশোধ করা যেমন ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণের নৈতিক কর্তব্য, তেমনি দু'টি শর্তের প্রতিপালন ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যে বাধ্যতামুলক। প্রথমত: সরকার কর্তৃক আদায়কৃত কর রাজস্বকে একটি আমানত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ করে দক্ষতার সহিত জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যে তা খরচ করতে হবে।[১৬] সরকারী হিসাবসমুহের যথাযথ নীরিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে; সংসদের নিকট সরকারের নির্বাহী বিভাগের দায়বদ্ধতা না থাকলে; এবং আমানতের খেয়ানতকারী ছোট-বড় সকলকে শাস্তির আওতায় না আনা গেলে এ শর্তের প্রতিপালন সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রকে অবশ্যই কর পরিশোধে সক্ষম সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে করের বোঝা সমান ভাবে বন্টন করে দিতে হবে।[১৭] এ শর্তটি প্রতিপালিত হবে না যদি সরকারের কর ব্যবস্থা ও ব্যয় নীতিমালা জনগণের নির্ভীক সমালোচনার জন্যে উম্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম না থাকে। ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে রাষ্ট্রকে প্রদত্ত তহবিল সৎ ও দক্ষতার সহিত ব্যবহার করা হবে এরুপ নিশ্চয়তা না পেলে কর পরিশোধের নৈতিক কর্তব্যের দোহাই যতই দেওয়া হোক না কেন করদাতাগণ কর্তৃক কর আদায় সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সহায়তা করার সম্ভাবনা নেই।

---

[১৫] Ibn Taymiyyah, Majmu al-Fatawa (1383 AH=1963), Vol. 30, p. 339.
[১৬] দেখুন,'Kharaj" in Ministry of Awqaf(Kuwait), al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 1990, Vol. 19, pp. 89-90.
[১৭] প্রাগুক্ত, P. 78; Ibn Khaldun, Muqaddimah, p. 308.

www.pathagar.com

ব্যয় নীতিমালা

যদিও চিরায়ত লেখকগণ করারোপের উপর প্রচুর লিখেছেন, ইসলামি দীক্ষার আলোকে সরকারী ব্যয় নীতিমালার প্রতি যথেষ্ট মনযোগ প্রদান করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান। এর কারন ছিল সম্ভবত: এই যে, বর্তমান বিশ্বের তুলনায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তখন সার্বিকভাবে সীমিত ছিল।[৯৮] তবে, তখন যেহেতু ইসলামি আইনশাস্ত্রের আওতাধীন ইসলামি আইন-বিধির উপর প্রচুর আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এক শতাব্দি ধরে মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদগণ একশ'রও বেশী আইন তৈরী করেছিলেন, সেহেতু এ সকল আলাপ-আলোচনা থেকে সরকারী ব্যয়ের একটি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপুর্ণ ভিত্তি তৈরীতে সহায়তা করার জন্যে নিম্ন-বর্ণিত ছ'টি সাধারণ নীতিমালা বের করা যেতে পারে:

১. সকল প্রকার ব্যয় বরাদ্দের মুল শর্ত হওয়া উচিৎ জনগণের কল্যাণ সাধন (অনুচ্ছেদ ৫৮)।
২. আরাম-আয়েশের চেয়ে দু:খ-কষ্ট দুর করার বিষয় অবশ্যই প্রাধান্য পাবে (অনুচ্ছেদ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩০, ৩১, ৩২)।
৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ সংখ্যালগিষ্ঠ জনগণের ক্ষুদ্রতর স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ (অনুচ্ছেদ ২৮)।
৪. জনগণের ত্যাগ বা ক্ষতি ঠেকানোর লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ত্যাগ বা ক্ষতি করা যেতে পারে, এবং ছোট-খাট ত্যাগ বা ক্ষতির বিনিময়ে বড় কোন ত্যাগ বা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ২৬, ২৭, ২৮)।
৫. যিনি সুবিধা গ্রহণ করবেন তাঁকে অবশ্যই তার খরচ বহন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮৭ ও ৮৮)।[৯৯]
৬. যা না করলে কোন একটি বিশেষ কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়, তাও একটি অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।[১০০]

সরকারী ব্যয় কর্মসূচীর এ সকল নীতিমালার কতিপয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে কতিপয় উদাহরণ আলোচনা করা যেতে পারে।

---

[৯৮] দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, al-Mawardi কর্তৃক তার al-Ahkam al-Sultaniyyah (1960), পৃ: ১৫-১৬ - এ বর্ণিত ১০টি কার্যাবলী।

[৯৯] Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, Majallah নামে সংক্ষেপে পরিচিত। প্রতিটি নীতির পর বন্ধনীর ভেতরে প্রদত্ত নম্বরটি Majallah -এর যে অনুচ্ছেদ হতে এ পাঁচটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাকে নির্দেশ করছে। Majallah-এর আরো নীতি ও তথ্যের জন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'পারেটো মান' (পৃ:) অংশটি দেখুন। আরো দেখুন, Mustafa al-Zarqa, 1967, Vol. 2, pp. 945-1060; Ali Ahmad al-Nadwi, 1986।

[১০০] দেখুন, al-Shatibi (মৃত্যু ৭৯০/ ১৩৮৮), Al-Muwafaqat, Vol. 2, p. 394; আরো দেখুন, Mustafa al-Zarqa (1967), Vol. 2, pp. 784, 1088।

www.pathagar.com

১ নম্বর নীতিমালা অনুসারে যেহেতু সার্বিক কল্যাণই হচ্ছে সকল সরকারী ব্যয়ের মুল উদ্দেশ্য, সেহেতু, ৬ নম্বর নীতিমালা অনুসারে বলা যেতে পারে যে, বর্ধিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও অভাব মেটানোর মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করতে সক্ষম সকল ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোগত প্রকল্পকে অন্য সব প্রকল্পের উপর প্রাধান্য দিতে হবে যাদের এরুপ সক্ষমতা নেই। এমনকি অপরিহার্য অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহও অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, আবাসন সমস্যা ও রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসার অভাব, বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাষণের অভাবজনিত কারনে সৃষ্ট দু:খ-দুর্দশা দুরীকরণমুলক প্রকল্পসমুহের উপর প্রাধান্য পেতে চাইবে। একইভাবে, ৩ নম্বর নীতিমালা অনুসারে একটি সুদক্ষ গণ-পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রকল্প প্রাধান্য পেতে পারে কারন এরুপ ব্যবস্থা না থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নগরবাসির জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে, যা দক্ষতা ও উন্নয়নে বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে, এবং যার ফলে কার ও পেট্রোলের মাত্রাতিরিক্ত আমদানী ঘটতে পারে। এ সকল কার নগরের উপকণ্ঠের লোকদের ক্ষুদ্রতর একটি অংশের জীবনে আলাদা আয়েশ নিয়ে আসলেও ৪ নম্বর নীতিমালা অনুসারে সেগুলোর আমদানী কমানো এবং সঞ্চিত অর্থ গণ-পরিবহন আমদানীর কাজে খাটানো যুক্তি সঙ্গত হতে পারে; এরুপ পদক্ষেপ কেবল মাত্র বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপই কমাবে না বরং নগরীর রাস্তায় ট্রাফিক-জট ও দুষণ হ্রাস করাসহ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণকে সুবিধাজনক পরিবহন সেবা প্রদান করবে।

৩ নম্বর নীতিমালা অনুসারে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, তাহলে বহু মুসলিম দেশে ব্যয় কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়নকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রাখার কোন যুক্তি নেই। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক গ্রামে বাস করে এবং যেহেতু পরিবার ও সমাজ থেকে জনশক্তির প্রচুর মুলোৎপাটনের কারনে আর্থ-সামজিক সমস্যা তৈরী হচ্ছে, সেহেতু, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারন, ও তাদের অভাব মেটানোর লক্ষ্যে এ সকল এলাকার উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ। এর ফলে জট হ্রাসের মাধ্যমে ও সেবাসমুহের উপর চাপ কমার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিক জীবনেরও উন্নয়ন ঘটতে পারে।

আয় ও সম্পদের বৈষম্য যদি হ্রাস করতে হয়, তাহলে ৬ নম্বর নীতিমালা অনুযায়ী উন্নততর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নে সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার প্রদান করার মাধ্যমে দরিদ্রদেরকে আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ তৈরী করে দেয়া জরুরী হতে পারে। এর জন্যে সরকারী ব্যয় কর্মসূচীতে পল্লী এলাকায় শিক্ষা ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে সকল

www.pathagar.com

যোগ্য ব্যক্তি এ সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্যে সমান সুযোগ পেতে পারে। এ লক্ষ্যে অর্থায়ন ব্যবস্থাকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে হতে পারে যার ফলে পল্লী ও শহর এলাকার বিরাট সংখ্যক উদ্যোক্তাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অভাব মিটোনোর উপযোগী পণ্য ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ যোগান দেওয়া যায়।

অধিকাংশ মুসলিম দেশসমুহের অস্বস্তিকর বাজেট ঘাটতির বাস্তবতায় অন্যান্য খাতে ব্যয় কমিয়ে ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও যথার্থ লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করার আশা করা অবাস্তব হবে। দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপচয় সরকারী ব্যয়ের কয়েকটি বড় কারন এবং এগুলো অনেক কমানো আবশ্যক। তবে, মুসলিম দেশে দুর্নীতির আকারের উপর তেমন কোন গবেষণা হয়নি, এবং কেন এরুপ কোন গবেষণা হয়নি তা বোঝা মুশকিল। এমনকি সরকারের এক-নায়কসুলভ আচরণ ও প্রায়-শুন্য জবাবদিহির কারনে কতিপয় মুসলিম দেশে সরকারী হিসাবগুলো বাইরের কোন নিরপেক্ষ পেশাদার নীরিক্ষক কর্তৃক নীরিক্ষাও করা হয় না। অধিকাংশ অনেক দেশে হিসাবসমুহ নীরিক্ষা করা হলেও সরকারী হিসাব সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন জন-সমক্ষে প্রকাশ করা হয় না, এবং যদি সেগুলো প্রকাশও করা হয়, তবুও কতিপয় পশ্চিমা দেশের মত সেগুলো কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কর না। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি না পাওয়া গেলে এবং চাকুরী হারানো, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় থাকলে বা অন্য ভাবে শাস্তি পাওয়ার আশংকায় থাকলে একজন অর্থনীতিবিদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তাঁর কাজ করতে সক্ষম হবেন না।

সামরিক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় উচ্চ হারে বাজেট ঘাটতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। এটি একটি দেশকে বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা দেয়। এটা সরকারী খাতে ঋণ বাড়ায়, স্থিতিশীলতায় ও সমন্বয় সাধনে সমস্যা তৈরী করে, এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[১০১] ইসলামের লক্ষ্যসমুহ অর্জনের কাঠামো ও ইতিপুর্বে আলোচিত ব্যয় নীতিমালার আলোকে বলা যায় যে, বাইরের আক্রমনের কোন হুমকীর অবর্তমানে বাজেটে জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ-দাবীর কোন যুক্তি নেই। কেউই মনে রাখে না যে, প্রতিরক্ষা ব্যয় কেবল অর্থ-ব্যয়ই ঘটায় না, গরীবদের কল্যাণমুলক খাতের ব্যয়ও কমিয়ে দেয়, যার ফলে সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়। অটোমান ও মুগল সাম্রাজ্যে অতিরিক্ত বেশী প্রতিরক্ষা ব্যয়ের কারনে করের হারই শুধু বাড়েনি, দেশের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরী ও জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যে সরকারের ক্ষমতাও হ্রাস

[১০১] World Bank, World Development Report, 1988, p. 106.

www.pathagar.com

পেয়েছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত নিজেদের পতনই শুধু আসেনি বরং মুসলমানদেরও অবক্ষয় হয়েছিল। আশ্চর্যজনক হচ্ছে যে, এমন কতগুলো জাজ্বল্যমান ঐতিহাসিক নজীর থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশসমুহের কতিপয় ইসলামি দল এত বেশী বাস্তবতাবিবর্জিত হয়েছে যে, তারা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজেট- ঘাটতি

মুদ্রার মুল্যমানের স্থিতিশীলতার [১০২] উপর আইনশাস্ত্রবিদগণের গুরুত্বারোপের বিষয়টি সকল লেখকগণের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। [১০৩] এ লক্ষ্য অর্জনের-প্রচেষ্টার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অতিরিক্ত অর্থায়নে রাষ্ট্রের সামর্থ নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, বাজেট ঘাটতিকে এমন পর্যায়ে রাখতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে ও বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ খুব বেশী কমে যেতে বাধ্য না করেই অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। অতএব, যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে যে, কর রাজস্ব বৃদ্ধি ও অপচয়মুলক ব্যয় হ্রাস করার সকল রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভাব্য ঘাটতি বাজেটে ইসলামি রাষ্ট্র কিভাবে অর্থায়ন করবে? নীতিগতভাবে অনুমোদন করলেও শরীয়াহ ঋণ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। [১০৪] ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে, কতিপয় বিখ্যাত চিরায়ত আইনশাস্ত্রবিদগণ তাদের সময়ে বিদ্যমান সরকারী অর্থায়নের অব্যবস্থাপনার কারনে রাষ্ট্র কর্তৃক ঋণ গ্রহণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। [১০৫] তাঁরা শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, দেনা পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা না থাকলে রাষ্ট্র ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। [১০৬] সরকারী অর্থের অব্যবস্থাপনা এখনও চলছে এবং

---

[১০২] Al-Misri (1990), pp. 94-5.

[১০৩] দেখুন, Al-Salama, 1982, p. 364; al-Jarhi in Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, p. 5; Chapra, 1985, pp. 37-44; al-Misri (1990), pp. 94-5.

[১০৪] কোন এক ব্যক্তিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে মহানবী (স:) বলেছিলেন, ‘ঋণ কম নাও, তুমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে' (ইবনে উমর থেকে al-Bayhaqi- এর বরাতে al-Mundhari, কর্তৃক উদ্বৃত, 1986, Vol. 2, p. 596:3। ঋণ গ্রহণ নিরুৎসাহিতকরন ও সময় মত ঋণ পরিশোধের তাগিদ সংক্রান্ত কতিপয় হাদিসের জন্যে দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯৬- ৬১৩)। ঋণ গ্রহণের প্রতি একই মনোভাব প্রকাশ করে উমর বলেছিলেন: ‘ঋণ হতে সাবধান, কারন প্রথমে এটি চিন্তার কারন হতে পারে, ও শেষ পর্যায়ে তা দেউলিয়া হওয়ার কারন হতে পারে' (Imam Malik, al-Muwatta, Vol. 2, p. 770:8)। আরো দেখুন, Kawthar al-Abji, 1990, pp. 1150-1; El-Gari, 1992, pp. 39-44; MN Siddiqi, 1996,, pp. 77-96।

[১০৫] দেখুন, al-Juwayni, 1979, p. 204। রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির কারনে ও ব্যয় যখন অপরিহার্য তখন ঋণ গ্রহণ করা সমর্থন করলেও তিনি মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের কঠোর সমালোচনা করেছেন (দেখুন, পৃ: ২০১- ১০)।

[১০৬] দেখুন, al-Juwayni, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১- ৩; আল- গাজ্জালি (মৃত্যু ৫০৫/ ১১১১), শিফা আল- গালিল, পৃ: ২৪১- ২; ও আল- শাতিবি (মৃত্যু ৭৯০/ ১৩৮৮), আল-

www.pathagar.com

বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্যে সরকারগুলো ব্যাপকভাবে ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ঋণের কিস্তি পরিশোধের দায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্যে সম্পদের প্রাপ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবত: কেউ বুঝতে পারছে না যে, ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কৃচ্ছ্রতা সাধন করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় না, ঋণ কৃচ্ছ্রতাকে অল্প সময়ের জন্যে মুলতবি রাখে মাত্র। একজন ব্যক্তি হিসেবে কাউকে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও সরকারী ঋণ পরিশোধের দায় বর্তায় ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর। বর্তমান প্রজন্মের চলমান অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের দায়ভার ভবিষ্যত প্রজন্মের কাঁধে চেপে দেওয়া অন্যায়।[১০৭] ঋণ পরিশোধের দায় থেকে অর্থনীতির উপর যে কু-প্রভাব পড়ে তার কারনে ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি এরূপ অবিচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়, বিশেষত: যদি রপ্তানী আয় ও সরকারের রাজস্ব আয়ের তুলনায় ঋণের দায় বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং, জরুরী অবস্থা মোকাবেলা ও মুলধন খাতে ব্যয় করা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারন এরূপ ব্যয়ের সুবিধা ভবিষ্যত প্রজন্মই ভোগ করবে। ইসলাম কতৃক সুদ নিষিদ্ধকরণের ফলে তা সরকারগুলোকে সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারনে নিজেদের উপর চাপ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখবে এবং এর ফলে ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। এ কারনে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হওয়া উচিৎ নয়। শরীয়াহ অনুমোদিত বহু উপায় অবলম্বন করে এরা এদের সকল গুরুত্বপুর্ণ প্রকল্পে অর্থ যোগান দিতে পারে।[১০৮] সরকারের অনুমোদিত নির্দেশনা মোতাবেক বেসরকারীভাবে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্মিত অবকাঠামোগত প্রকল্প ইজারা প্রদান করার পথে এগুতে পারে। এর ফলে দক্ষতা বাড়তে পারে ও দুর্নীতি কমতে পারে, এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে বেশী বেশী সহযোগিতার দ্বার খুলে যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে, বিলম্বিত পরিশোধের শর্তে, হায়ার পার্সেজ ও *ইস্তিসনা'র* ভিত্তিতে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে। সম-মুলধনের এমন কিছু

ইতিশাম, ২য় খন্ড, পৃ: ১২২। Ib Taymiayyah (মৃত্যু ৭২৮/১৩২৮) একই মত ব্যক্ত করেছেন। আরো দেখুন, al-Misri, Bay al-Taqsit, 1990, pp. 18-19।

[১০৭] দেখুন, Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance (1959), p. 560।

[১০৮] বিকল্পসমুহের জন্যে এ বিষয়ে এখন অনেক লেখা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরুপ: Ausaf Ahmad and T Khan (eds), 1997। আরো দেখুন, M Anas Zarqa, 'Islamic Financing of Mute Social Infrastructure: A Suggested Mode Based on Istisna,"-১৯৯০ সালের ২৬-২৮ মে বাহরাইনে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে পেশকৃত প্রবন্ধ; Chapra, Towards a Just Monetary System (1985), pp. 132-9 and 166-73; M Ariff and M A Mannan (1990); Bendjilali and Bashir, 1991, pp. 45-61: El-Gari, 1992, pp. 35-68; Kahf, 1995, pp. 1-30।

www.pathagar.com

প্রকল্প যেগুলো বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক কিন্তু যেগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারী খাতের উপর ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, এরূপ কতিপয় ক্ষেত্রে তারা বেসরকারী খাতকে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানাতে পারে। এর ফলে অর্থায়ন ব্যবস্থা এমন এক প্রকার শৃংখলার আওতায় আসবে যা সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থায় সরকারের পক্ষে ঋণের তুলনামুলক সহজলভ্যতার কারনে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। সেক্ষেত্রে, কতিপয় মুসলিম দেশসহ আরো অন্যান্য দেশে বোঝা হিসেবে বিবেচিত ঋণের অর্থে গড়ে তোলা কতিপয় শ্বেত-হস্তী প্রকল্প ও অদক্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠান বাদ দেওয়া সম্ভব হবে। বেসরকারীভাবে যতগুলো সম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দরিদ্রদের জন্যে আবাসন প্রকল্প, এতিমখানা ও অন্যান্য সামাজিক সেবামুলক প্রকল্প প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্যে সরকার দানশীল ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করতে পারে। মুসলিম ইতিহাসের বড় একটি অংশ জুড়ে *আওকাফ* (দাতব্য ট্রাস্ট) গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। ব্যয়বহুল জীবন যাত্রা ও ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারনে এর অমিত সম্ভাবনা সাম্প্রতিক কালে অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এ প্রতিষ্ঠানটির পুণর্জাগরণ হলে তা সমাজ কল্যাণমুলক প্রকল্পসমুহে অর্থায়নের সরকারী দায়ভার অনেকাংশে কমাতে সাহায্য করবে।[১০৯] পুর্বে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, কর ব্যবস্থার সংস্কার করা গেলে এ প্রতিষ্ঠানটির পুনর্জাগরণে একটি বড় বাধা দুর হতে পারে।[১১০] কল্যাণমুলক প্রকল্পে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্যে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও ঋণ গ্রহণ করতে পারে, তবে তা পরিমাণে বেশী নয়। বাজার মুল্য স্থিতিশীল রাখার বাধ্যবাধকতা একটি নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা উচিৎ।[১১১]

---

[১০৯] দেখুন, The Muslim World Book Review-এ প্রকাশিত JR Barnes-এর An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire (1986)-এর উপর Akram Khan-এর আলোচনা, ২/৮৮, পৃ: ৩৪-৩৬।

[১১০] এ বইয়ের পান্ডুলিপির উপর তাঁর মুল্যবান মতামত রাখতে গিয়ে রডনি উইলসন বলেছেন: 'দাতব্য ট্রাস্টগুলো শিক্ষা ও হাসপাতাল ক্ষেত্রে একটি ভুমিকা পালন করতে পারে, তবে তারা আরো সফল হতে পারে যদি তারা করের সুবিধাগুলো পায়। যেখানে হাসপাতাল বা স্কুল ফী আদায় করে থাকে, তার অংশ বিশেষ অস্বচ্ছল লোকদের জন্যে বিনা খরচায় চিকিৎসা প্রদান করা বা শিক্ষা-বৃত্তি প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইসলামী অর্থশাস্ত্রের কোন লেখায় এ সকল বিষয় আলোচিত হতে আমি দেখিনি'।

[১১১] দেখুন, Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* (1979), pp. 14-15।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
ভবিষ্যত কর্মপন্থা

যাদের বিশ্বাস রয়েছে ও যারা অবিচার করে বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না, তারা শান্তিতে থাকবে, এবং তারাই হচ্ছে প্রকৃত মোমিন। (আল-কুর'আন, ৬: ৮২)

সম্ভবত: ইসলামই হচ্ছে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মনযোগ আকর্ষণকারী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি। (রামজে ক্লার্ক)[১]

কয়েক শতাব্দি ধরে ইবনে খালদুনের চক্রাকার কার্যকারন মডেল ক্রিয়াশীল থাকার পর বর্তমানে রাজনৈতিক অবৈধতাই মুসলিম সমাজের এক মাত্র সমস্যা নয়। অবক্ষয় তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছে। অন্যান্য সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম এরূপ সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক ব্যাধিগুলোও মুসলিম সমাজে বিরাজ করছে, যাদের কতিপয় খুব বেশী মারাত্মক, কতিপয় একটু কম। সুতরাং, এগুলোর আমুল সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চলকসমুহের প্রতি নজর দিয়ে আমরা বেশী দুর এগুতে পারবো না।

কোথা থেকে শুরু করা যায়?

প্রশ্ন হচ্ছে: কোথা থেকে শুরু করা যায়? আমরা কোথায় যেতে চাই তার উপরই জবাব নির্ভর করছে। এর ফলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হয় সেই রূপকল্পে, যা ভূমিকায় আলোচিত হয়েছিল। রূপকল্পের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি না হয়ে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য থাকে যেখানে ইহজাগতিক উন্নতির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং সকলের জন্যে কল্যাণ সাধন, তাহলে যাত্রা শুরু করার উত্তম স্থান হচ্ছে সেটি, যেখান থেকে মহানবী (স:) নিজে যাত্রা শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ মানুষের সংস্কার[২]। যে কোন সভ্যতার উত্থান কিংবা পতনের পেছনের মুল

---

[১] লিন্ডন জনসন প্রশাসনের মার্কিন এটর্ণি জেনারেল রামজে ক্লার্ক, Impact International (London, UK)-এর সহিত এক সাক্ষাৎকারে, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ: ১০

[২] মুরাদ হফম্যান যথার্থই মন্তব্য করেছেন: 'শব্দটির আদি অর্থে 'মৌলবাদি' হওয়ার জন্যে' আমাদের ইসলামী বিশ্বাসের মুলে ফিরে যাওয়া, এবং মদীনা, আন্দালুস ও আব্বাসীয় পরীক্ষা-নীরিক্ষার পেছনে যে সকল বিষয় সহায়ক ছিল, সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্যে মুসলিম বিশ্বকে আন্তরিক উপদেশ প্রদান ভিন্ন আমার আর কোন প্রস্তাব জানা নেই। (হফম্যান, ১৯৯৬, পৃ: ৮৬)

www.pathagar.com

চালিকাশক্তি হচ্ছে মানুষ নিজে। মানুষের বেড়ে ওঠা, স্বভাব-চরিত্র ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সে মানব জাতির জন্যে আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপের কারন হতে পারে। যদি তার নৈতিক ও মানসিক গুনাবলীর উন্নতি না ঘটে, তাহলে সমাজ ও মানবজাতির কল্যান দুরে থাক, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলোও করতে পারবে না বা করার আগ্রহ থাকবে না। মহানবী (স:) ব্যক্তি মানুষকে উন্নততর করে গড়ে তোলার জন্যে তাঁর সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটি বিপ্লবী বিশ্ববীক্ষা (Worldview) জারী করেছিলেন, যা মানুষের জীবনকে একটি তাৎপর্য ও লক্ষ্য প্রদান করেছিল, জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল, এবং বেঁচে থাকার জন্যে তিনি একটি মহৎ লক্ষ্য তৈরী করে দিয়েছিলেন। সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তিনি ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সাম্য, আত্ম-সম্মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করেছিলেন। এর ফলে এমন এক প্রকার নৈতিক শক্তি তৈরী হয়েছিল যার সামনে তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামো মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবং তা ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুকুল হলে মানব জাতির সংস্কার ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত সহজতর হতো। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান রাজনৈতিক ক্ষমতার অবৈধতা লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বড় বাধা। এরুপ অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে দেয় না এবং ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্থ করে। এরুপ অবৈধ ক্ষমতা আইনের বিধানসুমহ সকলের উপর সমান ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করে না। ফলে দুর্নীতি উৎসাহিত হয় ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন হয় না। সুতরাং, রাজনৈতিক সংস্কার হচ্ছে মুসলিম সমাজের জন্যে একটি অতি জরুরী কাজ। কিছুটা সময় নিলেও কার্যকর জবাবদিহি'র মাধ্যমে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা হ্রাস পেতে পারে, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী ও নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নতিও ঘটবে। এ কারনে ভুমি সংস্কার করাও সম্ভব হবে। ফলে কৃষকগণ উৎপাদনের ন্যায্য হিস্যাই শুধু পাবে না, ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ উন্নত মানের বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদও পাবে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বে প্রযুক্তি, শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় বাড়তি কৃষি উৎপাদন ঘটবে। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার লক্ষ্যে দখলদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত ভুমি সংস্কারের কারনে

www.pathagar.com

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইয়ান এরূপ বাড়তি কৃষি উৎপাদন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩]

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে সকল দেশে ক্ষেত্র বিশেষে পশ্চিমা শক্তির আশীর্বাদে বস্তুগত ও সামরিক সহায়তায় অবৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশ শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, এবং যেখানে সংস্কার আন্দোলন দমন করার জন্যে সরকার সকল প্রকার দমন নীতি প্রয়োগ করে থাকে, সে সকল দেশে রাজনৈতিক সংস্কার কীভাবে আসবে। তবুও রাজনৈতিক সংস্কারের সর্বোত্তম কৌশল হচ্ছে শান্তিপুর্ণ ও অহিংস আন্দোলন, যদিও তা বেশ সময়-সাপেক্ষ বিষয় মর্মে প্রতীয়মান। ইসলামী আন্দোলন আরো বেশী সফল হবে যদি মুসলমানগণ তাদেরকে কোন আপদ নয়, আশীর্বাদ রূপে নিজেদের সমাজেই শুধু নয়, বিশ্বের মানুষের কাছেও নিজেদেরকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে, যেমন কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "আমরা তোমাদেরকে সকল মানব জাতির জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছি" (আল-কুর'আন, ২১: ১০৭)[৪]। ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা হওয়া, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছেড়ে একটি মধ্য-পন্থা অবলম্বন করা, ও যতদুর সম্ভব ভেতরের-বাইরের বিরোধ পরিহার করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

মানব সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কে অধিকতর বোঝা-পড়া এ শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের উপর কোরআনে বেশ জোরে-শোরে ও স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে: "জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ'র পথে আহ্বান কর" (১৬: ১২৫), "শান্তিই উত্তম"(৪: ১২৮), এবং "যা কিছু উত্তম তা দিয়ে মন্দকে নস্যাৎ করে দাও" (২৩: ৯৬)। জ্ঞানের তুলনায় গোঁড়ামী, অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতার চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে। মহানবীও (স:) শান্তিপুর্ণ সংগ্রামের পক্ষে বলেছেন: "যার মধ্যে ভদ্রতা নেই তার মধ্যে শুভ কিছু নেই", এবং "আল্লাহ অমায়িক ও অমায়িকতা পছন্দ করেন; তিনি অমায়িকতার জন্যে পুরুস্কৃত করেন, কিন্তু, তিনি রুঢ়তা বা অন্য কিছুর জন্যে পুরুস্কৃত করেন না"।[৫] এরূপ পছন্দের বিষয়টি আরো অনেক লেখকদের লেখায় স্থান পেয়েছে। উদাহরণত: ইবনে কুদামাহ(মৃত্যু

---

[৩] দেখুন, চাপরা, ভূমি সংস্কার বিষয়ক সেকসন, পৃষ্ঠা ১৭৫-৭।

[৪] এ আয়াতটি সরাসরি মহানবীর উদ্দেশ্যে বলা হলেও এটি পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল। মহানবীর বক্তব্যের মাধ্যমে তা আরো নিশ্চিত করা হয়েছে: সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর নিকট সব চেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাঁর বান্দাদের জন্যে সব চেয়ে বেশী উপকারী। (আল-বায়াকি রচিত শু'য়াব আল-ইমান গ্রন্থের আনাস ইবনে মালিকি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ১৯৯০, খন্ড ৬, পৃ: ৪৩, নম্বর ৭৪৪৫)।

[৫] যথাক্রমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আ'ইশাহ থেকে মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহি, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২০০৪: ২৫৯২ ও ২৫৯৩, কিতাব আল বীর ওয়া আল-সিলাহ ওয়া আল-আদাব: বাব ফাদল আল-রিফক থেকে নেওয়া।

www.pathagar.com

৬২০/ ১২২৩) লিখেছিলেন: "যুদ্ধের চেয়ে শান্তিতেই ইসলামের বেশী স্বার্থ নিহিত রয়েছে"।[৬] আল-কারাদাবিও একই মত প্রকাশ করেছেন, যখন তিনি বলেন যে, এ যুগে মুসলিম সমাজে সংঘাতের কোন সুযোগ নেই।[৭] তাদের সমস্যাগুলো এত জটিল ও কঠিন যে এগুলোর সমাধানের জন্যে অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সংঘাতের নীতি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং এরুপ সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এর ফলে তাদের সমস্যা শুধু বাড়বেই এবং তা কোরআনের উপদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে: "সৎ গুনাবলী ও ন্যায়পরায়নতার বিষয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপাচার ও আক্রমনে নয়" (আল-কুর'আন, ৫: ২)।

সুতরাং, কোরআনের দীক্ষা, মহানবীর দৃষ্টান্ত ও ইতিহাসের শিক্ষা ইসলামের পুণর্জাগরণের জন্যে বল প্রয়োগ বা সংঘাতের বিপক্ষে। মুসলমান দাবীদার কোন ব্যক্তির পক্ষে কীভাবে নির্দোষ মানুষজনকে হত্যা ও জখম করা সম্ভব। কোরআন মুসলমানদেরকে যেমন আশির্বাদ স্বরুপ চায়, এরুপ অবস্থায় তাদেরকে তেমন আশির্বাদ বলা যাবে না। তাছাড়া, অতীতে মুসলিম দেশগুলোতে সশস্ত্র সংগ্রাম খুব কমই সফল হয়েছিল, এবং এরুপ সশস্ত্র সংগ্রাম দমন ও জড়িত ব্যক্তিদেরকে নির্যাতন ও দুর্বল করার জন্যে সরকারগুলোর হাতে আরো উন্নত উপায় রয়েছে বিধায় বর্তমানে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আরো কম। সংঘাতের আশ্রয় নিয়ে সরকার উৎখাতের যে কোন প্রচেষ্টা প্রচুর জীবন হানি ও সম্পদ ধ্বংসের কারন হতে পারে। এর ফলে সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে, উন্নয়ন ও সংস্কার স্থবির হয়ে পড়তে পারে, এবং বিদ্যমান সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। দরিদ্র জনসাধারণ ও সুবিধা-বঞ্চিত লোকজনদের ভোগান্তি অসহনীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে। মহানবী (স:)'র মতে কোন মুসলমানেরই নিজকে এমন কষ্টদায়ক কাজের মধ্যে জড়িত করা সংগত নয়, যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।[৮]

শান্তিপুর্ণ সংগ্রাম সফল হতে পারে কি?

এটি বহু প্রশ্নের অবতারনা করে। একটি হচ্ছে শান্তিপুর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে সফল হওয়ার কোন আশা আছে কি? ভবিষ্যতের উপর মানুষের আস্থা সৃষ্টির পেছনে অনেকগুলো কারন থাকে। অবৈধ সরকারগুলোর জন্যে আন্তর্জাতিক পরিবেশ

---

[৬] ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনি, খন্ড ৯, পৃ: ২৮৬।

[৭] আল-কারাদাবি, *আওলাইয়াত*, ১৯৯১, পৃ: ৯৩

[৮] হাদিসের মুল অংশ এরুপ: 'কোন মুসলিমই নিজকে খাট করা উচিৎ নয়□। কীভাবে তিনি নিজকে খাট করেন তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে: □তিনি সইতে পারেন না এমন কোন কষ্টের বোঝা বহনের দায়িত্ব নেন□। (আল-তিরমিজি কর্তৃক রচিত জামি: কিতাব আল-ফিতান-এর আল-হুদেইফাহ থেকে সহি হাদিস হিসেবে বর্ণিত)

www.pathagar.com

বর্তমানে অনুকূল নয়, এবং ধীরে ধীরে এগুলোর পতন ঘটছে।[৯] রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাগনকে ঘুষ প্রদান নিষিদ্ধ করে ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে ২৯টি OECD-ভুক্ত দেশ ও অন্য ৫টি দেশ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিবেশ দুর্নীতিরও বিরুদ্ধে। তাছাড়া, বস্তুত সকল মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের জন্যে চাপ হালে পানি পাচ্ছে। শিক্ষার বিস্তার ও বর্তমানে ধীরে ধীরে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চলমান ধারা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে দুর্বল করতে সাহায্য করবে – যে ক্ষমতা কাঠামো সাধারণ জনগণের নিরক্ষরতা ও দারিদ্রের উপর ভর করে টিকে থাকে। প্রাথমিকভাবে সামন্ত প্রভুদের প্রাধান্য থাকলেও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোটারদের নির্বাচনী ক্ষমতার কারনে কালের পরিসরে ক্ষমতা কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা দুর্নীতি ও সামরিক ব্যয় হ্রাস করতে[১০], এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতে সম্পদের বরাদ্দ বাড়াতে সহায়তা করে, ভূমি সংস্কার কর্মসূচী চালু করতেও সাহায্য করে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দেশে পাঠানো অর্থের কারনে ইতিমধ্যেই শুরু হওয়া পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতির কারনে একটি বৃহদাকার ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটাবে যারা তাদের অধিকারের জন্যে লড়াই করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সামর্থ্যও রাখে।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলোর জন্যে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রবলভাবে সমালোচিত হচ্ছে। বেতার, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ফ্যাক্স ও বিশ্ব ব্যাপী ইন্টারনেট ওয়েব নির্যাতনকারী সরকারগুলোর বিদেশী সমালোচনার সেন্সর ও দেশের ভেতরে জনগণের মধ্যে অনুরুপ সমালোচনার প্রচার রোধ করার প্রয়াসকে নস্যাত করে দিচ্ছে। সুতরাং, যদিও সরকারগুলোকে দেশের ভেতরে জবাবদিহি করতে হয় না, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘনের জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। যদিও এটা যথেষ্ট নয়, তবুও সামনের দিনগুলোতে পথ চলায় এর একটি সহায়ক প্রভাব প্রতিফলিত

---

[৯] ১৯৭৪ সালে ৩৯টি দেশে, বিশ্বের প্রতি ৪টি দেশের একটিতে, গণতন্ত্র ছিল। বর্তমানে ১১৭টি দেশে, প্রায় তিনটির দু�টিতে, জনগণ উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় নেতা পছন্দ করে থাকে (বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৭, পৃ: ১১১)।

[১০] বিশ্বের সামরিক ব্যয় ১৯৮৫ সালের জিডিপি�র ৫.২ শতাংশ থেকে অনেক কমে ১৯৯৮ সালে ২.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। (১৯৮৫ সালের অংকটি বিশ্ব ব্যাংকের World Development Report, ১৯৯৮/৯৯, পৃ: ২২৩, থেকে নেয়া হয়েছে; ১৯৯৮ সারের অংকটি নেয়া হয়েছে IMF Survey, ৭ জুন, ১৯৯৯, পৃ: ১৮৬ থেকে)। কতিপয় মুসলিম দেশে এটা ঘটেনি। অভ্যন্তরীন চাপের ফলে আশা করা যায় এক সময় তা ঘটবে। তা যত দ্রুত হয়, ততই মঙ্গল।

www.pathagar.com

হবে, বিশেষত: যদি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলো সংস্কারবাদিদের পরিবর্তে নির্যাতনকারীদের সমালোচনা করে, যদিও অজ্ঞতাবশত: এখন সবাইকেই পাইকারীভাবে 'মৌলবাদি' ও 'সন্ত্রাসী' হিসেবে কাতারভুক্ত করা হচ্ছে, এবং তা করা হচ্ছে, না জেনে কিংবা ইসলাম-বিরোধী শক্তি ও নিপীড়ক সরকারগুলোর সাথে যোগসাজস করে।

এসব দেশে গণতন্ত্রকে সফল করা সহজ কাজ নয়। এর কারন বর্তমান শাসক শ্রেণীর অপরিবর্তনীয় স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যারা কিছু কাল ধরে নির্বাচনে জিতবেই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সহজে পরিবর্তন নাও হতে পারে এবং তারা প্রকৃত জবাবদিহিতা এড়ানোর জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। সুতরাং, প্রাথমিক পর্যায়ে স্বৈরশাসক ও নির্বাচিত শাসকদের আচরণের মধ্যে তেমন বড় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না। আন্দোলনের সফলতার সাথে সাথে প্রকৃত পার্থক্য ধীরে ধীরে লক্ষ্যণীয় হবে, যখন গণতন্ত্র একটি স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ও অনেকগুলো অতি প্রয়োজনীয় আইনগত, রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের সহায়তা পাবে। এ সকল সংস্কারের অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনে অর্থ, প্রতিপত্তি ও কারসাজি দুর করা কিংবা নিদেনপক্ষে এ গুলোকে ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজানো। মাত্রাতিরিক্ত নির্বাচনী ব্যয় ধনী ও প্রভাবশালীদের অনুকুলে এবং যোগ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রার্থীদের প্রতিকূলে কাজ করে। এর ফলে ব্যয়িত অর্থ পুষিয়ে নেয়া বা অর্থ প্রদানকারীকে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন-পরবর্তিকালের কাজকর্মে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হয়। তবে, এরূপ সংস্কার প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে পারে, এবং এর বাস্তবায়নের জন্যে সময় লাগতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া ভুমি জোত ও প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থাও গণতন্ত্রের জন্যে একটি বড় বাধা। কারন এ ব্যবস্থা বৈষম্য, পশ্চাদপদতা, ও নানা প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মুল উৎস। অনুপস্থিত ভুমি-মালিকগণ কর্তৃক কৃষক শোষণের ফলে উন্নত বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর জন্যে গ্রাম ও শহর এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাড়তি কৃষি উৎপাদনের কথা দুরে থাক, কৃষকগণ নিজেদের ও পরিবারের জন্যে খাবারই যোগাড় করতে পারে না। এরূপ শোষনের ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করতে উৎসাহ যোগায়। এটা তাদের আত্ম-মর্যাদায় ও কর্ম-স্পৃহায় আঘাত করে। উৎপাদন ও লাভের নিম্ন-হার তাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে তাদের অতি

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। জন্ম, বিয়ে-শাদি, মৃত্যু'র মত ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে সাধ্যের বেশী ব্যয় করার জন্যে অনুপ্রেরণা প্রদানকারী কতিপয় অনৈসলামিক বিধান তাদেরকে আরো দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয় এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগে মন্দাভাব সৃষ্টি করে।

এরূপ পীড়াদায়ক পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র হয়ে পড়ে একটি তামাসা। কারন কৃষকগণ, যারা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ, তাদের নেতা নির্বাচনের জন্যে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করতে পারে না। সামন্ত প্রভুগণ সশস্ত্র বাহিনী, আমলাতন্ত্রসহ বিচার বিভাগ ও পুলিশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। কারন তাদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণ এ সব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপুর্ণ পদগুলোতে আসীন থাকে এবং তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ সকল প্রকার বিরোধিতা নস্যাত করার কাজে ব্যবহার করা যায়। গোটা প্রশাসন যন্ত্র এভাবে তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের কাজে সহায়তাকারীর ভুমিকা পালন করে থাকে। কৃষককুলকে বঞ্চিত করার ফলে সামন্ত প্রভুদের সঞ্চয় বাড়ে না। কারন তারা তাদের আয় মাত্রাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসিতায় খরচ করে ফেলে। দেশ বাধ্য হয় প্রচুর পরিমান বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে, যার ফলে ঋণের কিস্তি পরিশোধের বোঝা অনেক বেড়ে যায়। দারিদ্র্যের দুষ্ট-চক্রের খেলা শুরু হয়ে যায়, এবং পরিণতিতে ইবনে খালদুনের কার্যকারন চক্র পুর্ণতা লাভ করে। অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অবিচার বাড়িয়ে দেয়, মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে তোলে, এবং উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।

ইসলামের পুণর্জাগরণ কি কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের পুণর্জাগরণ মুসলিম সমাজের সংস্কারের জন্যে সহায়ক হবে কি? ইসলামী সমাজ কর্তৃক ন্যায় বিচার ও কল্যান অর্জনের জন্যে এবং বর্তমান যুগের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্যে এটি সহায়ক হবে কি? সাধারণভাবে সকলের মত ইতিবাচক। মুসলিম বিশ্বে সম্ভবত: ইসলামই এক মাত্র জীবন্ত বাস্তবতা যার রয়েছে গণমানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা, প্রচুর বহুমুখীনতা সত্বেও তাদেরকে একত্রিত রাখার শক্তি, এবং শত শত বছরের অবক্ষয় সত্বেও ন্যায়ানুগভাবে কাজ করার জন্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা। ইসলাম একটি সার্বিকভাবে ভারসাম্যপুর্ণ ও বাস্তবায়নযোগ্য নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী প্রদান করে। আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি, আইনের শাসন, নৈতিক মুল্যবোধ, চরিত্র-গঠণসহ দিন বদলের জন্যে শিক্ষা ও সংলাপের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার কারনে এটি ইসলামী সমাজের জন্যে

www.pathagar.com

একটি আশির্বাদ স্বরুপ প্রতিভাত হওয়া উচিৎ। ইসলাম সাধারণ জীবন যাপনকে উৎসাহিত করে থাকে, যা ভোগ-বিলাস কমাতে সাহায্য করে, এবং যার ফলে দুর্নীতির একটি বড় কারন অপসৃত হয়। এর ফলে জনসাধারনের মধ্যে গড়ে উঠে ন্যয়পরায়নতা, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, সচেতনতা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, আত্ম-নির্ভরশীলতা, অন্যের অধিকার ও কল্যান সাধনের আগ্রহ – এমন সব গুণাবলী যে গুলো না থাকলে সম্পদের উৎপাদনশীল বন্টন কিংবা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন কঠিন হতে পারে। ইসলাম বেশ গুরুত্বারোপ করে পরিবার ও সামাজিক সংহতির উপর, যা সমাজের টিকে থাকা ও তার বিকাশের জন্যেও খুবই প্রয়োজনীয়। একইভাবে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যেও ইসলাম বেশ নমনীয়।

সন্দেহ নেই যে, ফিকহ্ শাস্ত্র কঠোর ও অনমনীয় হয়ে পড়েছে। অনমনীয়তা ইসলামের আদি বৈশিষ্ট্য নয়। বরং, পরবর্তিকালে সংঘটিত কতিপয় ঐতিহাসিক কারনে এরুপ অনমনীয়তার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে, যা পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তথাপিও ফিকহ্ শাস্ত্রের এরুপ কঠোরতা পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারনে ধীরে ধীরে নমনীয় হচ্ছে। *ইজতিহাদের* পুণর্জাগরণসহ বর্তমানে ধীরে ধীরে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘটিত সংমিশ্রণের কারনে আইনশাস্ত্রবিদগণকে ইসলামী উম্মাহ'র সামনে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যাগুলো মোকাবেলায় ইতিবাচকভাবে সাড়া দিতে সাহায্য করবে। ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের সাড়া দেওয়ার যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছেন। এরুপ মনে করার কোন কারন নেই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা একই রকম যোগ্যতার প্রমান রাখতে পারবে না এবং বর্তমানে অযৌক্তিক অতীতের কোন অনমনীয় আইনের বিধানকে বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। মহানবী (স:)-এর রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে শরীয়াহ'র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা যেতে পারে[১১]। শরীয়াহ'র কতিপয় বিধান অবিলম্বে বাস্তবায়ন যোগ্য, এবং অবশিষ্ট বিধানগুলোর বাস্তবায়ন অনুকুল পরিস্থিতি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা যেতে পারে[১২]। একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে, বিশেষ করে সংসদে, সকল বিষয়ের উপর উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত উপায়ে শরীয়াহ'র বিধানসমূহের কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

---

[১১] মুহসিন আবদ আল-হামিদ-এর মতে ইসলামী আন্দোলন তাদের সামর্থের চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে কয়েক বার চেষ্টা করে। এটা হচ্ছে তাদের ব্যর্থতা, পিছু হটা ও তাদের শত্রুর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করার অন্যতম কারন।(আবদ আল-হামিদ, ১৯৯৬, পৃ: ১৯৮-৯) ।

[১২] দেখুন, শেখ মুস্তাফা আল-জারকা, ১৯৬৭, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৮-৫৩; আল-কারাদাবি, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

মুসলিম দেশসমূহের অতি অল্প সংখ্যক গোঁড়া নাস্তিক ও ইহজাগতিক ব্যক্তিবর্গ শরীয়াহ বাদ দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ববীক্ষা, মুল্যবোধ ও জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার যে আহ্বান জানিয়েছে তা খুবই অবাস্তব। নিজস্ব বিশ্বাস ও মুল্যবোধ পরিত্যাগ করে অন্যের বিশ্বাস ও মুল্যবোধ গ্রহন করা যে কোন সমাজের জন্যে খুবই অস্বাভাবিক। যে কোন লোকের প্রস্তাব মানুষ কেন গ্রহণ করতে যাবে? তাঁদের প্রদত্ত বাণীর মধ্যে নিহিত মানবিক আবেদন, তাদেঁর নিষ্কলুষ চরিত্র, দৃষ্টান্তমুলক সহ্য-শক্তি ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের কারনে পয়গম্বরগণ সফল হয়েছিলেন। তথাপিও তাঁদেরকে কঠিন বিরোধিতা ও অলজ্ঘনীয় বাধার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। নাস্তিকতা কিংবা ইহজাগতিকতার কি সেরুপ আবেদন রয়েছে? উগ্র-পন্থী ইহজাগতিকতাবাদিদের কারো কি পয়গম্বরগণের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে?

ইহজাগতিকতাবাদিগণ তাদের সমাজের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তারা সম্ভবত: জানে না যে, বর্তমানে মুসলমানগণ ইসলামের দীক্ষা পুরোপুরি প্রতিপালন না করলেও মুসলিম জনগণের নিকট ইসলামের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই, এবং ইসলামের পুণর্জাগরণ একটি অতি জনপ্রিয় বিষয় রুপে বিকশিত হচ্ছে। এরুপ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ইসলামকে বাতিল করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে, যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটবে। এর ফলে সামজিক সংঘাত বৃদ্ধি পাবে, হিংস্রতাকে উস্কে দিবে যা নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হবে। এর স্থলাভিষিক্ত হবে বস্তুবাদি ও ইন্দ্রিয়পরায়নতার দর্শন, যা উম্মত্ত ভোগ-বিলাস, যথেচ্ছ যৌনাচার ও আত্ম-সন্তুষ্টি অর্জনকে উৎসাহিত করে। এটি আবার নৈতিক বন্ধনকে দূর্বল করে দেবে, সাধ্যের বাইরে জীবন যাপনকে উৎসাহিত করবে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমিয়ে দেবে, ভারসাম্যহীনতা বাড়িয়ে দেবে, বৈষম্য বৃদ্ধি করবে, এবং পারিবারিক ও সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করে দেবে। উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে এগুলোর পরিণতি কিরুপ হতে পারে তা অনুধাবন করা কারো জন্যেই কঠিন হবে না।

আল-মামুন ও তার দু' উত্তরসুরীর অভিজ্ঞতা থেকে এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তারা ইসলাম বিরোধী ছিলেন না এবং মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামকে বিদায় করার কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তারা কেবল মুতাজিলা মতবাদের কতিপয় বিষয় বলপূর্বক জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, যা উলেমাগণ শরীয়াহ'র পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করেছিল। শক্তি প্রয়োগের ফলে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যা অদ্যাবধি মুসলিম সমাজকে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৭০ বছর যাবৎ তুরস্কে বল পুর্বক ইহজাগতিকতা চালু করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক যেমনটি ব্যর্থ হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ায় বা'থ পার্টি, তিউনিসে

www.pathagar.com

হাবিব বুরগিবা ও তার উত্তরসুরী, এবং আলজিরিয়ায় ও আরো কতিপয় মুসলিম দেশের সামরিক স্বৈর-শাসকগণ। বা'থ পার্টির অনুসারীদের মত কতিপয় ব্যক্তি তাদের দেশের জন্যে দুর্দশা ব্যতিত আর কিছুই আনতে পারে নি।

> সরকার যদি জনগণের উপর ইহজাগতিকতা বলপুর্বক চাপিয়ে না দিয়ে বরং শরীয়াহ'র কাঠামোর মধ্যে থেকে শিক্ষা ও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের অধিকতর বাস্তবানুগ ও পরমত সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করতো, তাহলে উলেমাগণও তাদেরকে অনুসরন করতো যদি তারা বুঝতে পারতো যে, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী বিধানের বাস্তবায়ন করা এবং সেগুলো বাতিল করা নয়। আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার বৃদ্ধি পেত, সংঘাত কমতো, শাসক গোষ্ঠী (G) ও জনগণের মধ্যে (N) সংহতি বাড়তো, পরিবর্তনের পথে বাধা হ্রাস পেত, এবং ফিকহ শাস্ত্রের সংশোধন কেবল মাত্র আরো সহজই হতো না বরং উন্নয়নের জন্যে আরো অনুকুল পরিবেশ তৈরী হতো। এখন মুসলিম বিশ্বে যে পুণর্জাগরণ ঘটছে তার ফলে মুসলমানদের নৈতিক গুণাবলীর উন্নতি ঘটা উচিৎ। ফলশ্রুতিতে স্রষ্টা কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আরো উৎপাদনশীল ও সম-বন্টন উৎসাহিত হবে, এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে ইসলামের কল্পিত বর্ধিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হবে। এ হচ্ছে সেই পুণর্জাগরণ যা কুর'আনের নির্দেশনার আলোকে মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী করে তোলে:
>
> সুতরাং, উৎসাহ হারাবে না,
> কিংবা আশাহত হবে না,
> কারণ, তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী,
> যদি তুমি বিশ্বাসে আন্তরিক হয়ে থাকো। (আল-কুর'আন, ৩: ১৩৯)

স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও পর্ণো রচনার মাধ্যমে যুবক-বৃদ্ধ সকলের মনে বস্তুবাদি ও ইন্দ্রিয় পরায়ন সংস্কৃতির অবিরাম প্রচারের কারনে ইসলামের পুণর্জাগরণ অবশ্যই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু, যেহেতু এটি সকল সমাজের নৈতিক ও সামাজিক বন্ধনকে হুমকীর মুখে ফেলে দিয়েছে এবং অপরাধ, যৌন স্বেচ্ছাচার, পারিবারিক ভাঙ্গন ও কিশোর অপরাধ বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেহেতু, সমাজের অপেক্ষাকৃত সুস্থ অংশ সর্বত্র এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। মুসলিম সমাজে নৈতিক মুল্যবোধের পুণর্জাগরণ হলে এদের হাত শক্তিশালী হবে এবং চলমান নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে বিশ্বজুড়ে আন্দোলন শুরু হতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি?

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইসলামী অর্থনীতি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি? ইসলামী দর্শন মোতাবেক সার্বিক অর্থে মানব কল্যান বাস্তবায়নের জন্যে

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে সহায়তা করার জন্যে যতটুকু করণীয় ইসলামী অর্থনীতি ততটুকু করছে কি না তার উপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবাবটি নির্ভর করছে। এর জন্যে দরকার মুসলিম দেশসমুহে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার জন্যে দায়ী নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর মত মুখ্য বিষয়সমুহ বিবেচনায় গ্রহণ করে ইবনে খালদুনের বহু শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা, এবং এরুপ বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক সংস্কারের এক গুচ্ছ প্রস্তাব প্রস্তুত করা।

এ কাজটি করা হয় নি। তার স্থলে, এ যাবৎ ইসলামী অর্থনীতির মুল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিতে নৈতিকতার মাত্রা যোগ করে সার্বিক অর্থনৈতিক চলকসমুহের উপর কীভাবে একটি অনুকুল প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে এবং জাকাত ও সম-মুলধন ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কীভাবে কতিপয় জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তা দেখানো। যদিও এটি নি:সন্দেহে খুবই দরকারী, কিন্তু তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ফলাফল হচ্ছে যে, ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় সমালোচক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রবণতা দেখান, যখন তারা বলেন যে, প্রথমত: ইসলামী অর্থনীতির থলিতে এগুলো ছাড়া আর কোন কিছু নেই[১৩], এবং দ্বিতীয়ত: "সুস্থ, আধুনিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান"[১৪] সম্পর্কে এর 'সামান্যই' বলার রয়েছে। এ সকল সমালোচনা কি যুক্তিসঙ্গত: ?

---

[১৩] ইসলামী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম সমালোচক তিমুর কুরান ধারনা দিচ্ছেন যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র তিনটি পদক্ষেপের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আচার-আচরণের রীতি-নীতি, জাকাত, ও সুদ-প্রথার বিলুপ্তি (১৯৮৬, পৃ: ১৩৫)। কুরানের ধারনা ভুল নাও হতে পারে, কারন ইসলামী অর্থশাস্ত্রের উপর লিখতে গিয়ে অধিকাংশ লেখকই এ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। উদাহরণত: ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির উপর এক সেমিনারের কার্যবিবরণীর সূচনায় সম্পাদক মুহাম্মদ আরিফ বলেছেন: ইসলামী অর্থশাস্ত্রের সাথে অন্যান্য অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য হচ্ছে যে, ইসলামী অর্থশাস্ত্রের মুল্যবোধ সংক্রান্ত বিধানাবলী যা ভোগ, উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-এর গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে (আরিফ, ১৯৮২, পৃ: ৩)। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে করাচীতে ইসলামের রাজস্ব নীতি ও সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারের কার্যবিবরণীর সূচনায় আহমদ, ইকবাল ও খান বলেন যে, সেমিনারে যে সাধারন বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে, সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে আলাদা বৈশিষ্ঠ্য, এবং সুদ-প্রথার বিলুপ্তি ও জাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ নির্মানের জন্যে দু'টি গুরুত্বপুর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল (আহমদ, ইকবাল ও খান, ১৯৮৩, পৃ: ৩)। সেমিনারটি ছিল ইসলামের রাজস্ব নীতি ও সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে, সুতরাং, স্বভাবতই ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়সমুহ আলোচনায় স্থান পায়নি।

[১৪] কুরান, ১৯৯৩, পৃ: ১৪৮৬

www.pathagar.com

নৈতিক মুল্যবোধ এবং পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি ব্যতীত চলা সম্ভব কি?

প্রথম সমালোচনাটি যে বিষয়টি থেকে উদ্ভূত মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে, তা হলো একটি নৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজার ব্যবস্থার কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান ত্রুটি কমিয়ে আনা ও সমাজের মানবিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বাধ্যাধকতা সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব। এরূপ ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র বাজার ব্যবস্থাকেই তুলে দিতে চেয়েছিল। ইহার তিক্ত, এবং অপমানজনকও। অভিজ্ঞতা থেকে বেশ ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, কোন অর্থনীতিই বেসরকারী উদ্যোগ, প্রতিযোগিতা, এবং অবাধ বাজার ব্যবস্থা ব্যতীত সফলতার সহিত চলতে পারে না। সুতরাং, কল্যান রাষ্ট্রগুলো বাজার ব্যবস্থাটাকে রেখে দিল কিন্তু, অর্থনীতিতে সরকারের ভুমিকা বাড়িয়ে মানবিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের চেষ্টা করলো। ফলশ্রুতিতে যে অতি-নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণহীন বাজেট ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিল, তার কারনে কল্যান রাষ্ট্রগুলো অকার্যকর হয়ে গেল। নৈতিক পরিবর্তন ঘটানো না গেলে আইন-কানুনের উপর অত্যোধিক নির্ভরশীলতা ও মানবিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সরকারী ব্যয় উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভশীলতা আসতে বাধ্য। যা করা দরকার তা হচ্ছে, বাজার ব্যবস্থা ও কল্যান রাষ্ট্রের পাশাপাশি বাজারের সহিত সম্পর্কিত সকল পক্ষকে আরো বেশী নৈতিক শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসা। অতএব, রোয়েপকে যথার্থই বলেছেন: "শৃংখলা বোধ, ন্যায় বিচারের জ্ঞান, সততা, ন্যায়বোধ, আদর্শবাদিতা, মধ্যপন্থা, গণমুখী মানসিকতা, মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মানবোধ, নৈতিক দৃঢ়তা – এ সব গুণাবলী বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহনেচ্ছু ও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির থাকা উচিৎ। বাজার ও প্রতিযোগিতা উভয়কে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য খুঁটি"।[১৫]

অতএব, কেবল মাত্র "বাজারের নিয়ামকসমূহের শরণাপন্ন হওয়াই" যথেষ্ট নয়, "উঁচু মানের নৈতিক মুল্যবোধ"[১৬] থাকাও প্রয়োজন। উঁচু মানের নৈতিক মুল্যবোধ এবং সেগুলো মেনে চলার জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা না থাকলে বাজার ব্যবস্থা মানবিক লক্ষ্য অর্জন দুরে থাক, এমনকি পারেটো মানেও ভালোভাবে চলতে পারবে না। প্রকৃত পক্ষে, কোন মানবিক প্রতিষ্ঠান যতই সুস্থ-সবল হোক না কেন, সেটি দক্ষভাবে কাজ করতে পারবে না যদি মানুষ, যে কিনা এরূপ প্রতিষ্ঠানের ধারক ও বাহক, যথেষ্ট সংশোধিত না হয়। অবাক

---

[১৫] রোয়েপকে, ১৯৭৭, পৃ: ৬০
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯

www.pathagar.com

হওয়ার কিছু নেই যে, এমন কি অনেক পশ্চিমা অর্থনীতিবিদও অনুধাবন করছেন যে, মুল্যবোধ-নিরপেক্ষতার উপর কিছুটা বেশীই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তারা অর্থশাস্ত্রে মুল্যবোধের বিষয় পুণ: প্রচলনের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন।[১৭]

যদিও বাজার ব্যবস্থায় নৈতিকতার মাত্রা যোগ করা অপরিহার্য, এটা নিজেই একটি ন্যায়ভিত্তিক ও দায়িত্ববান সমাজ গড়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট নয়। কল্যাণ রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব কমাতে ও ঠিক মত সামলাতে হলে আরো দু'টি মাত্রা যোগ করার দরকার হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, পরিবারকে শক্তিশালী করা এবং শিশু, অসুস্থ, অক্ষম ও বয়স্ক ব্যক্তিবর্গকে দেখা-শুনার জন্যে পরিবারের ভুমিকা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সামাজিক সংহতি এমনভাবে শক্তিশালী করা যার ফলে সকলেই পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং প্রত্যেকেই অপরের কল্যাণের জন্যে অন্তত: কিছুটা হলেও স্বীয়-স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি থাকে। ইসলামের সকল মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান এরুপ পরিবার ও সমাজ তৈরীর লক্ষ্যে নিবেদিত। জাকাত ও সুদ-প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে এরুপ দু'টি প্রতিষ্ঠান। এগুলো কেবল মাত্র তখনই অধিকতর সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, যখন এগুলোসহ ইসলামের সকল কর্মসূচী একত্রে বাস্তবায়ন করা হবে। আলাদাভাবে প্রয়োগ করা হলে এগুলোর অবদান গুরুত্বপুর্ণ হতেও পারে, তবে যথেষ্ট হবে না।

প্রতিষ্ঠান কেন প্রয়োজন?

যে প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি তা হচ্ছে, ইতিহাসে কেন একই মুল্যবোধের প্রতিপালনে এমন উত্থান-পতন ঘটে থাকে যে, কোন এক সময়ে সেগুলো বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালিত হয়ে থাকে, অথচ অন্য এক সময়ে সেগুলো লংঘিত হয়? জবাবটি সম্ভবত: লুকিয়ে আছে "সুস্থ" ও "আধুনিক" সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমালোচনার মধ্যে। নৈতিক মুল্যবোধগুলো নিজেরাই যথেষ্ট নয়। মুসলমানগণ তাদের অবক্ষয়ের শত শত বছর ধরে হাদিস শুনে আসছে, তথাপিও তাদের সমাজের নৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি। সম্ভবত: মুসলিম বিশ্বে 'ইহজাগতিক' পশ্চিমা জগতের চেয়ে বেশী দুর্নীতি ও অবিচার বিরাজ করছে। সম্ভবত: মুসলিম বিশ্বের শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত কম বিবেকবান, কম পরিশ্রমী ও কম নিয়মানুবর্তী, এবং ইসলামের প্রত্যাশিত বিধি-বিধানের তুলনায়

[১৭] বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, হৌজম্যান ও ম্যাকফার্সন, ১৯৯৩; উইলসন, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীগণ সম্ভবত: অপেক্ষাকৃত কম সৎ ও কম নীতিবান। প্রতারণা, ঘুষ ও আয়-রোজগারের অন্যান্য অসৎ উপায়সমুহের মত অনেক অনৈতিক কাজকর্ম দীর্ঘ কাল যাবৎ চলতে থাকা, চেনা-পথে-চলার-অভ্যাস ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে-শক্তি-লাভ করার কারনে এখন নিরাপদে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। প্রত্যেকেই এগুলোর নিন্দা করে, অথচ আন্তরিকভাবে চাইলেও কারো পক্ষে এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কারন গোটা সামাজিক পরিবেশ দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এ শতাব্দির অন্যতম মুসলমান পন্ডিত মোহাম্মদ আসাদ যথার্থই বলেছেন যে, "ইসলামী জগতে ফিরে যাওয়ার বাসনা এক জিনিস, কিন্তু সে জগতকে তার সকল আঙ্গিকে স্পষ্টভাবে কল্পনা করা ভিন্ন জিনিস।"[১৮]

ইসলামী অর্থশাস্ত্র যদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নৈতিক মুল্যবোধের ভুমিকা চালু করার বিষয়ে আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে ইহার পক্ষে মনুষ্য সমাজে আদর্শ ও বাস্তব আচরণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কারনসমুহ সনাক্ত করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ সকল কারনগুলোকে দুর্বল করার জন্যে এবং যতদুর সম্ভব তাদের প্রভাবকে বিপরিতমুখী করে দেওয়ার লক্ষ্যে বাস্তব ও ব্যবহারিক পথ খুঁজে বের করতে হবে, যেন মুসলিম দেশগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নততর নৈতিক পরিবেশ ও অধিকতর কল্যানের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। উদাহরণত: আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের একটি অন্যতম কারন হচ্ছে কার্যকর রাজনৈতিক জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, যা ইসলামী রীতি-নীতির স্পষ্ট বরখেলাপ। এমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র নেই যেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র রয়েছে, সংবাদ পত্রের প্রকৃত স্বাধীনতা রয়েছে, আদালতগুলো প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করছে, যেখানে দেশের আইন ধনী ও ক্ষমতাশালী নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সুতরাং, পাশ্চাত্যে কোন নৈতিক বা আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা জানাজানি হলে সংবাদ মাধ্যমে সে বিষয়ে চাঞ্চল্যকর খবরের কাহিনী প্রচারিত হয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়, অথচ কোন মুসলিম দেশের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে এরুপ কোন ঘটনা আদৌ প্রকাশিত হয় না, এবং যেখানে সংবাদ মাধ্যম অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, সেখানে এরুপ ঘটনা প্রকাশিত হলেও তা ক্ষমতা কাঠামোতে তেমন কোন কম্পন সৃষ্টি করতে পারে না। কোন মন্ত্রী বা সরকারী কর্মকর্তা তার নিজের কোন দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনের ঘটনা জানাজানি হওয়ার কারনে পদত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করে না। তিনি বেশ সহজেই পুণ: নিয়োগ পেতে পারেন কিংবা পুণ: নির্বাচিত হতে পারেন। এরুপ পরিবেশে, যেখানে ধনী

---

[১৮] আসাদ, ১৯৮৭, পৃ: ৩।

www.pathagar.com

ও শক্তিধর ব্যক্তিগণ দুর্নীতি, বৈষম্য, অযোগ্যতা সত্ত্বেও সহজেই পার পেয়ে যেতে পারেন, সেখানে সংস্কার ও সার্বিক কল্যান অর্জনের জন্যে আন্তরিক রাজনৈতিক অঙ্গিকারের অভাব থাকতে বাধ্য।

অতএব, মুসলিম বিশ্বের যা করণীয় তা হচ্ছে, তাদের আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহে ইসলামী মূল্যবোধ যেন প্রতিফলিত হয় সে ব্যবস্থা করা এবং কার্যকরী ও নিরপেক্ষভাবে ইহজাগতিক পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। অপরাপর সমাজগুলো তাদের বাহ্যিক ইহজাগতিক ও মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ অবস্থান সত্ত্বেও এটি করেছে।[১৯] তারা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্যে একটি আইনগত কাঠামো ও যথাযথ আচরণ বিধি তৈরী করেছে, এবং স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, ও অপরাধ-প্রকাশকারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে প্রক্রিয়া চালু করেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে তারা যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এবং এরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে লংঘনকারী অক্ষতভাবে পার পেয়ে যেতে না পারে। এখানেই মুসলমানগণ পিছিয়ে রয়েছে। ইসলামের কারনে এরুপ হয়নি, বরং ইসলাম সত্ত্বেও এরুপ হয়েছে।

যদি ইসলামী অর্থশাস্ত্রের কাজ শুধুমাত্র 'কি হচ্ছে' তা ব্যাখা করা না হয়ে বরং 'কি হওয়া উচিৎ' সে দিকে পথ দেখানো হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামী মুল্যবোধগুলো বিরাজমান রয়েছে এরুপ অনুমান করলে কোন ফলোদয় হবে না যখন আদতে মুল্যবোধগুলো সার্বিকভাবে লংঘিত হচ্ছে। ইসলামী মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমুহকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্যে সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল অংশের সংস্কার সাধনই এর লক্ষ্য হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত: ইসলামী রীতি-নীতি থেকে মুসলিম সমাজের 'বিদ্যমান' মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমুহের বিচ্যুতির পরিমান জানার জন্যে এবং এরুপ বিচ্যুতির জন্যে দায়ী বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারন উদঘাটনের লক্ষ্যে কোন গবেষণা হয়নি। আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারন একবার জানা গেলে মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রচন্ড ক্ষতিকারক রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্যে একটি কার্যকর সংস্কার প্যাকেজ তৈরী করা সম্ভব হতে পারে।[২০]

শরীয়াহ্ কতিপয় পথ-প্রদর্শক নীতিমালা জারী করে রেখেছে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের কতিপয় এলাকা চিহ্নিত করে রেখেছে। নি:সন্দেহে এগুলো গ্রহণ করা

---

[১৯] দেখুন, উদাহরণত: OECD, *Ethics in the Public Service: Current Issues and Practice, 1996*

[২০] দেখুন, চাপরা, ১৯৯২, পৃ: ২৫১-৩৩৮।

www.pathagar.com

প্রয়োজন। তবে, এগুলোই যথেষ্ট নয়। একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজের মধ্যে শুধুমাত্র এগুলো থাকলেই চলবে না, বরং এমন আরো কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যেগুলো অন্যান্য সমাজে তাদের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে। শরীয়াহ'র পরিপন্থী না হলে ইসলাম কখনও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের বিরোধী ছিলনা, থাকতে পারে না। একটি অন্যতম আইনশাস্ত্রীয় নীতি হচ্ছে যে, শরীয়াহ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি এরুপ যে কোন বিষয় গ্রহণ করা হলে তা অনুমোদন যোগ্য, এবং যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তা গ্রহণ করা যেতে পারে। মহানবী (স:) স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, "জ্ঞান মুসলমানদের হারানো সম্পদ: যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তারাই এর সবচেয়ে বড় হকদার।"[২১]

গুরুত্বপুর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে কি করা যেতে পারে?

তাছাড়া, ইসলামী অর্থশাস্ত্রে মুসলিম দেশগুলোকে যন্ত্রণাদায়ক কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জাজ্বল্যমানভাবে বাদ পড়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: দুর্নীতি, ব্যয়ের আতিশয্য ও অপচয়, বাজেট ও বৈদেশিক দেনা পরিশোধের ঘাটতি, ঋণ-কিস্তি পরিশোধের বিরাট বোঝা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের নিম্ন হার, মুদ্রা-স্ফীতি ও বেকারত্বের উঁচু হার, আয় ও সম্পদের বন্টনে চরম বৈষম্য, এবং দরিদ্র লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দুদর্শা। আশু প্রয়োজন হচ্ছে, এ সকল সমস্যার সমাধান খুজেঁ বের করা। কতিপয় অমুসলিম দেশ কতিপয় আদর্শ সমাধান বের করে এ সকল সমস্যার অনেকগুলোই প্রশংসনীয়ভাবে নিষ্পত্তি করেছে, যে গুলো গ্রহণ করা সহজ এবং স্বল্প-মেয়াদে বেশ কার্যকর। ইসলামী অর্থশাস্ত্রে এ সকল আদর্শ সমাধানের বিষয়ে আলোচনা ভালোভাবে গ্রহণ করা হয় না মর্মে প্রতীয়মান। সংস্কারের এমন একটি পুর্ন প্যাকেজ এখনও ইসলামী অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়নি, যার মধ্যে ইসলামী ও অন্যান্য নৈতিক, এমনকি ইহজাগতিক, উভয় ব্যবস্থার কতিপয় বিষয়ও থাকতে পারে।

এ কারণ সমালোচক ও নীতি নির্ধারকদের নিকট ইসলামী অর্থশাস্ত্র অবাস্তব বিষয় হিসেবে আভির্ভুত হয়েছে। এমন কি ইসলামের প্রতি যাদের আকর্ষণ

---

[২১] আবু হুরায়রা থেকে আল-তিরমিজী কর্তৃক তার রচিত কিতাব আল-ইলম এ বর্ণিত। এটি একটি দুর্বল হাদিস, তবুও ইসলামী রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্য থাকার কারনে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত্ত হয়ে থাকে। ঈঙ্গিত হচ্ছে যে, জ্ঞানের উপর কারো একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি, এবং মুসলমানরা নির্দ্বিধায় জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন।

www.pathagar.com

রয়েছে, এমন অনেকেই রয়েছেন, তারাও মনে করেন যে, যদিও ইসলামী অর্থশাস্ত্রে আলোচিত অধিকাংশ নীতিগত দলিল মুসলিম সমাজের ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ ও দীর্ঘ-মেয়াদী সুস্থতার জন্যে অতি দরকারী, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে ও সেগুলো থেকে ফলাফল পেতে অনেক সময় লাগবে। অথচ, বিদ্যমান সমস্যার প্রতি এখনই নজর দেয়া দরকার এবং এগুলোর আশু সমাধান প্রয়োজন। এটা করা হলে স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হবে যে, ন্যায় বিচার, ভ্রাতৃত্ব, নৈতিক সংস্কার, পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি ও আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উপর অব্যাহত গুরুত্বারোপ ইসলামী অর্থশাস্ত্রকে যদিও আলাদা রাখে, তবুও প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ও ইসলামী অর্থশাস্ত্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। এরূপ হয়েছে এ কারনে যে, প্রচলিত অর্থশাস্ত্র আসলে অর্থনীতির পেশার পছন্দ অনুযায়ী ইহজাগতিক ও মুল্যবোধ-নিরপেক্ষভাবে বিকশিত হয়নি। প্রচলিত অর্থশাস্ত্র ভাববাদি মতামত প্রদান করা, নীতি-কৌশল বাতলে দেওয়া ও তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থাকেনি। প্রচলিত অর্থশাস্ত্রবিদগণ জীবন্ত মানুষ। তারা গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করে এবং তাদের পক্ষে তাদের সমাজের মুল্যবোধ, আশা-আকাংখ্যা উপেক্ষা করা সম্ভব নয় – যে সকল মুল্যবোধ ও আশা-আকাংখ্যার অনেকগুলোর শেকড় রয়েছে তাদের ধর্মে, ইহজাগতিকতা কিংবা বস্তুবাদিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়নতার মধ্যে নয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

মুসলিম দেশসমূহের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর প্রতি মনযোগ দেয়া এবং সেগুলোর ইসলাম সম্মত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাব্য সমাধান পেশ করার এখনই উপযুক্ত সময়।[২২] এরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করা হলে তা শুধুমাত্র ইহার জনপ্রিয়তা ও সার্বিক গ্রহণযোগ্যতাই বাড়াবে না, বরং সুনির্দিষ্ট ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি উন্নততর পরিবেশ তৈরী করবে। তবে পদক্ষেপের প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যে দেশ বিশেষের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন দেশে সমস্যার তীব্রতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, এবং সমাজে বিদ্যমান রীতি-নীতিও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সুতরাং, প্রত্যেকটি দেশের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা সংস্কার কর্মসূচীর প্রয়োজন হতে পারে। উদ্দেশ্য, নীতিমালা, যৌক্তিকতা ও কর্ম পদ্ধতি বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের

---

[২২] হোমা কাতোজিয়ান যথার্থই বলেছেন যে, "অর্থনীতিবিদ ও অপরাপর সমাজ বিজ্ঞানীরা আরো বেশী উপকারী অবদান রাখতে পারতেন যদি তাঁরা তাঁদের প্রয়াসগুলো দেশের প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ভেতর নিবদ্ধ রাখতেন"। (কাতোজিয়ান, ১৯৮৫, পৃ: ৩৯১)।

www.pathagar.com

উপর একটি সার্বিক আলোচনা ব্যতীত সকল মুসলিম দেশের জন্যে একটি অভিন্ন ও সাধারণ কর্মসূচী প্রত্যেকটি দেশের জন্যে উপযোগী নাও হতে পারে।

ইসলামী অর্থশাস্ত্রকে অনেকগুলো গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক চলকের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃত অবস্থা ও তার পেছনের কারন না জেনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের জন্যে কোন সুচিন্তিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তথ্য স্বচ্ছতা আনে এবং প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে, যা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বিধায় কোন কোন সরকার পছন্দ করে না। সুতরাং, ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম জরুরী প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলোর সংগ্রহ ও প্রচারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা। যে সকল বিষয়ের উপর কোন তথ্য পাওয়া যায় না সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: আয় ও সম্পদের বন্টন সংক্রান্ত তথ্য, অভাব মেটানোর পরিমান, মানুষের বিশেষত: গরীব লোকদের জীবন যাত্রার রকম ও মান। এ সকল তথ্য ব্যতীত সমাজে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনে কেমন সাম্য বিরাজ করছে তা জানা যাবে না, যা কোন মুসলিম অর্থনীতিতে ইসলাম বাস্তবায়ন যাছাই করনের জন্যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এ ছাড়া আরো যে সকল বিষয়ে তথ্যের অভাব রয়েছে সেগুলো হচ্ছে: সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়, ভোগ, ব্যক্তিগত পর্যায়ের ও জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের লোকদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আচরণ, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব, বাধ্যতামুলক নারী ও শিশু শ্রম, মজুরী ও বেতন, কাজের পরিবেশ, কর্মের অভ্যাস, উৎপাদনশীলতাসহ ইসলামী রীতি-নীতি থেকে বিচ্যুতির একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। এগুলো একবার করা হয়ে গেলে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের পক্ষে সমুদয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা, ও আয় বন্টনের উপর ইসলামী মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রভাব বিশ্লেষণ করার মত অর্থপুর্ণ কাজ করা সম্ভব হতে পারে।

প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন একটি কাজ

অতএব, ইসলামী অর্থশাস্ত্রের কাজ প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের কাজের চেয়ে বেশী ব্যাপক ও অনেক বেশী কঠিন। ইসলামী অর্থনীতির রূপকল্প এমনই যে, ইহার আলোচনা শুধুমাত্র 'কী ঘটছে'-এর মধ্যেই সীমিত থাকার কোন সুযোগ নেই। মুহাম্মদ (স:) ও অন্য সকল নবীগণ তাঁদের সমাজ বদল করা ও সমাজে 'যা ঘটা সমীচীন' সে পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন। ইসলামী অর্থশাস্ত্রের মৌলিক লক্ষ্য তা'ই হওয়া উচিৎ। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলামী অর্থনীতিকে সে সকল মুখ্য কারনসমুহ সনাক্ত করতে হবে যা অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

এজেন্টগুলোর আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে। ইবনে খালদুন যেমন ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন, এগুলোর কোনটিকেই আলাদাভাবে দেখা যাবে না। কারন তাদের প্রত্যেকটিই কালের পরিসরে চক্রাকারে পরস্পরের সহিত মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ভারসাম্যের সাধারণ তত্ত্বের সহিত তুলনীয় আর্থ-সামাজিক গতিশীলতার একটি তত্ত্ব দ্বারা সকল মুখ্য মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের সহিত অর্থনৈতিক চলকসমুহের সংঘটিত এরুপ মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে - যা ইসলামের রুপকল্পের সহিত সামঞ্জস্য রেখে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার মৌলিক ধারনা বহাল রাখার দরকার হতে পারে। তবে, যুক্তিবাদিতার ধারনাকে অবশ্যই ইসলামী রুপকল্পের আলোকে পুণ: সংজ্ঞায়িত করতে হবে। পার্থিব ও পরকালের স্বার্থকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বীয়-স্বার্থকে একটি দীর্ঘকালীন পরিসরের প্রেক্ষাপট প্রদান করা যেতে পারে। মানবিক লক্ষ্যসমূহ, বিশেষত: ন্যায় বিচার অর্জনকে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ইসলামী বিশ্বাস, ইসলামী রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমুহকে অবশ্যই ইসলামী রুপকল্পের 'নির্যাস' কিংবা 'রক্ষামুলক বেষ্টনী' হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবে, আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুতির মাত্রা, সংস্কার কর্মসূচীতে সেগুলোর গুরুত্ব, এবং অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সেগুলোর সক্ষমতার উপর নির্ভর করে কেবল মাত্র পর্যায়ক্রমেই সেগুলোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। অধিকতর কার্যকারিতার জন্যে অর্থনৈতিক কারনগুলোর সাথে এমনকি সামজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারনগুলোকেও অবশ্যই বিবেচনায় গ্রহণ করতে হবে। সরকারের ভূমিকাকেও আরো সতর্কতার সহিত সংজ্ঞায়িত করতে হতে পারে, বিশেষত: এ কারনে যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণ সরকারের যে ধরনের ভূমিকা পালন করার আভাস দিয়েছেন, তা করতে গিয়ে জনগণের নিকট দায়বদ্ধতাবিহীন বিদ্যমান দুর্নীতিগ্রস্থ ও অবৈধ সরকারগুলো তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করতে পারে। প্রচলিত ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের কাজে ব্যবহৃত কলা-কৌশলগুলো (tools) পরিবর্তিত রুপকল্পের আলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বহাল রাখার দরকার হতে পারে। এরুপ একটি উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক, প্রগতিশীল ও আন্ত:শাস্ত্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামী অর্থশাস্ত্র কেবলমাত্র অতীতে ইসলামী অর্থনীতিগুলোর প্রবৃদ্ধি ও স্থবিরতার ব্যাখা-বিশ্লেষণই করতে সক্ষম হবে না, বরং তাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর উৎসগুলোও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে পারে। ইসলামী অর্থশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত বেশী দৃঢ়তার সহিত অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

এজেন্টগুলোর আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সক্ষম হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহকে আরো কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ইসলামী অর্থশাস্ত্রের ব্যবহারিক স্তান এ যাবৎ এ লক্ষ্যের কাছাকাছি কোথাও আসতেও সক্ষম হয়নি। ইসলামী অর্থনীতি এখনও অতীতে মুসলিম অর্থনীতির উত্থান-পতন, ইসলামী রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক এজেন্টগুলোর প্রকৃত আচরণের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান সমস্যাসমুহের কারনগুলো ব্যাখ্যা করার কাজটিও ঠিকমত বুঝে উঠতে ও করনীয় ঠিক করতে পারেনি। মুসলিম দেশসমুহের নানা প্রকার ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করার কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা ও ইসলামের লক্ষ্যসমুহ বিশেষত: ন্যায়বিচার ও সার্বিক কল্যানের লক্ষ্যসমুহ, বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী অর্থনীতি এখনও ইসলামী দীক্ষার আলোকে এক গুচ্ছ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি-কৌশলগত প্রস্তাব পেশ করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া, ইহার তাত্ত্বিক মুল-ভিত্তি এখন পর্যন্ত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের গন্ডীর মধ্য থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়নি, যা মুলত: পরিমাপযোগ্য অর্থনৈতিক চলকগুলোকে বিবেচনায় গ্রহণ করে থাকে, এবং নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর পারস্পরিক জটিল ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়ার আলোচনা সাধারণত: এড়িয়ে চলে। এভাবে ইসলামী অর্থনীতি "পশ্চিমা অর্থনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ থেকে দুরে সরে যেতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থারই বুদ্ধিবৃত্তিক মাকড়সার জালেই ইসলামী অর্থনীতি আটকে গেছে, যার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরিকল্পনা সে করেছিল"।[২৩] সুতরাং, উন্নয়ন (g) ও ন্যায় বিচার (j) সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সমাজের অর্জনের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে ইসলামী অর্থনীতি অক্ষম, যেগুলো (উন্নয়ন ও ন্যায় বিচার) ইবনে খালদুনের মতে যে কোন সভ্যতার উত্থান ও পতনের পেছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে।

অতএব, নিকট ভবিষ্যতের প্রত্যাশা খুব বেশী উঁচু হওয়া সমীচীন হবে না। মুসলিম সমাজগুলোকে, অন্তত: নিকট ভবিষ্যতে, ইসলামের প্রত্যাশা অনুযায়ী উঁচু আধ্যাত্মিকতার পর্যায়ে এবং মুসলিম অর্থশাস্ত্রবিদগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে ব্যক্ত ধারনার উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া, সম্পদ ও রাজনৈতিক সমর্থনের অভাব, তথ্যের অভাব, এবং রুপকল্পে অন্তর্ভুক্তকরনের যোগ্য অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চলক পরিমাপের জটিলতার কারনে ইসলামী অর্থশাস্ত্রের নিকট থেকে প্রত্যাশিত সকল কার্যক্রমের সম্পাদন

[২৩] এস ভি আর নাসের, ১৯৯১, পৃ: ৩৮৮

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং, চূড়ান্ত লক্ষ্যসমুহের কথা যেমন ভুলবে না, তেমনি ইসলামী অর্থনীতির উচিৎ বাস্তববাদি হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অর্জনযোগ্য সম্ভাবনার প্রতি নজর দেওয়া। এমনও হতে পারে যে, প্রচুর চেষ্টা সত্বেও নিকট ভবিষ্যতে এর অর্জন খুব বড় কিছু হবে না। তবে, প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে। কারন নাসের যেমনটি বলেছিলেন, "ইসলামী অর্থশাস্ত্র ও এর ধারনার উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রচন্ড সম্ভাবনা রয়েছে যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি"।[২৪]

অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের শত শত বছর পর মুসলিম বিশ্বে যে রেনেসাঁ ক্রমান্বয়ে গতি পাচ্ছে, সুভাগ্যবশত: ইসলামী অর্থশাস্ত্র তা থেকে শক্তি অর্জনের সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। ইবনে খালদুনের (মৃত্যু ৮০৮/ ১৪০৬) বহু-শাস্ত্রীয় গতিশীলতার ভিত্তি ও প্রচলিত সামাজিক, মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্রসহ সামাজিক বিজ্ঞানসমুহ কর্তৃক গড়ে তোলা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কলা-কৌশলগুলো (tools) থেকেও সাহায্য গ্রহণের সুবিধা ইসলামী অর্থশাস্ত্রের রয়েছে। আশা করা যায় যে, মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং নৈতিক মুল্যবোধ, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক সংহতির স্পষ্ট অঙ্গীকার সমৃদ্ধ এ নতুন শাস্ত্রের বিকাশের ফলে শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বই উপকৃত হবে না, বরং সার্বিকভাবে অর্থশাস্ত্রে এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে।

---

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯২

www.pathagar.com

গ্রন্থ- তালিকা

Abbadi, Abd al-Salam Dawud al-, *Al-Milkiyyah fi al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman, Jordan: Maktabah al-Aqsa, 3 Vols.), Vol. 1, 1974; Vol. 2, 1975; Vol. 3, 1977.

Abbasi, S.M., K.W. Hollman and J. H. Murray, "Islamic Economics: Foundations and Practices", *International Journal of Social Economics*, 5/1990, pp. 5-17.

Abbott, F., "The Decline of the Mughal Empire and Shah Wali Allah", *Muslim World*, January 1962, pp. 115-23.

Abd al-Hamid, Muhsin, *Tajdid al-Fikr al-Islami* (Herndon, VA: IIIT, 1996).

Abduh, Isa, *Wad al-Riba fi Bina al-Iqtisad al-Qawmi* (Cairo: Al-Idarah al-Amwal li al-Thaqafah al-Islamiyyah bi al-Azhar, 1960).

Abji, Kawthar Abd al-Fattah al-, "Al-Muwazinah fi al-Fikr al-Mali al-Islami", in *Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Islam* (Amman: Mu'assasah Al al-Bayt, 1990), Vol. 3, pp. 1129-218.

Abod, Sheikh Ghazali Sheikh, Syed Omar Syed Agil and Aidit Hj. Ghazali, *An Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill, 1992).

Abu El-Fadl, Khaled, "Tax Farming in Islamic Law (*Qabalah and Daman of Kharaj*): A search for Concept", *Islamic Studies* (Islamabad), Spring 1992, pp. 5-32.

Abu Dawud al-Sijistani, Imam, (d. 275/888), *Sunan Abu Dawud* (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1952).

Abu Faris, M. Abd al-Qadir, *Hukum al-Shura fi al-Islam wa Natijatuha* (Jordan: Dar al-Furqan, 1988).

Abu Ghuddah, Abd al-Fattah and Izz al-Din Khoja, *Fatawa Nadwat al-Barakah*, 1981-1997 (Jeddah: Shirkah al-Barakah li al-Istithmar wa al-Tanmiyah, 1997).

Abu Rabi, Ibrahim M. (ed), Islamic Resurgence: *Challenges, Directions and Futute Perspectives (A Round Table Conference with Khurshid Ahmad*), (Tampa, Florida: World and Islamic Studies Enterprise, 1994)

Abu Sa'ud, Mahmud, "Islamic View of Riba", *Islamic Review* (London, February, 1957), pp. 9-16. Reproduced in Abod,, Agil and Ghazali, 1992, pp. 70-93.

Abu Shuqqah, Abd al-Halim M., *Tahrir al-Marah fi Asr al-Risalah* (Quwait: Dar-al-Qalam, 1990), 6 Volumes.

Abu Sulayman, Abdul Hamid A., *Economic Theory of Islam: The Philosophy and Contemporary Means* (Cairo: Dar Misr li-Tiba'aha, 1960).

_____, Crisis in the Muslim Mind, Yusuf Talal Delorenzo (tr.), (Herndon, VA: IIIT, 1993).

_____, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought (Herndon, VA: IIIT, 1993).

Abu Ubayd Qasim ibn Sallam (d. 224/839), *Kitab al-Amwal*, M. Khalil Harras (ed), (Cairo: Maktabah al-Kulliyya al-Azhariyyah, 1968).

www.pathagar.com

Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim (d. 182/798), *Kitab al-Kharaj* (Cairo: al-Mata'abah al-Salafiyyah, 2nd ed., 1352 AH). This book has been translated into English by Ben Shemesh (q.v.), Vol. 3, 1969.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).

_____, *Buhuth fi al-Riba* (Kuwait: Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah, 1970).

_____, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah* (Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.),

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama, Bahrain: AAOIFI, June 1997).

Aghnides, Nicholas P., *Mohammedan Theories of Finance with an Introduction to Mohammedan Law and a Bibliography* (New York: Columbia University, 1916).

Agil, Syed Omar Syed, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal", *Journal of Islamic Economics*, July 1989, pp. 79-93.

____,"Rationality in Economic Theory", in Tahir, Ghazali and Agil, 1992, pp. 31-48.

Ahmad, Abdul Rahman Yusri, "Islamic Securities in Muslim Countries' Stock Markets and an Assessment of the Need for an Islamic Secondary Market", *Islamic Economic Studies*, December, 1995, pp. 1-37.

Ahmad, Ausaf, *Development and Problems of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI/IDB, 1987, 1987).

____, "A Macro Theory of Distribution in an Islamic Economy", in M. Fahim Khan, 1988, pp. 111-4.

____, "Macroeconomic Function in an Islamic Framework: A Survey of Current Literature", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 245-76.

____, Towards an Islamic Financial Market: A Study of Islamic Banking and Finance in Malaysia (Jeddah: IRTI/ IDB, 1997).

____, and KR Awan, *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IDB/IRTI, 1992).

____, and Tariqullah Khan (eds.), Islamic Financial Instruments for Public Sector Resources Mobilization (Jeddah: : IRTI/ IDB, 1997).

Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 1980), 390 pp.

____, "Problems of Research in Islamic Economics with Emphasis on Research Administration and Finance", in IRTI (1986), pp. 77-89.

____, "Nature and Significance of Islamic Economics", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 19-48.

Ahmad, Mumtaz (ed.) *State Politics and Islam* (Indianapolis: American Trust Publications, 1986).

Ahmad, Mushtaq, *Business Ethics in Islam* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1995), 211pp.

www.pathagar.com

Ahmad, Shaikh Mahmud, *Economics of Islam: A Comparative Study* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1st ed., 1947; 2nd ed., 1952; several editions have been published since).

_____, "Banking in Islam", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), April/June 1985, pp. 13-27.

Ahmed, Ehsan (ed.), *Economic Growth and Human Resource Development in an Islamic Perspective*, Proceedings of the 4th International Islamic Economics Seminar, 1992 (Herndon, VA: IIIT, 1993).

_____, *Role of Private and Public Sectors in Economic Development in an Islamic Perspective*, Proceedings of the 5th International Islamic Economics Seminar, 1992 (Herndon, VA: IIIT, 1996).

Ahmed, Mahfooz, "Distributive Justice and Fiscal and Monetary Economics in Islam", in Ariff, 1982, pp. 311-40.

Ahmed, Osman, "Sudan: The Role of Faisal Islamic Bank", in Rodney Wilson, 1990, pp. 76-99.

Ahmed, Ziauddin, "Islamic Banking: State of the Art", *Islamic Economic Studies*, December 1994, pp. 1-33.

_____, Munawar Iqbal and M. Fahim Khan (eds.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Jeddah: ICRIE, 1983).

_____, Munawar Iqbal and M. Fahim Khan (eds.), *Money and Banking in Islam* (Jeddah, ICRIE, 1983).

Akhtar, M. Ramazan, "Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy", *American Journal of Islamic Social Sciences*, Winter 1993, pp. 491-511. See also the Comments on this paper by Shujaat Ali Khan in the Winter 1994 issue of *AJISS*, pp. 610-17.

Ali, Ahmad Muhammad, *Role of Islamic Banks in Development* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995), 54pp.

Ali, Muazzam, "Reflections on Islamic Banking", *New Horizon* (London), January 1997, pp. 4-6.

Ali, S. Nazim and Naseem S. Ali, *Information Sources on Islamic Banking and Economics, 1980-1096* (London:'Kegan Paul, 1994).

Allouche, Adel, *Mamluk Economics: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994).

Ansari-Pour, M.A., "Interest in International Transactions Under Shi'ite Jurisprudence", *Arab Law Quarterly* (London), 2/1994, pp. 158-70.

Ansari, Zafar Ishaq, "The Contribution of the Qur'an and the Prophet to the Development of Islamic Fiqh", *Journal of Islamic Studies*, July 1992, pp. 141-71.

Antoun, Richard T., *Muslim Preacher in the Modern World* (Princeton, NJ: 1989).

Anwar, Muhammad, *Modelling Interest-Free Economy* (Herndon, VA: IIIT, 1987).

_____, "Islamic Economics Methodology", *Journal of Objective Studies* (Aligarh, India), July 199o, pp. 28-46.

www.pathagar.com

Arberry, A.J., *Sufism: An Account of the Mystics of Islam* (London: George Allen & Unwin, 195o).

_____, *Revelation and Reason in Islam* (London: George Allen A Unwin, 1957)-

______ , *The Koran Interpreted* (London: Oxford University Press, 1964).

Ariff, Muhammad, *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: ICRIE, 1982), 412pp.

____, "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations", *Journal of Research in Islamic Economics*, Winter 1985, pp. 87-103.

____, "Islamic,Banking in Malaysia: Framework, Performance and Lessons", *Journal of Islamic Economics*, July 1989, pp. 67-78.

____, and M.A. Mannan (eds.), *Developing a System of Financial Instruments:* Proceedings of a Seminar held in Kuala Lumpur, Malaysia, 28 April-5 May 1986 (Jeddah: IDB/IRTI, 1990).

_____ , "The Role of the Market in the Islamic Paradigm", *IIUM Journal of Economics and Management* (Malaysia), 2/1997, pp-97-107.

Arnaldez, R., "Ibn Rushd", *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, new ed., 1971), Vol. 2, pp. 909-20.

______, *"Falsafa", The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, new ed., 1971), Vol. 2. pp. 769-75.

Arrow, Kenneth J., "Samuelson Collected", *Journal of Political Economy,* October 1967, pp. 730-7.

Arsalan, Amir Shakib, *Our Decline and its Causes,* M.A. Shakoor (tr.). (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1962).

Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1982).

__________,*This Law of Ours and Other Essays* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1987).

Asadi, Muhammad ibn Muhammad ibn Khalil al- (d. 854/1450), *al-Taysir wa al-Itibar,* `Abd al-Qadir Ahmad Tulaymat (ed.), (Cairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1967).

Ashker, Ahmad A.F. El-, *The Islamic Business Enterprise* (Kent, UK: Croom Helm, 1987).

_____, "Towards an Islamic Stock Exchange in a Transitional Stage", *Islamic Economic Studies,* December 1995, pp. 79-112.

Ashur, al-Sayyid M., *Abu al-Fadle Ja'far ibn 'Ali al-Dimashqi Abu al-lqtisad* (Cairo: Dar al-Ittihad al-`Arabi li al-Tab, 1973).

`Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al- (d. 852/1449), *Fath al-Bari:Sharh al Bukhari,* Muhibb al-Din al-Khatib and Qusay al-Khatib (eds.). (Cairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1380/1960).

www.pathagar.com

Atiah, A. Qadir M.A., "Tahlil Iqtisadi Ii Zahiratay al-Ghashsh al-Tijari wa Takhsir al-Mizan" (Economic Analysis of Commercial Cheating and Balance Fraud), *Review of Islamic Economics,* 1/1994, pp. 1-26.

Atiyyah, Mahmud Riyad, *Mujaz fi Maliyyah al-Ammah* (Cairo: Dar al-Ma riff, 1966).

Awad, M. Hashim,."Al-Haykal al-Daribi al-Mu ʿasir fi Daw' al-Mabadi" al-Daribah al-Islarniyyah", in Kahf, 1988-89, pp. 72-94.

Awa,di, Rifat al-Sayyid al-,."al-Daribah fi al-Nizam al-Islami", in Mu'assasah Al al-Bayt, 1990, Vol. 3, pp. 1055-126.

Azmeh, Aziz al-, *Ibn Khaldun* (London: Routledge, 1990).

Azmi, Sabahuddin, *Abu Yusuf's Contribution to the Theory of Public Finance* (Aligarh: Aligarh Muslim University, 1996).

Badawi, Abdurrahman, "Muhammad ibn Zakariyyah al-Razi", in M.M. Sharif, 1963, Vol. I, pp. 434-49.

____, *Min Tarikh al -Ilbad if al-Islam* (Beirut: Al-Mu'assasah al-Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 2nd ed., 1980).

Badawi, Ibrahim Zaki, "Nazariyytth al-Ribs al-Muharram fi al-Shari`ah al-Islamiyyah", *Majallah al-Qanun wa al-lqtisad,* April and May 1939. A somewhat revised and expanded version of this paper was published in book form under the same title (Cairo: Ah-Majlis al-A 'la li Ri ayah al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtimaiyyah, 1964).

Baeck, Louis, *The Mediterranean Tradition in Economic Thought* (London: Routledge, 1994).

Baglidadi, Abd al-Qahir ibn Tahir al- (d. 429/1037), *Al-Farq Bayn al-Firaq* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, n.d.).

Bahjat, M.F., "Nahwa Ma'ayir li al-Raqabah al-Shar`iyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah" (Towards Standards for Religious Audit in Islamic Banks), *Review of Islamic Economics,* 2/1994, pp. 1-6o.

Bairoch, Paul, "International Industrialization Levels from 1750 to 1980", *The Journal of European Economic History* (Rome, Italy), 1/1982, pp. 269-333.

Baladhuri, Abu al-Hasan al- (d. 279/892), *Futuh al-Buldan,* Ridwan M. Ridwan (ed.), (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1959).

Baljon, J.M.S. *Jr., The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 3rd ed., 1964); see also his article on Ahmad Khan in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 1, pp. 287-8.

Balog, Paul, *The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria* (New York: 1964).

Balogh, Thomas, *The Irrelevance of Conventional Economics* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1982).

Bank for International Settlements, *Financial Market Volatility: Measurement,*

www.pathagar.com

Causes and Consequences (Basle: BIS, March 1996).

______, *Annual Reports.*Banna, Imam Hasan al-, *Mushkilatuna fi Daw' al-Nizam* (Cairo: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1952).

____*Majmu'al-Rasa'il'al-Imam Hasan al-Banna* (Alexandria: Dar al-Da 'wah, 1989). Selections from this book have been translated under the title, *Five Traits of Hasan al-Banna,* Charles Wendell (tr.), (Berkeley, CA: University of California, 1978).

________, *Hadith al-Thulatha 'Hasan al-Banna,* Ahmad Isa Ashur (ed.), (Cairo: Maktabah al-Qur'an, 1985).

Barham, John, "Turkey: Still Reluctant to Grasp Inflation Nettle", *Financial Times,* 9 October 1997.

Barnes, J.R., *An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire* (Leiden: Brill, 1986).

Barraclough, Colin, "Tough Choices for Islamic Banking", *Institutional Investor,* July 1995, pp. 141-6.

Bauer, Peter T. and Basil S. Yamey, *The Economics of Underdeveloped Countries* (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1957).

Baumol, William J., "Toward a Newer Economics: The Future Lies Ahead!", *Economic Journal,* January 1991, pp. 1-8.

Bayhaqi, Imam Abu Bakr al- (d. 458/1065), *Shu'ab al-Iman,* Muhammad al-Sa 'id Bisyuni Zaghlul (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1990).

Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics* (Herndon, VA: IIIT, 1996), 84pp.

Bell, David and Irving Kristol (eds.), *The Crisis of Economic Theory* (New York: Basic Books, 1981).

Ben Shemesh, A., *Taxation in Islam,* translation of *Kitab al-Kharaj* by Qudamah ibn Ja'far (d. 337/948) as Vol. 1 (1965), Yahya ibn Adam (d. 203/818) as Vol. 2 (1967), and Abu Yusuf (d. 182/798) as Vol. 3 (1969), (Leiden: E.J. Brill, and London: Luzac).

Bendjilali, Boualem and Farid Bashir, "Al-Adrar al-Tawzi'iyyah li Riba al-Dayn al-'Am al-Mumawwal bi al-Dara'ib" (Adverse Distributional Effects of Tax Financed Servicing of Public Debt), *Review of Islamic Economics,* 1/1991, pp. 45-61.

_____, and Yousuf Abdullah al-Zamil, "Qiyas Dallah al-Istihlak fi Itar Islami" (Measuring Consumption Function in an Islamic Framework), *Review of Islamic Economics;* 2/1993, pp. 37-66.

Bennabi, Malek, *Islam in History and Society,* Asma Rashid (tr.), (Islamabad: Islamic Research Institute, 1987).

Berkey, Jonathan, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo. A Social History of Islamic Education* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992).

Bhutto, Zulfiqar Ali, *Political Situation in Pakistan,* Pakistan People's Party,

www.pathagar.com

Political Series No. 1 (Lahore: Haneef Ramay, "Al-Bayan", 1968).

Bigsten, Arne, "Poverty, Inequality and Development", in Norman Gemmell, ed., *Surveys in Development Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1987), pp. 135-77.

Binder, Leonard, *Ideological Revolution in the Middle East* (New York: 1964).

Biraima, M.E., "A Qur'anic Model for a Universal Economic Theory", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1991, PP. 3-41.

Bjorkman, *W., "Maks", in The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 6, 1991, PP. [1]94"5.

Blackhouse, Roger E. (ed.), *New Directions in Economic Methodology* (London: Routledge, 1994), 394pp.

Blankinship, Khalid Yahya, *The End of the Jihad State: The Reign of Hisham Ibn Abd al-Malik and the Collapse of the Umayyads* (Albany: State University of New York, 1994).

Blaug, Mark, *The Methodology of Economics: Or How Economists Explain* (Cambridge: Cambridge University Press, 198o).

----, *Economic Theory in Retrospect* (Cambridge: Cambridge University Press, 4th ed., 1985).

Blinder, Alan S., *Hard Heads, Soft Hearts: Tough-Minded Economicsfor a Just Society* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1987).

Bokare, M.G., *Hindu-Economics: Eternal Economic Order* (New Delhi: Janaki Prakashan, 1993).

Bosworth, C.E., "Saldjukids", in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 8, [1]995, PP. 936-73.

Boulakia, Jean David C., "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist", *Journal of Political Economy,* September/October 1971, pp.1 105-18.

Boulding, Kenneth E., *A Preface to Grants Economics: The Economy of Love and Fear* (New York: Praeger, 1981).

Brandel, Fernand and Frank Spooner, "PriCes in Europe from 1450 to 175o", in E.E. Rich and C.H. Wilson (eds.), *The Cambridge Economic History of Europe, Vol. q,* 1967, pp. 374-486.

Brinton, Crane, "Enlightenment", *The Encyclopaedia of Philosophy* (New York: Macmillan and The Free Press, 1967), Vol. 2, pp. 519-25.

Brittan, Samuel, *Two Cheers for Self-Interest: Some Moral Pre-Requisites for a Market Economy* (London: The Institute of Economic Affairs, for the Wincott Foundation, 1985).

____, and Alan Hamlin (eds.), *Market Capitalism and Moral Values: Proceedings of Section (Economics) of the British Association for the Advancement of Science, Keele, 1993* (Aldershot, UK: Edward Elgar, 1995).

Brzezinsky, Zbigniew, *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century* (New York: Touchstone Books, 1995).

www.pathagar.com

Bukhari, Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma al- (d. 256/ 869), *Sahi al-Bukhari,* al-Shaykh Qasim al-Shamma'i al Rifa'i (ed.), (Beirut: Dar al-Qalam, 1407/1987).

Burtt, Edwin A., *The Metaphysical Foundations of Modern Science* (Garden City, NY: Doubleday, 1955).

Cahen, Claude, "Economy, Society, Institutions", in Holt, Lambton and Lewis (eds.), 1970, Vol. 2, pp. 511-38.

____, "Buwayhids or Bayids", in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. I, 1986, pp. 1350-7.

___, *"Kharadj* (in the Central and Western Islamic Lands)", in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 4, 1990, pp. 1030-4.

____, and M. Talbi, *"Hisba", The Encyclopaedia of Islam, 1991,* Vol. 2, pp. 485-93.

Caldwell, Bruce, *Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century* (London: George Allen & Unwin, 1982).

_____, *The Philosophy and Methodology of Economics* (Aldershot, UK and Brookfield, VT: Edward Elgar, 1993).

Caws, Peter, "Scientfic Method", *The Encyclopaedia of Philosophy* (London: Macmillan, 1967), PP. 339-43.

Chalmers, A.F., *What is This Thing Called Science?* (Buckingham, UK: Open University, 2nd ed., 1982).

Chapra, M. Umer, *The Economic System of Islam: A Discussion of its Goals and Nature* (London: The Islamic Cultural Centre, 1970).

_____, *Objectives of the Islamic Economic Order* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1979).

_____, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1979), 31pp.

______, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985), 292pp.

_____, "The Need for a New Economic System", *Review of Islamic Economics,* 1/1991, pp. 9-47.

_____, "Islam and the International Debt Problem", *Journal of Islamic Studies,* July 1992, pp. 214-32.

______, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1992), 448pp.

______, "A Matter of Interest: The Rationale of Islam's Anti-Interest Stance", *Ahlan wa Sahlan* (Saudia in-flight magazine), October 1992, pp. 38-41.

_____, "Banks Without Interest: Is it Conceivable?" *Ahlan wa Sahlan* (Saudia in-flight magazine), August 1993, pp. 1-14.

_____, *Islam and Economic Development: A Strategy for*

www.pathagar.com

Development with Justice and Stability (Islamabad, Pakistan: IIIT & Islamic Research Institute, 1993), 166pp.

_____, "Statistics and Islamic Economics: Search for a New Dimension", *Proceedings of the First International Seminar on Statistics and Islamic Economics* (Held on 29-31 August 1994, in Lahore, Pakistan), (Lahore: Islamic Society of Statistical Sciences, 1994), pp. 1-19.

_____, "Monetary Management in an Islamic Economy", *Islamic Economic Studies* (Jeddah: IRTI/IDB), December 1996, pp. 1-34.

______, *What is Islamic Economics?* (Jeddah: IRTI/IDB, 1996). Chishti, Salim U., "Relative Stability of an Interest-Free Economy", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1985, PP. 3-11.

Choudhury, Masudul Alam, "The Micro-Economic Foundations of Islamic Economics: A Study in Social Economics", *The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS),* 2/1986, pp. 231-45.

--------, "Islamic Economics as a Social Science", in *International Journal of Social Sciences,* 6/1990, pp. 35-9.

____, "Toward Islamic Political Economy at the Turn of the Century", *The American Journal of Islamic Social Sciences,*
Autumn 1996, pp. 366-81.

Christ, Carl, "On Fiscal and Monetary Policies and the Government Budget Restraint", *American Economic Review,* 1979, pp. 526-38.

Cizakea, Murat, "The Relevance of the Ottoman Cash *Waqfs (Awqaf Al-Nuqud)* for Modern Islamic Economics", in M.A. Mannan, 1996, PP. 393-414.

____, *A Comparative Evolution of Business Partnerships: The Islamic World and Europe, with Specific Reference to the Ottoman Archives,* (Leiden: Brill Academic Publishers, 1996).

Colander, David and Reuven Brenner (eds.), *Educating Economists* (Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1992).

Cook, M.A. (ed.), *Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day* (London: Oxford University Press, 1970).

Council of Islamic Ideology (Pakistan), *Report of the Council of Islamic Ideology on the Elimination of Interest from the Economy* (Islamabad: Government of Pakistan, June 1980).

Dawalibi, M. Ma 'ruf al-, *"Hawla Mawqaf al-Shariah min al Masarif. al Ahkam wa al-Qawa'id al- 'Ammah al-Shar'iyyah — Bahth wa Da 'wah li Takyif al-Masarif al-Hadirah ala Qawa'id Ahkam al-Qirad wa al-Mudarabah",* a paper presented at a Conference held at the University of Paris in 1951.

___, "Da 'wah li Takyif al-Masarif al-Tijariyyah al-Hadirah 'Ala Ahkam al-Mudarabah wa al-Qirad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah", *Al-Dirasill al-Islamiyyah* (Islamabad), October-December 1988, pp. 89-105.

www.pathagar.com

Dawwani, Jalal al-Din al- (d. 906/1501), *Akhlaq-i-Jalali, Practical Philosophy of the Muhammadan People,* W.T. Thompson (ed.), (London: 1839).
De Boer, T.J., *The History of Philosophy in Islam,* Edward R. Jones (tr.), (London: Luzac, 1970).
Desai, M., "Demand for Cotton Textiles in Nineteenth Century India", *The Indian Economic and Social History Review,* December 1971, PP- 337'6'.
Desfosses, Helen and Jacques Levesque (eds.), *Socialism in the Third World* (New York: Praeger, 1975).
DeSomogyi, Joseph N., "Economic Theory in Classical Arabic Literature", in *Studies in Islam* (Delhi), January 1965, pp. 1-6.
Dimashqi, Abu al-Fadl Ja 'far ibn Ali al- (d. 570/1175), *Al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah,* Al-Bushra al-Shurbaji (ed.), (Cairo: Maktabah al-Kulliyyat Al-Azhar, 1977).
Dols, Michael W., *The Black Death in the Middle East* (Princeton, NJ: Princeton University, 1979).
Dopfer, Kurt (ed.), *Economics in the Future: Towards a New Paradigm* (London: Macmillan, 1976).
Dunya, Shawqi Ahmad *al-, "Taqallubat al-Quwwah al-Shira'iyyah li al-Nuqud", Majallah al-Muslim al-Mu'asir* (Beirut), 1985, PP. 49-78.
_______ , "Dawr al- Ulama' fi Ta'sis wa Tatwir Ilm al-Iqtisad: Al-Qimah wa al-Thaman 'inda Ibn Khaldun" (Contribution of Muslim Scholars in the Foundation and Development Economics: Ibn Khaldun's Views on Value and Price), *Review of Islamic Economics,* 1/1992, pp. 1-33.
Durant, Will, *The History of Civilization* (New York: Simon & Schuster, 1954).
____, and Ariel, *The Lessons of History* (New York: Simon & Schuster, 1968).
____, *The Story of Philosophy* (New York: Washington Square Press 1970).
Duri, A.A., "Note on Taxation in Early Islam", *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* 1974, pp. 136-44.
Dutton, Yasin, "The Introduction to Ibn Rushd's *Bidayat al-Mujtahid", Islamic Law and Society,* August 1994, pp. 188-205.
Easterlin, Richard, "Does Money Buy Happiness?" *The Public Interest,* Winter 1973, cited by Robert Heilbroner and Lester Thurow in *Economic Problem,* 1975, p. 538.
_____, "Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?" *Journal of Economic Behaviour and Organization,* 1995, pp. 35-48.
Edgeworth, F.Y., *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Science* (London: Kegan Paul, 1881).
Ehrenkreutz, A.S., Halil Inalcik and J. Burton-Page, *"Dar al-Darb",*in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 2, 1991, pp. 117-21.
Eickerman, Dale, *The Middle East: An Anthropological Approach* (Englewoods

www.pathagar.com

Cliffs, NJ: 1989).

Esposito, John L. (ed.), *Islam and Development: Religion and Socio-Political Challenge* (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1982).

Essid, M. Yassine, A *Critique of the Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: Brill, 1995).

Etzioni, Amitai, *The Moral Dimensions: Towards a New Economic:* (Macmillan, 1989).

Europa Publications, *The Europa World Yearbook.*

Fadl, Khaled Abou El-, "Tax Farming in Islamic Law *(Qabala* and *Daman* of *Kharaj)", Islamic Studies* (Islamabad), 1/1992, pp. 5-32.

Fahmi, Husain Kamel, "Towards Restructuring the Islamic Banking System" (Arabic), *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1992, pp. 3'44.

Fardmanesh, Mohsin and Shamim A. Siddiqi, "Financial Stability and a Share Economy", *Selected Papers and Proceedings of the International Conference on Political Economy of Global Restructuring* (Rome, Italy, 28-31 May 1991).

Faridi, F.R., *"Zakat* and Fiscal Policy", in K. Ahmad, 198o, pp. 119-3o.

_______ , "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", in Z. Ahmed et al., 1983, pp. 27-58.

____, (ed.), *Essays in Islamic Economic Analysis* (New Delhi: Genuine Publications, 1991), 243PP.

Faroghi, Suraiya, "Crisis and Change", in Inalcik (ed.), 1994, pp. 411-636.

_____, "Othmanli: Social and Economic Life", in Kramer et al., 1995, pp. 202-10

Federal Shariat Court (Pakistan), *Federal Shari'ah Court Judgement on Interest (Riba),* (Lahore: P.L.D. Publishers, 1992).

______, *Judgement on Interest (Riba),* (Jeddah: IRT/IDB, 1995), 464pp. Feigl, Herbert, "Positivism and Logical Empiricism", *The New Encyclopaedia Britannica* (15th ed.), (1993'4), Vol. 14, pp. 877-83. Feldman, Allan M., "Welfare Economics", in *The New Palgrave Dictionary of Economics* (London: Macmillan, 1987), Vol. 4, PP. 889'94.

Feyerabend, Paul, *Against Method* (London: Verso, 3rd ed., 1993).

Fischel, W.J., *"Djahbadh",* in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 2, 1992, pp. 382-3.

Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom* (Chicago: The University of Chicago Press, 1972).

_____; *Essays in Positive Economics* (Chicago: The University of Chicago Press, 1953).

_____, and Rose, *Free to Choose* (London: Seeker & Warburg, 198o).

Fukuyama, F., *The End of Order* (London: The Social Market Foundation, 1997). Fulton, John and Peter Gee (eds.), *Religion in Contemporary Europe* (Lampeter, UK: The Edwin Mellen Press, 1994). See also the review of this

www.pathagar.com

book by Murad Hofmann in the *Muslim World Book Review*, 4/1997. pp. 40—1.
Galbraith, John K., *Economics in Perspective* (Boston: Houghton Mifflin, 1987).
Gardet, L., *"Ilm al-Kalam"*, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, new ed., 1971), Vol. 3, pp. 1141-50.
Gari, M. All ibn Eid El-, "Mushkilah al- `Ajz al Mali al-HukumT fi al-Iqtisad al-Islami", *Review of Islamic Economics*, 1/1992, pp. 35-68.
_____, "Towards an Islamic Stock Market", *Islamic Economic Studies*, Deecember 1993, PP. 1-20.
_____, "Ba'd al-Mushkilat al-Bunak al-Islamiyyah wa Muqtarihat li Muwajihatiha', *Al-Amwal* (Jeddah), April 1997, pp. 46-51.
Gerber, Haim, "The Monetary System of the Ottoman Empire", *'Journal of the Economic and Social History of the Orient, 3/25, pp. 308-324.*
Ghazali, Abdel Hamid al-, *Al-Arbah wa al-Faw'id al-Masrafiyyah baynal-Tahlil al-Iqtisadi wa al-Hukm al-Shar^ci* (Cairo: Markaz al-Iqtisad al-Islami, 1990).
_____, *Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994).
Ghazali, Abu Hamid al- (d. 505/1111), *Al-Mustasfa* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937).
_____, *Shifa' al-Ghalil*, Muhammad al-Kubaisi (ed.), (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, n.d.).
_______, *Yhya Ulum- al-Din* (Cairo: Maktabah wa Matba'ah al-Mashlah . al-Husayini, n.d.), 5 Volumes.
______, *Al-Munqidh min al-Dalal*, along with three other books by al- Ghazal', *Kimya' al-Sa^cadah, al-Qaw'id al-^cAsharah*, and *al-Adab fi al-Din*, Muhammad Jabir (ed.), (Beirut: Al-Maktabah alThaqafah, n.d.). *Al-Munqidh* has been translated into English by W. Montgomery Watt under the title *The Faith and Practice of al-Ghazali* (London: George Allen & Unwin, 1953).
____, *Tahafut al-Falasifah*, Jirar Jihami (ed.), (Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, 1993). An English translation by Sabih Ahmad Kamali was published in 1963 by the Pakistan Philosophical Conference, Lahore.
Ghazali, Aidit, *Development: An Islamic Perspective* (Malaysia: Pelanduk, 1990).
_____, and Syed Omar Syed Agil (eds.), *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Malaysia: Pelanduk, 1989), 168pp.
Ghazali, Muhammad al-, *Al-Islam wa al-Awda` al-Iqtisadiyyah* (Islam and the Economic Conditions). The book actually deals with the economic principles of Islam. (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1st ed., 1947; 5th ed., 1961).
Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam* (Chicago: 1947).
______, *Studies on the Civilisation of Islam* (London: Routledge & Kegan Paul, 1962).

www.pathagar.com

Gibbon, Edward, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (J.B. Bury's edition, in 7 Volumes., abridged in I Volume by D.M. Low, 1960).
Gilani, Sayyid Manazir Ahsan, *Islami Ma'ashiyat* (Urdu), (1st ed., Hyderabad: Idarah Isha'at-e-Urdu, 1947; 2nd ed., Lahore: Shaikh Shawkat Ali, 1962).
Gimaret, D., *"Mu 'tazila"*, in *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, new ed., 1993), Vol. 7, pp. 783-93.
Goichon, A.M., *"Hikma"*, in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 3,1971, PP. 377-8.
Goitein, S.D., *Studies in Islamic History and Institutions* (Leiden: Brill, 1966).
_____, A *Mediterranean Society* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967).
Greenspan, Alan, "Statement Before the Committee on Banking and Financial Services, US House of Representatives, 1 October, 1998", in *Federal Reserve Bulletin*, December 1998, pp. 1046-50.
Groenewegen, RD., "A Note on the Origin of the Phrase, Supply and Demand", *Economic Journal*, June 1973, pp. 505-9.
Gulaid, Mahmoud A., *Land Ownership in Islam: A Survey* (Jeddah: 1RTI/IDB, 1991).
Hahn, F., "Some Adjustment Problems", Presidential Address at the December 1968 Meeting of the Econometric Society, *Econometric*, January 1970.
____, and M. Hollis, *Philosophy and Economic Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1979).
Hajjar, Bandar al-, John Presley and J.W. Wright, "Structural and Attitudinal Impediments to Effective Capital Distribution in Saudi Arabia's Islamizing Economy: Implications for Financial Sector Training", in Ehsan Ahmad, 1993, pp. 87-95.
_____, and John Presley, "Financing Economic Development in Islamic Economics: Attitudes Towards Islamic Finance in Small Manufacturing Businesses in Saudi Arabia", in M.A. Mannan, 1996, pp- 227-46.
Hakim, Abu Abdullah Muhammad al- (d. 848/1444), *Al-Mustadrak* (Riyadh: Maktaba wa Matabi al-Nashr al-Hadith, n.d.).
Hallaq, Wael B., "Was the Gate of *Ijtihad* Closed?" *Journal of Middle East Studies*, March 1984, pp. 3-41.
Hameedullah, Muhammad, "Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet", *Journal of the Pakistan Historical Society*, January 1955.
Hammad, Nazih Kamal, *Taghayyur al-Nuqud wa Atharuha 'ala al-Duyun fi al-Fiqh al-Islami, Majallah al-Bahth al-Ilmi wa al-Turath al-Islami* (Makkah: Kulliyyah al-Shariah, 1400/1980).
Hammond, Peter J., "Altruism", *The New Palgrave Dictionary of Economics* (London: Macmillan, 1987), Vol. 1, pp. 85-7.
Haq, Mahbubul, Inge Kaul and Isabelle Grunberg (eds.), *The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility* (Oxford University Press, 1996).

www.pathagar.com

Haque, Nadeem ul- and Abbas Mirakhor, "Optimum Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Economy", IMF Working Paper No. 12, 5 November 1986.

____, and Abbas Mirakhor, "Saving Behaviour in an Economy Without Fixed Interest", in Khan and Mirakhor, 1987, pp. 125-39.

Haque, Ziaul, *Landlord and Peasant in Early Islam* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).

Hasan, M. Aynul M. and Ahmed Naeem Siddiqi, "Is Equity Financed BudgetDeficit Stable in an Interest-Free Economy", in M.A. Mannan, 1996,pp. 139-6o.

Hasan, Zubair, "Determination of Profit and Loss Sharing Ratios in Interest-Free Business Finance", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1985, pp. 13-28.

_____, "Distributional Equity in Islam", in M. Iqbal, 1988, pp. 35-90.

Hasanuzzaman, S.M. "Definition of Islamic Economics", *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1984, pp. 51-3.

______, *The Economic Functions of the Early Islamic State* (Karachi: International Islamic Publishers, 1981). See also the reviews on this book by Hasan M.A. Shafie and Noor M. Ghifari, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1989.

_____ , "Indexation: An Islamic Evaluation", *Journal of Research in Islamic Economics* (King Abdulaziz University, Jeddah), Winter 1985, pp. 31-53, published as a monograph (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1993).

_____ , *The Economic Relevance of the Shariah Maxims (alQawa 'id al-Fiqhiyyah),* (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, n.d. but probably 1997).

Hausman, Daniel, *The Inexact and Separate Science of Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ____, and Michael McPherson, "Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy", *Journal of Economic Literature,* June 1993, pp. 671-731. This survey article has been expanded by the authors into a book, *Economic Analysis and Moral Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

Heilbroner, Robert L., "Economics as a 'Value-Free' Science", *Social Research,* 1973, pp. 129-42.

_____, and Lester C. Thurow, *The Economic Problem* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975).

_____, and William Milberg, *The Crisis of Vision in Modern Economic Thought* (New York: Cambridge University Press, 1996).

Hepburn, Ronald, *Christianity and Paradox* (London: 1958).

Hey, John, "*The Economic Journal:* Report of the Managing Director", Royal Economic Society, *Newsletter,* January 1997, pp. 3-4.

www.pathagar.com

Hicks, John, "Revelation", *The Encyclopaedia of Philosophy* (New York: Macmillan and The Free Press, 1967), Vol. 7, pp. 189-91.

_____ , "Limited Liability: The Pros and Cons", in Tony Orhnial (ed.), *Limited Liability and the Corporation* (London: Croom Helm, 1982).

Hijazi, S. Tahir, *Institutional Dynamics in Industrial Paradigm: The Fifty Years of Pakistan* (Islamabad: Dost Publications, n.d.).

Hinds, M., *"Mihna"*, in *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, 1993), Vol. 7, pp. 2-6

Hitti, Philip, *History of the Arabs* (London: Macmillan, 1958).

Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1977).

Hofmann, Murad Wilfried, "Backwardness and the Rationality of the Muslim World", *Encounters* (UK), March 1996, pp. 76-87.

Holland, Muhtar, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (Translation of Ibn Taymiyyah's *Al-Hisbah ft al-Islam),* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1982).

Hollis, Martin and Edward Nell, *Rational Economic Man —Philosophical Critique of Neo-Classical Economics* (Cambridge University Press, 1975).

Holt, P.M., Ann Lambton and Bernard Lewis (eds.), *The Cambridge History of Islam* (Cambridge: The University Press, 197o).

Homoud, Sami Hasan, "Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities", *Islamic Economic Studies,* December 1994, p p • 7 1 - 8 0 .

_____, "Bada'il Tamwil `Ajz al-Mizaniyyah wa Tawsi Mashru'at al-Qita al-`Am", *Al-Amwal* (Jeddah), Vol. 1 (1996-97), Issue 3 (April), pp. 68-71.

Hoodbhoy, Pervez, *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality* (London: Zed Books, 1991).

Hoover, Kevin D., "Why Does Methodology Matter for Economics?" *Economic Journal,* May 1995, pp. 715-34.

Horvath, Janos, "Foreword", in Solo and Anderson, 1981, pp. vii—xi.

Hosseini, Hamid, "Islamic Economics in Iran: Is a New Economic Paradigm in the Making?" *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* (Villanova, PA), 2/1988, pp. 21-44.

Hourani, George F., *Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy* (A translation, with introduction and notes, of Ibn Rushd's *Kitab Fasl al-Magal* with its appendix *(Damima)* and an extract from *Kitab al-Kashf an Manahij al-Adilla* (London: Luzac, 1961).

Howitt, Peter, "Macroeconomics: Relations with Microeconomics". *The New Palgrave Dictionary of Economics* (London: Macmillan, 1987), Vol. 3, pp. 273-5.

Huq, M.A., "Islamic Banking in Malaysia", *Thoughts on Economics,* 2/1986, pp. 1-21.

www.pathagar.com

Hutchison, T.W., *Positive Economics and Policy Judgements* (London: Allen & Unwin, 1964).

Huxley, Julian, *Religion Without Revelation* (London: 1947, 2nd ed., [1]957).

Ibn al-Athir, `Izz al-Din Ali (d. 63o/1233), *Al-Kamilf al-Tarrkh* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 198o).

Ibn al-Athir, Majd al-Din al-Mubarak (d. 606/121o), *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar* (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1963).

Ibn Bassam, Muhammad, *Kitab Nihayat al-Rutbah fi Talab al-Hisbah* (Baghdad: H. Samara', 1968).

Ibn Hazm (d. 456/1064), *Al-Muhallah* (Beirut: Al-Maktabah al-Tijari, n.d.).

Ibn Ja 'far, Qudamah (d. 337/948) — see Qudamah.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman, *Al-Ta`rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuha Gharban wa Sharaqan*, Muhammad Tawit al-Tanji (ed.), (Cairo: 1370/1951).

_____, *Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-`Arab wa al-`Ajam wa al-Barbar wa man Asharahum min Dhawi al-Sultan al-Akbar* (Beirut: Maktabah al-Madrasah wa Dar al-Kitab al-Lubnani, 1961).

_____, *Muqaddimah* (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.). See also its translation under Rosenthal (1967), and selections from it under Issawi (195o).

Ibn Majah, Imam (d. 273/886), *Sunan Ibn Majah* (Cairo: Isa al-Bab' al Halabi, 1952).

Ibn Qudamah, Abu Muhammad ʿAbdullah (d. 620/1223), *Al-Mughni* (Cairo: Matbaʿah al-ʿAsimah, n.d.)

Ibn Rushd (d. 595/1198), *Fasl al-Maqal wa-Tagrir ma bayna al-Shariah wa al-Hikmah min al-Ittisal* (Beirut: Dar al-Mashriq, 3rd ed., 1973).

_____, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Cairo: Matabi al-Babi al-Halabi, 3rd ed., 1960). Translated into English by Imran Ahsan Khan Nyazee under the title, *The Distinguished Jurists' Primer* (Reading, UK: Garnet, 1996).

______, *Tahafut al-Tahafut*, Maurice Bouyges (ed.), (Beyrouth: Dar al-Mashriq, 3rd ed., 1992). An English translation in 2 Volumes by Simon Van Den Bergh was published in 1954, reprinted in 1969, 1979 and 1987 by Luzac & Co., London. The second volume consists of only the translator's notes. References in the text pertain to the 1987 reprint.

Ibn Taymiyyah (d. 728/1328), *Majmu` Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, `Abd al-Rahman al- Asimi (ed.), (Riyadh: Matabi al-Riyad, 1st ed., 1381-3/1961-3).

______, *Al-Hisbah fi al-Islam*, `Abd al-Aziz Rabah (ed.), (Damascus: Maktabah Dar al- ___ Bayan, 1967). Translated by Muhtar Holland under the title *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1982).

______, *Al-Siyasah al-Shar`iyyah fi Isiah al-Ra`r wa al-Ra`iyyah*, Muhammad

al-Mubarak (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al'Arabiyyah, 1386/1966).

_______ _____, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah,* M. Rashad Salim (ed.), (Riyadh: Imam Muhammad Islamic University, 1986).

Ibn al-Ukhuwwah (Diya' al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Qurashi) (d. 729/1329), *al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah,* Reubin Levy (ed.), with an analysis in English. The original published from London in 1938. Reprint without. the English analysis (Cairo: Maktabah al-Mutanabbi, n.d.).

Ibn Zanjawiyyah (d. 251/865), *Kitab al-Amwal,* 3 Volumes, Shakir Dheeb Fayyad (ed.), (Riyadh: King Faysal Centre for Research and Islamic Studies, 1986).

Imam, Zakariyyah Bashir, *Tariq al-Tatawwur al-jtimai al-Islami* (Jeddah: Dar al-Shuruq, 1397 AH).

Inalcik, Halil, "The Rise of the Ottoman Empire", Holt et al., 197o, Vol. 1, pp. 295-323.

______„ "The Heyday and Decline of the Ottoman Empire", in Holt et al., 197o, Vol. I, pp. 324-31.

_______, "Dariba (in the Ottoman Empire)", in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 2, 1991, pp. 142-8.

_______, and Donald Quataert (eds.), *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994).

Institute of Islamic Banking and Insurance, *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance* (London: IIBI, 1995).

Institute of Policy Studies, Elimination *of Riba from the Economy* (Islamabad: IPS, 1994).

International Association of Islamic Banks, *Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, 1996,* (Jeddah: IAIB, 1997).

International Institute of Islamic Thought (IIIT) (ed.), *Islam: Source and Purpose of Knowledge* (Herndon, VA: IIIT, 1988).

_____ ed., *Toward Islamization of Disciplines* (Herndon, VA: IIIT, 1989), 555PP.

_______, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* (Herndon, VA: IIIT, 1989).

International Monetary Fund, *Government Finance Statistics: Yearbook* (Washington, DC: IMF, Annual).

_____, *International Financial Statistics* (Washington, DC: IMF, CD- ROM, Annual Yearbook, and monthly),

_____________, *World Economic Outlook,* issued twice a year.

Iqbal, Muhammad, *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1954).

Iqbal, Munawar, "Islamic Approach Towards the Economic Problem", in Molla (1986), pp. 12-28.

www.pathagar.com

_______ (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1988), 384pp. See also the review of this book by M. Ali Khan in the *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1991, pp. 97-117.

_____, "Organization of Production and Theory of Firm Behaviour from an Islamic Perspective", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 205-15.

Iqbal, Zubair and Abbas Mirakhor, *Islamic Banking* (Washington, DC: IMF, Occasional Paper No. 49, March 1987).

Islahi, A. Azim, *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1988).

__ _____, "Shah Waliyullah's Concept of *al-Irtifaqat* (Stages of Socio-Economic Development)", *Journal of Objective Studies,* January '994, pp. 46-63.

_______ _____, *History of Economic Thought in Islam* (Aligarh, India: Department of Economics, Aligarh Muslim University, 1996).

Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank, *Problems of Research in Islamic Economics* (Jeddah: IRTI, 1986).

Issawi, Charles, *An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis* (1332-1406), (London: John Murray, 195o), 790pp.

_ ____, *The Decline of Middle Eastern Trade, 1100-1850,* in Richards, 1970.

____________, *The Economic History of the Middle East, 1800-1914* (Chicago, 1966).

Jahiz, Amr ibn Bahr al- (d. 255/869), *Rasa'il,* A.M. Harfin (ed.), (Cairo: 1964-5).

_________ _____, *Kitab al-Tabassur bi al-Tijarah* (Treatise Concerning Reflections on Trade), Hasan Husayni Abd al-Wahhab (ed.), (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1983).

Jalbani, Ghulam Hussain, *Life of Shah Waliyullah* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1978).

Jarhi, Mabid Ali al-, "The Relative Efficiency of Interest-Free Monetary Economies: The Fiat Money Case", in K. Ahmad, 1980, pp. 85-118.

____, "A Monetary and Financial Structure for an Interest-Free Economy: Institutions, Mechanism and Policy", in Z. Ahmed et al., 1983, pp. 69-87.

____, "Towards an Islamic Macro Model of Distribution: A Comparative Approach", in M. Fahim Khan, 1988, pp.145-202.

Johns, C.H.W., John Dow, W.H. Bennett and J. Abelson, on the Babylonian, Christian, Hebrew and Jewish views respectively on "Usury", *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (New York: Charles Scribner's Sons, n.d.), Vol. 12, pp. 548-58.

Jomo, K.S. (ed.), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions* (London: Macmillan, 1992).

Jones, Eric L., *Growth Recurring: Economic Change in World History* (Oxford: Clarendon Press, 1988).

www.pathagar.com

Junaid, Syed Abdul Hamid, al-, "Factors of Production and Factor Pricing from an Islamic Perspective", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 185-204.

Juwayni, Abu al-Ma'ali al- (d. 478/1085), *Al-Ghiyathi: Ghiyath al-Umam fi al-Tiyath al-Zulam* (Helping Nations to Eliminate Injustices), Fu'ad Abd al-Mun'im and Mustafa Hilmi (eds.), (Alexandria: Dar al-Da'wah, 1979).

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy* (Plainfield, IN: Muslim Students' Association of US and Canada, 1978). See also the review of this book by M.U. Chapra in the *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1984, pp. 83-5.

_____, "A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society", in K. Ahmad (1980), pp. 19-36.

_____, "Fiscal and Monetary Policies in an Islamic Economy", in Ariff, 1982, pp. 125-44.

_____, "Taxation Policy in an Islamic Economy", in Ziauddin Ahmed et al., 1983, pp. 131-61.

_____(ed.), *Mawarid al-Dawlah al-Maliyyah fi al-Mujtama' al- Hadith min Wujhat al-Nazar al-Islamiyyah* (Jeddah: IDB/IRTI, 1988-89).

_______, *"Zakat:* Unresolved Issues in the Contemporary *Fiqh", Journal of Islamic Economics* (Malaysia), January 1989, pp. 1-22.

_______, "Market Structure: Free Cooperation", in Tahir, Ghazali and Agil (eds.), 1992, pp. 1476-56.

_____, "Time Value of Money and Discounting in Islamic Perspective: Revisited", *Review of Islamic Economics,* 2/1994, pp. 31-8.

_______ , "Mu'alijah al- Ajz fi al-Mizaniyyah al-Amrnah fi al-Nizam al-Islami" (Treatment of Public Budget in the Islamic System), *Review of Islamic Economics,* 1/1995, pp. 1-30.

______, and Tariqullah Khan, *Principles of Islamic Finance: A Survey,* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992).

Kaldor, Nicholas, "The Irrelevance of Equilibrium Economics", *Economic Journal,* 1972.

Kamali, M. Hashim, *"Tas'ir* in Islamic Law", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* Spring 1994, pp. 25-37.

Kamil, Shaikh Saleh, "Al-Bunuk al-Islamiyyah: Akbar Injazat al-Iqtisad al-Islami", *Al-Iqtisad al-Islami,* July 1977, pp. 32-45; August 1997, pp. 30-2.

Karanshawy, Hatem El-, "Financing Economic Development from Islamic Perspective", in M.A. Mannan, 1996, pp. 37-58.

Karsten, Ingo, "Islam and Financial Intermediation", IMF *Staff Papers,* March 1982, pp. 108-42.

Katib, 'Abd al-Hamid al- (d. 13²/749), "Risalat Abd al-Hamid al-Katib fi Nasihat wali al- Ahd", Muhammad 'Ali Kurdi, *Rasa'il al-Bulagha'* (Cairo: 1946), pp. 173-21o.

www.pathagar.com

Katouzian, Homa, "*Riba* and Interest in an Islamic Political Economy", in *Peoples Mediterranean,* March 1979, pp. 97-109.

_____, "Shi'ism and Islamic Economics", in Nikki Keddie (ed.), *Religion and Politics in Iran* (New Haven: Yale University Press, 1983), pp. 145-65.

_____, Book Reviews on Taleghani, 1982; and M.N. Siddiqi, 1983; *International Journal of Middle East Studies,* 1985, PP. 383-416.

Kennedy, Paul, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500-2000* (New York: Random House, 1987).

Keynes, J.M., *The Collected Writings of John Maynard Keynes* (London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1972).

Khadduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984).

Khaleefa, Mohamed Uthman, "Islamic Banking in Sudan's Rural Sector", *Islamic Economic Studies,* December 1993, pp. 37-55.

Khallal, Abu Bakr al- (d. 311/923), *Al-Haththʻala al-Tijarah wa al-Sina'ah wa al-ʻAmal* (Riyadh: Dar al- Asimah, 1407 AH).

Khan, Javed Ahmad, *Islamic Economics and Finance: A Bibliography* (London: Mansell, 1995).

Khan, M. Akram, "Inflation and the Islamic Economy: A Closed Economy Model", in Ariff, 1987, pp. 237-59.

_____, "The Federal *Shari'ah* Court Judgement on *Riba* and the Unresolved Issues", *Review of Islamic Economics,* 2/1994, pp. 19-27.

_____, *Islamic Banking in Pakistan: The Future Path* (Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1994), 94 PP.

___, "Long-Term Finance in Islamic Countries: Case Study of Pakistan", in M.A. Mannan, 1996, pp. 197-226.

_____, "The Role of Government in the Economy", *AJISS,* Summer 1997, pp. 155-71.

______, *Public Finance in Islam* (A Bibliography of Works in English), (Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, n.d.).

Khan, M. Fahim (ed.), *Distribution in Macroeconomic Framework: An Islamic Perspective* (Islamabad: HIT, 1988).

_____, *Human Resource Mobilization Through the Profit-and-Loss Sharing Based Financing System* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992).

____, *Essays in Islamic Economics* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1995).

_____, (ed.), *Islamic Financial Institutions: Proceedings of a Seminar held in Jakarta, Indonesia, September, 1990* (Jeddah: IRTI/IBD, 1995).

Khan, Mohsin S., "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis", in Khan

www.pathagar.com

and Mirakhor, 1987, pp. 15-35 and 201-6.

____ and Abbas Mirakhor (eds.)., *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, TX: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987). See also the review of this book by M. Ali Khan in the *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1992, pp. 51-79.

____ and Abbas Mirakhor, "The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1989, pp. 39-57. See also the comments on this paper by Zubair Hasan in the 1991 issue of this same Journal, pp. 85-93.

______and Abbas Mirakhor, "Monetary Management in an Islamic Economy", *Journal of King Abdulaziz Umversity: Islamic Economics,* 1994, pp. 3-22.

Khan, M.A. Muqtedar, "The Philosophical Foundations of Islamic Political Economy", *AJISS,* Autumn 1996, pp. 389-400.

Khan, Shahrukh Rafi, "An Economic Analysis of PLS Model for the Financial Sector", in Khan and Mirakhor, 1987, pp. to7-24.

Khan, Tariqullah, "Demand for and Supply of Mark-up and PLS Funds in Islamic Banking: Some Alternative Explanations", *Islamic Economic Studies,* December 1995, pp. 39-77.

Khan, Waqar Masood, *Towards an Interest-Free Islamic Economic System* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985), 126pp.

______, "Towards an Interest-Free Islamic Economic System", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1989, PP. 3-38.

_____, "Savings and Investment in an Interest-Free Economy", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 277-88.

Kharabshah, Abd, "Khulasah", in Mu'assasah Al al-Bayt, 1990, Vol. 3, pp. 1337-58.

Kharufah, Alauddin, *Aqd al-Qurud fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'ssasah Nawfal, 1982).

Kindleberger, Charles P, *Manias, Panics, and Crashes* (London: Macmillan, 1978).

Klamer, A., *The New Classical Macroeconomics: Conversation with New Classical Macroeconomics and Their Opponents* (Brighton, UK: Harvester Wheatsheaf, 1984).

Klein, Lawrence R., *The Keynesian Revolution* (New York: Macmillan,1954).

Kocherlakota, Narayana, R., "The Equity Puzzle: It's Still a Puzzle", *The Journal of Economic Literature*, March, 1996, pp. 42-71.

Kramer, H. H., "Geography and Commerce", in Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The Legacy of Islam* (London: Oxford University Press, 1952). et al., "Othmanli", *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 8, 1993, pp. 190-231.

Kraus, P., "Ibn al-Rawandi", *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden, Brill,

www.pathagar.com

revised edition, 1971), Vol. 3, pp. 905-6.
Kuhn, TS., "The Function of Measurement in Modern Physical Science", Isis, 52 (1961), pp. 161-93.
____, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1st ed. 1962, and 2nd ed. 1970).
Kran, Timur., "The Economic System in Contemporary Islamic Economic Thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle Eastern Studies, 2/1986*. Reprinted in Jomo, 1992.
____, Review of Chapra's book, *Islam and the Economic Challenge*, 1992, in the *Journal of Economic Literature*, September 1993, pp. 1484-6.
____, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", *Journal of Economic Perspectives*, Autumn 1995,, pp. 155-73. See also Chapra's comment on this paper and the author's reply in Summer 1996 issue of ibid., pp. 193-6.
____, "Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited", *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, March, 1997, pp. 41-71.
Lakatos, I., "Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes", in *Criticism and the Growth of Knowledge, I.* Lakatos and A. Musgrave (eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1974), pp. 90-196.
Laliwala, J.I., "Islamic Economics: Some Issues in Definition and Methodology", *Journal of King Abdul aziz University: Islamic Economics*, 1989, pp. 129-31.
Lambton, Ann K.S., *Landlord and Peasant in Persia* (Oxford: Oxford University Press, 1953)
____, "Persia: The Breakdown of Society", in Holt et al., 1970, Vol. 1, pp. 430-67.
____, *State and Government in Medieval Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1981).
____, "Reflections on the Role of Agriculture in Medieval Persia", in Udovitch, 1981, pp. 283-312.
____, "*Kharadj* (in Persia)" in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 4, 1990, pp. 1034-53.
Landau, J.M., "*Kuttab*", in *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: Brill, Vol. 5, 1986), pp. 567-70.
Lapidus, Ira M., A *History of Islamic Societies* (Cambridge: 1988).
Lawson, Nigel, "Some Reflections on Morality and Capitalism", Brittan and Hamlin, 1995· PP. 35-44.
Lewis, Bernard, "Abbdsids", in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 1, 1960, pp. 15-26.
____, "Ottoman Observers of Ottoman Decline". *Islamic Studies*, (1962), pp. 71-87.
____, "Sources for the Economic History of the Middle East" in Cook, 1970, pp. 78-92.

www.pathagar.com

_______, "*Duyan-e-Umumiyye*", in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 2, 1991, p. 677.

_______, *The Middle East:* 2000 *years of History from the Rise of Christianity to the Present Day* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1995).

Lin, M., *Foundations of Social Research* (New York: McGraw 1976).

Lipsey, Richard G., *An Introduction to Positive Economics* (London: Weidenfeld Nicolson, 7th ed., 1989).

Lovejoy, Arthur, *The Great Chain of Being* (New York: Harper & Brothers, 1960).

Lucas, Robert E. Jr., "Some International Evidence on Output-*pp.* Inflation Trade-Offs", *American Economic. Review*, June 1973, pp. 326-34.

_______, "Econometric Policy Evaluation: A Critique", *Journal of Monetary Economics*, Supplement Series, 1/1976, pp. 19-46.

_______, and Thomas J. Sargent, "After Keynesian Macroeconomics", Federal Reserve Bank of Minneapolis, *Quarterly Review*, Spring 1979, pp. 1-16.

Lutz, Mark and Kenneth Lux, *The Challenge of Humanistic Economics* (Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1979).

_______(ed.), *Social Economics: Retrospect and Prospect* (London: Kluwer Academic, 1990).

Machlup, Fritz, *Methodology of Economics and Other Social Sciences* (New York: Academic Press, 1978).

Maddison, Angus, *Monitoring the World Economy, 1820-1992* (Paris: OECD, Development Centre Studies, 1995).

Mahboob, Abdul Hamid A.L., "Nahwa Nazariyyah fi Suluk al-Mustahlak al-Muslim wa al-Rifahiyyah al'Iqtisddiyyah" (A Theory of Muslim Consumer Behaviour and Economic Well- Being), *Review of Islamic Economics*, 2/1991, pp. 1-23.

Mahdavy, Hossein, "Islamic Banking in Iran", IIBI, 1995, pp. 221-30.

Mahdi, Muhsin, *Ibn Khaldun's Philosophy of History* (Chicago: University of Chicago Press, 1964).

Makdisi, G., *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).

Mallat Chibli (ed.), *Islamic Law and Finance* (London: Graham & Trotman, 1988).

Mani, Abdallah ibn Sulayman ibn, *Al-Waraq al-Naqdi, Haqiqatihr, Tarikhhihi, Qimatihi, Hukmihi (Riyadh:* Matabi al-Farazdaq, 2nd ed., 1984).

Mankiw, Gregory, "A Quick Refresher Course in Macroeconomics", *Journal of Economic Literature*, December 1990, pp. 1645-60.

Mankiw, Gregory, David Romer and David Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*, May

www.pathagar.com

1992, pp. 407-37.

Mannan, M.A., *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, revised ed., 1986), 425pp.

Manz, Beatrice Forbe, *The Rise and Rule of Tamerlane* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

Maqrizi, Taqi al-Din Ahmad ibn 'Ali al- (d. 846/1442), *Al-Khitat al-Maqriziyyah* (Beirut: Dar Sadir, n.d.).

_______ _____, *Ighathah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah,* 'Abd al-Nafi Tulaymat (ed.), (Hims, Syria: Dar ibn al-Wahid, 1956). See its English translatioh by Adel Allouche, 1994 (q.v.).

_______ ____, *Kitab al-Sulak li Ma' rifah Duwal al-Mulak,* Said Abd al-Fattah 'Ashur (ed.), (Cairo: Dar al-Kutub wa al-Watha'iq al-Qawmiyyah, Markaz Tahqiq al-Turath. Egyptian Arab Republic, 1971).

Maslow, Abraham, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 197o).

Masud, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).

Masudi, Abu al-Hasan 'Ali (d. 346/957), *Muraj al-Dhahab wa Ma'adirr al-Jawhar,* M. Muhy al-Din 'Abd al-Hamid (ed.), (Beirut: Al-Maktabah al- 'Asriyyah, 1988).

Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali al- (d. 45o/1058), *Adab al-Dunya wa al-Din,* Mustafa al-Saqqa (ed.), (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955).

_____, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat ai-Diniyyah* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 196o). The English translation of this book by Wafa Wahba has been published ucder the title, *The Ordinances of Government* (Reading: Garnet, 1996).

Mawdudi, Sayyid Abul A'la, *Islam awr Adl-e-Ijtima'i* (Islam and Social Justice), (Lahore: 1963).

_____, *Islam awr Jadid Ma'ashi Nazariyyat* (Lahore: Islamic Publications, 1959).

______, *Khilafat-o-Mulakiyat* (Lahore: Islamic Publications, 1966).

_____, *Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 3rd ed., 1967).

______, *Tafhim al-Qur'an* (Lahore: Maktabah Ta'mir-e-Insaniyyat, 1967-73).

______, *The Islamic Movement: The Dynamics of Values, Power and Change,* Khurram Murad (tr. and ed.), (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1984).

McCloskey, D.N., *The Rhetoric of Economics* (Brighton, UK: Harvester Wheatsheaf, 1986).

McGowan, Bruce, "The Age of the Ayans", in Inalcik (ed.), 1994, pp. 637-758.

Mehmet, Ozay, *Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery* (London: Routledge, 199o).

www.pathagar.com

Meier, Gerald M., *Leading Issues in Development Economics: Selected Materials and Commentary* (New York: Oxford University Press, 1964).

_____, *Emerging from Poverty: The Economics that Really Matter* (New York: Oxford University Press, 1984).

Metwally, Mokhtar M., *Macroeconomic Models of Islamic Doctrines* (London: J.K. Publishers, 1981).

_____, "Fiscal Policy in an Islamic Economy", in Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, pp. 59-97.

_____, "The Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy", *Journal of Research in Islamic Economics*, Summer, 1984, pp. 21-30. See also the comments on this paper by M. Umer Chapra in the Summer, 1985 issue, pp. 75-81.

_____, "A Behavioural Model of an Islamic Firm", in Tahir, Ghazali and Agil, 1992, pp. 131-8.

_____, "Attitudes of Muslims Towards Islamic Banks in a Dual- Banking System", *The American Journal of Islamic Finance* (Greenwich, CT, USA), 6/1996, pp. 1-17.

Meyer, M.S., "Economic Thought in the Ottoman Empire in the 14th- Early 19th Centuries", *Archiv Orientali*, 4/57,1989, pp. 305-18.

Mieczkowski, Bogdan, "Ibn Khaldan's Fourteenth Century Views on Bureaucracy", *The American Journal of Islamic Social Sciences*,December 1997, pp. 179-99.

Miles, G.C., "Dinar" and "Dirham", in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 2, 1991, pp. 297-9 and 319-20.

Miller, George A., *Psychology: The Science of Mental Life* (New York: Harper & Row, 1962).

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kuwait, *Al-Mawstu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'iin al-Islamiyyah, 2nd ed., 1983), 23 Volumes issued so far up to the letter *za*.

Minsky, Hyman, *Stabilising an Unstable Economy* (New Haven: Yale University Press, 1986).

Mirakhor, Abbas, "Short-Term Asset Concentration and Islamic Banking", in Khan and Mirakhor, 1987, pp. 185-99.

_____, "The Muslim Scholars and the History of Economics: A Need for Consideration", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, December 1987, pp. 245-76.

_____, "The Progress of Islamic Banking: The Case of Iran and Pakistan", in Mallat, 1988, pp. 91-115.

_____, and Iqbal Zaidi, "Stabilization and Growth in an Open Economy", IMF Working Paper (Washington, DC: IMF, 198')).

Misri, Rafiq Yunus al-, *Al-Islam wa al-Nuqud* (Jeddah: King 'Abdulaziz University, 1981).

www.pathagar.com

______ , "Al-Nizam al-Masrafi al-Islami: Khasa'isihi wa Mushkilatihi", in ICRIE/KAU, 1985, pp.161-262.
______ , Al-Riba *wa al-Hasm al-Zamani fi al-Iqtisad al-Islami* (Jeddah: Sharikah al-Madinah li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1986).
_____, *Al-Hasm al-Zamani* (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1987).
_____, *Bay' al-Taqsit: Tahlil Fiqhi wa lqtisadi* (Damascus: Dar al-Qalam, 1st ed., 199o; 2nd ed., 1997).
_____________, *Al-Jami' fi Usal al-Riba* (Damascus: Dar al-Qalam, 1991).
_____, "Al-Zakat wa al-Nizam al-Daribi al-Mu 'asir" *(Zakat* and the Modern Taxation System), *Review of Islamic Economics*, 2/1994, pp. 61-95.
______, *Al-Masarif al-Islamiyyah Dira sah Shar'iyyah li Adad Minha* (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1995).
______, "Ta'zim al-Ribh: Hal Huwa Ja'iz fi al-Islam", Al-Amwal/(Jeddah), October-December 1997, pp. 8o-1.
Molla, Rafiqul Islam et al. (eds.), *Frontiers and Mechanics of Islamic Economics* (Nigeria: University of Sokoto, 1988).
Moore, Philip, *Islamic Finance: A Partnership for Growth* (London: Euromoney, 1997).
Morawetz, David, *Twenty-Five Years of Economic Development: 1950 to 1975* (Washington, DC: IBRD, 1977).
Morgan, D.O., "Mongols", in *The Encyclopaedia of Islam, Vol. 7,* 1993, pp. 230-5.
Moten, A. Rashid, "Democratic and *Shura-Based* Systems: A Comparative Analysis", *Encounters* (Leicester, UK: The Islamic Foundation), March 1997, pp. 3-20.
Mu'assasah Al al-Bayt, Al-Majma' al-Maliki li Buhuth al-Hadarah al-Islamiyyah.' *Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Islam* (Amman, Jordan: Mu'assasah Al al-Bayt, 3 Volumes, 1989).
Mudawi, Al-Bagkir Yeossef, "Medium- and Long-Term Finance by Islamic Financial Institutions", *Journal of Islamic Banking and Finance,* 2/1986, pp. 16-35.
______, "The Experience of Islamic Banks in the Sudan", in IIBI, 1995, pp. 246-50.
Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami, see Organization of the Islamic Conference (OIC).
Mundhari, Abd al- Azim al- (d. 656/1258), *Al-Targhib wa al-Tarhib,* Mustafa M.Amarah (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1986).
Musallam, Adnan M., "Sayyid Qutb and Social Justice, 1945-1948", *Journal of Islamic Studies,* 4/1 (1993), pp. 52-70

www.pathagar.com

Musallam; B.F., "Birth Control and Middle Eastern History: Evidence and Hypotheses", in Udovitch, 1981, pp. 419-70.

Musgrave, Richard A., *The Theory of Public Finance: Study in Public Economy* (New York: McGraw Hill, 1959).

Muslim, Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi (d. 261/874), *Sahih Muslim*, Muhammad Fu' ad Abd al-Baqi (ed.), (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1374/1955).

Myers, David G., *The Pursuit of Happiness: Who is Happy and Why?* (New York: Avon, 1993).

Myers, Milton L., *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith* (Chicago: University of Chicago Press, 1983).

Myrdal, Gunnar, *Asian Drama* (New York: The Twentieth Century Fund, 1968).

______, *Objectivity in Social Research* (London: Gerald Duckworth, 1970).

Nadwi, Ali Ahmad al-, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1986).

Nagel, E., *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation* (London: Routledge & Kegan Paul, 1961).

Najjar, Ahmad al-, "Al-Mushkilat al-lati Tuwajihu al-Bunuk al-Islamiyyah fi al-Tatbiq", in Mu'assasah Al al-Bayt, 1989, Vol. 1, pp. 13-32.

Najjar, Zaghlul Raghib al-, *Qadiyyah al-Takhalluf al-Ilmi wa al-Taqani fī al-Alan, al-Islami* (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Shar'iyyah wa al-Shu'un al-Diniyyah, 1409 AH).

Naqvi, S.N.H., *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981). See also the Review of M. Umer Chapra on this book in *The Muslim World Book Review* (Leicester, UK: The Islamic Foundation), 1/198i, pp. 21-6.

_____, "Interest Rate and Intertemporal Anocative Efficiency in an Islamic Economy", in Ariff, 1982, pp. 75-106.

______, *Islam, Economics, and Society* (London: Kegan Paul, 1994).

Nasa'i, Imam Abu Abd al-Rahman ibn Shu'ayb al- (d. 303/915), *Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964).

Nasr, Seyyed Hossein and Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy* (London and New York: Routledge, 1996).

Nasr, Seyyed Vali Reza, "Whither Islamic Economics?" *The Islamic Quarterly*, Vol. 20, No. 4, Fourth Quarter 1986, pp. 211-20.

_____, "Towards a Philosophy of Islamic Economics", *Hamdard Islamicus* (Karachi), 4/1989, pp. 45-60.

_____, "Islamic Economics: Novel Perspectives", *Middle Eastern Studies* (London), 4/1989, pp. 516-30.

_____, "Islamisation of Knowledge: A Critical Overview", *Islamic Studies*, Autumn 1991, pp. 387-400.

www.pathagar.com

Nawas, John A., "A Re-Examination of Three Current Explanations for al-Ma'mun's Introduction of the *Mihna", International Journal of Middle East Studies* (Cambridge, UK), 1994, pp. 615-29.

Nienhaus, Volker, "Islamic Economic Finance and Banking: Theory and Practice", *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2/1985, PP. 36-54.

_____, "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases", in Mallat, 1988, pp. 129-70.

Nizam al-Mulk, see Tusi, Nizam al-Mulk.

Nomani, Farhad and Ali Rahnama, *Islamic Economic Systems* (London: Zed Books, 1994).

Noonan, John T. Jr., *The Scholastic Analysis of Usury* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957).

Norman, Daniel, *Islam and the West: The Making of an Image* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960).

______, *The Arabs and Medieval Europe* (London: Longman, 1975). North, Douglas C., *Structure and Change in Economic History* (New York: W.W. Norton, 1981).

_____, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

______, "Economic Performance Through Time", *The American Economic Review*, June 1994, pp. 359-68.

_____, and Robert Paul Thomas. *The Rise of the Western World: A New Economic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973).

Nyazee, Imran A.K., *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: HIT, 1994).

Oghli, Sahili Khalil, "Maliyyat al-Dawlah al- Uthmaniyyah", in Mu'assasah Al al-Bayt, Vol. 2, 1989, pp. 591-656.

Okun, Arthur, *Equality and Efficiency: The Big Trade-Off* (Washington, DC: The Brooking Institution, 1975).

Olson, Mancur, *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities* (New Haven: Yale University Press, 1982).

OECD, *Ethics in the Public Service: Current Issues and Practice* (Paris: OECD, Public Management Occasional Papers, No. 14, 1996).

_____, *Financing and External Debt of Developing Countries*, Annual Survey.

Organization of the Islamic Conference (OIC), Majma al-Fighi al-Islami, *Qararat wa Tawsiyat*, 1406-9 (1985-8), (Jeddah: OIC, n.d.).

Osman Fathi, "The Contract for the Appointment of the Head of an Islamic State: *Bay 'at al-Imam"*, in Mumtaz Ahmad, 1986, pp. 51-85.

Sahwah, 1994).

Qaranshawi, Hatim A. al-, "Tamwii al-Tanmiyah fi Itar Islami", in Kahf, 1988-9, pp. 175-91.

www.pathagar.com

Quataert, Donald, "The Age of Reforms, 1812-1914", in Inalcik, 1994, PP. 861-943.

Qudama, Ja'far ibn, *"Kitab al-Kharaj", Taxation in Islam,* Ben Shemesh (ed.), (Leiden: E.J. Brill, 1965). This book has been translated into English by Ben Shemesh, (q.v.). Vol. 2, 1965.

Qurashi, Yabya ibn Adam al- (d. 203/818), *Kitab ai-Kharaj,* Ahmad Muhammad Shakir (ed.), (Cairo: Al-Matba'ah ai-Salafiyyah, 2nd ed., 1384 AH). This book has been translated into English by Ben Shemesh (q.v.).

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest* (Lahore: S. Muhammad Ashraf, 1945).

Qureshi, D.M., "Agenda for a New Strategy of Equity Financing by the Islamic Development Bank", *Islamic Economic Studies,* December 1993, pp. 71-88.

Qurtubi, "Abu Umar Hafiz ibn Abd al-Barr al-Namiri al- (d. 463/ 1070), *Jami Bayan al-Ilm wa Fadluhu* (Madinah: al-Maktabah al- Ilmiyyah, n.d.).

Qutb, Sayyid, *Al-Adalah al-ljtima'iyyah fi al-Islam* (Cairo:, Isa al-Babi al-Halabi, 6th ed., 1964), John B. Hardie (tr.), *Social Justice in Islam* (Washington: DC: American Council of Learned Societies, 1970).

_____, *Fi Zilal al-Qur'an* (Jeddah: Dar al-Qalam, 1986). Rabie, Hassanein, *The Financial System of Egypt: 564-741/1169-1341* (London: Oxford University Press, 1972).

_____, "The Size and Value of the Iqta in Egypt, 564-741 AH (1169-1341 AD)", in Cook, 1970, pp. 129-38.

Rahim, M.A., "Some Early Works on Islamic Economics", in *Thoughts on Islamic Economics* (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 1980), pp. 319-27.

Rahman, Fazlur, "Riba and Interest", *Islamic Studies,* March 1964, PP.1-43.

_____, *Islamic Methodology in History* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1965).

Rashid, Abdul Aziz al-Nasir al-, *Ifadat al-Sa'il fi ahamm al-Fatawa wa al-Masa'il* (Riyadh: Dar al-Rashid li al-Nashr wa al-Tawzi', 2nd ed., 1980).

Rashid, Salim, "An Agenda for Muslim Economists: A Historico-Inductive Approach", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1991, pp. 45-55.

Rawls, John, "Justice is Fairness", *Philosophical Review,* Vol. 67 (1958), pp. 164-94.

Raysuni, Ahmad al-, *al-Nazariyyah al-Maqasid Inda al-Imam al-Shatibi* (Riyadh: Al-Dar al- Alamiyyah lil Kitab al-Islami, 2nd ed., 1992).

Rayyis, Muhammad Diya al-Din al-, *Al-Kharaj wa al-Nuzum al-Maliyyah li al-Dawlah al-Islamiyyah* (Cairo: al-Maktabah al-Angelo al-Misriyyah, 2nd ed., 1961).

Razi, Fakhr al-Din al- (d. 606/1209), *Al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 3rd ed., n.d.).

www.pathagar.com

Reinhart, A. Kevin, *Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral Thought* (Albany: State University of New York Press, 1995)

Richards, D. S. (ed.), *Islam and the Trade of Asia* (Oxford and Philadelphia, 1970).

Rida, Shaykh Muhammad Rashid (d. 1354/1935), *Al-Wahi al-Muhammadi* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1352 AH).

_____, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim,* also called *Tafsir al-Manar* (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 4th ed., 1954).

______, *Al-Riba wa al-Mu'amalat fi al-Islam* (Cairo: Maktabah al- Qahirah, 1960).

Robbins, Lionel, *An Essay in the Nature and Significance of Economic Science* (London: Macmillan, 2nd ed., 1935).

Roberts, Bruce and Susan Feiner, *Radical Economics* (London: Kluwer Academic, 1992).

Robinson, Joan, "What are the Questions? *Journal of Economic Literature,* December 1997.

Roded, Ruth, *Women in Islamic Biographical Collections from Ibn Sa'd to Who's Who* (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1994).

Rodinson, Maxime, *Islam and Capitalism,* Brian Pearce (tr.) (London: 1974).

Roepke, Wilhelm, "Ordered Anarchy", in Lawrence Stepelwich (ed.), 1977, pp. 29-81. The excerpts here are from Roepke's *Economics of the Free Society, A Humane Economy,* and *International Economic Disintegration.*

Rosenberg, Alexander, *Economics: Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns* (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

Rosenthal, Franz, "The Technique and Approach of Muslim Scholarship", *Analecta Orientalia* (Rome, Pontificam Institut"m Biblicum, Vol. [2]4, [1]947), pp. 1-73.

_______, *Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to Histor* (London: Routledge & Kegan Paul, 1st ed., 1958; 2nd ed., 1967), 3 Volumes.

Rosly, Saiful Azhar, "Welfare Implications of Interest-Free Bank Asset Management", *Journal of Islamic Economics,* July 1989, pp. 109-18.

Rostow, W.W., *The World Economy: History and Prospects* (London: Macmillan, 1978).

Routh, Guy, *The Origin of Economic Ideas* (London: Macmillan, 2ild ed., 1989).

Rozina, Parveen, "Ibn Khaldun as an Economist: A Comparative Study with Modern Economists", *Pakistan Journal of History and Culture* (Islamabad, Pakistan), 15:1, 1994, pp. I11-30.

Russell, Bertrand, *A History of Western Philosophy* (New York: Simon & Schuster, 1945).

www.pathagar.com

Saadallah, Ridha, "Concept of Time in Islamic Economics", *Islamic Economic Studies*, December 1994, pp. 81-102.

Sadeq, Abul Hasan M., *Economic Development in Islam* (Malaysia: Pelanduk, 1990).

---- (ed.), *Financing Economic Development: Islamic and Mainstream Approach* (Malaysia: Longmans, 1992).

Sadr, M. Baqir al-, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Fikr, 1st ed., 1961; 14th ed., 1981). The English translation by the Peer Mohammed Ebrahim Trust of Pakistan was published under the title, *Our Economics* (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1982). Parts of the book were also translated by Ian Howard of Edinburgh University and published in the Islamic Studies magazine, *Al-Sirat,* which is no longer in circulation. See Rodney Wilson, 1998, for an analysis of the contents of this and other writings of al-Sadr.

Saeed, Abdullah, "The Moral Context of the Prohibition of *Riba* in Islam Revisited", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* Winter 1995, pp. 496-517.

Salama, Abidin Ahmad, "Fiscal Analysis of Zakat with Special Reference to Saudi Arabia's Experience in Zakah", in Ariff, 1982, PP. 341-74.

____, "Fiscal Policy of an Islamic State", in Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, pp. 99-129.

_____, "Utilization of Financial Instruments: A Case Study of Faisal Islamic Bank (Sudan)", *Journal of Islamic Banking and Finance,* 2/1987, pp. 24-40.

Saleh, Nabil, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Samarraie, Husam Q. al-, *Agriculture in Iraq During the 3rd Century AH* (Beirut: Librairie du Liban, 1972).

Samuels, Warren, "Institutional Economics", *The New Palgrave Dictionary of Economics* (London: Macmillan, 1987), Vol. 2, pp. 864-6.

Samuelson, Paul A., *The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson,* George Stiglitz (ed.), (Cambridge, MA: MIT Press, 1966 and 1972).

Sanhuri, Abd al-Razzaq al-, *Masadir al-Haqqfi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1953-4).

Sarakhsi, Shams al-Din al- (d. 483/1090), *Kitab al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), particularly *"Kitab al-Kasb"* of alShaybani in Vol. 30, pp. 245-87.

Sarton, George, *Introduction to the History of Science* (Washington, DC: Carnegie Institute, 3 Volumes issued between 1927 and 1948, the 2nd and 3rd each in two parts).

Sato, Tsugitaka, *State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta's and Fallahun* (Leiden: Brill Academic Publishers, 1997).

www.pathagar.com

Saunders, John J. (ed.), *The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1966).

Sayyid, 'Ashur M. al-, *Abul-Fadl Ja'far b. 'Ali al-Dimashqi Abul-Igtisad* (Cairo: Dar al-Ittihad al- 'Arabi li-l-Tab, 1973).

Schadwick, Owen, *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century* (Cambridge, Cambridge University Press, 1975).

Schatzmiller, Maya, *Labour in the Medieval Islamic World* (Leiden: Brill, 1994).

Schumpeter, Joseph A., *History of Economic Analysis*, Elizabeth B. Schumpeter (ed.), (New York: Oxford University Press, 1954). Schweitzer, Alfred, *The Philosophy of Civilization* (New York: 1949). Searth, Wan, "Bond Financed Fiscal Policy and the Problem of Instrument Instability", *Journal of Macroeconomics*, 1979, pp. 107-17.

Sen, Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981).

____, *On Ethics and Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1987). Sewharwi, M. Hifz al-Rahman, *Islam ka Iqtisadi Nizam* (Urdu), (Delhi: Nadwah al-Musannifin, 1st ed., 1358/1939; 5th ed., 1379/1950).

Sezgin, Fu'ad, *Tarikh al-Turath al-Arabi'* (History of Arab Legacy), Mahmud Fahmi Hijazi (tr.), (Riyadh: Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, First Volume 1983, followed by other Volumes in later years).

Shah, Syed Yaqub, *Chand Ma'ashi Masail awr Islam* (Urdu), (Lahore: Idarah Thaqafat-e-Islami, 1967).

Shahrastani, Abu al-Fath Muhammad ibn Abd al-Karim al- (d. 548/ 1153), *Al-Milal wa al-Natal*, Muhammad Sayyid Kaylani (ed.), (Cairo: Mustafa al-Babr 1961).

Shalabi, Ahmed, *History of Islamic Education* (Cairo: Egyptian Anglo Library, 2nd ed., 196o).

Shalaq, al-Fadl, "Al-Hisbah: Dirasah fi Sliar'iyyah al-Mujtama' wa al-Dawlah", *Al-Ijtihad*, Winter 1989 (Beirut: Dar al-Ijtihad lil Abhath wa al-Tarjumah wa al-Nashr), pp. 15-89.

Sharif, M.M. (ed.), A *History of Muslim Philosophy* (Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1963), 2 Volumes.

Shatibi, Abu Ishaq al- (d. 790/1388), *al-I'tisam* (Beirut: Matba'ah al-Manar 1913).

_____, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.).

Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan al- (d. 189/804), *Kitab al-Kasb*, Abd al-Fattah Abu Ghuddah (ed.), (Halab, Syria: Maktab al-Matbu at al-Islamiyyah, 1977).

______, *Kitab al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustatab*, Suhayl Zakkar (ed.), (Damascus, 1980).

Shayzari, 'Abd al-Rahman al- (d. 589/1193), *Nihayat al-Rutbah ff Talab al-Hisbah*

www.pathagar.com

(Cairo, 1946).

Shihabi, Mustafa al- et al., *"Filaha"*, in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 2, 1965, pp. 899-910.

Shirazi, H. (ed.), *Islamic Banking Contracts* (Tehran: Central Bank of Iran, 1988).

Siba'I, Shaikh Mustafa al-, *Ishtirakiyyah al-Islam* (Damascus: Mu'assasah al-Matbu 'at al- Arabiyyah, 2nd ed., 196o).

Siddiqi, M. Nejatullah, *Economic Enterprise in Islam* (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1972).

_____, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1981)

_____, *Issues in Islamic Banking* (Leicester, UK: The Islami Foundation, 1983).

_____, "An Islamic Approach to Economics", in IIIT, 1988, pp. 155-74.

_____, "History of Islamic Economic Thought", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 69-9o.

_____, "Towards Regeneration: Shifting Priorities in Islamic Movements", *Encounters* (Leicester, UK: The Islamic Foundation), September 1995, pp. 3-29.

_____, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1996).

_____, *Teaching Economics in Islamic Perspective* (Jeddah: Scientific Publishing Centre, 1996), 244PP.

Siddiqui, Shamim A. and Asad Zaman, "Investment and Income Distribution Pattern Under Musharakah Finance", I: The Certainty Case, *Pakistan Journal of Applied Economics,* 1/1989; II: The Uncertainty Case, *Pakistan Journal of Applied Economics,* 2/1989.

____, and Mohsin Fardmanesh, "Saving and Investment .Under *Mudarabah* Finance", *Review of Islamic Economics,* 1/1992, pp. 31-51.

_____, and Mohsin Fardmanesh, "Financial Stability and a Share Economy", *Eastern Economic Journal* (USA), Spring 1994.

Siegel, Jeremy J., "The Equity Premium: Stock and Bond Returns Since 1802", *Financial Analyst's Journal,* January-February 1992, pp. 28-38.

____, and Richard H. Thaler, "Anomalies: The Equity Premium Puzzle", *Journal of Economic Perspectives,* Winter 1997, pp. 191-200.

Simons, Henry, *Economic Policy for a Free Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1948).

Skinner, Quentin (ed.), *The Return of the Grand Theory in the Human Sciences* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Smith, Adam (d. 1790), *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth*

www.pathagar.com

of Nations (1776), (New York: The Modern Library, 1937).

Snooks, Graeme Donald, *Economics Without Time: A Science Blind to the Forces of Historical Change* (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1993).

Solo, Robert A. and Charles W. Anderson (eds.), *Value Judgement and Income Distribution* (New York: Praeger, 1981).

Sorokin, Pitirim, *Social Philosophies of an Age of Crisis* (Boston: Beacon, 1951).

Spengler, Joseph, "Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun", *Comparative Studies in Society and History,* April I 964, pp. 26-306.

Spengler, Oswald, *Decline of the West* (New York: 1947).

Spuler, Bertold, *The Mongol Period: History of the Muslim World* (Princeton, NJ: Marcus Wiener, 1996).

_____, and R. Ettinghausen, "Ilkhans", in *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 3, 1986, pp. 1120-7.

Stark, Oded, *Altruism and Beyond: An Economic Analysis of Transfers and Exchanges Within Families and Groups* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

State Bank of Pakistan, *Banking Statistics of Pakistan, 1988-89* (Karachi: State Rank of Pakistan, 1991).

_____,, *State Bank News,* 16 June 1998.

_____, *Statistical Bulletin* (Karachi: State Bank of Pakistan, issued monthly).

Steplevich, Lawrence S. (ed.), *The Capitalist Reader* (New Rochelle, NY: Arlington, 1977).

Steven, Abdulkader, "Summary Analysis of the 1992 North American Survey for Islamic Finance", *The American Journal of Islamic Finance,* April 1993, pp. *5-8*.

Stigler, G., *Production and Distribution Theories: The Formative Period* (New York: Macmillan, 1941).

Streeten, Paul, *Development Perspectives* (London: Macmillan, 1981).

Suhaibani, M.I., *Athar al-Zakat ala Tashghil al-Mawarid al-lqtisadiyyah* (Effect of *Zakat* on the Employment of Economic Resources), (Riyadh: al-ʿUbaykan, 1990).

Sulayman, Sami Ramadan, "Majalat Fard Dara'ib Jadidah min Muntalaq Islami in *Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Islam* (Amman: Mu'assasah Al al-Bayt, 1990), Vol. 3, pp. 1013-54.

Sultan, Salah, *Saltat Wali al-Amr fi Fard Waza'if Maliyyah (Dara'ib)* (Cairo: Dar Hijr, 1409/1988).

Suyuti, Jalal al-Din al- (d. 911/1505), *al-Jami' al-Saghir* (Cairo: 'Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, n.d.), Vol. 2, p. 96.

Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al- (d. 310/923), *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).

www.pathagar.com

Tabrizi, Wali al-Din al-, *Mishkat al-Masabih*, M. Nasir al- Din al-Albani (ed.), (Damascus: al-Maktabah al-Islarni, 1381 AH).

______, "Macro-Consumption Function in an Islamic Framework",in *Journal of Research in Islamic Economics*, Summer 1984, pp. 57-62.

_____, "Risk Aversion, Moral Hazard and Financial Islamization Policy", *Review of Islamic Economics*, 1/1991, pp. 49-66.

Tag El-Din, S.I., "Debt and Equity in a Primary Financial Market: A Theory with Islamic Implications", *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 1992, pp. 3-33.

_____, "Ma Huwa al-Iqtisad al-Islami?" (What is Islamic Economics?), *Review of Islamic Economics*, 2/1994, pp. 97-100.

Tahir, Sayyid, Aidit Ghazali and Syed Omar Syed Agil (eds.), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Malaysia: Longman, 1992).

Taheri, Amir, "Turkey Experiences Own Kulturkampf', *Arab News*, 7 August 1997.

Talbi, M., *"Hisba"*, in *The Encyclopaedia of Islam. 1991,.Vol.* 3, pp. 4^85~93.

_______ _____, "Ibn Khaldun", in *The Encyclopaedia of Islam* .(Leiden: Brill, 1986), Vol. 3, pp. 825-31.

Taleghani, Ayatullah Sayyid Mahmud, *Society and Economics in Islam*, R. Campbell (tr.), (Berkeley, CA: Mizan Press, 1982).

Tamimi, Azzam, "Democracy in Islamic Political Thought", *Encounters* (Leicester, UK: The Islamic Fotindation), March 1997, PP. 21-44.

Tantawi, Ali al- and Naji al-Tantawi, *Akhbaru Umar wa Abdullah ibn Umar* (Damascus: Dar al-Fikr, 1959).

Tawney, R.H., *The Acquisitive Society* (New York: Harcourt Brace, 1948).

Thomas, Abdulkader Steven, *What Is Permissible Now: A Collection of Essays Discussing Islamic Financial Principles and How They May be Applied in Modern Financial Systems and Among Muslim Minorities* (Singapore: The Muslim Converts' Association of Singapore, 1995).

Thurow, Lester, *Zero-Sum Society* (New York: Basic Books, 198o).

Thweatt, W.O., "Origins of the Terminology, Supply and Demand", *Scottish Journal of Political Economy, November* 1983, pp. 287-94. Tibawi, A.L., "Muslim Education in the Golden Age of the Caliphate", *Islamic Culture* (Hyderabad), 1954, pp. 418-38.

____, "Origin and Character of al-Madrasah", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1962, pp. 225-38.

Tirmidhi, Imam Muhammad ibn 'isa al- (d. 279/892), *Jami'al Tirmidhi* with commentary, *Tuhfat al-Ahwadhi* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.).

Toutounchian, Iraj, "Resource Mobilization for Government Expenditures Through Islamic Modes of Contract: The Case of Iran", *Islamic Economic Studies*, June 1995, pp. 35-58.

www.pathagar.com

_____, "Some Consideration on the Size of the Public Sector in the Islamic Republic of Iran", in M.A. Mannan, 1996, pp. 247-84.

Toynbee, Arnold J., *A Study of History* (London: Oxford University Press, 2nd ed., 1935).

_____, *A Study of History,* abridgement by D.C. Somervell (London: Oxford University Press, 1957).

Turabi, Hasan, "Principles of Governance, Freedom and Responsibility in Islam", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* September 1987, pp. 1-11.

Turtushi, Abu Bakr Muhammad al-Walid al-Fahri al- (d. 52o/1 27), *Siraj al-Muluk,* Muhammad Fathi Abu Bakr (ed.), (Cairo: Al Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah, 1994), 2 Volumes.

Tusi, Nasir al-Din al- (d. 672/1274), *Majmu'ah Rasa'il az Ta'lifat-i-KhwajaNasir al-Din Tusi* (Tehran: University of Tehran, 1956).

_____, *Akhlaq-i-Nasiri* (The Nasirean Ethics), G.M. Wickens (ed.), (London: Allen & Unwin, 1964).

Tusi, Nizam al-Mulk al- (d. 485/1092), *Siyasat Namah,* translated into English under the title *The Book of Government or Rules for Kings* by Herbert Darke (London: 1961).

Udovitch, Abraham L., "At the Origins of the Western *Commenda:* Islam, Israel, Byzantium?" *Speculum, 37,* 1962, pp. 198-207.

_____, *Partnership and Profit in Medieval Islam* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970).

_____(ed.), *The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History* (Princeton, NJ: The Darwin Press, 1981).

_____, "Bankers Without Banks: Commerce, Banking and Society in the Islamic World of the Middle Ages", Princeton Near East Paper No. 3o (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981).

Urvoy, Dominique, *Ibn Rushd,* Olivia Stewart (tr.), (London: Routledge, 1991).

Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998).

Uzair, Muhammad, "Central Banking Operations in an Interest-Free Banking System", in Ariff, 1982, pp. 211-36.

_____, "Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking" in K. Ahmad, 198o, pp. 37-58.

Valiuddin, Mir, "Mu'tazilism", in M.M. Sharif, 1963, Vol. i, pp. 199-22o.

Van Den Bergh, Simon (tr.), *Averroe's Tahafut al-Tahafut* (The Incoherence of the Incoherence), (Cambridge, UK: The Gibb Memorial Trust, 1954; reprinted in 1969, 1979 and 1987 by Luzac & Co., London), 2 Volumes. See also Ibn Rushd, 1992.

Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk*

www.pathagar.com

and Return (London: Kluwer Law International, 1998).

Waghid, Yusuf, "Islamic Educational Institutions: Can the Heritage be Sustained?" *American Journal of Islamic Social Sciences,* Winter 1997· PP. 35˙49.

Waliullah, Shah (d. 117611762), *Hujjatullah al-Balighah,* M. Sharif Sukkar (ed.), (Beirut: Dar Ihya' al- 'Ulum, 2nd ed., 1992), 2 Volumes. An English translation of this book by Marcia K. Hermanses was published in 1996 by E.J. Brill, Leiden.

Ward, Benjamin, *What's Wrong with Economics?* (New York: Basic Books, 1972).

Warnock, G.J., "Reason", *The Encyclopaedia of Philosophy* (New York: Macmillan, 1972), Vol. 7, pp. 83-5.

Watson, Andrew M., "A Medieval Green Revolution: New Crops and Farming Techniques in the Early Islamic World", in Udovitch, 1981, pp. 29-58.

______. *Agricultural Innovation in the Early Islamic World: The Diffusion of Crops and Farming Techniques: 700-1100* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

Watt, W. Montgomery, *Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963).

___, *The Influence of Islam on Medieval Europe* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972).

______, *The Formative Period of Islamic Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973).

Weiss, Dieter, "Ibn Khaldun on Economic Transformation", *International Journal of Middle Eastern Studies* (Cambridge,, UK), November 1995, pp. 27-39.

Westerlund, David (ed.), *Questioning the Secular State: The Worldwide Resurgence of Religion in Politics* (London: C. Hurst, 1996).

Wiles, Peter and Guy Routh (eds.), *Economics in Disarray* (Oxford: Basil Blackwell, 1984).

Williamson, John, *The Political Economy of Policy Reform* (Washington, DC: Institute for international Economics, 1993).

Wilson, Rodney, "Islamic Banking in Jordan", *Arab Law Quarterly,* 3/1987, pp. 207-29.

_____*(ed.), Islamic Financial Markets* (London: Routledge, 1990).

______, "Quantifying the Islamic Financial Market Size", *New Horizon* (London), August 1996, pp. 9-14, and September 1996. pp. 13-15.

______, *Economics, Ethics and Religion* (London: Macmillan, 1997)."The Contribution of Muhammad Baqir al-Sadr to Contemporary Islamic Economic Thought", *Journal of Islamic Studies, 9/1,* 1998, pp. 46-59.

Wiseman, Jack, "The Black Box", *Economic Journal,* January 1991, p. 150.

Wohlers-Scharf, Traute, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: OECD, 1983).

www.pathagar.com

World Bank, *Global Development Finance,* previously entitled *World Debt Tables.*
______, *World Development Report,* Annual publication. Wright, J.W. Jr., "Muslim Attitudes Toward Islamic Finance: A Review Lecture and an American Survey", in Ehsan Ahmed, 1996, pp. 123-34.

Yalcintas, Nevzat, "Problems of Research in Islamic Economics: General Background", in IRTI (1986), pp. 23-41.

Yusufuddin, Muhammad, *Islam ke Ma'ashi Nazariyye* (Hyderabad: Matba'ah Ibrahimiyyah, 2nd ed., 195o).

Zaim, Sabahuddin, "Contemporary Turkish Literature on Islamic Economics", in K. Ahmad, 198o, pp. 317-52.

Zaman, Asad, "Towards Foundations for an Islamic Theory of Consumer", in Tahir, Ghazali and Agil, 1992, pp. 81-9.

Zaman, M. Qasim, *Religion and Politics Under the Early Abbasids* (Leiden: Brill, 1997).

Zangeneh, Hamid, "Islamic Banking: Theory and Practice in Iran", *Comparative Economic Studies,* Autumn 1989, pp. 67-84.

______, and Ahmad Salam, "Central Banking in an Interest-Free Banking System", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* 1993, pp. 25-35.

Zarqa, M. Anas, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", in K. Ahmad, 1980, pp. 3-118.

_____, "Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-Free Islamic Economy", *Journal of Economics and Administration* (Jeddah, Saudi Arabia), November 1982, pp. 43-55.

______, "An Islamic Perspective on the Economics of Discounting in Project Evaluation", in Ahmed, Iqbal and Khan, 1983, pp. 203-34.

________, "Stability in an Interest-Free Economy: A Note", *Pakistan Journal of Applied Economics,* 1983, pp. 181-8.

_____, "Problems of Research in the Theory of Islamic Economics: Suggested Solutions".

_______ "Qawa'id al-Mubadalat fi al-Fiqh al-Islami: al-Muqaddimah li al-Iqtisadiyyin" (Rules of Exchange in Islamic Jurisprudence: An Introduction for Economists), *Review of Islamic Economics,* 2/1991, pp. 35-70. See also the rejoinder to this paper by M.L.A. Bashar in the same Journal, 1/1095, pp. 17-27.

______, "A Partial Relationship in a Muslim's Utiiity Function", in Tahir, Ghazali and Agil, 1992, pp. 105-12.

_______, "Methodology of Islamic Economics", in Ahmad and Awan, 1992, pp. 49-67.

_______, *"Shari' ah* Compatible Shares: A Suggested Formula and Rationale", in M.A. Mannar.. '1996, pp. 21-36.

www.pathagar.com

______ and M. Ali El-Gari, "Al-Ta'wid 'an Darar al-Mumatalah fi al-Dayn bayn al-Fiqh wa al-Iqtisad", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 1991, pp. 25-57; see also the comments by M. Zaki Abd al-Barr and Habib al-Kaf on pp. 61-4.

Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *Al-Fiqhal-Islami fi Thawbihi al-Jadid* (Damascus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967).

______, *Al-Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadith* (Damascus: Dar al-Qalam, 1996).

Zebiri, Kate, *Mahmud Shaltut and Islamic Modernism* (New York: Oxford University Press, 1993).

Ziadeh, Nicolas, *Al-Hisabah and Al-Muhtasib in Islam: Old Texts Collected and Edited with an Introduction* (Beirili.: Catholic Press, 1962).

Zilfi, Madeline C. (ed.), *Women in the Ottoman Empire* (Leiden: Brill Academic Publishers, 1997).

Zineldin, Mosad, *The Economics of Money and Banking: A Theoretical Study of Islamic Interest-Free Banking* (Stockholm: Almqvist & Wicksell International, 1990). See also the review of this book by M. Nejatullah Siddiqi, in the *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 1994, pp. 43-6.

Zu'ayr, M. Abd al-Hakim, *"Fatwa* and *Shari'ah* Supervision at Islamic Banks", *The American Journal of Islamic Finance*, (Rancho Palos Verdes, CA), 3/1995, pp. 4-6.

______, "Ta'akhkhur al-Madinin 'an al-Sidad", *Al-Iqtisad al-Islami*, July 1997, pp. 50-7.

Zurayk, C.K., *"Djami'a"*, in *The Encyclopaedia of Isiam, Vol. 2*, 1992, pp. 422-7.

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. এম উমর চাপরা ১৯৩৩ সালে সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এ রিসার্চ এডভাইজর হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৬৫ সালের জুলাই থেকে তিনি সউদী এরাবিয়ান মনিটারী এজেন্সীতে সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি অর্থনীতিতে অধ্যাপনা করেন যথাক্রমে উইসকনসিন, প্রাটিভিল, কেন্টাকি (লেক্সিনটন) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্স-এর তিনি সিনিয়র ইকনোমিস্ট এবং পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ-এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ-এর রিডার ছিলেন। ইসলামী অর্থনীতি ও ফিন্যান্সের উপর তিনি বেশ কিছু বই, মনোগ্রাফ এবং সত্তরটিরও অধিক প্রফেশনাল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছেঃ 'টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম (১৯৮৫)', 'ইসলাম এন্ড ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (১৯৮৮)' 'ইসলাম এন্ড দি ইকনোমিক চ্যালেঞ্জ (১৯৯২)' এবং 'দা ফিউচার অব ইকোনোমিকস: এন ইসলামিক পারসপেকটিভ (২০০০)।' ইসলামী অর্থনীতিতে তাঁর এরূপ বহুবিধ অবদানের জন্য ১৯৮৯ সালে তিনি অর্থনীতিতে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার' এবং ইসলামী স্টাডিজে 'বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেন।

www.pathagar.com